‘‘বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৯০১-১৯৫০)’’

পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ-২০১৪ ইং

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক

মোঃ মাছউদুর রহমান

পিএইচ.ডি. গবেষক

রেজিঃ নং ও শিক্ষাবর্ষঃ ৫৯ / ২০১৩-২০১৪ (পুনঃ)

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. মোঃ ছানাউল্লাহ

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ মাছউদুর রহমান, পিএইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় **‘বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৯০১-১৯৫০)’** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছে। আমি তার রচিত পাণ্ডুলিপি মনোযোগ সহকারে পড়েছি এবং গত কয়েক বছর যাবৎ সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছি। এটা তার একক রচনা। আমার জানা মতে, অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় / প্রতিষ্ঠান / সংস্থায় কোন প্রকার ডিগ্রি / ডিপ্লোমা লাভের জন্য বা প্রকাশনার জন্য এই অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ বা আংশিক জমা দেওয়া হয় নি। তাই গবেষককে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রদানের নিমিত্তে অভিসন্দর্ভটি পরীক্ষকগণের নিকট প্রেরণের জন্য জমা নেওয়া যেতে পারে।

অধ্যাপক ড. মোঃ ছানাউল্লাহ

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

এই মর্মে অঙ্গীকার প্রদান করছি যে, আমি মোঃ মাছউদুর রহমান পিএইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। **'বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৯০১-১৯৫০)'** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ ছানাউল্লাহ (ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) স্যারের নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক গবেষণা কর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান বা সংস্থায় কোনো প্রকার ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা লাভের নিমিত্তে এর সম্পূর্ণ কিংবা অংশ বিশেষ জমা দেয়নি।

(মোঃ মাছউদুর রহমান)

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

মহান আল্লাহ তা'আলার অশেষ করুণা ও মেহেরবাণীতে **'বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৯০১-১৯৫০)'** শীর্ষক পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভটি পূর্ণাঙ্গভাবে তৈরী করে উপস্থাপন করলাম। দেরিতে হলেও বিধি অনুসারে অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া আদায় করছি। শ্রদ্ধা নিবেদন করছি সেসব বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকের প্রতি যাদের অবদানে আজ আমরা বাংলা ভাষায় দ্বীন ইসলামকে জানার ও বুঝার সুযোগ পেয়েছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ইসলামী সাহিত্যের উপর অসংখ্য বই-পুস্তক দেখার সুযোগ হয়েছে আমার। সেই থেকেই এই বিষয়ে গবেষণা করার আগ্রহ মনে সৃষ্টি হয়। এম.ফিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আমার পরম শ্রদ্ধেয় তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মোঃ ছানাউল্লাহ স্যারের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলে, তিনি উৎসাহ প্রদান করেন। বোর্ড অব এ্যাডভান্সড স্টাডিজের সুপারিশে এম.ফিল প্রোগ্রাম পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে স্থানান্তরিত করার অনুপতি পাওয়ার পর আমার আগ্রহ বেড়ে যায়। সর্বোপরি আমার তত্ত্বাবধায়কের সঠিক পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতা না থাকলে এই কাজ কখনো সম্ভব হতো না।

আজ গবেষণা কর্মের শেষ পর্যায়ে এসে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার প্রিয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. মোঃ ছানাউল্লাহ (ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) স্যার এর নিকট, যিনি পারিবারিক ব্যস্ততা, গবেষণা ও অধ্যাপনাসহ বিভিন্ন দায়িত্বের মধ্যেও আমার গবেষণা কর্মের জন্য নিরলসভাবে সময় দিয়েছেন এবং সময় সময় ভুল-ত্রুটি ধরে দিয়ে আমাকে চির ঋণী করেছেন। তাঁর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েই এই বিষয়ে গবেষণা করার জন্য সেই অনার্স পর্যায় থেকেই স্বপ্ন দেখে আসছি। স্যারের অনুপ্রেরণা, উৎসাহ ও সার্বক্ষণিক খোঁজ-খবর ও পরামর্শ দানের জন্য আজ গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে। এই গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত, সূচিকরণ ও বিন্যস্তকরণ, অধ্যায় ও পরিচ্ছেদে সাজানো ইত্যাদি খুঁটিনাটি প্রত্যেকটা বিষয়েই তাঁর আন্তরিক ও নিরলস পরিশ্রমের ছাপ রয়েছে। এই জন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি। সাথে সাথে এও কামনা করছি যে আল্লাহ তা'আলা যেন আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করেন।

আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় তথ্য-উপাত্ত ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ যাঁদের থেকে নিয়েছি তাঁরা হচ্ছেনঃ অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শফিকুর রহমান (ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপক ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী (দা'ওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া), ডক্টর মুহাম্মাদ লুৎফুর রহমান আল-আযহারী (সহকারি অধ্যাপক, কুরানিক সাইন্স এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম), আমি তাঁদের প্রতিও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার অভিসন্দর্ভখানা রচনার ক্ষেত্রে অনেক সময় আমি দেশি-বিদেশি গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার, নিবন্ধকার, কবি ও সাহিত্যিকগণের সহযোগিতা নিয়েছি। আমি তাঁদের কাছেও আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণার পাণ্ডুলিপি রচনা করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম পাবলিক লাইব্রেরী, জাহানারা বেগম গণ-গ্রন্থাগার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম আঞ্চলিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী ঢাকা, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক লাইব্রেরী ও কবি সুফিয়া কামাল গণগ্রন্থাগার ইত্যাদি গ্রন্থাগারের সহযোগিতা নিয়েছি। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরী করতে যাদের সহযোগিতা পেয়েছি, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

মোঃ মাছউদুর রহমান

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ-সংকেত

অনূ = অনূদিত

ইফাবা = ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইং = ইংরেজি

খ্রি. = খ্রিস্টাব্দ

খ. = খণ্ড

জ. = জন্ম

প্রাগুক্ত = পূর্বোল্লেখিত

মাও. = মাওলানা

সম্পা. = সম্পাদিত / সম্পাদনা

সা. = সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম

রা. = রাদিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু / আনহা / আনহুমা / আনহুম

রহ. = রাহমাতুল্লাহি ‘আলাইহি

হি. = হিজরী

পৃ. = পৃষ্ঠা

ড. = ডক্টর

বি. দ্র. = বিস্তারিত / বিশেষ দ্রষ্টব্য

Ed = Edited / Editor / Edition

p = Page

P = Page (s)

Ibid = (Ibidem) In the same place, from same source.

Dr. = Doctor (of Philosophy)

Vol. = Volume

সূচিপত্র

পৃ.

প্রত্যয়নপত্র..........

অঙ্গীকারনামা ....

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ.....

শব্দ-সংকেত.........

এ্যাবস্ট্রাক্ট............

ভূমিকা................

প্রথম অধ্যায়ঃ ইসলামী সাহিত্যের প্রকৃতি ও পরিধি	**০১**
প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামী সাহিত্যের পরিচিতি	০১
ক. সাহিত্যের সংজ্ঞা?	**০১**
খ. ইসলামে সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব	০৪
গ. ইসলামী সাহিত্যের পরিচয় ?	০৯
ঘ. মুসলিম সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্য	১১
ঙ. ইসলামী সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	১২
চ. ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু	১৭
ছ. ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব	২০
জ. ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য	২৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ১২০০-১৯০০ শতাব্দী সময়কালে ইসলামী সাহিত্য চর্চা	**৩৪**
ক. চতুর্থদশ শতাব্দীতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা	৩৭
খ. পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইসলামী সাহিত্য চর্চা	৩৭
গ. ষোড়শ শতকে ইসলামী সাহিত্য চর্চা	৩৮
ঘ. সপ্তদশ শতকে ইসলামী সাহিত্য চর্চা	৪২
ঙ. অষ্টাদশ শতকে ইসলামী সাহিত্য চর্চা	৪৫

চ. ঊনবিংশ শতকে ইসলামী সাহিত্য চর্চা ৪৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ অবিভক্ত বাংলার সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি **৪৮**

ক. সামাজিক অবস্থা, খ. ধর্মীয় অবস্থা, গ. রাজনৈতিক অবস্থা, ঘ. অর্থনৈতিক অবস্থা, ঙ. সাহিত্য চর্চা ৪৯-৬৮

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ইসলামী সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (১৯০১-১৯৫০) **৭৪**

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ১৯০১-১৯২০ঃ **৭৪**

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ১৯২১-১৯৪০ঃ **৮১**

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ১৯৪১-১৯৫০ঃ **৯৭**

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ইসলামী সাহিত্যের উপর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ ও রচনাবলী (১৯০১-১৯৫০) ১৩৩

প্রথম পরিচ্ছেদঃ **১৩৩**

ক. কুরআন বিষয়ক রচনা (১৯০১-১৯৫০) ১৩৩

খ. সীরাত ও হাদীস বিষয়ক রচনা (১৯০১-১৯৫০) ১৪৮

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ **১৬৭**

ক. ফিক্‌হ বা ইসলামী বিধি বিধান ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা (১৯০১-১৯৫০) ১৬৭

খ. ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন চরিত ও অন্যান্য রচনা (১৯০১-১৯৫০) ১৭২

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলামী ভাবধারায় লিখিত ও প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা (সাপ্তাহিক, পাক্ষিক মাসিক ও ষান্মাসিক) (১৯০১-১৯৫০) ১৮৬

চতুর্থ অধ্যায়ঃ গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক মূল্যায়ন **১৯৩**

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ‘অনল প্রবাহ’, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ১৯৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ **২১৫**

ক. ‘ইসলামী কবিতা’, কাজী নজরুল ইসলাম ২১৫

খ. ‘নজরুল ইসলাম’ঃ ইসলামী গান ২৪০

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ **২৭৮**

ক. ‘ধর্ম জীবন’ ডাঃ লুৎফর রহমান ২৭৮

খ. ‘মানব জীবন’ ডাঃ লুৎফর রহমান ২৮৫

পঞ্চম অধ্যায়ঃ বাংলাদেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা **২৯৩**

ক. মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জন, প্রচার ও প্রসারে ইসলামী শরীয়তী নির্দেশ পালনের প্রয়োজনীয়তা ২৯৫

খ. সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা বাংলায় জ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও বাঙালি মনীষীদের চিন্তা ২৯৮

গ. মাতৃভাষাকে বর্জন, আরবী ও উর্দু মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য চর্চার ফল ৩০৯

ঘ. সিলেবাস উপযোগী তুলনামূলক আরবী ও বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক রেফারেন্স গ্রন্থ ৩১৯

ষষ্ঠ অধ্যায়: বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ভবিষ্যৎঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব **৩৩১**

ক. ইসলামী সাহিত্যের প্রতি উদাসীনতা ৩৪৭

খ. বাংলা ভাষার উপর কুরআনের প্রভাব ৩৪৯

গ. বাংলা ভাষার ইসলামী সাহিত্যকে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ৩৫০

ঘ. ইসলামী ভাবধারার পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা ও সংঘ ৩৫১

উপসংহার ৩৫৮

গ্রন্থপঞ্জি **৩৬৩**

‘‘বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৯০১-১৯৫০)’’

এ্যাবস্ট্রাক্ট-সারসংক্ষেপ

বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল। নানা চড়াই-উতরাই পার হয়ে ২০০ বছরের ইংরেজদের অত্যাচার-নির্যাতনের শেষ ৫০ বছর। বিদেশী শাসক কর্তৃক মুসলমানদের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা-হাঙ্গামার সর্বশেষ কলঙ্কজনক অধ্যায় এই সময়কাল। মুঘল আমলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সৌহার্দ-সম্প্রীতি থাকলেও, ব্রিটিশ শাসনের সময় তা আর অব্যাহত থাকেনি। ইংরেজদের একচোখা নীতি ও বিভিন্ন ধরনের কূটকৌশলের কারণে বাংলার মুসলমানরা জীবনের সকল স্তরে, সকল প্রতিযোগিতায় তাদের প্রতিবেশি হিন্দুদের সাথে হেরে যায়। মুসলমানরা জীবনের সকল দিকের মত সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়ে। অগ্রসর হিন্দু সংস্কৃতিবানরা এই সুযোগে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিকে সাংস্কৃতিকভাবে আক্রমণ করতে থাকে। উদীয়মান ঈমানদার মুসলিম সংস্কৃতিবান ও সাহিত্যিকগণ এর পাল্টা জবাব দিয়ে এই সময়ে সাহিত্য রচনা করেন। বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্য থেকে পরিকল্পিতভাবে ইসলামী আদর্শ নিয়ে সাহিত্য রচনা করার জন্য অনেকেই এগিয়ে আসেন। গবেষণায় দেখা গেছে, এই ৫০ বছরে হাজারেরও অধিক মুসলিম সাহিত্যিক ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে সাহিত্য রচনায় অবদান রাখেন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ এবং পরবর্তীতে অন্যান্য রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি দুর্দশার কারণে মুসলিম সাহিত্যিকদের এই অবদানের কথা আজ আমরা ভুলে যাচ্ছি। তাঁদের লিখিত প্রকাশিত-অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি ও গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের অভাবে আজ হারিয়ে যাচ্ছে। যা মুসলিম জাতির জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতির দিক। বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের জন্য। অভিসন্দর্ভে উল্লেখিত সময়কালে বাংলার মুসলমানরা বৈরী শাসন ব্যবস্থা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও ইসলামী সাহিত্যের বিভিন্ন দিকে যেসব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তা আলোকপাত করা হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা ভাষায় প্রয়োজনীয় ইসলামী ভাবধারার বই-পুস্তকের অভাব-এই অজুহাত দেখিয়ে আরবী ও উর্দু ইত্যাদি ভাষায় লিখিত ইসলামী বই-পুস্তকের মাধ্যমে পাঠদান করা হয়। এই গবেষণায় প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি বাংলা ভাষায় পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত ভাষার মতই প্রচুর ইসলামী বই-পুস্তক রয়েছে, যা ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করে আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই পাঠদান সম্ভব। মাতৃভাষায় ইসলামী জ্ঞানার্জনের সুযোগ ইসলামকে বাস্তব জীবনে জানার ও আমল করার সুযোগ বাড়িয়ে দিবে। অন্যদিকে মাতৃভাষায় ইসলামী জ্ঞানার্জন না করার কারণে বাংলার মুসলমান সমাজে ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধ অনুকরণ বেড়েই চলছে।

আমার গবেষণায় ১৯০১-১৯৫০ সময়কালের মধ্যে যারা সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত ছিলেন বা সাহিত্য রচনা করেছেন, তাদের জীবনী ও রচিত সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এ ক্ষেত্রে অনেক সাহিত্যিক

উল্লেখিত সময়কালে জন্ম গ্রহণ করলেও, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছেন এ সময়কালের পরে। প্রাসঙ্গিকভাবে তাঁদের আলোচনাও আমার গবেষণায় এসেছে।

প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে **'ইসলামী সাহিত্যের প্রকৃতি ও পরিধি'**। ইসলামী সাহিত্যের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, গুরুত্ব ও বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কালে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে এবং এর সাথে উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাহিত্য চর্চার অবস্থা নিয়ে আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে **'ইসলামী সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (১৯০১-১৯৫০)'** তুলে ধরেছি। তিনটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে তাঁদের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁদের লিখিত উল্লেখযোগ্য রচনাবালী সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। যে গ্রন্থগুলো বিশ্বের অন্যান্য ভাষায় রচিত উন্নত ইসলামী সাহিত্যের সাথে তুলনা হতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি **'ইসলামী সাহিত্যের উপর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ ও রচনাবলী (১৯০১-১৯৫০)'**। এখানে কুরআন, হাদীস, সীরাত, ফিক্হ, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমানরা ইসলামী সাহিত্যের যে সব ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, তা আলোচনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সমস্ত বাংলায় এর প্রভাব পড়ে। সীরাত সাহিত্য ও ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যের উপর বই-পুস্তক রচনার ক্ষেত্রে অসংখ্য বাঙালি এগিয়ে আসেন। ইসলামী ভাবধারা পুষ্ট পত্র-পত্রিকার অবদানও এ সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা এই অধ্যায়ের শেষের দিকে আলোচনা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়ে রয়েছে **'গুরুত্বপূর্ণ বইগুলোর সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক মূল্যায়ন'**। এই অধ্যায়ে বিখ্যাত তিনজন ইসলামী চিন্তাবিদের কয়েকটি গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করেছি। তাঁদের রচনায় ইসলামী ভাবধারা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে, তা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এতে গদ্য ও পদ্য দুটো রূপই আলোচনা হয়েছে। ইসলামী গান, গজল, গীতি ইত্যাদিও ইসলামী সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলা ভাষায় কাজী নজরুল ইসলামকেই এর সম্রাট বলা চলে। নজরুল রচিত হামদ, নাত, গজল নিয়ে এই অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। সর্বোপরি, ইসলামী সাহিত্যিকগণ ইসলামের মর্মবাণীকে কত হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছিলেন, মূলতঃ তাই এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রয়েছে **'বাংলাদেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা'**। এই অধ্যায়ে ইসলামী সাহিত্য চর্চার প্রতি অবহেলা ও উদাসীনতা, মাতৃভাষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের অবহেলা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষা তথা মাতৃভাষার পরিবর্তে বিজাতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ ইত্যাদির পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করলে, বিশেষ করে কওমী মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিলে, ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব বাংলাদেশে ঘটতে পারে- গবেষণায় এ বিষয়টিও বের হয়ে এসেছে। এই অধ্যায়ের শেষের দিকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া ও আন্তর্জাতিক ইসলামী

বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম এর শরী'আ অনুষদের ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ক সিলেবাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত আরবী রেফারেন্স গ্রন্থের পাশাপাশি বাংলা গ্রন্থ উপস্থাপন করে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, বাংলা ভাষায় ইসলাম বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা অর্জন সম্ভব। আরবী ও উর্দু মাধ্যমে অধ্যয়নের তুলনায় মাতৃভাষা বাংলায় অধ্যয়ন আমাদের ইসলামী জ্ঞান শতগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে **'বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ভবিষ্যৎঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব'** নিয়ে আলোচনা করেছি। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল ও ফলপ্রসূ। মূলতঃ এই আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদই এই অধ্যায়ে ব্যক্ত করা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর শেষের ৫০ বছরে অসংখ্য ইসলামী লেখক ও সাহিত্যিকের জন্ম বাংলা ভাষায় হয়েছে। শতাধিক ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশনা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আরবী, উর্দু, ফার্সী ও ইংরেজি ভাষা থেকে সহস্রাধিক বই-পুস্তক অনূদিত হয়ে বাংলা ভাষায় ইসলামকে জানার পথ আরও সহজতর হয়েছে। গ্রাম গঞ্জ থেকে শহর পর্যন্ত সর্বত্র ইসলামী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। মকতব, মসজিদ, মাদরাসা স্কুল, কলেজ ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে বাৎসরিক তাফসীরুল কুরআন ও সাধারণ ওয়াজ মাহফিল আয়োজন ও উদযাপনের মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হচ্ছে। সব শেষে রয়েছে উপসংহার।

ভূমিকাঃ

বর্তমান পৃথিবীতে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা ব্যাপক আকারে বর্ধনশীল। এর অসংখ্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এ ধর্ম মানুষের শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে মানসিক, আত্মিক এবং চিন্তার পরিচ্ছন্নতাকেও নিয়ন্ত্রণ করে। মুসলিম মানব জীবনে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান বিতরণ তথা যেকোনো ধরনের সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শকে অতিক্রম করে পথ চলার কোনো সুযোগ নেই। ইসলাম মানব জীবনের সব ধরনের কল্যাণমূলক কাজকেই যেমন ইবাদত মনে করে, ঠিক তেমনি মানবকল্যাণ বিরোধী যেকোনো কাজকেও পাপের কাজ বা গুনাহ্‌র কাজ বলে মনে করে। সুতরাং সাহিত্য চর্চা সংস্কৃতির অংশ হলেও ইসলামী আদর্শের ভিতরে থেকেই এর চর্চা করতে হবে। এর মধ্যে কোনো ধরনের অশ্লীলতা প্রকাশের সুযোগ ইসলামে নেই। হযরত মোহাম্মদ (সা.) ও সাহাবীদের (রা.) যুগে যেসব কবি সাহিত্যিক রুচি গর্হিত সাহিত্য রচনা করতেন, তাঁদের তিনি অভিসম্পাত করেছেন। পবিত্র কুরআনেও রুচিশীল ও রুচিগর্হিত কবি সাহিত্যিকদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

কিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম প্রচারের কাজ অব্যাহত থাকবে। যুগের চাহিদানুযায়ী তার প্রচারের ধরন ও প্রকৃতি পরিবর্তন হতে পারে। একজন মুসলমান মানেই হচ্ছে তার স্বীয় ধর্মের একজন প্রচারক। কেননা, আমাদের নবী (সা.) বলেছেন, 'একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ হতে প্রচার করে দাও'। পৃথিবীর যেখানেই মুসলিম বসতি স্থাপন করবে, সেখানেই তিনি তার কথা ও কর্মের মাধ্যমে ইসলামের আদর্শকে উপস্থাপন করবেন। বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দের অনেকেই নবীজীর (সা.) এ হাদীসের অনুসরণ ও বাস্তবায়নের জন্য সাহিত্য চর্চা করেছেন। তাঁরা আরবী ও উর্দু ভাষা আয়ত্ত্ব করে তা থেকে সার নির্যাস বাংলা ভাষায় সাহিত্যরসের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

প্রথম দিকে কুরআন-হাদীসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আরবী ভাষা থেকে বাংলায় মৌখিকভাবে অনুবাদের মাধ্যমে নওমুসলিমদের মাঝে প্রচার করা হতো। এই কাজ পর্যায়ক্রমে মসজিদ, মাদরাসা, খানকাহ, মকতব, মাহফিল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, হযরত ওমর (রা.) এর শাসনকাল থেকেই সাহাবীগণ (রা.) বাংলায় ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেন বলে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন। তবে ১২০০ শতাব্দীতে তুর্কী সেনাপতি

ইখতিয়ারউদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজী এর বাংলায় আগমন ইসলাম প্রচারের পথ সুগম করে দেয়। বখতিয়ার খলজী একদিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করেছেন, অন্যদিকে সুফী, দরবেশগণ বিনা বাধায় গ্রাম-বাংলায় ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই সুফীগণের অনেকেই আরব, ইরান ইত্যাদি দেশ থেকে আরবদের বাণিজ্য বহরের সাথে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেন। তাঁদের অনাড়ম্বর জীবন-যাপন বাংলার ব্রাহ্মণ হিন্দুদের কর্তৃক নির্যাতিত সাধারণ হিন্দুদের মন ও মানসে প্রভাব বিস্তার করে। সুফী-দরবেশগণ কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। বাঙালি নওমুসলিমদের মধ্যেও অসংখ্য ইসলাম প্রচারক বাংলা ভাষায় ইসলাম প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন।

বাংলা ভাষার প্রাচীন যুগে (৭০০-১২০০ শতাব্দী) ইসলামী সাহিত্যের উপর লিখিত বই-পুস্তক তেমন ছিল না। কিন্তু এর মধ্য যুগে আমরা ইসলামী সাহিত্যের উপর লিখিত অনেক বই-পুস্তক, পুঁথি সাহিত্য ও গীতি সাহিত্য দেখতে পাই। বিশেষ করে তুর্কী, মুঘল ও সুলতানী আমলে ইসলামী শিক্ষা ও শিল্প-কলার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সময়ে সুলতান ও আমীর-ওমরাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনেক উন্নতি হয়। ইলিয়াস শাহ, গিয়াসউদ্দীন আযম শাহ, ফিরোজ শাহ, নসরত শাহ, নাসিরুদ্দীন মুহম্মদ শাহ, নিজাম শাহ, রুকন উদ্দীন মুবারক শাহ প্রমুখ সুলতানগণ যুগে যুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

আধুনিক যুগে বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা শুরু হওয়ার পূর্বে দেব-দেবীর গুণ-কীর্তন নিয়ে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হয়েছিল। অনেক মুসলমানরাও সে সাহিত্য পড়ত। সুলতানী আমল থেকে যখন মুসলমানদের হাতে সাহিত্য রচিত হওয়া শুরু হয়, তখন থেকে মানুষের মানবিক এবং কুরআন-হাদীস ভিত্তিক সাহিত্য রচিত হতে থাকে। চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী সময়কালে ইসলামী ভাবধারা নিয়ে যে সমস্ত ইসলামী সাহিত্য রচিত হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ শাহ মুহম্মদ সগীর কর্তৃক ‘ইউসুফ জোলেখা’ (১৩৮১-১৪১০), জৈনুদ্দীন কর্তৃক ‘রসুল বিজয়’, ‘ওফাতে রাসুল’ (১৪৭৪-১৪৮১), চাঁদ কাজী কর্তৃক ‘পদ রচনা’ (১৪৯৩-১৫১৯), আফজাল আলী কর্তৃক ‘নসীহত নামা’ (১৫৩২-১৫৩৩), সাবিরিদ খান কর্তৃক ‘রসুল বিজয়’ ও দোনাগাজী কর্তৃক ‘সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জামান’। ষষ্ঠদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত বই-পুস্তকের মধ্যে রয়েছে- সায়্যিদ সুলতান কর্তৃক ‘শবে মিরাজ’, ‘নবীবংশ’, নসরুল্লাহ খান কর্তৃক ‘জঙ্গনামা’, ‘মুসার সওয়াল’, ‘শরীয়ৎনামা’, শেখ পরাণ কর্তৃক ‘নূরনামা’, ‘নসিহৎনামা’, শেখ মুত্তালিব

কর্তৃক 'কিফায়াতুল মুসাল্লীন', আবদুল হাকীম কর্তৃক 'ইউসুফ জোলেখা', 'নূরনামা' ও শিহাবুদ্দীন নামা' ইত্যাদি। অষ্টাদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত উল্লেখযোগ্য সাহিত্য হচ্ছে- সায়্যিদ নূরুদ্দীন কর্তৃক 'দাকায়েকুল হাকায়েক', 'কিয়ামতনামা', 'মুসার সাওয়াল', মুহাম্মদ কাসিম কর্তৃক 'আমীর হামজা', 'হাতেম তাঈ' ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এসে মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২), কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২), শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১) এ সকল ব্যক্তির উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেয়ে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত অসংখ্য ইসলামী সাহিত্যিক বাংলা ভাষায় জন্মগ্রহণ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ও সভ্যতা নিয়ে অগণিত বই-পুস্তক রচিত হয়। এতে বাংলা ভাষাও অনেক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করে। বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৯০১-১৯৫০) বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের উপর যে ব্যাপক কাজ হয়েছে সে বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরার প্রয়াসই এ গবেষণার উদ্দেশ্য। এ ক্ষুদ্র গবেষণা বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য দিক নির্দেশনা, চেতনা-উদ্রেক, চিন্তার সামান্য খোরাক ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জীবন বিধানকে মাতৃভাষায় হৃদয়ঙ্গম ও বাস্তব জীবনে অনুশীলনের সুবর্ণ সুযোগ করবে রাব্বুল আলামীনের সমীপে আমার কামনা ও প্রার্থনা এটুকুই। আমীন।

প্রথম অধ্যায়

ইসলামী সাহিত্যের প্রকৃতি ও পরিধি

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামী সাহিত্যের পরিচিতি

ক. সাহিত্যের সংজ্ঞাঃ

‘সাহিত্য’ শব্দটি সহিত থেকে উদ্ভুত। কেউ কেউ সাহিত্য শব্দটিকে সম্মিলন অর্থে ব্যবহার করেছেন। এ সম্মিলন মানেই হচ্ছে- মনে মনে, আত্মায় আত্মায় ও হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন। সাহিত্য শব্দটির সাথে হিত, কল্যাণ ও মঙ্গল ইত্যাদি ভাব সম্পর্কযুক্ত।[১] পশ্চিম বঙ্গের সুপরিচিত ইসলাম ধর্মীয় গ্রন্থ প্রণেতা মুহাম্মদ ইসমাইল বলেন, ‘রসপিপাসু অনুভবে সাহিত্য হচ্ছে ‘সহ+হিত’। ব্যাখ্যা করলে এবং অন্ড়র দিয়ে চিন্ড়া করলে সাহিত্যে হিতের কথাটাই হবে বড় এবং মুখ্য।

আরো উঁচু করে প্রকাশ করলে, পণ্ডিত মহলের বাচন হলো সাহিত্যে বিধৃত ‘সত্যম শিবম সুন্দরম’। অনিত্য অসুন্দরের অস্ড়িত্ব সাহিত্যে অচল। সাহিত্য সত্য সুন্দরে আধারিত বলেই সাহিত্যিক সত্যের পূজারি। সে নিত্যের নিশ্চয়তা আনে। সুন্দরের সাধনা করে। আর শিবার্থে যদি শুচি পবিত্রতাই বুঝি, তাহলে সাহিত্যই পবিত্র। সাহিত্যিক তার সে শিব সুন্দরের সাধনায় শুচি হয়, সাহিত্যের জীবিকায় সে শুভ্র অন্য কথায় যেটা আদবী আখলাক।’[২]

‘ইতালিয় রসতাত্ত্বিক ক্রোসে বলেছেন, ‘সাহিত্য হলো রূপায়ণ (Expression)। তবে রূপায়ণ সার্থক হওয়া চায়।’[৩] রুশিয় সাহিত্যিক টলস্টয়ের মতে, ‘সাহিত্যের কাজ হচ্ছে জ্ঞাপন (Communication)।

---

[১] . অধ্যাপক মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য*, নতুন কলম (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগস্ট, ১৯৯৫) পৃ. ৩, মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০০-১৯০০), এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০০৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ. ২ (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)

[২] . মুহাম্মদ ইসমাইল, *ইসলামী সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান সমাজ* (কলকাতাঃ মলিণ্ডক ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০১), পৃ. ৬৭

[৩] . মুজিবুর রহমান খাঁ, *সাহিত্যের সীমানা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৭), পৃ. ১৩

কোনো ভাবানুভূতি যখন মনকে ভারাক্রান্ড় করে, তখন সে প্রকাশের বেদনায় পীড়িত হয়, সেই ভাবানুভূতি অপরকে সাগ্রহে জানানোর তাগিদে মানুষ লিখে, গান গায় ও ছবি আঁকে। এ পথে মানুষ যখন কলার কারবারী করে, তখনই সে কবি ও সাহিত্যিক।' যখন কোনো মানুষ তার ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতাকে ইচ্ছাপূর্বক অন্যকে জানাতে চায়, তখনই তা হয় শিল্প। এটিই কথায় হলো সাহিত্য, আন্দোলনে হলো নাচ, সুরে হলো গান ইত্যাদি।'[৪] এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক ও ইসলামী চিন্ড়াবিদ আবদুস শহীদ নাসিম বলেন, "জীবন ও জগতের অন্ড়র্গত উপলব্ধিকে ভাবের ব্যাকুলতায় রূপ চিত্রময় ভঙ্গি ও শিল্প সম্মত প্রকাশের নামই সাহিত্য।"[৫]

সাহিত্য সম্পর্কে সুন্দর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন বিশিষ্ট ইসলামী সাহিত্য গবেষক আবদুল মান্নান তালিব। "হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশই সাহিত্য। বাইরের কোন কিছু সূক্ষ্মভাবে অনুভব করার পর ব্যক্তি মাত্রই তা প্রকাশের আকাঙ্খা পোষণ করে। সাহিত্যিক হৃদয়ের এই সূক্ষ্ম অনুভবকে অলঙ্কার, রূপক, ছন্দ, ভাষা ও শব্দের কারচকার্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন।"[৬] ম্যাথিও আর্নল্ডের মতে, "Literature is the criticism of life " সাহিত্য হচ্ছে জীবনের সমালোচনা। জীবন-নিরপেক্ষ কোন সাহিত্যের কথা কল্পনা করা যায় না। তবে জীবনের বাস্ড়বতা ও সাহিত্যের বাস্ড়বতার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে।

সাহিত্যে রং, রস, কল্পনার উপস্থাপনা অপরিহার্য। কেননা সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য-আনন্দ দান, যে সাহিত্য আনন্দদানে ব্যর্থ তা সার্থক সাহিত্য নয়। তবে আনন্দ দুরকম-শণ্টীল ও অশণ্টীল। একটি মানুষকে সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও মহত্তম মানবিক প্রবণতার দিকে পৌঁছে দেয়, অন্যটি মিথ্যা, অকল্যাণ, কাম, ক্রোধ, লালসা, হিংসা ও বিদ্বেষ প্রভৃতি অমানবিক প্রবণতার দ্বার প্রান্ড়ে ঠেলে দেয়। প্রথমোক্ত সাহিত্যকে Keats বলেছেন "A thing of beauty is joy forever, and beauty is truth and truth is beauty." অতএব, সাহিত্যকে অবশ্যই শিল্পসুষমা হতে হবে, রসোত্তীর্ণ হতে হবে, অলঙ্কারের রূপ সজ্জায় সুসজ্জিত হতে হবে। কিন্তু সে সাথে তাকে রুচিবোধ ও নৈতিকতাবোধে উত্তীর্ণ হতে হবে। কারণ মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা বর্তমান। একটি হলো জৈবিক সত্তা এবং আরেকটি হলো নৈতিক সত্তা। এই নৈতিক সত্তাই মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে। মানুষকে দিয়েছে মানবিক মর্যাদা।

---

[৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৫] . আবদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি* (ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭), পৃ. ১৮৪

[৬] . আবদুল মান্নান তালিব, *ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান* (ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৪

যে শিল্প-সাহিত্যে নীতি-নৈতিকতাকে অস্বীকার করা হয়, সেটা মূলত মানবতার বিরূদ্ধে বিদ্রোহ ছাড়া আর কিছু নয়। Mathew Arnold এ প্রসঙ্গে বলেছেন, A poetry of revolt against moral ideas is poetry of revolt against life, a poetry of indifference to moral ideas is a poetry of indifference towards life."[7]

উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তবিদ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীমের মতে, 'হৃদয়-মনের অনুভূতির ভাষাগত রূপায়ণকেই বলা হয় সাহিত্য। আবেগ ও চেতনাকে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক শব্দের বিন্যাসের মাধ্যমে ব্যক্ত করাই সাহিত্য। তা যেমন বক্তৃতা ও ভাষণরূপে প্রকাশিত হতে পারে, তেমনি কাব্য ও কবিতার ছন্দময় পরিচ্ছদেও সজ্জিত হতে পারে। গদ্য রচনার সম্ভারে বিভিন্ন রূপ নিয়েও আসতে পারে তা জনগণের সম্মুখে।'[৮]

প্রখ্যাত মানবতাবাদী সাহিত্যিক ডাঃ লুৎফর রহমান তাঁর 'উন্নত জীবন' গ্রন্থে বলেন, "কথা কাগজে ধরে অসংখ্য মানুষের দৃষ্টির সম্মুখে ধরার নাম সাহিত্য সেবা। এই যে কথা, একথা সাধরণ কথা নয়, এ কথার ভিতর দিয়ে জীবনের সন্ধান বলে দেওয়া হয়। পুণ্যের বাণী ও মুখ্যের কথা প্রচার করা হয়। বর্তমান ও অনন্ত সুখের দ্বার মুক্ত করে দেওয়া হয়।"[৯] প্রখ্যাত ভাষাবিজ্ঞানী ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহিত্যের একটা সুন্দর পরিচয় দিয়েছেনঃ "যেখানে আনন্দহারা আনন্দ পায়, ব্যথিতের ব্যথা জুড়ায়, হতাশের ভরসা জাগে, তাপিত আরাম পায়, দুখী সুখের খবর শোনে, প্রেমিক স্বর্গের সৌরভ শোঁকে, সে-ই সাহিত্য।"[১০]

অতএব, উপরের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, সাহিত্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত একটি ধারণা বা পথ। এই পথ যিনি যত সুন্দরভাবে সৃষ্টি করতে পারবেন, তিনি তত সফল ও সার্থক সাহিত্যিক হিসেবে সমাজে পরিচিতি লাভ করবেন।

---

[৭] . মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, *বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০০-১৯০০)*, মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০০৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। (অপ্রকাশিত) পৃ. ২, মুজিবুর রহমান খাঁ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪, আবদুস শহীদ নাসিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

[৮] .মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০০), পৃ. ১৬৩

[৯] . ডাঃ লুৎফর রহমান, 'উন্নত জীবন', *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধ সমগ্র*, বেলায়েত হোসেন সম্পা (ঢাকাঃ দি স্কাই পাবলিশার্স, জুলাই, ২০১০), পৃ. ৮

[১০] . ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ "সাহিত্যের রূপ" *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, মোশরফ হোসেন খান সম্পা. (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন, ১৯৯৮), পৃ. ২০২

খ. ইসলামে সাহিত্য চর্চার গুরচ্ত্ব ঃ

উন্নত সাহিত্যের মাধ্যমে উন্নত জাতি বিচার করা যায়। সাহিত্যের মধ্যে রস থাকে বলে জাতির সন্ড়ানেরা সময়ে-অসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে অধ্যয়ন করার সুযোগ পায়। উন্নত সাহিত্যের মাধ্যমে জাতি তার সমস্ড় আবেগ ও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে থাকে। 'মানুষের জন্যই সাহিত্য। সাহিত্যের প্রকৃত অর্থ জীবনাদর্শের সাধনা। জীবনবোধের গভীরতার উপরেই সাহিত্যের মান নির্মিত হয়। মানুষের অনুভূতি থেকেই সাহিত্যের জন্ম। তাই সাহিত্য অনুভূতির অভিব্যক্তি। জীবন সাধনাকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে সাহিত্যের প্রয়োজন। তাই সাহিত্য জীবনের কথা বলে। সমাজও মানুষের কথা বলে। সাহিত্য চিন্ড়ার মূল কথা হলো সুন্দর ও মহত্ত্বের পরিকল্পনা। সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। কিন্তু সাহিত্য যুগোপযোগী না হলে তা সমাজ ও জাতিকে মঙ্গলময় ক্রমবিকাশের পথে নিয়ে যেতে পারে না।'[১১]

সাহিত্যে প্রেম ও কল্যাণের সংযোগ থাকে। সাহিত্য সাধনায় জাতি উন্নতি ও শান্ড়ির চরম শিখরে উঠতে পারে। সাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরী এদিকে ইঙ্গিত করেই বলেনঃ "সাহিত্য বিলাস পরিতৃপ্তি নহে। বিশ্রাম সময়ের বিশ্রন্ড়ালাপ নহে। সাহিত্য জীবনের সাধ-সাহিত্য সাধনা, সাহিত্য আরাধনার ধন। এ যে প্রেমের যোগ কল্যাণের সাধনা। সাহিত্য জাতির জীবন রস, সাহিত্য স্ফূর্তি। চিরদিন মাতৃভাষা ও সাহিত্যের চর্চা এবং সাধনায় জাতি উঠিয়াছে, এখনও উঠিবে।"[১২] গবেষক মোঃ জামান খান এর ব্যাখ্যায় বলেনঃ "সাহিত্য মনের কথা, প্রাণের কথা বলে। সাহিত্য প্রাণে প্রাণে অনুপ্রেরণা জাগায় এবং জাতির প্রাণে এভাবেই আনন্দ দেয়। সাহিত্য চর্চায় জাতি জেগে ওঠে এবং জাতির প্রাণে ঝংকার তোলে। সাহিত্য জাতিকে কল্যাণের পথে মঙ্গলের পথে নিয়ে যায়।"[১৩]

ডাঃ লুৎফর রহমান সাহিত্য চর্চার গুরচ্ত্ব সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান উক্তি করেছেন বলে মনে হয়। মানব কল্যাণের চিন্ড়া ও কথাকে, মানুষের মনে জ্ঞানের উদ্রেক হয় এমন কথাকে, তিনি সাহিত্য বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন 'যে কথাগুলো মানুষের কল্যাণ বর্ধন করে, তথা অর্থপূর্ণ, যাহা শুনিলে শ্রোতার মনে জ্ঞানের উদ্রেক হয়, তাহাই সাহিত্য। প্রবীণের পরামর্শ, বন্ধুর আশা সাহিত্যের ভিতর পাওয়া যায়।

---

[১১] . মোঃ জামান খান, *বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ও এস ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০৩), পৃ. ৩১

[১২] . মোঃ জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩, *এয়াকুব আলী চৌধুরী অপ্রকাশিত রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৩৭০) পৃ. ৪১

[১৩] . মোঃ জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

মানুষের কথাই ত সাহিত্য। পৃথিবীতে যাহা আছে তাহাই সাহিত্য। তোমার জীবনটা সাহিত্যের একটা ধারা।'[১৪] তাঁর মতে যে সমাজ সাহিত্যকে মূল্যায়ন করতে জানে না, সে সমাজ বর্বর ও অসভ্য। সে জাতি কখনও উন্নত হবে না। "যে সমাজে সাহিত্যের কোন আদর নাই, তাহা সাধারণত বর্বর সমাজ। কোন জাতি সাহিত্যকে অস্বীকার বা অবহেলার চোখে দেখে উন্নত হবার চেষ্টা করলে, সে জাতি আদৌ উন্নত হবে না।"[১৫]

দেশের উন্নয়ন সাহিত্যের উন্নয়নের সাথে জড়িত বলেও তিনি অভিমত পোষণ করেন। জাতির ভিতর সাহিত্য চর্চার ধারা সৃষ্টি করে দিতে পারলেই দেশ এগিয়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন। "দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে, সাহিত্যের সাহায্যেই তা করতে হবে। মানব-মঙ্গলের জন্য যত অনুষ্ঠান আছে, তার মধ্যে এইটিই প্রধান ও সম্পূর্ণ। জাতির ভিতর সাহিত্যের ধারা সৃষ্টি কর, আর কিছুরই আবশ্যক নাই।"[১৬]

মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে মানুষ চিন্ড়া করতে শেখে বলে তিনি অভিমত পোষণ করেন। সাহিত্যচর্চা মানুষকে জ্ঞান ও দৃষ্টি বাড়িয়ে দেয়। তিনি আরও বিশ্বাস করেন, সাহিত্যের সাথে আত্মার গভীর সম্পর্ক আছে। দেহ থেকে যেমন আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তেমনি সাহিত্যকে জীবন থেকে আলাদা করা যায় না।

কোনো দেশকে সভ্য করতে চাইলে সে দেশের মানুষের সামনে তার দেশের সাহিত্য তোলে ধরতে হবে। অনুবাদ বা বিদেশী সাহিত্য দ্বারা এ উদ্দেশ্য হাসিল হবে না। তিনি বলেনঃ "কোন দেশকে সভ্য ও মানুষ করবার বাসনা তোমার আছে? তাহলে বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে সেই দেশের সাহিত্যকে উন্নত করতে তুমি চেষ্টা কর। মাতৃভাষার সাহায্যে সাহিত্যকে উন্নত করতে চেষ্টা করতে হবে। বিদেশী সাহিত্যে মানব সাধারণের কোন কল্যাণ হয় না। দেশীয় সাহিত্যকে উন্নত করতে হবে। আবার বিশ্বের উন্নত সাহিত্যের সার সংগ্রহ করতে হবে।"[১৭]

---

[১৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[১৫] . ডাঃ লুৎফর রহমান, *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধ সমগ্র*, বেলায়েত হোসেন সম্পা (ঢাকাঃ দি স্কাই পাবলিশার্স, জুলাই, ২০১০) পৃ. ৮

[১৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[১৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

সাহিত্য এমন এক ক্ষমতা রাখে যা সমগ্র দেশের মানুষকে শক্তিশালী করতে পারে। মানুষের বিপদে-আপদে সাহিত্য বিচারকের ভূমিকা পালন করতে পারে। লেখকের ভাষায়, "সাহিত্যের শক্তিতে দেশের প্রত্যেক মানুষ শক্তিশালী মহাপুরুষ হতে পারে। মানুষের সব বিপদের মীমাংসা সাহিত্যের ভিতর দিয়েই হয়ে থাকে।"[১৮]

মাওলানা আবদুর রহীম এই বিষয়ে আরও স্পষ্ট করে বলেন, 'মানব সমাজের সাথে সাহিত্যের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। জীবনের মূল্যমান নির্ধারণ ও বিনির্মানে তার ভূমিকা অত্যন্ড় প্রবল। মানুষের অন্ড়র্নিহিত সৌন্দর্যবোধ ও সৌন্দর্য চেতনাকে তা উজ্জীবিত, উচ্ছ্বসিত ও উদ্ভাসিত করে তুলতে সক্ষম। সৌন্দর্য চেতনাকে ভারসাম্যময় এবং জীবনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বানাতে এবং উচ্চ মানসম্মত লালিত্য ও সুধাময় করে তোলাও সাহিত্যেরই অবদান। মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা জাগ্রতকরণ এবং তার লালন ও উৎকর্ষ সাধন সাহিত্যেরই কীর্তি।

কুপ্রবৃত্তির ওপর সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির বিজয় অর্জন এবং পরিশেলিত রচিচবোধ সৃষ্টি ও তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার ক্ষেত্রে সাহিত্যের দায়িত্ব ও কর্তব্য অসামান্য। সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানকে উন্নত করার দায়িত্বও তারই উপর অর্পিত। মানব চিত্তের চেতন, অবচেতন ও অচেতন অবস্থার মনস্ড়াত্ত্বিক বিশেণ্টষণ করে দুর্বলতা সমূহকে সুস্পষ্টরূপে দেখিয়ে দেয়াও সাহিত্যেরই কাজ।

সাহিত্য আমাদের জীবনের প্রতিটি কোণ ও প্রতিটি দিকের ওপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। তা আমাদেরকে আনন্দের সামগ্রী পরিবেশন করে এবং দুঃখ ও দুশ্চিন্ড়ায় ভেঙ্গে পড়া মনকে হাত ধরে উর্ধ্বে তুলে দেয়। দরিদ্র ও সর্বহারার পর্ণকুটিরে যেমন তার স্থান, তেমনি ধনবান ও ক্ষমতাসীনদের বিলাস-বহুল প্রাসাদেও তার অবাধ গতি।

সাহিত্য মূলত আমাদের হৃদয় স্পন্দনের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি; শব্দের চাকচিক্যময় পোশাক পরে তা আমাদের সামনে শরীরী হয়ে দেখা দেয়। সামগ্রিক দৃষ্টিতে সাহিত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন একটা অংশ, যাকে উপেক্ষা করা যায় না-বিচ্ছিন ও অপ্রয়োজনীয় মনে করাও সম্ভব নয়।'[১৯]

---

[১৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[১৯] . মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩-১৬৪

পাক-ভারত উপমহাদেশে মুসলমানরা প্রায় হাজার বছর রাজত্ব করেছে। এই সময়ের মধ্যে দিলিণ্ডর কুতুব মিনার, বাবরী মসজিদ ও আগ্রার তাজমহলসহ অনেক মুসলিম স্থাপত্য এবং ফতোয়ায়ে আলমগিরীসহ অসংখ্য ধর্মীয় কিতাবাদি; ইসলামী সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে ও শিল্পকলায় মুসলমানদের অসামান্য অবদান রয়েছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমান ভারতীয় হিন্দু সাহিত্যে তার প্রমাণ মিলে না। আর অন্যদিকে মুসলমান সাহিত্যিকরাও এই উপমহাদেশে মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জীবন চরিত নিয়ে এখনও পর্যন্ড় ভালো কোন সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি। কত পীর-আওলিয়া, দরবেশ মানবকল্যাণে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন, তাদের নিয়েও সুখপাঠ্য কোন সাহিত্য রচিত হয় নি। কিন্তু তাদের মাজারকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কুসংস্কার দিন দিন বেড়েই চলছে। আর ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রূপকে মাজার, ওরস ও পীরভক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে বিকৃত করা হচ্ছে।

এই সুযোগে হিন্দু সাহিত্যিকেরা তাদের হিন্দু সাহিত্যের মাধ্যমে মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে ইসলামের প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণাবোধ সৃষ্টি করার অপচেষ্টা সেই বঙ্কিম চন্দ্র (১৮৩৮-১৮৯৪) থেকে কমবেশি সবাই চালিয়ে যাচ্ছেন। ‘সাহিত্যের প্রতি ঔদাসীন্য এবং সাহিত্যিকের প্রতি অবজ্ঞা আমাদের সমাজের একটি প্রধান কলঙ্ক। আমাদের এই মনোভাবের দরচ্ন আমরা কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ড় হয়েছি সে কথা ভাবলে আতঙ্কে প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠে। আমরা পাঁচশত বৎসর এদেশে রাজত্ব করেছি অথচ আমাদের কোন ইতিহাস এখনও লিখিত হয়নি। আজ শত শতাব্দি ধরে বাঙ্গালা দেশে মুসলমান বাস করছে অথচ তাদের একজন মহাপুরচষেরও জীবনী খুঁজে পাওয়া যায় না। অসংখ্য পীর মোরশেদ মহাজন এদেশে জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের বিষয় আমরা কি জানি, কিম্বা জানবার কি চেষ্টা করি ?

আমাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার ভার আমরা নিশ্চিন্ড় মনে হিন্দু লেখকদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ঘুমুচ্ছি, অথচ সেই ছেলেরাই যখন নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জাবোধ করে তখন হায় হায় করতে ছাড়ি না। আমরা আমাদের রাজনৈতিক দুর্বলতা নিয়ে মুখ ভার করে বসে আছি। রাগের মাথায় কখনও কপালের দোষ দিচ্ছি; কখনও ইংরাজ সরকারের দোষ দিচ্ছি। আবার কখনও আমরা হিন্দু প্রতিবেশীদের

দোষ দিচ্ছি। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে কি সহজেই বুঝা যায় না আমাদের মাতৃভাষার প্রতি এবং সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞারই এটা হচ্ছে অনিবার্য ফল।'[২০]

ইসলাম একত্ববাদের ধর্ম। এর নিয়ম-কানুন ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমেও মুসলমানরা তাদের স্রষ্টার সন্তুষ্টি পেতে চায়। ইসলামী সংস্কৃতি ও চিন্ত্মা-চেতনার উপর ভিত্তি করে সাহিত্য গড়ে উঠলে তা স্রষ্টার জগতের সকল সৃষ্ট জীবের কল্যাণ বয়ে আনবে। এখানেই ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির সার্থকতা নিহিত। এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলীর মন্ত্মব্য প্রণিধানযোগ্যঃ "আমি ইসলামিক কালচারের ভিত্তির উপর আপনাদের সাহিত্য গড়তে বলছি, তার কারণ, ইসলামকে আমি আলণ্ঢাহর শ্রেষ্ঠ দান বলে মনে করি। আর আমার স্থির বিশ্বাস, যে কালচার ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, সেই কালচার জগতের শ্রেষ্ঠ কালচার বলে গণ্য হবে। আর বিশ্ব মানব আস্তে আস্তে তাকেই জগতের আদর্শ কালচার বলে বরণ করবে।"[২১]

সাহিত্যের মাধ্যমেই উন্নত জাতি বা সভ্য জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। উন্নত সাহিত্যের মাধ্যমে জাতির ভবিষ্যৎ জীবন স্থায়ী হয়। রাজনৈতিক ইতিহাসে কোন জাতির পতন হলেও তদীয় রচিত উন্নত সাহিত্য তাদেরকে পৃথিবীতে দীর্ঘদিন বাঁচিয়ে রাখে এবং অদূর ভবিষ্যতে তাকে জাগিয়ে তোলে। সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলী বাঙালি মুসলমানের এ দুর্গতির কথা চিন্ত্মা করে বিভিন্ন নজীর দিয়ে তিনি বলেনঃ 'সাহিত্য জাতিকে কেবল নতুন জীবন দান করে না, তার জীবনকেও চিরাস্থায়ী করে। এ বিষয়ে সাহিত্যের ক্ষমতা আবেহায়াতেরই অনুরূপ। ক্ষুদ্র এহুদি জাতির কথা একবার ভাবুন। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে তারা রাজ্য হারিয়েছে, দেশ হারিয়েছে। যাযাবর Gipsy--দের মত তারা বিক্ষিপ্তভাবে দেশ-বিদেশে বিভ্রান্ত্মের মত যুগের পর যুগ ধরে ঘুরে বেড়িয়েছে।

এইরূপ অবস্থায় পড়ে শত শত জাতি তাদের জাতীয়তা চিরতরে হারিয়ে ফেলেছে, অতীতের স্মৃতি পর্যন্ত্ম তাদের মন থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। এহুদিদের সাহিত্য কিন্তু তাদের জাতীয়তাকে অমর করে রেখেছে; সুদূর অতীতের লীলাভূমিতে ফিরে যাবার জন্য অবিরাম তাদের উদ্বুদ্ধ করেছে, নিত্য নূতন প্রয়াসে তাদের অনুপ্রাণিত করেছে।

---

[২০] . এস. ওয়াজেদ আলী " মুসলমান ও বাংলা সাহিত্য"*এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[২১] . এস. ওয়াজেদ আলী "বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার পথ" প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২

Dhaka University Institutional Repository

এই ভারতবর্ষের হিন্দুদের দেখুন। শত শত বৎসর পূর্বে তারা তাদের স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলেছে। যুগ যুগান্ড়র ধরে উন্নত সভ্যতা এবং কালচার বিশিষ্ট জাতিদের অধীনে তাদের থাকতে হয়েছে। এখনও কিন্তু তারা বেঁচে আছে। তাদের রামায়ণ আর মহাভারত তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এই দুটি মহাগ্রন্থ যে হিন্দুর বিশিষ্ট ধর্ম এবং সমাজকে যুগ যুগান্ড়র ধরে বাঁচিয়ে রাখবে, সে কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে।

আমরা যদি আমাদের জাতিকে জীবন্ড়, জাগ্রত করে তুলতে চাই, নূতন কর্ম প্রেরণায় যদি তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চাই, সৃষ্টির অদম্য আগ্রহে যদি তাকে অনুপ্রাণিত করতে চাই, তাহলে আমাদেরও সাহিত্য সৃষ্টির মহাব্রতে একান্ড়ভাবে আত্মনিয়োগ করতে হবে। আমাদের জাতীয় জীবনের ভবিষ্যৎ আমাদের সাহিত্যের উপর নির্ভর করে।’[২২]

অতএব, উপরের আলোচনায় এ কথা স্পষ্ট যে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের উন্নত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে তাদের উন্নত ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির উপর। উন্নত ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করতে না পারলে, নাস্ড়িক্যবাদ ও বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে বিদ্যমান ইসলামী মূল্যবোধ অচিরেই ধবংস হয়ে যাবে। এজন্য পরিকল্পিত উপায়ে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়োজন।

গ. ইসলামী সাহিত্যের পরিচয় ঃ

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও মহানবী (সা.) এর আদর্শ হচ্ছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। কুরআন মানব জীবনের জন্য পরিপূর্ণ বিধান আর হাদীস হচ্ছে কুরআনের ব্যাখ্যা। অতএব, ইসলামী সাহিত্যের পরিচয়, রূপ ও আদর্শ জানতে হলে কুরআন ও হাদীসের তথা ইসলামী আদর্শের সীমারেখার ভিতরেই জানতে হবে। এর বাহিরে যাওয়া যাবে না।

ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে সাহিত্য চর্চা শুরচ হয়ে এ পর্যন্ড় চলে আসলেও ইসলামী সাহিত্যের প্রকৃত সংজ্ঞা নিয়ে লিখিত কোন প্রামাণ্য গ্রন্থের সাক্ষাৎ আমরা পাইনা। প্রায় এক হাজার বছর যাবৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামের চর্চা হয়ে আসছে। এর মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকজনের হাতে আমরা ‘ইসলামী সাহিত্যে’র উপর সংজ্ঞা ও সীমারেখা আঁকতে দেখি। এ বিষয়ে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এর মতামত উলেণ্ডখ করছিঃ ‘আমার মতে বঙ্গীয় মুসলমান তাহার ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার

---

[২২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৬

ব্যবহার লইয়া যে সাহিত্যের সৃষ্টি করে অর্থাৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের যে অংশে মুসলমানের ধর্ম, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আচার-ব্যবহারের সুন্দর দিক ফুটিয়া উঠে, তাহাই মুসলিম সাহিত্য।

আমার মতে শুধু মুসলমান কর্তৃক রচিত হইলেই সে সাহিত্য "মুসলিম সাহিত্য" হয় না। যে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের কথা পূর্বে উলেন্টখ করিয়াছি, তাহার অভাব যে সাহিত্যে বর্তমান, তাহা মুসলমান কর্তৃক রচিত হইলেও মুসলিম সাহিত্য নয়। পক্ষান্ড়রে যে সাহিত্যে তাহা পূর্ণ মাত্রায় অবিকৃত অবস্থায় বর্তমান, তাহা মুসলমান কর্তৃক রচিত না হইলেও মুসলিম সাহিত্য। আধুনিক মুসলমান লেখকদের মধ্যে পনের-আনি লেখকের লেখা ইসলামী বৈশিষ্ট্য-বর্জিত।'[২৩]

ইসলামী সাহিত্য গবেষক আবদুল মান্নান তালিব বলেন, 'ইসলামী সাহিত্য তাকেই বলা হবে যা মানবতাকে নৈতিকতার অনৈসলামী মূল্যবোধ থেকে সরিয়ে আনে এবং তাকে ইসলামী মূল্যবোধের দিকে আহ্বান জানায়। আবার ইসলামী কবিতা ও গল্প হচ্ছে এমন এক পর্যায়ের সাহিত্য যার পিছনে সক্রিয় চিন্ড়াধারা ও মন-মস্ড়িষ্ক ইসলামী চিন্ড়ার সীমারেখাকে মেনে নিয়েছে এবং বিষয়বস্তু উপস্থাপনা, বর্ণনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে ইসলাম আরোপিত নৈতিক বিধিনিষেধকে নিজের জন্য অবশ্য পালনীয় গণ্য করেছে। ইসলামী সাহিত্যে মানুষের সাধারণ আশা-আকাঙ্খা এমন স্বাভাবিক পদ্ধতিতে মূর্ত হয়ে ওঠে যার ফলে তা একটি সৎ ও সুন্দর জীবনের গঠনের ক্ষেত্র তৈরী করে বা তাতে সহায়তা দান করে।"[২৪]

বিশিষ্ট নজরুল গবেষক আবদুল মুকীত চৌধুরী বলেন-'ইসলামী সাহিত্য কি ইসলাম ধর্মীয় সাহিত্য অথবা ইসলাম-আদর্শ নিয়ন্ত্রিত বা অনুপ্রাণিত সাহিত্য ? এ আদর্শের পূর্ণ বা অংশ বিশেষ প্রতিফলিত সাহিত্যকে ইসলামী সাহিত্য বলা যেতে পারে। অবশ্য ইসলামী সাহিত্য বলতে একটা ব্যাপক সাংস্কৃতিক রূপকেও চিহ্নিত করা হয়। এ প্রসঙ্গে ইসলামী শিল্পকলা সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। দেখা যায় যে, মুসলমানদের বিরচিত শিল্প ও সাহিত্য বিশ্বে ইসলামী শিল্প-সাহিত্য নামে সাধারণভাবে পরিচিত। এর একমাত্র কারণ হয়ত এই যে, ঐ শিল্প-সাহিত্যে কোন না-কোনভাবে ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপের প্রতিফলন ঘটেছে।'[২৫]

---

[২৩] .আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, "বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, মোশরফ হোসেন খান সম্পা. (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন, ১৯৯৮), পৃ. ১৮১-৮২

[২৪] . আবদুল মান্নান তালিব, *ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

[২৫] . আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পা, *নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ১৯৮০), পৃ. দশ

আবদুল মান্নান তালিব আরও বলেন, "ইসলামী সাহিত্য জীবনের প্রতিনিধিত্ব করে। আর জীবন যা ছিল, যা হচ্ছে বা হবে এবং যা হওয়া উচিত সবগুলোই বুঝায়। ব্যাপক অর্থে বলতে গেলে ইসলাম যে সমস্ড় নৈতিক মূল্যবোধ সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, যে সাহিত্য সেগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে, যে সাহিত্যে এই মূল্যবোধগুলো পত্র-পলণ্ঢবে শাখা-প্রশাখায় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেটিই ইসলামী সাহিত্য।"[২৬]

পরিশেষে বলা যায় ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ড় মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র নিয়ে এখানে দিক-নির্দেশনা রয়েছে। যে সাহিত্যিকের চিন্ড়া-চেতনায় এ আদর্শের আংশিক বা পুরোপুরি প্রতিফলন ঘটে, সে সাহিত্যই ইসলামী সাহিত্য বলে পরিচিত হবে। অন্যভাবে বললে, ইসলামী দর্শনের যথার্থ উপস্থাপন যে রচনায় বা সাহিত্যে বিদ্যমান অথবা যে সাহিত্যে ইসলামী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার চিত্র অঙ্কন করা হয় সেটাই ইসলামী সাহিত্য। সেটা মুসলিম বা অমুসলিম যার হাতেই সৃষ্ট হোক না কেন।

ঘ. মুসলিম সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্যঃ

অনেকের ধারণা, মুসলিম রচিত সাহিত্য মানেই ইসলামী সাহিত্য। আর অমুসলিম রচিত সাহিত্য মানেই ইসলাম বিরোধী সাহিত্য। তা আদৌ সত্য নয়। একজন মুসলমানের সাহিত্যও ইসলাম বিরোধী হতে পারে। আবার একজন অমুসলিমের সাহিত্যও ইসলামী সাহিত্য হতে পারে। এ রকম অনেক প্রমাণ আমরা বাংলা সাহিত্যে দেখতে পাই। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) এদিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ "কেবল লেখক মুসলমান হ'লেই মুসলমান সাহিত্য হয় না। হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ড় ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। হিন্দুর সাহিত্য রস সংগ্রহ ক'রে হিন্দুর সমাজ থেকে, আমাদের সাহিত্য করবে মুসলিম সমাজ থেকে। সুহৃদয় সত্যেন্দ্র দত্ত, ভক্তিভাজন গিরিশচন্দ্র সেন, মাননীয় শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রদ্ধেয় শ্রীজলধর সেন, মান্যবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি হিন্দু লেখকও অনেক মুসলমান সাহিত্য রচনা করেছেন।"[২৭]

---

[২৬] . আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২০

[২৭] .ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ্ "সাহিত্যের রূপ" *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-৯৭

মূল ব্যাপার হচ্ছে মূল্যবোধ। কে কোন মূল্যবোধ নিয়ে সাহিত্য রচনা করলো। একজন অমুসলিমও যদি কুরআন ও হাদীসের মূল্যবোধ নিয়ে সাহিত্য রচনা করেন, তবে তা অবশ্যই ইসলামী সাহিত্য হিসাবে গণ্য হবে। গবেষক আবদুল মান্নানের ভাষায়ঃ "ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়, কোনো অমুসলিমের হাতে সৃষ্টি হলেও তা ইসলামী সাহিত্য। কাজেই মুসলিম সাহিত্যের গন্ডি একান্তই সীমাবদ্ধ। সে তুলনায় ইসলামী সাহিত্য অনেক বেশী ব্যাপক ও বিশ্বব্যাপী।"[২৮]

ইসলামী সাহিত্য একটি সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। যেমনঃ ইসলামী আদর্শ ও চিন্তা-চেতনা সমাজে ও মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা। হালাল, হারাম, ন্যায় ও অন্যায় এগুলোর বিষয়ে নীতি অনুসরণ করে চলা। সৎপথে মানুষকে আহ্বান করা ও অন্যায় থেকে বারণ করা ইত্যাদি। অন্যদিকে মুসলিম সাহিত্যের উপরোলেখিত বিষয়গুলো নিয়ে কোন সুনির্দ্দিষ্ট লক্ষ নেই। 'ইসলামী সাহিত্য একটি আদর্শ ও লক্ষাভিসারী। কিন্তু মুসলিম সাহিত্যের বিশেষ কোন আদর্শ ও লক্ষ্যের পরোয়া নেই। মুসলমানের সৃষ্ট যে কোন ধরনের সাহিত্য মুসলিম সাহিত্য হতে পারে। কিন্তু মুসলমানের সৃষ্ট ইসলামী মূল্যবোধ বর্জিত কোন সাহিত্য ইসলামী সাহিত্য নামে আখ্যায়িত হতে পারে না। তাই মুসলিম সাহিত্য যেখানে একটি জাতীয় সাহিত্য সেখানে ইসলামী সাহিত্য হচ্ছে একটি আদর্শবাদী ও উদ্দেশ্যমুখী কিন্তু সার্বজনীন সাহিত্য।'[২৯]

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহ মুসলিম সাহিত্যিক ও ইসলামী সাহিত্যিকের কর্মকে আলাদা করে ইসলামী সাহিত্যের অবস্থান আমাদের সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি এ দু'য়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় করে বলেন, 'আমরা বাঙ্গালি যেমন সত্য আমরা মুসলমান তেমনি সত্য। আমাদের একটা বিশেষ কৃষ্টি আছে। যদি বাংলা সাহিত্যে আমাদের সেই কৃষ্টির ছাপ না থাকে, তবে সে সাহিত্য আমাদের কাছে বিজাতীয় সাহিত্যের মতনই ঠেকবে। লেখক মুসলমান হলেই তার লেখা সাহিত্য মুসলমান সাহিত্য হতে পারে না, যদি না তাতে মুসলমানত্ব থাকে। মুসলমান কবিদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলী অনেক স্থলে উপাদেয় হলেও, সেগুলোকে মুসলমান সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা চলে না।'[৩০]

ঙ. ইসলামী সাহিত্যের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

মানব জীবনের আনন্দ-রসের জন্ম দেয়া সাহিত্যের একটি অংশ হলেও, শুধু আনন্দ দান করা সাহিত্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। সাহিত্যের মাধ্যমে মানবীয় গুণাবলীকে মানুষের কল্যাণে জাগিয়ে তুলতে পারাটাই

---

[২৮] . আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[২৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[৩০] . ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলাহ্ "সাহিত্যের রূপ" *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

সাহিত্যের সার্থকতা। 'সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানুষের কল্যাণ'।[৩১] আধুনিক কালে অনেক সাহিত্যিককেই দেখা যায়, তারা মানুষকে আনন্দ ও রস দানেই ব্যস্ড়। সত্যিকার ভবিষ্যৎ কল্যাণ নিয়ে খুব কম সংখ্যক সাহিত্যিকই চিন্ড়া করেন।

শুধু আনন্দ দান করা সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। আবার নিছক শিল্পকারিতা বা সাহিত্যের খাতিরে সাহিত্য করাও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের জীবনের প্রতিটা কদমই উদ্দেশ্যের সাথে জড়িত। ভালো ও কল্যাণমূলক উদ্দেশ্য নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। সাহিত্যের মধ্যে কল্যাণ না থাকলে তাকে সাহিত্য বলা যায় না। "মানুষের জীবনে উদ্দেশ্যবিহীন কোন বিষয় কল্পনা করা যায় না। সে উদ্দেশ্য ভালো হতে পারে, মন্দ হতে পারে, ছোট হতে পারে, বড়ও হতে পারে। তেমনি সাহিত্যের উদ্দেশ্যও রয়েছে।"[৩২]

মানুষের আচার-ব্যবহার ও দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে যে খারাপ দিকগুলো আছে বা মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে যে রচ্চি গর্হিত দিকগুলো আছে, তা সমাজ থেকে দূর করাই সাহিত্যের লক্ষ। মানুষের উন্নত রচ্চিবোধে ব্যাঘাত ঘটে এমন কোন কল্পনা সাহিত্যের অংশ হতে পারে না। 'যে সাহিত্যিক নিছক ব্যক্তিগত ভাব-কল্পলোকে বিচরণ করে, যে প্রসারিত দৃষ্টির অধিকারী নয়, সমগ্র জীবনকে করতলগত করার মতো মতাদর্শ থেকে যে বঞ্চিত, জীবনের খ- খ- ঘটনাবলী, মানবিক কার্যক্রম ও খ-িত আবেগ-অনুভূতিকে একটি বিশ্বজনীন সত্যের ছাঁচে ঢালাই করার ক্ষমতা যার নেই, সে সমগ্র মানবতা ও তার সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা অধ্যয়নের ক্ষমতাই রাখেনা, সে আসলে উদ্দেশ্য ও লক্ষাভিসারী সাহিত্য সৃষ্টির মহান দায়িত্ব থেকে দূরে পালিয়ে বেড়ায়।'[৩৩]

ইসলামী সাহিত্যিক তাঁর লেখায় ন্যায়-অন্যায়কে তুলে ধরবেন, মানুষকে ভালো কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবেন, এটাই ইসলামের দাবি। শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে যেন মানুষের জীবন ধবংস না হয়, এর জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। 'আদর্শ ও লক্ষাভিসারী সাহিত্যিক ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দুর্দান্ড় শিকারী বাজপাখীর মতো। হতাশা ও নৈরাশ্যকে গলা টিপে হত্যা করার এবং দুঃখ-শোক, অন্যায়-অকল্যাণ, ফিতনা-ফাসাদের বিরচ্দ্ধে সংগ্রাম মুখর হয়ে প্রতিকূল পরিবেশের প্রাচীর ভেঙ্গে নতুন দুনিয়া গড়ে তোলার জন্য সে মানুষকে আহ্বান জানাতে থাকে।'[৩৪]

---

[৩১] .মোঃ জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

[৩২] . আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৩৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৩৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

মানুষের জীবনে অসংখ্য দিক রয়েছে। প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা, সমাজ জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও পারিবারিক জীবন ইত্যাদি। ইসলামী সাহিত্যের লক্ষ্য থাকবে ইসলামী নৈতিকতার আলোকে জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে সাহিত্য রচনা করা। 'জগত ও জীবনের অসংখ্য দিক রয়েছে। ইসলামী সাহিত্য এইসব দিকের ওপর ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে।

এ থেকে পরোক্ষভাবে একথাও প্রমাণ হয় যে, ইসলামী সাহিত্য একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষাভিসারী। জীবনের যেমন একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে ইসলামী সাহিত্যও তেমনি একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষকে কেন্দ্র করে এগিয়ে চলে। তাহলে দেখা যায়, 'আর্ট ফর আর্টর্স সেক' ধরনের কোন সাহিত্য যদি থেকেই থাকে তবে ইসলামী সাহিত্যে তার কোন স্থান নেই।

আমাদের জীবন যদি উদ্দেশ্যবিহীন না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সাহিত্য উদ্দেশ্যবিহীন হবে কেন? আমাদের জীবন কয়েকটা নিয়মের অধীন, তেমনি আমাদের সাহিত্যও। ইসলামী সাহিত্যে ব্যাপকতা আছে, চিন্ড়া ও লেখার স্বাধীনতা আছে। অন্য কোন সাহিত্যে এগুলো যে চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেছে, ইসলামী সাহিত্যে তার অবকাশ নেই। অন্য সাহিত্য নিজেকে নৈতিকবোধ, বিধি-নিষেধ ও নিজেকে নিয়ম শৃঙ্খলার উর্ধ্বে রাখতে চায় কিন্তু ইসলামী সাহিত্যে তা সম্ভব নয়।'[৩৫]

মজলুমের পাশে দাঁড়ানো যেমন একজন মু'মিনের কর্তব্য, ঠিক তেমনি একজন ইসলামী সাহিত্যিকও তাঁর সাহিত্য সাধনা দিয়ে নিপীড়িত, নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। যেই কোন অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরচদ্ধে তাঁর সাহিত্য সাধনা জাতিকে জাগিয়ে তুলবে। সত্যের জয় ঘোষণা করবে। কেননা 'ইসলামী সাহিত্য সমগ্র মানব জাতির কল্যাণকামী। এ সাহিত্য প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবরকম জুলুমের বিরচদ্ধে প্রতিবাদমুখর।

ধনী দরিদ্রের ওপর যে জুলুম করে, শক্তিশালী দুর্বলের ওপর যে নির্যাতন চালায়, মালিক শ্রমিককে উৎপীড়নের যে স্টীম রোলারে পিষে স্ড়ব্ধ করতে চায়, সাদারা কালোদের বিরচদ্ধে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষ অভিযান চালায়, সমাজ ব্যক্তির ওপর এবং ব্যক্তি সমাজের ওপর যে অন্যায় বাড়াবাড়ি করে-এ সাহিত্য সে সবের বিরচদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে।'[৩৬]

---

[৩৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৩৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

তাই ইসলামী সাহিত্য ইসলামের ভাবধারা ও মহিমা তার সাহিত্যে তুলে ধরবে এটাই স্বাভাবিক। এ সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে মানুষের মন-মস্তিষ্ক ইসলামীকরণে অনুপ্রাণিত হবে। ইসলামের সঠিক দিক ও নির্দেশনা মুসলিম ও অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেরই এ সাহিত্য থেকে প্রাণ ভরে গ্রহণ করার সুযোগ থাকবে।

কবি ও সাহিত্যিক গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) ইসলামের মহিমা প্রচারই ইসলামী সাহিত্যের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে মনে করেন। 'ইসলাম যদি চিরন্তন মানুষেরই মর্মবাণী হয় আর মুসলমান যদি সেই শাশ্বত বাণীকেই তার সাহিত্যে রূপ দেয়, তবে তা সাহিত্য পদবাচ্য হতে পারে কি না ? ইসলামই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম-যাতে চির মানুষের বাণী বিঘোষিত হয়েছে।

কাজেই মানুষের বাণী বলা আর ইসলামের বাণী বলা মূলতঃ একই। সাহিত্য সৃষ্টি উদ্দেশ্যবিহীন নয়। সাহিত্য জীবনেরই বিশ্লেষণ। ধর্ম সেই জীবনকেই তো ধারণ করে আছে। কাজেই ধর্মও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না। 'সাহিত্য' আর 'ধর্মের' মধ্যে যদি তুলনা করতেই হয় তবে ধর্মকে ফেলে শুধু সাহিত্য নিয়ে আমরা থাকতে পারি না। সাহিত্যের চেয়ে ধর্ম বড়।'[৩৭]

ডাঃ লুৎফর রহমান সাহিত্যের লক্ষ্য নিয়ে সবচেয়ে সুন্দর কথা বলেছেন বলে মনে হয়। "সাহিত্যের কাজ মানুষকে তার চারদিকের মন্দশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা, তার মধ্যে সমাজ, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে অগ্রাহ্য করে ন্যায়, সত্য ও আল্লাহকে মেনে নেবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে দেওয়া"।[৩৮] বাংলায় গদ্য সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার প্রধান স্রষ্টা শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩৩)। তিনি 'সাহিত্যের আদর্শ ও লক্ষ্য' প্রবন্ধে মুসলমান সাহিত্যিকের লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তা আরও খোলাসা করে বলেন। 'ইসলাম শুধু মানবের পার্থিব উন্নতি ও কল্যাণ সাধনের জন্যেই জগতে আসে নাই বরং সমগ্র বিশ্বের মানব জাতিকে মুক্তি ও স্বর্গের পথে লইয়া যাইতেই তাহার আবির্ভাব। সুতরাং ইসলামী সাহিত্য একদিকে যেমন উন্নতি ও কল্যাণের উৎস হইবে, অন্যদিকে তেমনি মুক্তির ধারা ও সৃষ্টির প্রেরণা বিশ্ব মানবের প্রাণের

---

[৩৭] . শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০)* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯৩), পৃ.২৮৬

[৩৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭

মধ্যে ঢালিয়া দিয়া তাহার হৃদয়তন্ত্রী বাজাইয়া তুলিবে। ইহাই মুসলমান সাহিত্যিকের প্রধানতম লক্ষ এবং ইহাই তাহাদের জাতীয় সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ হওয়া উচিত।'[৩৯]

ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে আদম সন্ড়ানকে মানুষ করে তোলা। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তাদের জীবনকে হেফাজত করা। বিশেষ করে মুসলমান সমাজকে তার নিজস্ব ধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার সম্পর্কে সজাগ করে দেওয়া। যেই সংস্কৃতি বহন করে সে প্রকৃত ও আদর্শ মানুষ হওয়ার সুযোগ পাবে। “আমাদের সাহিত্য সাধনার চরম এবং পরম আদর্শ হবে বাঙ্গালী মুসলিমকে প্রকৃত মুসলিম বানিয়ে তোলা, যে মুসলিম নিজেকে সম্মান করবে, নিজের সমাজকে সম্মান করবে, নিজের ধর্ম্মকে সম্মান করবে, নিজের দেশকে সম্মান করবে, এবং নিজের মানবতাকে সম্মান করবে।”[৪০]

হতাশা গ্রস্ড় মুসলমান জাতির মধ্যে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে আত্মবিশ্বাস ও জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করতে হবে। ‘আমাদের ধর্ম্ম সবচেয়ে বড়, আমাদের ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত কালচারের ভবিষ্যৎ সবচেয়ে উজ্জ্বল। এই হবে আমাদের সাহিত্য সাধনার মূলমন্ত্র। কেবল মুখে এ কথা বললে চলবে না। অন্ড়রের সঙ্গে এর উপর বিশ্বাস করতে হবে। আর সেই বিশ্বাসের উপর আমাদের সাহিত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

আত্মবিশ্বাস এবং আত্মসম্মানই হচ্ছে জাতির উন্নতির এবং গৌরবের শ্রেষ্ঠ পথ। আর আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং আত্মতাচ্ছিল্য হচ্ছে ব্যক্তির এবং জাতির পতন এবং মৃত্যুর নিশ্চিত কারণ এবং লক্ষণ।'[৪১] সাহিত্যের আসল কাজ সম্পর্কে শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী বলেনঃ ‘সাহিত্যের কাজ নট-নটীর কাজের ন্যায় কেবল লোকচিত্ত বিনোদন নয়, ভাঁড়ের ভাড়ামীর মত হাস্য-রহস্য বা রস-রঙ্গ সৃষ্টি করাও নয় অথবা চিত্রকরের সচিত্র অঙ্কনের ন্যায় মানব মনকে সৌন্দর্য রসে ডুবিয়ে রাখাও নয়। সাহিত্যের কাজ হচ্ছে মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা-তার অন্ড়র জ্ঞানের আগুন জ্বালিয়ে তার ভীরচতা ও জড়তা ও মূর্খতার আবর্জ্জনা পুড়িয়ে দেওয়া এবং তৎপরিবর্তে সৎসাহস, কর্ম্মস্পৃহা ও দেশাত্মবোধ উদ্দীপ্ত করা।'[৪২]

---

৩৯ . শাহজাহান মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯

৪০ . এস. ওয়াজেদ আলি, “বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনার পথ”, *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী* **১**, সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫), পৃ. ৫২৪

৪১ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪

৪২ . শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, “মোসলেম বঙ্গ-সাহিত্য”, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, মোশরফ হোসেন খান সম্পা (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন, ১৯৯৮), পৃ. ২০৮

চ. ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তুঃ

ইসলাম নির্দ্দিষ্ট কোনো ভূ-খন্ডের ধর্ম নয়। ইসলাম কোন জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস না করে বরং আন্ড়র্জাতিকতাবাদে বিশ্বাস করে। সুতরাং ইসলামের আদর্শ যে ভূ-খন্ডে প্রচার-প্রসার লাভ করেছে, সে তার পরিবেশের মাঝে তার আকীদা-বিশ্বাস ঠিক রেখেই সে তার কাজ চালিয়ে গিয়েছে। সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ভাষায়ঃ 'আর একটা কথা আমাদের সাহিত্যিকরা যেন না ভোলেন। আমরা যে মোহাম্মদীয় ইসলামের অনুবর্তী, ইসলামের অনুবর্তী, তার জন্ম ও প্রথম পরিপালন একটা বিশেষ দেশে হলেও সেই দেশের মানবতা ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ইসলামকে সীমাবদ্ধ করে দেখা অনুচিত।

সকল যুগ, সকল দেশ ও সকল জাতিকে অতিক্রম করে ইসলামের বিস্ড়্র- একথা বলতে চাইবেন না, এমন কোনো মুসলিম সাহিত্যিক বোধ হয় এ দেশে নেই। এটা যদি তাঁদের প্রাণের কথা হয়, তাহলে এও তাঁরা অবশ্যই বুঝবেন যে শুধু উট, খোরমা-তরচ ও মরচভূমির বালুকাতেই ইসলামের অনুভূতি খুঁজলে চলবে না; আমাদের সাগর, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, শস্য-শ্যামল প্রান্ড়র ছায়া-ঢাকা পাখী ডাকা বনানী ইত্যাদির সংগেও তাকে গ্রহণ ও অনুভব করার শক্তি পেতে হবে।'[৪৩]

সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলীর মতামত এ ক্ষেত্রে আরও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। ''সাহিত্য আকাশ থেকে পড়ে না, মাটিতেই জন্মায়। যে মাটিতে সাহিত্য জন্মায়, সেই মাটির বৈশিষ্ট্য সেই সাহিত্যে প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে সাহিত্য হচ্ছে একটা জাতির জীবনের, তার জীবনাদর্শের, তার সুখ-দুঃখের, তার আশা-আকাঙ্খার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি।"[৪৪]

সাহিত্যিক আবদুল মান্নান তালিব ইসলামী সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করেন। একজন ইসলামী সাহিত্যিকের সাহিত্য সাধনার পূর্বে যে বিষয়গুলো সম্পর্কে তার জানা অত্যাবশ্যক তার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র নিম্নরূপঃ

১. 'ইসলামের তিনটি মৌলিক বিশ্বাস-তওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এ তিনটি বিষয়বস্তুকে কবিতায়-গল্পে-উপন্যাসে এমনভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তা সমগ্র পরিবেশকে প্রভাবিত করে। এজন্য অবশ্যি একজন ইসলামী কবি ও ইসলামী গল্পকারকে তার পরিবেশ ও সমাজ চিন্ড়র কাঠামোর

[৪৩]. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার", *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী প্রথম খন্ড*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৯০), পৃ. ৪৬৭-৪৬৮

[৪৪]. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৫

বিরুদ্ধে সারাক্ষণ যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হবে। এ মৌলিক বিশ্বাস তিনটিকে একটি বিশ্বজনীন জীবন দর্শনের চিন্তাগত ভিত্তি হিসাবে পেশ করতে হবে। এ তিনটি বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিবেশের ধারা ও ঘটনার মোড় পরিবর্তন করতে হবে।

২. ইসলামী চরিত্র ও নৈতিক গুণাবলী। ইসলামী কবি ও গল্পকার ঐতিহাসিক ঘটনাবলী উপস্থাপনের মাধ্যমে তার মধ্যে সক্রিয় নৈতিক গুণাবলী ও বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরবেন। অন্যদিকে বর্তমান নৈতিকতা বিগর্হিত পরিবেশ ও অসুস্থ সমাজ চরিত্রের মুখোশ উন্মোচন করবেন। এ সঙ্গে ইসলামের নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীর আলো জ্বালিয়ে সমগ্র সমাজ অংগনকে আলোকিত করবেন। উন্নত নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীকে পরিপূর্ণতা দান করার জন্য নবী করিম (সা.) কে পাঠানো হয়েছিল। ইসলামী সাহিত্যিকদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজ দেহে এই গুণাবলীকে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করা।

৩. আমাদের সমাজ ও পরিবেশ। প্রথমে দেশের সমাজ ও পরিবেশ এবং পরবর্তী পর্যায়ে আন্তর্জাতিক সমাজ ও পরিবেশ। এছাড়াও মানসিক ও চিন্তাগত এবং নৈতিক পরিবেশ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তথা সব ধরনের পরিবেশ। এসব পরিবেশ আমাদের প্রতিকুল। এদের সাথে আমাদের চিন্তাগত বিরোধ সুস্পষ্ট। কাজেই এই বিরোধী পরিবেশ ও তার কাঠামোয় প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে। নতুন পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য আমাদের সাহিত্যের সমস্ত শক্তিকে নিয়োগ করতে হবে।

৪. বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় নারীকে যেখানে স্থাপন করা হয়েছে এবং বস্তুবাদী সমাজ ব্যবস্থা নারীকে যেভাবে উপস্থাপন করছে আমরা তা থেকে তাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায় স্থাপন করতে এবং ভিন্নভাবে উপস্থাপন করতে চাই। নারীকে গৃহের ও পরিবারের মধ্যমণি বানিয়ে আমরা যে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ও পরিবারের শান্তির নীড় রচনা করতে চাই, আমাদের কবিতায় ও গল্পে একদিকে যেমন তার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠবে তেমনি অন্যদিকে পাশ্চাত্য সমাজ নারীকে কর্মক্ষেত্রে নামিয়ে এনে তাকে পুরুষের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতার দৌড়ে ঠেলে দিয়ে যে সমাজ গড়ে তুলেছে তার ক্ষতি, বিপর্যয়, বৈপরীত্য ও ধ্বংসের চিত্রও তাতে ফুটে উঠবে।

৫. পুঁজিবাদ ও কমিউনিজম। আধুনিক জাহেলিয়াতের এ দুটি সন্তান আমাদের দেশে এবং অন্যান্য দেশেও যে ধবংস ডেকে আনছে তার প্রত্যেকটা পর্যায় আমাদের জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। বিশেষ করে কমিউনিজম বিপ্লব আনার জন্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তার সাথে আমাদের সুস্পষ্ট বিরোধ। ইসলামী বিপ্লবের পদ্ধতি সম্পর্কে মুসলমানদের সঠিকভাবে অবহিত করার জন্য

আমাদের এ বিষয়বস্তুটি অবলম্বন করতে হবে। এই সংগে দারিদ্র্য ও শোষণের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম হতে হবে বিরামহীন।

৬. দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক সুবিচার। একদিকে যেমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ইসলামী সাহিত্য হবে সোচ্চার তেমনি অন্যদিকে ইসলামের অর্থনৈতিক সুবিচারের দৃষ্টান্তও তুলে ধরতে হবে।

৭. ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী বিপ্লব। ইসলামী বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এটিই হবে আমাদের সবচেয়ে আবেগময় বিষয়বস্তু। ইসলাম একটা আন্দোলন এবং ইসলামী সাহিত্য এ আন্দোলনের ফসল। মুসলমানদের জাগ্রত করার জন্য এ আন্দোলনের মূল চিন্তাধারা ও পদ্ধতি তাদের সামনে তুলে ধরাও এর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু।'[৪৫]

সাহিত্যিক আব্দুল মান্নান তালিবের ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের বিষয়-বস্তুর এ মনোরম চিত্রই ফুটে উঠে। একজন ইসলামী সাহিত্যিক কোন্ ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে তার সাহিত্যের প্রাসাদ গড়ে তুলবে এটা একটা বিচার্য বিষয়। ইসলামী সাহিত্যিক একদিকে যেমন ইসলামের ওপর পূর্ণ বিশ্বাসী হবে তেমনি অন্যদিকে হবে পুরোপুরি সমাজ সচেতন। মানুষের ও মানুষের সমাজের সমস্যাগুলো সে হৃদয় দিয়ে অনুভব করবে। মানবতার কল্যাণাকাঙ্খা তার হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে অনুরণিত হবে।[৪৬]

ইসলামী সাহিত্যিকের সামনে বিষয়বস্তু স্পষ্ট না থাকলে সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তিনি ভুল পথে পা বাড়াতে পারেন। একটি সুন্দর ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য সামনে রেখে ইসলামী সাহিত্যিকগণ এগিয়ে যাবেন এটাই প্রকৃত মুসলমানদের প্রত্যাশা। 'ইসলামী সাহিত্যিকের নিকট এক পরম সত্য হয়ে থাকে পরকালে বিশ্বাস। সাহিত্য সৃষ্টি কর্মে এই বিশ্বাসের গভীর প্রভাব অনিবার্যভাবে প্রতিফলিত হয়। এ কালের দার্শনিক সাহিত্যিকদের বেলায়ও এ কথাই সত্য। ইসলামী সাহিত্যিক নিজের কলমের সাহায্যে স্বীয় রচনাবলীতে এই অনুভূতি, চেতনা-স্পন্দনকে ভরে দিয়ে প্রত্যেক পাঠকের হৃদয়ে-অন্তরে সমৃদ্ধ ও দৃঢ়মূল করে দেয়। তারপরে এমন একটি বিশেষ সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের লক্ষ্যে লোকদেরকে কর্মব্যস্ত ও অবিশ্রান্ত সংগ্রামী বানিয়ে দেয়, যেখানে মানুষ মানুষের প্রভু বা সার্বভৌম নয়, মানুষ নয় মানুষের গোলাম বা দাসানুদাস।'[৪৭]

---

[৪৫]. আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৫

[৪৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

[৪৭]. মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-২৯

ছ. ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব ঃ

গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক যাই হোন না কেন মুসলমান হিসেবে তাঁর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত নীতিমালা অনুযায়ী তাঁর সাহিত্য রচনা করা। তাঁর সাহিত্য সেবা কোন অবস্থাতেই কুরআন ও হাদীস তথা ইসলামী আদর্শের বিরোধী হবে না এবং ইসলামী ভাবধারার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না। 'একজন মুসলিম কবি ও মুসলিম গল্পকার ভালো ও মন্দের যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদিসের মূলনীতির বাইরে অবস্থান করতে পারেন না। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সৎবৃত্তি ও কল্যাণের প্রসারে এবং অসৎবৃত্তি ও অকল্যাণকে সমাজের বুক থেকে চিরতরে উৎখাত করার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন।'[৪৮]

ইসলামী সাহিত্যিকদের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করার পূর্বে সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলীর (১৮৯০-১৯৫১) লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। 'বিশ্বমানবতার সবচেয়ে বড় সমর্থক হচ্ছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বমানবতার বিষয় নিয়ে যত লিখেছেন, আর কেউ বোধ হয় তত লেখেন নি। তাঁরই লেখা পড়ে এবং বক্তৃতা শুনে একদল দেশপ্রেমিক আমাদের সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা দিয়েছেন, আর তারা ইসলামী সভ্যতাকে বাঙ্গালাদেশ থেকে তাড়াবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন এবং হিন্দু ও মোসলেম সভ্যতার সমন্বয় করে নতুন একটা কিছু গড়বার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা এসব করছেন, তিনি অশেষ কষ্ট করে ভারতবর্ষ থেকে বড় বড় পণ্ডিত সঙ্গে নিয়ে ক্ষুদ্র বালী দ্বীপে যাচ্ছেন হিন্দু কালচারের পুনরুত্থানের জন্য; নটরাজের পালা লিখছেন, বাঙ্গালী ছেলেদের হিন্দু পৌত্তলিকতার আধ্যাত্মিকতা শেখাবার জন্য বেদমন্ত্র পাঠে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উৎসব সম্পন্ন হচ্ছে প্রাচীন হিন্দু আদর্শকে জাগিয়ে রাখবার জন্য।

যে রবীন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধ লিখলে দশবার তাতে উপনিষদের উল্লেখ করতে ছাড়েন না, তাঁরই নির্দেশিত পথের অনুসরণ করে আমাদের সমাজের কতিপয় সাহিত্যিক ইসলামিক কালচারের শত্রুতা সাধনে আত্মনিয়োগ করেছেন। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস!'[৪৯]

---

[৪৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৪৯] . এস. ওয়াজেদ আলী "বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী মুসলমান" *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০-১৯১

মুসলমান তাকেই বলে যে বাস্ড়ব জীবনে ইসলামী জীবনাদর্শ তথা ইসলামের সামগ্রিক দিক মেনে চলে। প্রত্যেক মুসলমানের উপরেই ইসলাম প্রচারের নির্দেশনা রয়েছে। স্ব স্ব অবস্থানে থেকে মুসলমান মাত্রই সে একজন তার ধর্মের প্রচারক। এ ধর্মের মহিমা ও মহত্ত্ব সে যেই সমাজেই থাকুক, সেখানে মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করবে। প্রচার ও প্রসার করার চেষ্টা করবে।

মুসলমানের মধ্যে যারা সাহিত্য নিয়ে কাজ করেন বা সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত অথবা যাঁদেরকে আলণ্ডাহ সাহিত্য জ্ঞানে ভূষিত করেছেন, তাঁদেরকে অবশ্যই ইসলামী সাহিত্য সেবা করতে হবে। 'সাহিত্যিক সমাজ থেকে আলাদা কোন সত্তার নাম নয়। বরং তিনি হচ্ছেন সমাজের সবচেয়ে অনুভূতিশীল সদস্য। ইসলামী সাহিত্যিক যেমন ইসলামী সমাজের সবচেয়ে অনুভূতিশীল প্রতিনিধি তেমনি তার সাহিত্য ইসলামী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে।

ইসলাম তার সদস্যদের ওপর যে দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে ইসলামী সাহিত্যিককে তা থেকে অব্যাহতি দেয়নি।'[৫০] ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ ইত্যাদি মুসলিম সাহিত্যিককে তার সাহিত্য সেবায় তোলে ধরতে হবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রচারিত ধর্মের নীতিমালার ভিতরে থেকেই তাকে সাহিত্য সাধনা করতে হবে। 'মুসলিম সাহিত্যিক যে সাহিত্য সৃষ্টি করবে তা একদিকে সমাজে ন্যায়, কল্যাণ ও সৎবৃত্তির প্রসার ঘটাবে এবং অন্যদিকে অসৎবৃত্তি, অন্যায় ও অকল্যাণের স্পর্শ থেকে সমাজকে দূরে রাখবে।

তাই এই ভালো ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, সৎ ও অসৎ, কল্যাণ ও অকল্যাণের মানদ- কি হবে ? এগুলো কি কোন আপেক্ষিক বিষয় ? কুরআন এগুলোর যে মানদ- দিয়েছে মুসলিম সাহিত্যিকের জন্য একমাত্র সেই মানদ-ই গ্রহণীয় হবে। ভালো ও মন্দ, হালাল ও হারামের নীতি কুরআন ও হাদীসই সুস্পষ্ট করে দিয়েছে এবং তাই হবে একমাত্র গ্রহণীয় নীতি।

নিজের জন্য যা ভালো বা মন্দ, পরিবারের জন্য যা ভালো বা মন্দ, সমাজের, জাতির ও দেশের জন্য যা ভালো বা মন্দ, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই ভালো বা মন্দ।'[৫১] মুসলিম সাহিত্যিককে ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো অবশ্যই সাহিত্য রচনার পূর্বে জেনে নিতে হবে। কেননা কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই মুসলিম সমাজে সাহিত্য রচনা করতে হয়। "ইসলাম আমাদের যে নৈতিক মূল্যবোধগুলো দান

---

[৫০] . আবদুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৫১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

করেছে সেগুলোই হবে আমাদের ইসলামী সাহিত্যের মূলভিত্তি আর এখান থেকে একথাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলামী সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মূল গাইড বুক হচ্ছে কুরআন।”[৫২]

ইসলাম বিদ্বেষী সাহিত্যিকেরা ইসলামের ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে কলঙ্ক লেপন করেছেন। ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছেন। এদের চক্রান্ড় সম্পর্কে ইসলামী সাহিত্যিকদের সাবধান থাকতে হবে। কেননা ‘যাঁরা ইসলামের ইতিহাসে অজ্ঞ, তারা মনে করতে পারেন যে ইসলামীয়া শিক্ষা চিরকালই এইরূপ দর্শন বিজ্ঞান বর্জিত হয়ে আছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্ড়াবে ইসলাম, গ্রীক, পারসী ও হিন্দু তিনটি প্রাচীন কালচার থেকে কম বেশী তার মাল মসলা আহরণ করে এক বিরাট ইসলামীয় কালচার গড়ে তুলেছিল। কাব্য, জ্যোতিষ, দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, গণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, ইতিহাস, ভূগোল কোন বিষয়েই ইসলামের দান কম নয়।

এক সময়ে সেবিল, কর্দ্দোভা ও গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্ঞান আহরণের জন্য খ্রীষ্টান ইউরোপের দূর প্রান্ড় থেকে ছাত্ররা আসত এবং কৃতবিদ্য হয়ে নিজ নিজ দেশে জ্ঞান বিস্ড়ার করতে চলে যেত। বাঙ্গালার মুসলিম সাহিত্য গড়তে গেলে মুসলমান ধর্ম্ম ও কালচারের সঙ্গে গাঢ় পরিচয় থাকা চাই। কিন্তু সাধারণ প্রণালীর শিক্ষায় তা ঘটে উঠে না। ঘটে উঠা ত দূরের কথা, অনবরত ইসলামের বিপক্ষে লোকদের রচনা পড়ে তাদের মাথা এমন বিগড়ে যায় যে ইসলামের প্রতি একটা স্পষ্ট বিদ্রোহের গন্ধ তাদের লেখায় পাওয়া যায়।’[৫৩]

ইসলামী সাহিত্য চর্চাকে অমুসলিমরা কখনই সুনজরে দেখে নাই। দেখবে বলেও মনে হয় না। এই উপমহাদেশে হিন্দুদের সাহিত্য মুসলমানেরা প্রাণভরে ও উদার চিত্তে গ্রহণ করেছে ও করছে। কিন্তু মুসলমানের কোন সাহিত্য হিন্দুরা গ্রহণ করে নাই। অনেক মুসলমান সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে হিন্দুদের গোলামী করলেও, হিন্দুরা মুসলমান রচিত সাহিত্যকে ইচ্ছে করে ধরাছোঁয়ার বাহিরে রেখেছে। “দুঃখের বিষয় মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যেও দুই-চারিজন আছেন, যাঁহারা মুসলমানদের সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াসকে সংকীর্ণতার পরিচায়ক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজের দৃষ্টি এতই সঙ্কীর্ণ অথবা স্বজাতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞান এতই অল্প যে, পরের কুযুক্তিকে তাহারা সহজেই পরম সুযুক্তি বলিয়া মাথা

[৫২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৫৩] . ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্ডাহ্ “সাহিত্যের রূপ” *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১০২

পাতিয়া গ্রহণ করেন। তাহারা ভুলিয়া যান যে, হিন্দুরা মুখে যত বড় বড় কথা বলেন না কেন, কার্যতঃ তাহারা হিন্দু সভ্যতাকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য গঠন করিয়াছেন ও করিতেছেন।

রবীন্দ্রনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া চুনাপুটি সাহিত্যিক পর্যন্ড় কেহই বাঙ্গালা সাহিত্যে হিন্দু সভ্যতাকে বর্জন করিতে ইচ্ছুক নহেন। রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সভ্যতার জয়-গৌরব ঘোষণার জন্য বৃহত্তর ভারত আবিষ্কারের কল্পনায় অধীর হইয়া বৃদ্ধ বয়সেও সাগর পাড়ি দিতে ত্রচ্টি করিতেছেন না। ইহাতে যদি তাহাদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ না পায়, তবে মুসলমান বেচারারা তাহাদের সভ্যতার ছাপ বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অঙ্গে লাগাইয়া দিতে চাহিলে, তাহাকে সঙ্কীর্ণতা বলা হইবে কেন?

পরলোকগত গিরিশচন্দ্র সেন ভিন্ন অন্য কোন খ্যাতনামা হিন্দু বা ব্রহ্ম সাহিত্যিক এ যাবৎ ইসলামী সভ্যতাকে ভালরূপে জানিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করেন নাই। কেবল হিন্দু সভ্যতা লইয়াই তাহারা ব্যস্ড়। ইহাতে যদি তাহাদের সঙ্কীর্ণতা প্রকাশ না পাইয়া থাকে, তবে নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়াসী মুসলমানদিগকে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি বলা হইবে কোন অপরাধে ?"[৫৪] এই হিন্দু সাহিত্যের প্রভাবে বা হিন্দু প্রভাবিত মুসলিম রচিত সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবে আজ ইসলামী সাহিত্যের অস্ড়িত্ব হুমকীর সম্মুখীন বা বিলীনের পথে।

বঙ্কিম থেকে শমরেশ পর্যন্ড় এই বিশাল হিন্দু সাহিত্যের বই পড়েন নাই, এমন শিক্ষিত বাঙালি মুসলিম পাওয়াই যাবে না। শরৎ চন্দ্রের বই পড়েন নাই এমন বাঙালি মুসলিম যুবক খোঁজে পাওয়া যাবে না। হিন্দু সাহিত্যের এই প্রভাব থেকে মুসলমানদের বাঁচাতে চাইলে ইসলামী সাহিত্য রচনা করতে হবে। আর তা রচনা করতে হলে মুসলিম সাহিত্যিকদের একত্ববাদে শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। "শরৎ সাহিত্যের মত মাদকতাময় সাহিত্যকে ধাক্কা মারিয়া সরাইয়া দিয়া বাঙালী মনের উপর স্থান লাভ করিতে হইলে যে শক্তিশালী সাহিত্যের দরকার, সে সাহিত্য কেবল তৌহীদবাদী মুসলমানই দিতে পারিবে। এ বিশ্বাস অনেকের কাছে পাগলামী মনে হইতে পারে।"[৫৫]

মুসলিম সাহিত্যিকদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ইসলামী সাহিত্য রচনা করতে হবে। কেননা, অন্যান্য ধর্ম বিশ্বাসের সাথে ইসলামের অনেক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। "ইহা কাহারও অবিদিত নহে যে, হিন্দু-সেবিত বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু সভ্যতাকে ভিত্তি করিয়াই দন্ডায়মান। পৌত্তলিকতা, জাতিভেদ, পুনর্জন্মবাদ, অবতারবাদ প্রভৃতি হিন্দু সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার রক্তমাংসে, অস্থিমজ্জায় বিজড়িত রহিয়াছে। ইহার

[৫৪] . মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "সাহিত্যে স্বাতন্ত্র কেন ?" *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

[৫৫] . আবুল মনসুর আহমদ, "সাহিত্য ও যুগধর্ম", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

আওতায় গেলে মুসলমানের স্বরূপ লুপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে মুসলমানেরা স্বতন্ত্র থাকিয়া বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের বুকে তাঁহাদের নিজস্ব সভ্যতার জন্য স্থায়ী আসন রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে।”[৫৬]

সাহিত্যের বিচারে পবিত্র কুরআন সবচেয়ে উচুঁ মানের গ্রন্থ। এ কথা বড় বড় দার্শনিক ও গবেষকবৃন্দ স্বীকার করেছেন। মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দকে সেই কুরআনের নির্যাস মন্থন করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রকাশ করতে হবে। শেখ আবদুর রহীম মুসলিম সাহিত্যসেবীদের কর্তব্যের কথা উলেণ্ঢখ করে বলেনঃ “মুসলিম সাহিত্যিকদিগকে সর্বপ্রথমে কোরআন শরীফ ও হাদীস শরীফের নির্ভুল বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে হইবে। ইহার পরে ফেকা, অসুল ও আকায়েদ সংক্রান্ড় গ্রন্থগুলির অনুবাদ হইবে। ঐ সকল কেতাবের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, চরিত, দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রও অনুবাদ করিতে হইবে। এই কার্য্যে বিচক্ষণ আলেম ও আরবী ভাষাভিজ্ঞ সাহিত্যিকদিগকে অগ্রগামী হইয়া পথ প্রদর্শন করিতে হইবে। ইহার পরে তবে নূতন সৃষ্টি, নূতন সৌন্দর্য, কাব্য-কবিতা, উপন্যাস।”[৫৭]

মুসলিম সাহিত্যিকদের হাতে ইসলাম বিরোধী কোন সাহিত্য রচিত হওয়া শোভা পায় না। শেখ আবদুর রহীম আরও বলেনঃ “আমরা কলা ও সৌন্দর্য্যের নামে সাহিত্যে উদ্ভট আমদানি সমর্থন করিতে পারি না। আমাদিগকে সবসময় মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা মুসলমান। দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজেও একদল অসৎ সাহিত্যিকের আমদানী হইয়াছে। তাই ইহাদের রচিত বইগুলির ঘোর সামাজিক অনর্থের হেতু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যের পূত মন্দির হইতে ঐ আবর্জনারাশি অবিলম্বে অপসৃত করা একান্ড় কর্ত্তব্য।”[৫৮]

ইসলামী সাহিত্যিকবৃন্দকে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সবচেয়ে সুন্দর পথনির্দেশনা দিয়েছেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্ড়াবিদ ও সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)। মুসলিম সাহিত্যিকবৃন্দ যদি সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে তাঁর নির্দেশনা মেনে চলেন, তাহলে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে আবার সোনালী যুগের আবির্ভাব ঘটতে পারে। তিনি বলেনঃ “ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি কোরআন। ইহার নিম্নে বিশ্বস্ড় হাদিসের স্থান। তারপর ফেকা, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, ইসলামের এই সকল

[৫৬] . শাহজাহান মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, “সাহিত্যে স্বাতন্ত্র কেন ?” *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

[৫৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫, শেখ আবদুর রহিম, *শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী*, পৃ. ২৩৯

[৫৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫, শেখ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

উৎস হইতে ভাবধারা সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে সঞ্চারিত করিতে হইবে। তবেই আমাদের সাহিত্য সাধনা সফল ও সার্থক হইবে।”[৫৯]

ইসলামী আদর্শের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের কল্যাণ। ইসলামী সাহিত্য চর্চার আদর্শও তা-ই। “ইসলাম মানব মনে কল্যাণ সম্পর্কে যে বিশেষ ধারণা বা প্রবণতা জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে, সাহিত্যে তা প্রতিবিম্বিত হলেই ইসলামের প্রতি সাহিত্যিকের কর্তব্য পালিত হয়।”[৬০]

অন্যান্য সাহিত্যের মতো ইসলামী সাহিত্য নীতি-নৈতিকতা বর্জিত নয়। সাহিত্যের প্রতিটি পাতায় ইসলামের মর্ম ও মূল চেতনা থাকার পক্ষে তিনি মত প্রকাশ করেন। ‘আমরা ইসলাম রঞ্জিত সাহিত্য সৃষ্টি করতে চাইলে ইসলামকে একটা নীতি, আদর্শ ও প্রবণতা হিসেবেই আমাদের মানসিকতার ভেতর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই প্রবণতার সঙ্গে একত্র জড়িত হয়ে ব্যক্তিগত কল্যাণবুদ্ধি বিশ্ব-জগতে নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারলেই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি হবে।’[৬১]

ইসলামী ভাবধারাকে বা নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শকে কিভাবে সাহিত্যে রূপ দেয়া যায় সে সম্পর্কে ওয়াজেদ আলীর বক্তব্য ইসলামী সাহিত্যিক ও গবেষকদের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেনঃ “তুলনা, উপমা, রূপক ইত্যাদির মিশ্রণে তথা বর্ণনা, কাহিনী, রচনা, চরিত্র সৃষ্টি, প্রবন্ধ-লিখন ও কাব্য-রচনা এমন সুকৌশলে করা চলে, যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পাঠক বা রসগ্রাহী ব্যক্তি নিজের অজ্ঞাতসারে ইসলামী জীবনাদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়বে।”[৬২]

ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক। আবার এই দায়িত্ব পালন করতে গেলে পদে পদে সৃষ্টি হবে অনেক বাধা। ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যকে, ইসলামী রেনেসাঁকে এগিয়ে নিতে হলে, ইসলামের ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করতে হলে এই সাহিত্যিকদের ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

---

[৫৯] . হাবিব রহমান, *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩), পৃ. ২৩৮

[৬০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৮

[৬১] . মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, “ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার”, *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৭

[৬২] . মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, “নতুন সাহিত্য”, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৯

বিজাতীয় সাহিত্যের প্রভাবে ইসলামী সাহিত্যিককে বিলীন হয়ে গেলে চলবে না। এক ফোটা তৈল যেমন এক বালতি পানির মধ্যে তার আলাদা বৈশিষ্ট্য ধরে রাখে, ঠিক তেমনি প্রবল প্রতিকুলতার মধ্যে ইসলামী সাহিত্যিককে তার আলাদা বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেই সামনে অগ্রসর হতে হবে।

'অতএব বর্তমান যুগের মুসলমান সাহিত্যিকদের দায়িত্ব অত্যন্ড় গুরচতর। তাঁহার ভ্রমণ-পথ অত্যন্ড় বিঘ্ন সঙ্কুল-বাধাকণ্টকিত। মুসলমান সমাজে জাতীয় জীবনের উদ্বোধনই তাঁহার কঠোরতম ব্রত-পবিত্রতম লক্ষ্য; তাঁহার সকল সাধনা, সকল কার্য্যের চরম গতি। এজন্য তাঁহাকে গভীর-গম্ভীর হইতে হইবে। হালকা আবহাওয়া হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। হিন্দুর বর্তমান সাহিত্যকে আদর্শ করিয়া চলিলে আমাদের সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে চিরকালের জন্য একটা ফাঁক থাকিয়া যাইবে-আমাদের সাহিত্য সমগ্র মুসলমান সমাজের সাহিত্য হইয়া উঠিবে না।'[৬৩]

একজন সাহিত্যিককে সবসময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তার সাহিত্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কল্যাণ হয়। শুধু হাসি-তামাশার জন্যই তিনি সাহিত্য রচনা করবেন না। আর সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে সাহিত্যিককে গভীর জ্ঞান সাধনা করতে হবে। একমাত্র জ্ঞান সাধনাই উন্নত সাহিত্য সৃষ্টিতে লেখককে সহযোগিতা করে থাকে। 'মানুষের মঙ্গলই হবে সাহিত্যের লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য সাহিত্যিককে শ্রেষ্ঠতম উপকরণ নির্বাচন করতে হবে, আর যথাসম্ভব তারই ব্যবহার করতে হবে। উচ্চতম আদর্শ ও এবং শ্রেষ্ঠতম উপকরণের সাহায্যে বিমল আনন্দের পরিবেশন-এই হল সাহিত্যিকের কাজ।

মানুষের মঙ্গল আর বিমল আনন্দের পরিবেশন, এই হল সাহিত্যের কাজ। তাই যদি হয়, তা হলে শ্রেয়ের সঙ্গে, কাম্যের সঙ্গে সাহিত্যকে পরিচিত হতে হবে। তার জন্য দরকার জ্ঞান সাধনার, গভীর অন্তর্দৃষ্টির। জ্ঞানের সাধনা সাহিত্যিকের জন্য অপরিহার্য। জ্ঞানের বর্তিকার সাহায্যেই মঙ্গলের পথ তাকে বের করতে হবে। আর লেখনীর সাহায্যে পাঠকের জন্য সে পথকে ফুটিয়ে তুলতে হবে।'[৬৪]

ইসলামী সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারা ও চেতনাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। এই জন্য সাহিত্যিককে গভীরভাবে ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী ও তাদের লিখিত ভালো ভালো বইগুলো পড়তে হবে। তাদের চিন্ড়া-চেতনাকে উপলব্ধি করে ইসলামের আলোকে সাহিত্য রসের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে হবে। 'ভাবের ব্যঞ্জনার উপরই সাহিত্যিকের সাফল্য নির্ভর করে; সুতরাং ভাবের অনুশীলনে

---

[৬৩] . মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "বাঙ্গলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

[৬৪] . এস. ওয়াজেদ আলি, "সাহিত্য", *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী ১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

সাহিত্যিককে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখা, ভাল ভাল বই পড়া, ভাল ভাবের স্রোতে গা ঢেলে দেওয়া, এই রকম উপায়ে ভাবের অনুশীলন করতে হবে।

ভাব বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করেই আত্ম-প্রকাশ করে; আর ভাবের মূল্য তার বিষয়-বস্তুর উপর নির্ভর করে। সুতরাং বিষয়-বস্তু নির্বাচনে জ্ঞানের Cognition-এর সম্যক ব্যবহার করতে হবে।'[৬৫] সাহিত্যিককে নিজের সব ধরনের স্বার্থ ভুলে গিয়ে জাতির কল্যাণে কাজ করার বাসনা তার মনের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। জাতির দুঃখ-বেদনা তাকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে হবে। সব ধরনের মোহ, লোভ, লালসা ত্যাগ করে মানুষের মঙ্গল ও মুক্তি কামনায় তাকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাহলেই তার লেখা সকলের নিকট আদরণীয় হবে।

"সাহিত্যিক হল জাতির পথ-প্রদর্শক-তার জীবন্ড় জীবনের মুখপত্র এবং প্রতীক। সাহিত্যিক যখন মুক্তির বাণী প্রচার করে, তখনই তার লেখা থেকে জ্বলন্ড় স্ফুলিঙ্গ বের হয়, তার কথায় বৈদ্যুতিক শক্তি দেখা দেয়।"[৬৬] ইসলামী সাহিত্যিকের অন্যতম লক্ষ্য থাকবে তার সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলামের জাগরণ। আর ইসলামের জাগরণ সৃষ্টি করতে মুসলমানদের প্রিয় বস্তু কুরআন, হাদীস এবং প্রিয় ব্যক্তি নবী-রাসুল (সা.), সাহাবা (রা.), ইসলাম প্রচারক, দরবেশ ও আওলিয়া ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের গৌরবময় ইতিহাস ও জীবন কাহিনী তাদের সাহিত্য রচনায় তুলে ধরতে হবে।

সাহিত্যিক এস. ওয়াজেদ আলী বলেনঃ 'আপনারা যদি সমাজের কল্যাণ চান, সন্ড়ান সন্ড়তির কল্যাণ চান আর মুসলমান জাতির কল্যাণ চান তা হলে একাগ্র মনে সাহিত্যের প্রচারে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করচ্ন। মুসলমান যুবকদের সামনে তাদের ধর্মের এবং তাদের নিজস্ব সভ্যতার জ্যোতির্ময় স্বরূপ প্রকাশ করচ্ন। তাদের গৌরবময় ইতিহাসের কাহিনী তাদের শ্রবণে ধ্বনিত করচ্ন। তাদের পূর্বপুরচ্ষদের কীর্তি তাদের চোখের সামনে সাহিত্যের তুলিকায় প্রস্ফুটিত করে তুলুন। দেখবেন, তাদের মনের বিকার দূর হয়ে যাবে, তারা আর অসাড় থাকবে না। তাদের কর্মজীবনের দ্রচত স্পন্দন তখন জগতকে মোহিত এবং চমৎকৃত করবে।'[৬৭]

---

৬৫ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭

৬৬ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৬৭ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

ইসলামী সাহিত্যিককে অবশ্যই উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। মদ ও নেশা জাতীয় বস্তু সেবন থেকে তাকে দূরে থাকতে হবে। অবৈধভাবে নারী সংস্রব থেকে তথা সব ধরনের শয়তানী কর্মকান্ড থেকে সাহিত্যিককে দূরে থেকে ইসলামী সাহিত্য রচনা করতে হবে। কেননা সাহিত্যিক ভালো চরিত্রের অধিকারী না হলে পাঠক তার রচনা পড়তে আগ্রহী হবেন না বা তাঁর লেখা পাঠককে প্রভাবিত করবে না।

সুতরাং সাহিত্যিককে প্রশস্ড় হৃদয়ের অধিকারী হতে হবে এবং এর সাথে তাকে বিদ্যানুরাগী ও মানবপ্রেমিক হতে হবে। ‘দানের মূল্য যত বেশী, দাতার সম্মানও তত বেশী। উঁচু দরের সাহিত্য তিনিই দিতে পারেন প্রাণ যার নানারসে ভরপুর; মন যার নানা বিদ্যায়, নানা জ্ঞানে, নানা অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, অন্ড়র যার মহৎ ভাবের তরঙ্গে হিলেণ্ডালিত। সে যদি মহৎকে ভালোবাসতে শেখে সাহিত্য তার মহৎ হবে, আর সে যদি তুচ্ছকে ভালবাসতে শেখে সাহিত্য তার তুচ্ছ হবে।’[৬৮]

একজন ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে এস. ওয়াজেদ আলীর বক্তব্য সকল সাহিত্য প্রেমিকদের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ‘আমাদের সাহিত্য সাধনা সার্থক করতে হলে শ্রেয়ের সন্ধানে, সত্যের সন্ধানে, সুন্দরের সন্ধানে আমাদের অভিযান করতে হবে। সে অভিযান যিনি যত আগ্রহের সঙ্গে, যিনি যত নিষ্ঠার সঙ্গে করবেন, সাহিত্য সাধনা তার তত সার্থক হবে। জীবনে তুচ্ছতাকে যিনি যত বর্জন করতে পারবেন, সাহিত্য তাঁর ততই তুচ্ছতা বর্জিত হবে। সাময়িক উত্তেজনা ছেড়ে যিনি যত শাশ্বতের দিকে, চিরন্ড়নের দিকে যেতে পারবেন, তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য ততই শাশ্বত, ততই চিরন্ড়ন হবে।

পথের আমাদের শেষ নাই। সৃষ্টি সাধনারও আমাদের শেষ নাই। অনন্ড় পথের যাত্রী আমরা, অন্ড়হীন আমাদের সম্ভাবনা। সেই অনন্ড় পথের খানিকটা মাত্র এ জীবনে আমরা চলতে পারবো। আর সেই অনন্ড় সম্ভাবনার খানিকটা মাত্র এ জীবনে আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। তবে সেই খানিকটাও যদি করতে পারি, জীবন তাহলে আমাদের ব্যর্থ হবে না।

আলণ্ডাহর নৈকট্য লাভ করে আমরা ধন্য হব। আর আমরা তখন বুঝতে পারব যে যিনি চির সুন্দর তাঁর সাধনাই হচ্ছে জীবনের একমাত্র কার্য। সাহিত্যের তথা আমাদের সর্ব সাধনার একমাত্র লক্ষ্য, আর তাঁর প্রেমই হচ্ছে সর্ব আনন্দের অফুরন্ড় উৎস।’[৬৯]

---

[৬৮] . এস. ওয়াজেদ আলি, “সাহিত্য সম্বন্ধে দুচার কথা” প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

[৬৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

সাহিত্যিকের কর্তব্য সম্পর্কে সবচেয়ে সুন্দর কথা বলেছেন শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী। 'মানুষ যাতে খাঁটি মানুষ হয়- জ্ঞানে উন্নত, চরিত্রে আদর্শ, কর্ম্মে সুপটু, পর হিতৈষণায় সুদক্ষ ও স্বজাতি কল্যাণে অকুণ্ঠিতচিত্ত হয়, তারই চেষ্টা করা প্রত্যেক সাহিত্যিকের অপরিহার্য্য কর্তব্য। মানুষের মনে আবিলতা, হৃদয়ে সঙ্কীর্ণতা ও প্রাণের দুর্বলতা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিতে পারে যে সাহিত্য, সেই সাহিত্যের খেদমতে নিয়োজিত হওয়া আমাদের সাহিত্যিকগণের একান্ড় দরকার। আশা করি আমাদের সাহিত্যিক বন্ধুগণ সেই সাহিত্য গড়ে তুলতে চেষ্টা পাবেন।'[৭০]

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরচ্ল ইসলাম আরও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলেনঃ "সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মত উন্মুক্ত উদার, তাহাতে কোন ধর্মবিদ্বেষ, জাতিবিদ্বেষ, বড়-ছোট জ্ঞান থাকিবে না। বাঁধ-দেওয়া ডোবার জলের মত যদি সাহিত্যিকের জীবন, পঙ্কিল, সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার সাহিত্য সাধনা সাংঘাতিকভাবে ব্যর্থ হইবে। তাঁহার সৃষ্ট সাহিত্য আতুঁড়-ঘরেই মারা যাইবে। যাঁহার প্রাণ যত উদার, যত উন্মুক্ত, তিনি তত বড় সাহিত্যিক। কারণ, সাহিত্য হইতেছে বিশ্বের, ইহা একজনের হইতে পারে না। সাহিত্যিক নিজের কথা, নিজের ব্যথা দিয়া বিশ্বের কথা বলিবেন, বিশ্বের ব্যথায় ছোঁওয়া দিবেন।"[৭১] সুতরাং সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে ইসলামী সাহিত্যিককে যথেষ্ট দায়িত্ববান হতে হবে।

জ. ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যঃ

ইসলামী সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গে ইসলামী ভাবধারা ও বৈশিষ্ট্য থাকা বাঞ্ছনীয়। মুসলমানরা যে সাহিত্য পাঠ করবে তাতে যদি ইসলামী আদর্শ না থাকে, তাহলে মুসলমানরা পথচ্যুত হয়ে পড়বে। 'মুসলমানের উপন্যাস ও নাটকের ভিতর একটা মুসলমানি ছাপ থাকা চাই। নচেৎ জাতীয় জীবনের জন্য সে উপন্যাস, সে নাটক বৃথা। কাব্য ও খ ন্ড কবিতায়ও ইসলামিক ভাব থাকা চাই। কাব্য এমন হইবে, কবিতা এমন হইবে, যাহা পাঠে মুসলমান খাঁটি মুসলমান হইতে পারে। তাহাতে মুসলমান জীবনের আদর্শ থাকিবে। যে দিন সে শুভদিন দেখিতে পাইব, সেদিন আমার জীবন সফল হইবে, আমার মরণ ধন্য হইবে।'[৭২]

---

[৭০] . শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, "মোসলেম বঙ্গ-সাহিত্য", প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

[৭১] . কাজী নজরুল ইসলাম "বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান" *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, মোশরফ হোসেন খান সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২-১২

[৭২] . শাহজাহান মনির, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯২, মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ 'ভাষা ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরব মহিমা প্রচার করতে হবে। ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বিশ্বসভ্যতায় ঐতিহাসিক ভূমিকা ইত্যাদি সাহিত্যের ভিতর দিয়ে মুসলিম যুবক ও প্রতিবেশি অমুসলিমদের নিকট প্রচার করতে হবে। "মুসলমানের ধর্ম্ম দেশগত বা জাতিগত ধর্ম্ম নহে। তাহা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য তাঁহার ধর্ম্ম তাঁহার প্রবিবেশীকে বুঝাইয়া দেওয়া। সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদিগকে ইসলামের মহত্ত্ব, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, ইসলামের সৌন্দর্য প্রচার করিতে হইবে।"[৭৩]

ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্টার মত প্রণিধানযোগ্যঃ "হিন্দুর সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাচ্ছে বেদান্ড় ও গীতা, হিন্দু ইতিহাস ও হিন্দু জীবনী থেকে। আমাদের সাহিত্য অনুপ্রেরণা পাবে কুরআন ও হাদীস, মুসলিম ইতিহাস ও মুসলিম জীবনী থেকে। বাস্ড়বিক বাঙ্গালা সাহিত্য হিন্দু মুসলমানে অক্ষয় মিলন মন্দির হবে। হিন্দু সাহিত্য ও মুসলিম সাহিত্য হবে তার দুই কুঠরী। সর্বত্রই সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার। যে পর্যন্ড় মুসলিম সাহিত্য না গড়ে উঠছে সে পর্যন্ড় মিলন মন্দির পূর্ণাঙ্গ হচ্ছে না।"[৭৪]

মুসলিম জীবনের যেই কোনো ক্ষেত্র নিয়ে সাহিত্য রচিত হবে, সেখানেই ইসলামের ছাপ থাকতে হবে। তা না হলে ইসলামী সাহিত্য হবে না। মাওলানা আবদুর রহীম এ প্রসঙ্গে বলেনঃ 'ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক জীবন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও খ াকারে যাপিত হওয়ার কোন অবকাশই ইসলামী পদ্ধতিতে স্বীকৃত নয়। আনুষ্ঠানিক ইবাদত-বন্দেগীতে ইসলামী রীতি পালন, কিন্তু সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রপরিচালনায় তাকে অস্বীকার করার এক বিন্দু অনুমতি নেই এ জীবন পদ্ধতিতে।

যে সাহিত্যে মানুষকে আদর্শহীন, চরিত্রহীন ও নির্লজ্জ বানায়, তার ফসল ফলানো দূরের কথা, তার চাষ করাও এখানে সম্ভব নয়-তার প্রকাশ ও প্রচলনের তো কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।'[৭৫]

ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এস. ওয়াজেদ আলীর বক্তব্যও এ ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্যঃ "বিভিন্ন কালচার থেকে মূল্যবান সম্পদ এনে অবশ্য আমাদের কালচারকে সাজাতে এবং সম্পদশালী করে তুলতে

---

[৭৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩, মুহম্মদ শহীদুলণ্টাহ 'ভাষা ও সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[৭৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩, মুহম্মদ শহীদুলণ্টাহ, অভিভাষণ, '*শহীদুলণ্টাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ*'

[৭৫] . মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

হবে। তবে সে কাজ করতে হবে আমাদের ধর্ম্ম এবং কালচারকে যথাস্থানে কায়েম রেখে, তাদের বর্জন বা স্থানচ্যুত করে নয়।

বাঙ্গলার মুসলমান সাহিত্যিকেরা এ বিষয়ে বিপথে চলেছেন বলেই আমার বিশ্বাস। প্রথমতঃ যে ইসলামিক কালচার তাদের সাহিত্যের ভিত্তি হওয়া উচিত, তাকে তাঁরা অবহেলা করে আসছেন; দ্বিতীয়তঃ যে হিন্দু কালচার বাঙ্গালাদেশে ইসলামিক কালচারকে গ্রাস করবার চেষ্টা করছে, পতঙ্গ যেমন পুড়ে মরবার জন্য আগুনে ঝাঁপ দেয়, তারা সেই কালচারে আত্ম-সমর্পণ করবার জন্য ঠিক সেই রকম অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা দেখাচ্ছেন।”[৭৬] পবিত্র কুরআনে হকপন্থী কবি-সাহিত্যিকদের ব্যাপারে চারটি গুণের কথা উলেণ্ঢখ রয়েছেঃ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ {227/26} [77]

উপরোক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা করে গবেষক মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন বলেন, প্রথমত, তাঁরা হবেন মুমিন অর্থাৎ আলণ্ঢাহ ও তাঁর রাসুল ও তাঁর আসমানী কিতাবসমূহ তাঁরা মানেন এবং আখিরাতে পূর্ণ আস্থা রাখেন।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা সৎকর্মশীল। অর্থাৎ নিজেদের কর্মজীবনে তাঁরা সৎ হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তাঁরা ফাসিক, দুস্কৃতিকারী ও বদকার হন না। নৈতিকতার বাঁধন মুক্ত হয়ে তাঁরা নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেন না।

তৃতীয়ত, আলণ্ঢাহকে তাঁরা সার্বক্ষণিক স্মরণ করেন। তাঁদের ব্যক্তি জীবনে আলণ্ঢাহভীতি ও আলণ্ঢাহর আনুগত্য রয়েছে। তাঁদের কবিতা পাপ-পঙ্কিলতা, লালসা ও কামনারসে পূর্ণ নয়। তাঁদের রচনা সমাজকে আলণ্ঢাহমুখী করে তোলে।

চতুর্থত, তারা সব রকম জুলুম-নির্যাতন, শোষণ-বঞ্চনার বিরচদ্ধে সর্বদা উচ্চকণ্ঠ। তাঁরা নিজেদের স্বার্থে কারোর নিন্দা করে না এবং ব্যক্তিগত, গোত্রীয় বা বংশীয় বিদ্বেষে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতিশোধের আগুন জ্বালায় না। কিন্তু জালিমের মোকাবেলায় সত্যপথে সমর্পণের প্রয়োজন হলে তাঁদের তখনি তীর ও তরবারির

[৭৬] . এস. ওয়াজেদ আলী “ বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য-সাধনার পথ”*এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৩

[৭৭] . আল'কুরআনঃ ২৬ঃ ২২৭, (সুরাঃ আশ শু'আরা)

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়।[৭৮] তিনি আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা তার অভিসন্দর্ভে উলেণ্ঢখ করে বলেনঃ

১. ইসলামী সাহিত্য একটি লক্ষ্যাভিসারী সাহিত্য। কেননা একজন ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন সাহিত্যিক শিল্পের প্রয়োজনে শিল্প রচনা করে না; বরং একটি নিজস্ব চিন্ড়্াদর্শনের রূপায়ণ করে শিল্পকে নিয়োজিত করে। অর্থাৎ মানবহৃদয়ে আলণ্ঢাহর প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসকে মজবুত করা, উৎকৃষ্ট নীতি আদর্শের বিকাশ ঘটানো এবং তার মধ্যে কল্যাণকর মনোবৃত্তির স্ফূর্তি ঘটানো ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জন করার প্রয়োজনে সে শিল্পাশ্রিত উপস্থাপনার দ্বারস্থ হয়। একজন ইসলামী সাহিত্যিককে তাঁর সাহিত্য রচনার পূর্বে ঈমানে মুজমাল ও ঈমানে মুফাসসাল[৭৯] ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কেও তাঁকে পূর্ণাঙ্গ সজাগ থাকতে হবে।
২. ইসলামী সাহিত্য একটি দায়বদ্ধ সাহিত্য অর্থাৎ এটি ইসলামী মূল্যবোধ ও এর নীতি এবং দর্শনের অকাট্য আনুগত্য স্বীকার করে।
৩. ইসলামী সাহিত্য মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্যের নিরেট রূপায়ণ করে।
৪. ইসলামী সাহিত্য একটি স্বাধীন মনস্ক সাহিত্য। অর্থাৎ একজন ইসলামী ভাবধারার সাহিত্যিক অন্যান্য সাহিত্যিকের প্রভাববলয় থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে নিজস্ব স্বকীয়তা ও শৈল্পিক নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে তার সকল শৈল্পিক প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। তার দৃষ্টিতে চিন্ড়্া ও চেতনার মর্মমূলে ইসলামই হবে প্রধান বিবেচ্য বিষয়।
৫. একজন ইসলামী ভাবধারার সাহিত্যিক যেহেতু ইসলামের চিরন্ড়ন মূল্যবোধের চেতনায় উজ্জীবিত, সেহেতু তিনি তার স্বকীয়তা ও আত্মপরিচয় এবং অতীত ও বর্তমানকে অবিচল ও দৃঢ়ভাবে ধারণ করেন।
৬. ইসলামী সাহিত্য ধারার একজন সাহিত্যিকের কাছে তার শৈল্পিক নৈপুণ্য যেমন অতীব গুরচ্ত্বপূর্ণ তেমনি তার চারিত্রিক দায়বদ্ধতাও গুরচ্ত্বপূর্ণ। এ দুয়ের সমান্ড়রাল অগ্রসরতায় ইসলামী সাহিত্যের সকল আয়োজন নিষ্পন্ন হয়।

[৭৮] . মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, *বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০০-১৯০০)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[৭৯] . امنت بالله كما هو باسمائه وصفاته وقبلت جميع احكامه , امنت با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت.

৭. অন্যান্য কালজয়ী সাহিত্যের মতো ইসলামী সাহিত্যেরও উন্নত শিল্প উপাদান থাকতে হবে এবং এর জন্যে অবকাঠামোগত আয়োজনের সঙ্গে ভাবগত ঐশ্বর্যের সমন্বিত শৈল্পিক যোজনায় নৈপুণ্য প্রদর্শন অত্যাবশ্যক।

৮. ইসলামী ধারার সাহিত্যিক তার বিশ্বাস সম্পর্কে সচেতন। স্রষ্টা কর্তৃক তার উপর দায়িত্বকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি কথার গুরচত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত। এরূপ সচেতনতা তার শিল্পীসত্তার সর্বত্র বিরাজমান।[৮০] ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা থাকা সাহিত্যিকের জন্য অপরিহার্য।

---

[৮০] . মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, *বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০০-১৯০০)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১, ১৯৮১ সালে আবুল হাসান আলী আন নদভীর সভাপতিত্বে ভারতের দারুল উলুম লাক্ষ্মৌতে অনুষ্ঠিত প্রথম ইসলামী সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধমালা এবং ড. আবদুর রহমান রাফাত আল বাশা কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ। আন্তর্জাতিক ইসলামী সাহিত্য সংস্থার সচিবালয় কর্তৃক প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ, পৃ. ৬৯-৭১।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ১২০০-১৯০০ শতাব্দী সময়কালে ইসলামী সাহিত্য চর্চাঃ

ভাষাভাষী জনসংখ্যার দিক থেকে বাংলা ভাষা বিশ্বে পঞ্চম স্থান অধিকার করে আছে। আধুনিক সাহিত্যই তাকে এ সম্মান দিয়েছে। ভাষার বিবর্তন ও সাহিত্যের সৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যের দিকে লক্ষ্য রেখে সমগ্র বাংলা সাহিত্যকে সাহিত্য গবেষকগণ তিন অংশে ভাগ করেছেন। প্রাচীন যুগ-যা ৭০০-১২০০ শতাব্দী পর্যন্ড় বিস্তৃত। মধ্য যুগ-১২০১-১৮০০ শতাব্দী পর্যন্ড়। সর্বশেষ আধুনিক যুগ-১৮০১-২০০০ শতাব্দী বা বর্তমান সময় পর্যন্ড়।

আমাদের আলোচনা মধ্য যুগ থেকে মূলতঃ শুরচ হবে। প্রাচীন যুগে হিন্দু রাজাদের শাসন-শোষণ ও অন্যায়-অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ভারতবর্ষের নিম্ন শ্রেণির হিন্দু ও নবদীক্ষিত মুসলমানদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। বিশেষ করে সেন ও পাঠান আমলে এই অত্যাচার ও জুলুম ছিল সীমাহীন ও বর্ণনাতীত।

মানুষ একজন ভালো শাসকের অপেক্ষায় প্রার্থনা করে সময় কাটাচ্ছিল। এমনি সময়ে (১২০৪) আগমণ ঘটে তুর্কী সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির। তিনি বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে বঙ্গভূমি দখল করে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। বখতিয়ার খলজির শাসন যেমন বাংলার মানুষের জন্য আর্শীবাদ স্বরূপ ছিল, তেমনি বাংলা ভাষা ও ইসলামী সাহিত্যের জন্য গোড়া পত্তন বা ভিত্তি রচনার সময়। ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ এ বিষয়ে বলেন, ‘সেন রাজাদের আমলে কঠোর ব্রাহ্মণ্য অস্পৃশ্যতা ও নিষ্ঠুর শাস্ত্রীয় শাসনে যখন সর্বসাধারণের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, তখনই মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। ১২০৪ সালে তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন বখতিয়ার খলজি বিনা যুদ্ধে ও বিনা রক্তপাতে বাংলাদেশ দখল করেন।

বাংলায় মুসলিম আগমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির দুয়ার খুলে দেয়। এদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এর সুদূর প্রসারী প্রভাবের কথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। বলা যায়, তুর্কি আক্রমণ বাংলা সাহিত্যে আশির্বাদ স্বরূপ। বাংলায় মুসলিম শাসনামলেই মুসলিম সুলতানদের এবং তাঁদের অধীনস্থ

কর্মচারী ও তাঁদের অমাত্যদের পৃষ্ঠপোষকতায়, উৎসাহে ও আদেশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নবজন্ম হয় এবং নবতর সমৃদ্ধির পথে এর অগ্রগতি সূচিত হয়।'[৮১]

বখতিয়ার খলজির বাংলা জয়ের পর থেকে বাংলায় আগমনকারী সুফী, সাধক ও ধর্মপ্রচারকদের ইসলাম প্রচারের পথ সুগম হয়। ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, মানবতা ও পরোপকার ইত্যাদি বিষয়ে মুগ্ধ হয়ে বাংলার হিন্দু ও বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এ বিপুল সংখ্যক নবদীক্ষিত মুসলমানদের ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচয় ও শিক্ষা দানের জন্য এবং ধর্ম-কর্ম পালনের সুবিধার্থে বাংলা ভাষায় ইসলামী বই-পুস্ড়্ক রচনা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু শুরুতে তারা শুধু আরবী ও ফার্সী ভাষাতেই ইসলামী সাহিত্য চর্চা করেন।

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বাকীর গবেষণায় বলা হয়, 'ত্রয়োদশ শতকের গোড়া থেকে মুসলিম শাসকগণ একদিকে রাজ্যের পর রাজ্য জয় করেন, অন্যদিকে উলামা ও মাশায়েখ বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় ও ইসলামী বিধি-বিধান ও সাম্যে মুগ্ধ হয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধরা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। এদের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। এ সকল মুসলমানের ধর্ম কর্ম পালনের জন্য ধর্মীয় বই রচনার প্রয়োজন প্রকট হয়ে দেখা দেয়। বাংলাদেশের কোনো কোনো মনীষী এই অভাব পূরণের লক্ষ্যে আরবী ও ফার্সী ভাষা চর্চার সূত্রপাত ঘটান। পরবর্তীতে ঐ সকল মনীষী উভয় ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা করেন। এতে করে বাংলাদেশের আরবী ও ফার্সী ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনার দ্বার উন্মুক্ত হয়।'[৮২]

তুর্কী শাসনামল ও স্বাধীন মুসলিম শাসনামল (১২০১-১৫৭৫) ইসলামী সাহিত্য ও শিল্পকলা সৃষ্টির সূচনা পর্ব ছিল বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন। ধর্মীয় কাজ কর্মের জন্য মানুষকে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষার উপর দীর্ঘদিন নির্ভর করে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু এই অঞ্চলের মানুষের মাতৃভাষা ছিল বাংলা আর ধর্ম চর্চার ভাষা ছিল আরবী, উর্দু ও ফার্সী। এই পরিস্থিতি তাঁদের সচেতন বিবেককে নাড়া দেয় এবং বাংলা ভাষাভাষী কিছু মনীষী বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনা করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। এই সময়ে লিখিত প্রথম রচনা হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৩৯-১৪০৯) 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য সুপরিচিতি লাভ করেছে। যা বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও প্রথম পদক্ষেপ বলেও ধারণা করা হয়।

---

[৮১] . কাজী দীন মুহম্মদ, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অবদান", *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান*, শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

[৮২] . ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, "ইসলামী সাহিত্যে বাংলাদেশের মনীষীদের অবদান (১২০১-১৯৪৭)", *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৪৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৪), পৃ. ১১৪

এর পর পর্যাক্রমে আরও বহু গ্রন্থ ইসলামী সাহিত্যের উপর রচিত হয়। ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল বাকী এর গবেষণায় আমরা এ বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাই। ‘তুর্কী শাসনামলের দেড়শত বছরের মধ্যে মুসলিম রাষ্ট্র-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এদেশে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ এদেশে তুর্কী শাসন পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ব্রাক্ষণ্য প্রভাব ও ব্রাক্ষণ্য সংস্কৃতি লোপ পায় এবং ইসলামী সংস্কৃতি চর্চা শুরচ হয়। এতে করে এদেশে ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

অতঃপর স্বাধীম মুসলিম আমলে দেশী ভাষায় মুসলিম সাহিত্য রচনার ধারা উন্মুক্ত হয়। এ ধারায় যাঁরা ভূমিকা রাখেন, তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের শাহ মোহাম্মদ সগীর (১৩৮৯-১৪০৯), বঙ্গের জৈনদ্দীন, চট্টগ্রামের মুজাম্মিল, সাতকানিয়ার আফজাল আলী, চাঁদপুরের দোনাগাজী, চট্টগ্রাম ফতেহাবাদের দৌলত উজীর বহরম খাঁ-এর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মুঘল আমলে এ ধারায় যাঁরা অবদান রাখেন, তাঁদের মধ্যে চট্টগ্রামের চক্রশালার সায়্যিদ সুলতান, চট্টগ্রামের সীতাকু–ের শেখ পরান, চট্টগ্রামের রামু এর নসরচল্লাহ খাঁ, হাটহাজারীর মুহম্মদ খান, চট্টগ্রামের সীতাকু–ের শেখ মুতালিব, সন্দ্বীপের আবদুল হাকিম, চট্টগ্রামের ছিলিমপুরের অধিবাসী আবদুন নবী, রংপুর জেলার পীরগঞ্জের হায়াত মাহমুদ-এর নাম বিশেষভাবে উলেণ্ডখযোগ্য।’[৮৩]

মধ্য যুগের পুরো সময়কালটাই রাষ্ট্রভাষা ছিল ফার্সী। তা সত্ত্বেও মুসলিম শাসকগণ বাংলা ভাষাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার কারণে মুসলমানরা বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য গড়ে তোলার এক বিরাট সুযোগ পেয়ে যান। তবে মধ্য যুগে রচিত সমস্ড় সাহিত্যেই পদ্যে রচিত। যদিও এ সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রে আরবী, ফার্সী ও হিন্দি ভাষা থেকে অনূদিত। তুর্কিদের শাসনের পর বাংলার স্বাধীন সুলতানরাও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেন বলে জানা যায়। ‘বাংলার স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলা ভাষা ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা পায়। সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) আরব বংশোদ্ভুত (মতান্ড়রে বাংগালী) হওয়া সত্ত্বেও তিনি ও তাঁর পুত্র নাসিরচদ্দীন নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২) বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁদের সেনাপতিরাও যেমনঃ পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ গং বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে গেছেন।’[৮৪]

---

[৮৩] . ড. মুহাম্মদ আবদুল বাকী, “ইসলামী সাহিত্যে বাংলাদেশের মনীষীদের অবদান (১২০১-১৯৪৭)”, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

[৮৪] . জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *চিন্তাধারা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৮৮), পৃ. ১৯৭৬

ক.চতুর্দশ শতাব্দীতে ইসলামী সাহিত্য চর্চাঃ

এ সময়কালে সুলতানদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য গৌড় রাজদরবারেও মর্যাদা লাভ করে। ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই কবি-সাহিত্যিকরা সাহিত্য চর্চা করতেন। সুলতানরা বিভিন্ন রাজ্য জয় করতেন আর আলেম ওলামা, পীর-দরবেশ এবং সুফী-সাধকগণ বাংলার বিভিন্ন এলাকায় ইসলাম প্রচার করতেন। "সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অনেক শক্তিশালী হয়। মাহমুদশাহী রাজবংশের শাসনকর্তা শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-৮০) শাসনামলে জয়নুদ্দীন 'রসুল বিজয়' কাব্য প্রণীত হয়, যা ইসলামী কাব্য ধারায় অতি স্মরণীয় নাম। মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কবি আফজাল 'নসিহত নামা' কাব্য রচনা করেন।"[৮৫]

খ. পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইসলামী সাহিত্য চর্চাঃ

মধ্যযুগের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে শাহ মুহম্মদ সগীরের নাম বাংলা সাহিত্যে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর রচিত 'ইউসুফ জোলেখা' কাব্য গ্রন্থখানির মাধ্যমে বাঙালি মুসলমানের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মধ্যযুগে কিরূপ সাধনা ও আকর্ষণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর সমসাময়িক কালের আরেকজন বিখ্যাত মুসলিম কবির নাম হচ্ছে জৈয়নুদ্দীন। 'শাহ মুহম্মদ সগীর ও কবি জৈনুদ্দীন রচিত কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্য চেতনা ভক্তিরসের সংগে মিশ্রিত হয়ে সাহিত্যরসে প্রসারিত হয়েছে।

শাহ মুহম্মদ সগীর এ শতাব্দীর অন্যতম মরমী কবি এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে। তিনি মধ্যযুগের হয়ে আধুনিক চিন্ত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ উচ্চমানের দেশপ্রেমিক কবি। কবি জৈনুদ্দীন গৌড়াধিপতি বারবাক শাহের পুত্র ইউসুফ খান কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর 'রসুল বিজয়' কাব্য রচনা করেন। এ কাব্যখানির রচনাকাল ১৪৭৪ ঈসায়ী সন। হযরত মুহাম্মদ (স) এর মূল কাহিনীর সঙ্গে কতগুলো উপকাহিনীও সংযোজিত হয়েছে। হযরত আবু বকর, হযরত উমর, হযরত উসমান ও হযরত আলী, ইমাম হাসান ও হোসেন, হানিফা প্রমুখের জড়িত উপকাহিনী রসুল বিজয়ের ধারা বর্ণনা রসসমৃদ্ধ করেছে।

সগীরের 'ইউসুফ জোলেখা' ও জৈনুদ্দীনের 'রসুল বিজয়' উভয় কাব্যই ফারসি কাব্যের অনুসরণে লিখিত। দু'খানি কাব্যেই ইসলামী ঐতিহ্য ও কৃষ্টির রূপ ও রীতি ধারা ও ধারণায় উজ্জীবিত।'[৮৬] সুলতান গিয়াসউদ্দীন আযম শাহের (১৩৯৭-১৪১০) সমসাময়িক প্রথম মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের

---

[৮৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

[৮৬]. কাজী দীন মুহম্মদ, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অবদান", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

(১৩৩৯-১৪০৯) রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান 'ইউসুফ জোলেখা'য় যে কিরূপ ইসলামী ভাবধারা প্রকাশ পেয়েছে তার নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো থেকে ধারণা করা যায়ঃ

"জীবাত্মার পরমাত্মায় মহাম্মদ নাম।
প্রথম প্রকাশ তথি হৈল অনুপাম।
যত ইতি জীব আদি কৈলা ত্রিভুবন।
মহম্মদ হন্ড়ে কৈলা তা সব রতন॥"[৮৭]

শাহ মুহম্মদ সগীরই ইসলামী ধ্যানধারণায় পুষ্ট প্রথম মুসলিম কবি। 'এই প্রথম ইসলামী চিন্ড়াধারা পুষ্ট সাহিত্যের যাত্রা শুরচ হলো। শাহ মুহম্মদ সগীর যে কাব্যটি রচনা করেন তার নাম ইউসুফ জোলেখা। কুরআনে বর্ণিত এ কাহিনীটি একটি রোমাঞ্চকর প্রেম কাহিনী মাত্র নয়। সততা, নিষ্ঠা, সত্যপ্রিয়তা, ধৈর্য্য ও আত্মবিশ্বাসের একটি অনিন্দ্য সুন্দর উদাহরণ এটি।'[৮৮]

'খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে শাহ সগীর, জৈনুদ্দীন, মুজাম্মিল থেকে শুরচ করে উজীর বহরম খান ও মুহম্মদ কবীর পর্যন্ড় আমরা যে কবিদের পরিচয় পাই তাঁদের কাব্য বিষয় দেখলেই আমরা জানতে ও বুঝতে পারি ইসলামী জীবন দর্শন দ্বারা এঁরা প্রভাবিত। এদের বিষয়ে একদিকে যেমন এসেছেন রসুল (স) এবং তাঁহার সাহাবীরা, তেমনি এসেছে মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিগত বিষয়। যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কোন না কোনভাবে ইসলামী জীবন-দর্শনকে তাঁদের শরীরের রক্তে বহন করছে।'[৮৯]

গ. ষোড়শ শতকে ইসলামী সাহিত্য চর্চাঃ

এই শতকের উলেণ্ডখযোগ্য ইসলামী ভাবধারার কবিরা হচ্ছেন, সাবিরিদি খান, শেখ কবির, দৌলত উজির বাহরাম খা, শেখ ফয়জুলণ্ডাহ, শেখ পরাণ, আফজাল আলী, সৈয়দ সুলতান, শেখ চান্দ, দোনাগাজী চৌধুরী মুহম্মদ কবির, মুজাম্মিল ও হাজী মুহম্মদ। 'চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলিম কবিদের লেখায় যে ধর্মীয় ভাব দেখেছি, ষষ্ঠদশ শতাব্দীর কবিদের লেখাতেও আমরা সেই ধর্মীয় প্রভাব দেখতে পাই। এখানে ঐ সময়ে লেখা কয়েকটি পুস্ড়কের নাম দেখলেই আমরা বুঝতে পারব বিষয়ের

---

[৮৭] . মুকুল চৌধুরী, "বাংলা কবিতায় রসূল প্রশস্তি", "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অবদান", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২ , মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা, *পুথি সাহিত্যে মহানবী (সা)* (ঢাকাঃ তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৯২), পৃ. ১৮

[৮৮] . শাহাবুদ্দীন আহমদ, "ইসলামী ভাবপুষ্ট বাংলা ভাষার কবি-সাহিত্যিক", *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

[৮৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

দিক থেকে বইগুলো কতটা ধর্মকেন্দ্রিক। রসুল বিজয়, ওফাত-ই-রসুল, শব-ই-মিরাজ, নবীবংশ, নূরনামা, নসিহৎনামা, জঙ্গনামা, শরিয়ৎনামা, কিয়ামৎনামা, দজ্জালনামা, আমীর হামজা, কারবালা, মুনাজাত ইত্যাদি পুস্ড়ক কোন না কোনভাবে ধর্মেরই মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে সায়্যিদ সুলতান থেকে শুরচ করে আবদুল হাকিম এবং তারপরে সপ্তদশ শতাব্দীতে নওয়াজিশ খাঁ থেকে শুরচ করে হায়াৎ মামুদ পর্যন্ড় প্রায় সব মুসলিম কবিকে আমরা শাশ্বত ইসলামের মহিমা কীর্তন করতে দেখেছি।

ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে আমরা যেমন সায়্যিদ সুলতানকে লিখতে দেখেছি 'রসুল বিজয়', 'শব-ই-মিরাজ, শেখ পরাণকে লেখতে দেখেছি 'নূরনামা', 'নসিহতনামা' তেমনি সপ্তদশ শতাব্দীর হায়াৎ মামুদকে লিখতে দেখছি 'জঙ্গনামা' বা 'মহরম পর্ব' 'হিতজ্ঞান বাণী' বা 'আম্বিয়া বাণী'।'[৯০]

অষ্টম শতাব্দী থেকে শুরচ করে প্রায় ছয় সাতশত বছর পর্যন্ড় বাংলা সাহিত্যে হিন্দুয়ানী ভাবধারাই প্রচলিত ছিল। কাজেই বাংলা সাহিত্যের আদিপর্বে যেসব সাহিত্য পদবাচ্য কাব্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল সেসবের মধ্যে 'শূণ্য পুরাণ', 'ধর্মমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল', 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'চন্ডিমঙ্গল', 'গোরক্ষবিজয়' ইত্যাদি প্রধান। এসব গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্মের সার তত্ত্ব, হিন্দু দেব-দেবী ইত্যাদির গুণকীর্তনই মুখ্য ছিল এবং বাংলাদেশের মুসলমানরা এসবই শুনতে অভ্যস্থ ছিলেন।

মধ্যযুগের কবি সৈয়দ সুলতানই (১৫৫০-১৬৪৮) সম্ভবতঃ সর্বপ্রথম বাংলা কাব্য-সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার প্রবর্তন করে মুসলমানদের মধ্যে এক নব চেতনার সঞ্চার করেন। তাঁর সুবৃহৎ কাব্য গ্রন্থ 'নবীবংশ' এর উলেণ্টখযোগ্য প্রমাণ। হিন্দু দেবদেবী গুণকীর্তন শুনতে শুনতে তিনি যে কতটা ব্যথিত হয়েছিলেন তা তাঁর 'নবীবংশ' এর বর্ণনাতেই উপলব্ধি করা যায়। যেমনঃ

কত দেশ কত ভাষে কোরানের কথা।
দ্বিন মহাম্মদী বুঝি দেয়স্থ ব্যবস্থা॥
কর্মদোষে বঙ্গেতে বাঙালী উৎপন্ন।
না বোঝে বাঙ্গালী সবে আরবী বচন॥
আপন দ্বীনের বোল এক না বুঝিল।

[৯০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪

পশুর চরিত্র হই সেসব রহিল॥

সদয় পড়য় রাম কৃষ্ণের যে কথা।

শুনিয়া আমার মনে লাদে অতি ব্যথা॥

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু নৈরাকার।

আদ্যে যে আছিল তাহা করিমু প্রচার।

যেরূপে আদম ছাফি হইল উৎপন।

কহিলাম সেসব কিঞ্চিৎ বিবরণ॥

দ্বিতী এ প্রণাম করি প্রভু নিরঞ্জন।

নূর মহাম্মদের কহিমু বিবরণ॥”[৯১]

‘মধ্যযুগে শাহ মুহম্মদ সগীরের যাঁরা অনুগামী হয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন দৌলৎ উজির বহরম খান, মুহম্মদ কবীর, আলাওল, দৌলত কাজী, শাহ গরীবুলণ্ঢাহ, সৈয়দ হামজা, সৈয়দ সুলতান প্রমুখ। সৈয়দ সুলতান (১৫৫০-১৬৪৮) ও সৈয়দ আলাওল (১৫৯২-১৬৭৩ মতান্ড়রে ১৬০৭-১৬৮০) এবং প্রথমোক্তজন যিনি আরাকান অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে সুসম্পর্কিত থেকেও মধ্যযুগীয় মুসলমানী বাংলা সাহিত্যের উদ্যোক্তা পুরচ্ষ হিসেবে আত্মস্বাতন্ত্র্য চিন্ড়ায় ভাস্বর হয়ে উঠেছিলেন এবং দ্বিতীয়জন বাঙালি মুসলিম চিত্তবৃত্তির যুগ প্রতিনিধিত্বের দাবিদার হওয়ার গৌরবে হয়েছিলেন অভিষিক্ত; তাঁদের দুজনের রসূল প্রশস্ড়ির দুটি অংশ বিশেষের নমুনাঃ

প্রথমে প্রভুর নাম করি এ স্মরণ

আঠার হাজার আলম যাহার সৃজন।

দ্বিতী এ লয় মুস্ড়াফা পয়গম্বর

যাহার সিফত আছে রোজ মহাশর।

যতন করি ধরি এ রসূল দুই পা এ

আখেরে এড়াইবা যদি হিসাইবার দাএ

[জ্ঞান প্রদীপ] -সৈয়দ সুলতান

---

[৯১] . আবদুস সাত্তার, “বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব”, মোশাররফ হোসেন খান সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৫

পূর্বেতে আছিল প্রভু নৈরূপ আকার।

ইচ্ছিলেক নিজ সখা করিতে প্রচার॥

নিজ সখা মহম্মদ প্রথমে সৃজিলা।

সেই জ্যোতি-মূলে ত্রিভূবন নিরমিলা॥

জন্মিয়া যে জনে না লইল তার নাম।

তাহার হইব নরকের মাঝে ধাম॥

[পদ্মাবতী]- সৈয়দ আলাওল'[৯২]

উলেণ্টখ্য, এ সময় মুসলিম কবিগণের হাতে রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের পাশাপাশি 'রসূল বিজয়' ও 'জঙ্গনামা' শ্রেণীর কাব্যও প্রণীত হতে থাকে। এ ধারায় কবি জৈনুদ্দীন সর্বপ্রথম রসুল বিজয় কাব্য রচনা করেন। (রচনাকাল ১৪৭১-১৪৮১)। জৈনুদ্দীনের ধারা অনুসরণ করে এগিয়ে আসেন শাহ বারিদ খাঁ (১৫১৭-১৫৫০) এবং পরবর্তীতে সৈয়দ সুলতানও (১৫৫০-১৬৪৮)। সৈয়দ সুলতানের 'নবী বংশ' রচনা কাল (১৫৮৫-১৫৮৬)। 'রসুল বিজয়' ও 'ওফাতে রসুল' এ ক্ষেত্রে উলেণ্টখযোগ্য। কবি শেখ চান্দ, (১৫৬০-১৬৬০), নসরচ্লণ্টাহ খান (১৫৬০-১৬৪৫), মুহম্মদ খানও (১৫৮০-১৬৫০) এ ধারা অনুসরণ করেন। এরা সৈয়দ সুলতানের সমসাময়িক এবং শেষোক্তজন তাঁর উপযুক্ত ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁদের রসুল প্রশস্ড়ির নমুনাঃ

'বন্দম নূর মোহাম্মদ হাবিব আলণ্টাহর

চৌদ্দ ভুবনের পীর হ-মহিমা অপার॥

আউয়ালে আখেরে করি একিদা নূরের।

গুণা মাফ করাইব চৌদ্দ ভুবনের' [রসূল বিজয়, শেখ চান্দ]

'আর এক কথ কহি আমি রঙ্গমনে।

জেই কর্ম না করিব মুহমিনগণে॥

জে সকল কর্মে মোহাম্মদ অসন্ড়েষ

হিছাবের কালে প্রভু করিবেন্ড় রোষ॥' [হিদায়াতুল ইসলাম, নসরচ্লণ্টাহ খান]

[৯২]. মুকুল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২ , মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

'চিরঞ্জন চিনিবারে নবীমাত্র লক্ষ্য।

নহে প্রভু চিনিবারে করিয়াছে সক্য॥

দর্পণে দেখিও যেন আপনা বদন।

নবীকে ভাবিলে পাই প্রভু নিরঞ্জন॥' [সত্য কলি-যুগ সংবাদ-মুহম্মদ খান]"[৯৩]

ঘ. সপ্তদশ শতকে ইসলামী সাহিত্য চর্চাঃ

সতেরো শতকে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর অগণিত গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়। দৌলত কাজী, আলাওল, মাগন ঠাকুর প্রমুখ কবির অবদানে ও সৃষ্টিশীল রচনায় এ শতাব্দী বাংলা কাব্য সাধনায় আমাদের জাতীয় ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। আরবী, ফার্সী ও হিন্দির বিষয়বস্তুর সাথে ভারতীয় বিষয় ভাবনার চমৎকার সমন্বয় সাধিত হয়।

আলাওল এ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি।[৯৪] 'আসহাবনামা', কিয়ামৎনামা', 'দজ্জালনামা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ ষোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য মুহম্মদ খান কর্তৃক রচিত। 'কিফায়াতুল মুসালিণ্ঢন' ও 'কায়েদানে কিতাব' ইত্যাদি জনপ্রিয় গ্রন্থ রচিত হয় কবি শেখ মুত্তালিব কর্তৃক। যিনি ইসলামী শাস্ত্র জ্ঞানে সেই সময় যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। 'জঙ্গনামা', 'শরীয়তনামা', 'হেদায়াতুল ইসলাম' ও 'মুসার সওয়াল-জওয়াব' ইত্যাদি ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক কাব্য গ্রন্থ রচিত হয় নসরচ্লণ্ঢাহ খান কর্তৃক।

কবি আবদুল হাকিম (১৬২০-১৬৯০) ইসলামী ভাবধারা তাঁর লেখায় প্রকাশ করেন এবং তাঁর অনুসারীদের এ পথে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। 'কবি আবদুল হাকিমের নামে মোট আটখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 'ইউসুফ জোলেখা', 'লালমতি সয়ফুল মুলুক', 'শিহাদুদ্দীননামা', 'নূরনামা', 'নসিহতনামা', 'চারি মোকাম ভেদ', 'কারবালা', ও 'শাহনামা'। বেশির ভাগ কাব্যই ফারসি কাব্যের অনুবাদ বা অনুসরণে লিখিত।

বাংলা ভাষায় ধর্ম কথা প্রকাশ করতে কবিরা নানাভাবে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। কারণ বাংলা ভাষা তখন বে-দীনী বা কাফেরদের ভাষারূপে আখ্যায়িত ছিল। সকলেরই ধারণা ছিল এ ভাষা সংস্কৃতজাত। তাই দেখা যায় সৈয়দ সুলতান, মুহম্মদ খান, হাজী মুহম্মদ, শেখ মুত্তালিব প্রমুখ কবি মুনাফিক ফতোয়ার ভয়ে

[৯৩] . মুকুল চৌধুরী, "*বাংলা কবিতায় রসূল প্রশস্তি*", "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অবদান", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৪

[৯৪] . কাজী দীন মুহম্মদ, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অবদান", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

শংকিত চিত্তে বাংলা লেখা ধরেছিলেন। বাংলায় ধর্ম কথা শোনানোর জন্য কৈফিয়ৎও দিয়েছিলেন। এ কৈফিয়তের ব্যাপারটি সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিমের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল।'[৯৫] যেমন: কবি আবদুল হাকিম বলেনঃ

"কিতাবে রোজার যেবা বৃত্তান্ড় আছিল
নিজ দেশী ভাষে তাঁহে পাঁচালী রচিল।"

তিনি আরবী, ফার্সী এবং শেষ পর্যন্ড় বাংলায় 'শাস্ত্রের বিধান' বুঝতে আহ্বান জানানঃ

'আরবী পড়িয়া বুঝ শাস্ত্রের বিধান
যথেক এলেম মধ্যে আরবী প্রধান॥
আরবী পড়িতে যদি নারে কদাচিত
ফারসী পড়িয়া বুঝ পরিণাম হিত॥
ফারসী যতি না পার কিঞ্চিত
নিজ দেশী ভাষে শাস্ত্র পড়িতে উচিত॥

তাঁর 'নূরনামা' কাব্যে বলেনঃ

আরবী ফারসী শাস্ত্রে নাই কোন রাগ
দেশী ভাষা বুঝিতে ললাটে পুরে ভাগ॥
যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন যুয়াএ
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায় ॥"[৯৬]

দৌলত কাজী বা কাজী দৌলত (মৃ.১৬৫৮) তিনিও সতেরো শতকে বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করে বাঙালি মুসলিম সমাজে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর রচনার নমুনাঃ

"বিছমিলণ্টা প্রধানেক নাম নিরঞ্জন।

---

[৯৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

[৯৬] . আবদুল মুকীত চৌধুরী, "বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

যে নাম স্মরণে কার্য্যসিদ্ধি সর্বক্ষণ॥

কি করিব যমদূতে বিপক্ষ বিবাদ।

সর্ব্বসিদ্ধি জয় জয় সে নাম প্রসাদ॥

রহমান নাম অর্থ করচ্চা সদায়।

যে নাম স্মরণে দুঃখ দারিদ্র্য খন্ডায়।

রহিম নামের অর্থ কি কহিমু আর।

দীন দয়াময় প্রভু মহিমা অপার॥"[৯৭]

সৈয়দ আলাওল মধ্যযুগের বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে এক অসাধারণ প্রতিভা। তিনি আরবী, ফার্সী, উর্দু ও সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় সুপন্ডিত ছিলেন বলে তাঁর লেখায় প্রমাণ পাওয়া যায়। "উন্নত জীবনবোধ নির্মাণের পরিপোষক ভাষা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের নানামুখী বিকাশে মহাকবি আলাওল ছিলেন অন্যতম বিরল পন্ডিত কবি। দার্শনিক তত্ত্ব, সৌন্দর্য তত্ত্ব, অধ্যাত্মবাদ, সুফীসাধনা তাঁর মধ্যে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারই অপূর্ব প্রকাশ আলাওলের কাব্যে বিধৃত। আলাওল আনুমানিক ১৬৪৬ সালে 'পদ্মাবতী' কাব্য সমাপ্ত করেন। তিনি 'সয়ফুল মূলক বদিউজ্জামান'ও রচনা করেন। তাঁর ধর্মীয় তত্ত্বমূলক গ্রন্থ 'তোহফা' নামক কাব্যে ৪৫ টি বাব বা অধ্যায় আছে।"[৯৮] আলাওলের রচনার নমুনাঃ

"নাহিক দাসের লক্ষ্য তুমি বিনু আর।

ঘোর পাপ হন্তে মোরে করহ উদ্ধার॥

হীনমতি বহু মোর বৃত্তি দাগাবাজি॥

ক্ষমদানে ফকির-ফোকরা কর রাজি॥

সবর-শোকর প্রভু কর মোরে দান।

এ দান প্রসাদে পাইমু দুই কুলে মান॥"[৯৯]

---

[৯৭] . ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, "সাহিত্যের রূপ", মোশাররফ হোসেন খান সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

[৯৮] . কাজী দীন মুহম্মদ, "*বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অবদান*", *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫

[৯৯] . আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯২) পৃ. ১৬৩

ঙ. অষ্টাদশ শতকে ইসলামী সাহিত্য চর্চাঃ

'মুহম্মদ উজির আলী', 'হায়াত মাহমুদ', 'ফকির গরীবুলণ্ঢাহ', 'সৈয়দ হামজা', 'মুহাম্মদ আলী রাজা', 'আলী রাজা ওরফে কানু ফকির', 'কাজী শেখ মনসুর', 'শেখ সাদী', 'নওয়াজিস খান', 'পরাগল', 'মুহম্মদ রফিউদ্দীন', 'মুহম্মদ মুকীম', 'মুহম্মদ আল', 'সৈয়দ নূরউদ্দীন', 'মুহম্মদ জীবন', 'সৈয়দ মুহম্মদ নাসির', 'বালক ফকির', 'আরিফ' ও 'দানিশ' ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ অষ্টাদশ শতকের অন্যতম কবি বলে খ্যাত। এ সময়ে বাংলার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও বিভিন্ন কারণে ইসলামী সাহিত্যে মৌলিক রচনার অভাব দেখা যায়। 'যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজ্য বিস্ভ্রূরের অশুভ অবস্থায় দেশ তখন ক্ষতবিক্ষত, ইংরেজের কায়েমী শাসন প্রায় আসন্ন। বঙ্গে, বিশেষ করে কলকাতা থেকেই তার প্রবর্তনা। ফলে এই রাজনৈতিক কোলাহলের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরী প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও কলকাতায় তখন এই রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যেও একটি সাহিত্য সমাজ গড়ে ওঠে, যা একদিকে দোভাষী রীতির মুসলিম সাহিত্য রূপ পরিগ্রহ করে, অন্যদিকে বিকৃত নাগরিক রর্চচির গীতি ও কবিগানে বিকাশ লাভ করে। মুসলিম বাংলার ইতিহাসে দোভাষী রীতিই তখন তার বহুবিধ অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও জাতীয় সাহিত্যের ধারাটিকে প্রবাহমান রাখে। এই ধারায় যেসব মুসলিম কবি স্ফূর্তি আনয়ন করতে অপারগ হন, তাঁরা পূর্ববর্তীগণের ইসলামী তত্ত্ব ও রোমান্টিক ধারার কাব্যের অনুসরণে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পান বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা আর পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে পারেন নি।'[১০০]

মুঘল আমলের শেষ দিকের কবি হায়াত মাহমুদ। যিনি 'জঙ্গনামা', 'চিত্ত উত্থান', 'হিতজ্ঞানবাণী' ইত্যাদি লিখে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর কাব্য মুসলিম দর্শন ও তত্ত্বকথায় সমৃদ্ধ। হায়াত মাহমুদের রচনার নমুনাঃ

"আহাদ হইতে আলণ্ঢা কৈল আহমদ।

মিমাধিক্যে পূর্ণ সেই কৈল মহম্মদ॥

আহাদ আহমদ দুই এক করি জান।

---

[১০০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

মিমে মহম্মদ শেষে কৈল উৎপাদন॥"[১০১]

চ. ঊনবিংশ শতকে ইসলামী সাহিত্য চর্চাঃ

মধ্যযুগের শেষ পর্যায় পর্যন্ড় সাহিত্য সৃষ্টির বিভিন্ন ধারায় মুসলমানরা হিন্দুদের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবেই এগিয়ে আসছিলেন। হিন্দু কবিদের কাব্যে যেমন স্বধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ব্যাপক পরিচয় ফুটে উঠেছে, তেমনি মুসলিম কবিদের কাব্যেও স্বধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রতিফলিত হয়েছে। তবে লক্ষণীয় যে সৃজনশীলতা ও কাব্যিক উৎকর্ষের দিক দিয়ে হিন্দু কবিদের ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন থাকলেও মুসলিম কবিদের ক্ষেত্রে তা থাকে নি।[১০২] তার কারণ '১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ড় এই একশ বছরের কাহিনী বাংলার মুসলমানদের জন্য লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা ভরা এক সুদীর্ঘ তমসাকালের রক্তঝরা কাহিনী। তারই সঙ্গে সে কাহিনী যুগপৎ এক দৃঢ়সংকল্প মরণপণ সংগ্রামেরও কাহিনী; সে কাহিনী অপূর্ব ত্যাগ ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্টের মোকাবেলায় বীরত্বভরা কাহিনী।

সে কাহিনী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য, দারিদ্র আর লাঞ্ছনার নাগপাশ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক পুনরচ্জ্জীবনের জন্য, নিজেদের সভ্যতা ও কৃষ্টিকে ধারণ করে বেঁচে থাকার উপযোগী এক জীবন রচনার জন্য বেদনা ও প্রতিশ্রচ্তির স্বাক্ষরে উজ্জ্বল এক কাহিনী। সে কাহিনীতে আছে মজনু শাহ-তিতুমীর-শরীয়তুলণ্ঢাহ-দুদুমিয়ার সংগ্রামের কথা, আছে শাহ ওয়ালিউলণ্ঢাহ প্রবর্তিত পুনর্জাগরণ আন্দোলনের 'বালাকোট' মুখী সংগ্রামের কথা, আছে শহীদী খুনে ভাসমান অসংখ্য রক্তপদ্মের কথা। শত বছরের সেসব সংগ্রাম-কথা বুকে নিয়ে বিক্ষুব্ধ অগ্নিগিরি ১৮৫৭'র বিস্ফোরণে নিঃশেষিত হয়ে গেল; মুক্তি তখনও বহুদূরে!'[১০৩]

এমনি অবস্থায় বাংলার মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের কাব্য চর্চার কথা ভাবাইতো যায় না। তবুও তারা নিশ্চেষ্ট হয়ে ছিলেন না। এই তমসাকালেও যাঁরা বাংলা ভাষায় কাব্য চর্চা করে যাচ্ছিলেন, তাঁদের মধ্যে 'তমিজী', 'মুহম্মদ চুহর', 'মালে মোহম্মদ', 'বাকের আলী চৌধুরী' 'মুহম্মদ খাতের', 'রহিমুন্নেসা', ও

[১০১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩-৪

[১০২] . কাজী দীন মুহম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৫

[১০৩] . ডক্টর আসকার ইবনে শাইখ, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬২

'হামিদুলণ্ঢাহ খান' উলেণ্ঢখযোগ্য।[১০৪] এই সময় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য একটা ক্রান্ড়িলগ্নে উপনীত হয়েছিল। একদিকে ফার্সী ভাষা নিষিদ্ধ হয়ে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন, অন্যদিকে মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের কারণে বাইবেল অনূদিত হয়ে বাংলা ভাষার গদ্যরীতির প্রচলন শুরচ হয়। 'ইংরেজ সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হল ভারতবর্ষে।

মুসলিম সাহিত্যসেবীরা দেখতে পেলেন, আলো ঝলমল সেই নিরচদ্বিগ্ন দিনে হিন্দু সাহিত্যসেবীরা তাঁদের পথপরিক্রমায় বহুদূর এগিয়ে গেছেন। ১৮০০-১৮৭০ সালের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের অক্লান্ড় চেষ্টায় আধুনিক বাংলা সাহিত্য হল দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সে সাহিত্য ততদিনে হিন্দু ঐতিহ্যবাহী। মুসলিম সাহিত্যিকরা স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করলেন, হিন্দু সাহিত্যিকদের কাছ থেকে মুসলিম ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য সৃষ্টির আশা বাতুলতা মাত্র।'[১০৫]

ইংরেজ ও হিন্দুদের এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দমন পীড়নের মধ্যে আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যে যে কয়েকজন মুসলিম সাহিত্য রূপকার আমরা দেখতে পাই তারা হলেনঃ 'মীর মশাররফ হোসেন', 'মোহাম্মদ নইমুদ্দীন', 'আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী', 'কায়কোবাদ', 'মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী', 'রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী', 'শেখ আবদুর রহিম', 'মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক', 'মোহাম্মদ নজিবুর রহমান', 'মোহাম্মদ মেহেরচলণ্ঢাহ', 'মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ', 'শেখ আবদুস সোবহান', 'নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী', 'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ', 'শেখ মোহাম্মদ জমিরচদ্দীন', 'মতীয়র রহমান খান', 'শেখ ওসমান আলী' 'আবু মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী', 'মোহাম্মদ মনিরচজ্জামান ইসলামাবাদী', 'সৈয়দ এমদাদ আলী', সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী', 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন', 'শেখ ফজলুল করিম', ও 'কাজী ইমদাদুল হক' প্রমুখ।

তাঁদেরই হাত ধরে বিংশ শতাব্দীর শুরচতে কলকাতা ও ঢাকাকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার ইসলামী সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। ইসলামী সাহিত্য চর্চা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করে। ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মুসলমান শিক্ষিত সমাজ প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে উঠে। যার

---

[১০৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩

[১০৫]. ডক্টর আসকার ইবনে শাইখ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪-৬৫

ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ পৌত্তলিকতা বর্জিত এবং একত্ববাদ প্রভাবিত সাহিত্য অধ্যয়নের সুযোগ পায়। আলেম সমাজের নিকট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দিন দিন আদরণীয় হতে থাকে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ অবিভক্ত বাংলার সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি ঃ

সমকালীন সাহিত্যিকদের চিন্ড্র-চেতনার প্রকার ও ধরণ সম্পর্কে সঠিক ধারণা এবং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাঁদের সমসাময়িক সমাজ ও পরিবেশ খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। উলেণ্টখ্য, বর্তমান গবেষণায় আমিও সমকালীন সমাজের একটা প্রেক্ষাপট এখানে তোলে ধরার চেষ্টা করছি, যা অভিসন্দর্ভের বিষয়ের সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক।

কবি ও সাহিত্যিকদের সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের সামনে চলে আসে। যে বিষয়গুলো সমকালীন ইসলামী সাহিত্যিকদের সাহিত্য রচনার বা চিন্ড্র-চেতনার ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমানগণ সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। এ সময় শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মাত্রেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় যে, ধর্মীয় কুসংস্কার ও অশিক্ষা দূর করতে না পারলে অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের কোন উন্নতি হবে না।

দুর্দশাগ্রস্ড় মুসলমান সমাজের উন্নয়নকল্পে কয়েকজন প্রথিতযশা বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিক জীবনে বিবাহ না করার সিদ্ধান্ড় নিয়েছিলেন। তাঁদের ধারণা ছিল বিবাহ করলে পারিবারিক দায়িত্বের কারণে দুর্দশাগ্রস্ড়ড় মুসলমানকে প্রকৃত সেবা দেয়া যাবে না। তাঁদের মধ্যে সুসাহিত্যিক মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) ও এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৪০) অন্যতম। মুসলমানদের মধ্যে সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সংস্কারক, বক্তা, কবি ও সাহিত্যিক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ মেধা ও যোগ্যতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন অবিভক্ত বাংলার অনেক হৃদয়বান ও ত্যাগী মানুষ। তাঁদের শ্রম ও সাধনায় পতিত মুসলিম জাতি ব্রিটিশদের ২০০ বছরের জুলুম ও শোষণ থেকে মুক্তি পায়।

কিভাবে এই পতিত সমাজকে জাগানো যায়; এই ভাবনা থেকেই তাঁদের স্মৃতিতে ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসের কথা উদ্রেক হয়। ইসলাম ধর্মের ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রচারের মাধ্যমে অধিকাংশ মুসলিম চিন্ড় াবিদরা এই সময়ে কাজ করেছেন। নিম্নে আধুনিক যুগে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির সময়কালে

ক. সামাজিক, খ. ধর্মীয়, গ. রাজনৈতিক, ঘ. অর্থনৈতিক ও ঙ. সাহিত্য ইত্যাদির অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করছিঃ

ক. সামাজিক অবস্থা ঃ

পলাশীর প্রান্ড়রে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মাধ্যমেই মূলতঃ মুসলমানদের দুর্গতি এই উপমহাদেশে তথা অবিভক্ত বাংলায় প্রবেশ করে। ইংরেজরা পর্যায়ক্রমে ক্ষমতা গ্রহণ করে। লর্ড কর্নওয়ালিশ (১৭৩৮-১৮০৫) কর্তৃক ১৭৯৩ সালে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ড় হয় তাতে বাংলার মুসলমান সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। কৃষি জমির মালিকানা কৃষকের হাত থেকে জমিদারদের হাতে চলে যায়। ইংরেজরা আরও বিভিন্ন ধরনের আইন করে বাংলার মুসলমনাদের শাসন-শোষণ করতে থাকে।

১৭৫৭-১৮৫৭ এই ১০০ বছরের মধ্যে মুঘল আমলের রাজ মুসলমানেরা ভিখারিতে পরিণত হয়। এদিকে ১৮৫৭ সালে ইংরেজদের দুর্নীতি ও অন্যায়ের বিরচ্দ্ধে ‘সিপাহি বিপ্লব’ হয়। এই বিপ্লব ইংরেজরা কঠোর হস্ড়ে দমন করেন এবং বিপ্লবের জন্য মুসলমানদের দোষারোপ করে প্রতিশোধ ও শাস্ড়ির ব্যবস্থা করা হয়। ইংরেজদের ধারণা ছিল মুসলমানরা মুঘল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্যে এ বিদ্রোহ ও বিপ্লব ঘটিয়েছে। যদিও সিপাহি বিপ্লবের পর বাঙালি মুসলমান সমাজের নেতা নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) ও স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮) ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ ইংরেজদের সাথে যোগাযোগ করে মুসলমানদের উপর ইংরেজদের সন্দেহ দূর করার অনেক চেষ্টা করেন। ১৮৩৫ সালে রাজভাষা ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজিকে স্থাপন করা হয়।

যুগ যুগ ধরে ফার্সী ভাষা যেহেতু মুসলমানদের চিন্ড়-চেতনার প্রতীক ছিল, হঠাৎ ইংরেজি ভাষা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়ার কারণে তারা তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন এবং ইংরেজদের সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আর যেহেতু ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজদের দোসর ছিল হিন্দুরা, তাই হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। “বাংলাদেশে ইংরেজ অধিকারের ফলে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই ক্ষতিগ্রস্ড় হয়। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে নানাভাবে সংযোগ-সহযোগিতার মাধ্যমে-জমিদারি কিনে, তাদের ভাষা শিখে, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, দালালি, মুৎসুদ্দিগিরি করে হিন্দু সমাজের

একটি অংশ নিজেদের পুনর্গঠিত করে নেয়।"[১০৬] উলেণ্টখ্য ওয়াহাবী ও ফরায়েজী আন্দোলনের কারণেও ইংরেজরা মুসলমানদের প্রতি রুষ্ট হয় এবং হিন্দুদের প্রতি আস্থা বাড়ে।

ইংরেজ শাসনামলে হিন্দুরা মুসলমানদের মত এমন কোন সরকার বিরোধী আন্দোলন করে নাই, যাতে ইংরেজ শাসন কার্যের ব্যাঘাত ঘটে। ইংরেজি না জানা ও পাশ্চাত্য কৃষ্টি কালচারের সাথে অপরিচিত মুসলমানরা চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি থেকে দিন দিন বঞ্চিত ও প্রত্যাখ্যাত হতে থাকে এবং তাদের প্রতিবেশি হিন্দুরা ইংরেজদের থেকে সমস্ড় সুবিধাদি নিয়ে অগ্রসর হতে থাকে।

ইংরজরা যখন ভারতবর্ষের ক্ষমতা দখল করে ঠিক তখন থেকে ইংরেজদের বিদায়বেলা পর্যন্ড় ২০০ বছরের বাংলার সামাজিক ইতিহাস খুবই ঘৃণ্য ও দৃষ্টিকটু। অশিক্ষা, কুসংস্কার, আশরাফ-আতরাফ, গ্রাম্য ও গোষ্ঠীগত দলাদলি ইত্যাদিতে বাংলার সামাজিক ইতিহাস পরিপূর্ণ ছিল। মুসলমান সমাজের এই দুরবস্থার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন গবেষক বলেনঃ 'এসব ধর্মবিরুদ্ধ দেশাচার ও লোকাচার জন্মলাভের পিছনে একাধিক কারণ ছিল। শিক্ষাহীনতা, ইসলামের মূলনীতি অনুধাবনে অক্ষমতা, দীর্ঘকাল পাশাপাশি হিন্দুদের সাহচর্যে বাস করার ফলে নানা ধরনের অনৈসলামিক প্রভাব প্রভৃতি কারণ ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যবোধের উপর কুঠারাঘাত করে।

তাছাড়া বাংলার ধর্মান্ড়রিত মুসলমানদের অধিকাংশই এসেছিল নিম্নবর্ণের হিন্দুদের থেকে। এরা শুধু ধর্মবোধের কারণে নয়, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নানা কারণেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে, ধর্মমত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনের বদল হয়নি এবং পূর্বকালের অনেক সংস্কার তাদের মধ্যে অক্ষুন্ন রয়ে গিয়েছিল। নবদীক্ষিত মুসলমানদের ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে শিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থাও গৃহীত হয়নি। এছাড়া সূফীপন্থী পীর-ফকীর, আউল-বাউল-দরবেশ প্রভৃতি সাধক সম্প্রদায়ের ধর্মমতের উদারতা ও শরীয়ত বহির্ভূত অনেক আচার-আচরণ মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশকে সত্যিকার ইসলামপন্থী হয়ে ওঠার পক্ষে অন্ড়রায় সৃষ্টি করে।'[১০৭]

---

[১০৬] . হাবিব রহমান, *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩), পৃ. ১

[১০৭] . হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮, রমেশ চন্দ্র মজুমদার, 'ধর্ম ও সমাজ', *বাংলাদেশের ইতিহাস*, মধ্যযুগ, (কলকাতাঃ জেনারেল প্রিন্টার্স, দ্বি-স, ১৩৮০), পৃ. ২৩২-২৩২, Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslim in Bengal, Bangla Academy, Dhaka, 1977, pp, 29-30*

অন্যদিকে ইংরেজ আমল পুরোটাই ভ-পীরদের এক করাখানা ছিল অবিভক্ত বাংলার অলিতে-গলিতে। ইসলামের নামে পীর-মুরীদি ছিল অত্যন্ড় জমজমাট ব্যবসা। ভ-পীরদের অন্ধ অনুকরণ ও বিশ্বাস মুসলিম সমাজ ব্যবস্থাকে এবং ইসলাম মূল বিশ্বাস ও ধারাকে পঙ্গু করে দিয়েছিল। এই ভ-পীরেরা বিভিন্ন ধরণের কেরামতি ও অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলে মানুষকে বৈরাগী বানাতো। এই জাতীয় পীরদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে গরীব ও নিঃস্ব মানুষ কর্মবিমুখ হয়ে যেত। 'স্বার্থপরায়ণ এসব পীরের প্রভাবে মুসলিম সমাজে পীর পূজা, কবর পূজা, মাজার পূজা, মানত, কবর জেয়ারত প্রভৃতি অনৈসলামিক কর্মকা- ঘটতে থাকে।

'সওগাত' সম্পাদক জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে মুসলমানরা শীতলা পূজা, লক্ষ্মী পূজা, মনসা পূজা প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণ করত। এমনকি কোনো সম্ভ্রান্ড় মুসলমানও দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা করতেন। এসব প্রথা পৌত্তলিকতারই সামিল। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীসহ প্রায় সকল লেখক বুদ্ধিজীবি কাঠমোলণ্ঢাদের দৌরাত্ম্য ও পীরবাদ তথা শিরক ও বেদাতের হাত থেকে মুসলিম সমাজকে মুক্ত করার আশু তাগিদ উপলব্ধি করেছিলেন।'[১০৮]

ব্রিটিশ আমলে মুসলমান সমাজে বংশের গৌরব, আশরাফ-আতরাফ ও কৌলিন্য গর্ব ইত্যাদি মহামারী আকারে চলছিল। যার রেশ এখনও বাংলাদেশের কিছু কিছু অঞ্চলে দেখা যায়। হিন্দুদের মত মুসলমান সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি বিভক্তি জন্ম নিয়েছিল, যা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক। "ব্রিটিশ আমলে বাঙালি মুসলমান সমাজে অভিজাতদের কৌলীন্যগর্ব তথা আশরাফ-আতরাফ সমস্যা এত প্রকট হয়ে উঠেছিল যে তা ছিল এ সমাজের একতা ও সম্প্রীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট অন্ড়রায়। তথাকথিত শরীফ নামধারীরা অন্যদের তুচ্ছ ভাবত। তারা মনে করত যে, তাদের রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, আত্মা যাহা কিছু আছে সবই পৃথক। অশরীফগণের একটার সহিতও মিল নাই।"[১০৯]

ইসলাম ধর্ম হচ্ছে সাম্যের ধর্ম। এখানে উঁচু-নিচুর কোন ভেদাভেদ নাই। কিন্তু ভারতীয় অশিক্ষিত মুসলমানরা ইসলামের সেই শিক্ষা পায় নাই বলেই তাদের সমাজে তা প্রবেশ করেছিল। নব্য শিক্ষিত মুসলমান লেখক, কবি ও সাহিত্যিকগণ এ আশরাফ-আতরাফের বিরূদ্ধে কঠোর অবস্থা অবলম্বন করে

[১০৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০, কাজী আবদুল ওদুদ, 'হিন্দু-মুসলমনের বিরোধ', *শাশ্বত বঙ্গ* (ঢাকাঃ ব্র্যাক প্রকাশনা, ১৯৮৩) পৃ. ১৭২

[১০৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০, মোহাম্মদ ময়জর রহমান, 'সমাজ চিত্র', আল-এসলাম, ভাদ্র, ১৩২৬, উদ্ধৃত, 'জীবন ও জনমত', পৃ. ৬২

লেখনি ধারণ করেন। “মুসলিম লেখক বুদ্ধিজীবীরা আশরাফ-আতরাফ সমস্যাকে মুসলিম সমাজের অধঃপতনের একটি অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন। তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এই আশরাফ-আতরাফ প্রভেদ জ্ঞান ঘুন ধরা বাঁশের মতই সমাজকে ভিতরে ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র করিয়া চলিয়াছে।”[১১০] এই সময়ে বাংলার মুসলমানদের সবচেয়ে বড় একটি সামাজিক সমস্যা ছিল নারীর প্রতি অমানবিক আচরণ। ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা না থাকার কারণে বা ইসলামে নারীর মূল্য ও অধিকারের কথা না জানার কারণে নারীর প্রতি চরম বৈষম্য আচরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, সমসাময়িককালে হিন্দু সমাজেও নারীর অবস্থা খুবই ভয়াবহ ছিল।

‘সতীদাহ প্রথা’সহ আরও অনেক কুসংস্কারে জর্জরিত ছিল হিন্দু ধর্ম। রাজা রাম মহোন রায় (১৭৭২/৭৪-১৮৩৩) ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) আগমনে হিন্দু সমাজের দুর্দশা কিছুটা হলেও হ্রাস পায় কিন্তু মুসলমান সমাজে সেরূপ কোন পুরুষ বা সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব হয়নি। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবা, তালাক ও যৌতুক বা পণপ্রথা ইত্যাদি বিষয়গুলো দরিদ্র মুসলিম সমাজকে ভারাক্রান্ড় করেছিল। ইসলামে নির্দেশিত ‘ইজাব-কবুল’ পদ্ধতি অনুসরণ না করে জোর-জবরদস্ড়ি করে মেয়েদেরকে বিয়ে দেয়া হতো। মূলতঃ সমসাময়িককালে হিন্দু সমাজের অসংখ্য প্রথা ও কুসংস্কার মুসলমান সমাজের অংশ হয়ে গিয়েছিল।

সমাজ থেকে এই অন্ধকার দূরীকরণে উনিশ শতকের শেষ দিকে এবং বিশ শতকের প্রথম দিকে যে কয়েকজন মনীষী এগিয়ে আসেন, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। “বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমান লেখকেরা স্ব-সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্ড়া-ভাবনা করেছেন, এর মধ্যে সমাজ চিন্ড়াই প্রধান। বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যেসব ভাব আন্দোলন দেখা দেয় তা ছিল ধর্মজীবনের আদর্শ মুখ্য। মুসলমান সমাজকে সচেতন করার জন্যে নওয়াব আব্দুল লতীফ আন্দোলন করেন। সৈয়দ আমীর আলী ছিলেন তাঁর অনুসারী।”[১১১]

নওয়াব আব্দুল লতিফ মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্যে `Mohamaddan Literary Society’ (1863) গঠন করেন। একই উদ্দেশ্যে আমীর আলীও গঠন করেন `National Mohamaddan Association’ (1878) ।

---

১১০ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১১, এম. এ. তোরাব আলী, আশরাফ-আতরাফ, সওগাত, শ্রাবণ, ১৩৩৫, পৃ. ২৮

১১১ . মোঃ জামান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩

এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের প্রথম সার্থক গদ্য লেখক মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাব হয়। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় মুসলমান সমাজের দুঃখ দুর্দশা কথা তুলে ধরেছেন এবং সমাধানের পথ দেখিয়েছেন। এর পরে আসেন মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), যিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য নিয়ে আজীবন সাহিত্য সাধনা করেন। মুসলমানদের অতীত গৌরব তোলে ধরে অবহেলিত মুসলিম সমাজকে জাগাতে চেয়েছেন। "তিনি মুসলিম কৃষ্টি নিয়ে আদর্শ জীবনের কল্পনা করেছেন। মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষার প্রচলনের জন্যে তিনি অবরোধ ও পণ প্রথার বিরোধিতা করেছেন।"[১১২]

মৌলানা মনিরচ্জ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) অবহেলিত মুসলিম সমাজের জাগরণে আত্মনিয়োগ করেন। তৎকালে মুসলমান সমাজের সামাজিক কলহে যে মামলা-মোকদ্দমা হতো তা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেনঃ "আপনারা যথাসাধ্য মামলা-মোকদ্দমা হইতে বাঁচিয়া থাকিবেন। ঝগড়া বিবাদাদি আপোষে সালিশি বিচারে মীমাংসা করিয়া লইবেন। আর একটি কথা মনে রাখিবেন, আমাদের মা, বোনেরা এবং গ্রামের সধবা, বিধবা ও কুমারীরা যে সূতা কাটে এবং দেশের যুগী, তাঁতী ও কারিগণ তদ্বারা যে কাপড় বুনায় সকলেই সেই কাপড় ব্যবহার করিবেন, দেশের টাকা দেশে থাকিবে, দেশবাসী সুখী হইবে।"[১১৩]

সাহিত্যিক কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) তাঁর 'আবদুলণ্ডাহ' উপন্যাস ও অন্যান্য লেখার মাধ্যমে সমাজে অন্ধ পীর পুজা, মাজার পুজা ও ইসলাম বিরোধী অবৈধ পর্দা প্রথার বিরচদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করেন।

বিশ শতকের প্রারম্ভে নারীদের অধিকার সম্পর্কে সবচেয়ে গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)। যাঁকে তাঁর অবদানের জন্য নারী জাগরণের অগ্রদূত বলা হয়। সামাজিক কুসংস্কার ও গতানুগতিক সমাজ-প্রচলিত প্রথার বিরচদ্ধে বেগম রোকেয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমান সমাজে নারীর স্বাধীনতা। নারী স্বাধীনতা ও নারী মুক্তি কামনা তাঁর রচনার প্রধান বিষয়বস্তু।

---

[১১২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[১১৩] . মৌলানা মনির ্জ্জামান ইসলামাবাদী, "অভিভাষণ" *মৌলানা মনির ্জ্জামান এছালামাবাদী রচনাবলী ১ম খ ,* মনির ্জ্জামান সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩) পৃ. ৩৬৪

মুসলমান সমাজে অবরোধের নামে নারীত্ব ও মনুষ্যত্ব অবমাননার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেনঃ 'ভগিনীগণ! চক্ষু রগড়াইয়া জাগিয়া উঠুন, অগ্রসর হউন। বুক ঠুকিয়া বল মা! আমরা পশু নই; বল ভগিনী আমরা আসবাব নই, বল কন্যে আমরা জড়োয়া অলঙ্কার রূপে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ থাকিবার বস্তু নই; সকলে সমস্বরে বল, আমরা মানুষ। আর কার্যতঃ দেখাও যে, আমরা সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ অংশের অর্ধেক। বাস্তবিক পক্ষে আমরা সৃষ্টি জগতের মাতা, তোমরা নিজের দাবি-দাওয়া রক্ষা করিবার জন্য নিজেরাই বিবিধ সমিতি গঠন কর।' [১১৪]

আধুনিক সমাজের অনেকের ধারণা বেগম রোকেয়া ইসলাম বিরোধী ছিলেন বা ধর্মনিরপেক্ষ ছিলেন, যা আদৌ সত্য নয়। এটা রোকেয়ার প্রতি একধরনের অপবাদই বলা চলে। তিনি যে ইসলামের আদর্শের প্রতি বিশেষ করে নারীদের পর্দা ও শালীনতার প্রতি কত নিষ্ঠাবান ছিলেন, তাঁর নিম্নোক্ত রচনায় তা ফুটে উঠেছে। "আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে, আমাদের জঘন্য অবরোধ প্রথাই নাকি আমাদের উন্নতির অন্তরায়। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ভগ্নিদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে "বোরকা" ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিসটা কি ? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে? যদি তাই হয় তবে কি বুঝিব যে জেলেনী, চামারনী, ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে ? সভ্যতাই (civiliztion) জগতে পর্দা বৃদ্ধি করিতেছে।"[১১৫]।

তিনি আরও বলেনঃ "Our girls should not only obtain University degrees, but must be ideal daughters, wives and mothers- or I may say obedient daughters, loving sisters, dutiful wives and instructive mothers[116]".

তিনি নারীদেরকে অলঙ্কার ও গহনার প্রতি লোভ-লালসা ত্যাগ করে বই-পুস্তক পড়ার প্রতি বা শিক্ষার প্রতি উৎসাহ প্রদান করে বলেন: "একখানা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক পাঠে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ হয়, দশখানা অলঙ্কার পরিলে তাহার শতাংশের একাংশ সুখও পাওয়া যায় না। অতএব শরীর-শোভন অলঙ্কার ছাড়িয়া

---

[১১৪] . মোঃ জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫, *রোকেয়া রচনাবলী*, আবদুল কাদির সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩), পৃ. ৮

[১১৫] . বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *রোকেয়া রচনাবলী*, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও অন্যান্য সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ৪০-৪২

[১১৬] . তাহ্‌মিনা আলম, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্তা-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯৬), পৃ. ৭৮, Mrs, R. S, Hossain, `Educational Ideals for the Modern Indiab Girls', The Mussalman, Vol. XXV. T.W. Edition, Vol. VII, March 5, 1931, N0. 26, P.7

জ্ঞান-ভূষণ লাভের জন্য ললনাদের আগ্রহ বৃদ্ধি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই বলি অলঙ্কারের টাকা দ্বারা ‘‘জেনানা স্কুলের” আয়োজন করা হউক। কিন্তু ভগ্নীগণ যে স্কুল লাভের জন্য সহজে গহনা ত্যাগ করিবেন, এরূপ ভরসা করা যায় না”।

নারীদের পর্দা মেনে চলাকে বেগম রোকেয়া একটি নৈতিক দায়িত্ববোধ বা কাজ হিসেবে আখ্যায়িত করে বলেন: “অবরোধ- প্রথা স্বাভাবিক নহে-নৈতিক। কেননা পশুদের মধ্যে এই নিয়ম নাই। মনুষ্য ক্রমে সভ্য হইয়া অনেক অস্বাভাবিক কাজ করিতে শিখিয়াছে। যথা-পদব্রজে ভ্রমণ করা স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষে সুবিধার জন্য গাড়ী, পাল্কী প্রভৃতি নানাপ্রকার যানবাহন প্রস্তুত করিয়াছে। সাঁতার দিয়া জলাশয় পার হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু মানুষে নানাবিধ জলযান প্রস্তুত করিয়াছে। তাহার সাহায্যে সাঁতার না জানিলে অনায়াসে সমুদ্র পার হওয়া যায়। ঐরূপ মানুষের “অস্বাভাবিক” সভ্যতার ফলেই অন্দ্ড়্পুরের সৃষ্টি।”[১১৭]

এমনিভাবে ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ডাঃ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), মৌলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ অবহেলিত নারী সমাজের উন্নয়নে গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন এবং সমাজে চলমান অশিক্ষা, কুসংস্কার, অন্যায়-অত্যাচার ও জুলুম ইত্যাদির বিরচদ্ধে আজীবন যুদ্ধ চালিয়ে যান।

আর এই যুদ্ধের আরেকজন মশালবাহী ছিলেন আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরচল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)। তিনি ভারতবর্ষের অবহেলিত নারী সমাজকে নিয়ে বেগম রোকেয়ার চেতনাকে আরো বেগবান ও উর্ধ্বে তোলে ধরে ছিলেন। তাঁর কবিতা পাঠে পুরচষ মাত্রেই নারীর অবদান স্বীকার ও নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন না করে নিস্ড়্গর নেই। কবির ভাষায়ঃ

“এ-বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ ?
অন্দ্ড়রে তার মোম্‌তাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।
জ্ঞানের লক্ষ্মী, গানের লক্ষ্মী, শস্য-লক্ষ্মী নারী,
সুষমা-লক্ষ্মী নারীই ফিরিছে রূপে রূপে সঞ্চারি।

[১১৭] . বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

পুরুষ এনেছে দিবসের জ্বালা তপ্ত রৌদ্রদাহ,
কামিনী এনেছে যামিনী-শান্তি, সমীরণ, বারিবাহ।
দিবসে দিয়াছে শক্তি-সাহস, নিশীথে হয়েছে বধূ,
পুরুষ এসেছে মরুতৃষা ল'য়ে-নারী যোগায়েছে মধু।
শস্যক্ষেত্র উর্ব্বর হল, পুরুষ চালাল হল,
নারী সেই মাঠে শস্য রোপিয়া করিল সুশ্যামল।
নর বাহে হল, নারী বাহে জল, সেই জল-মাটি মিশে
ফসল হইয়া ফলিয়া উঠিল সোনালী ধানের শীষে।"[১১৮]

নারীরা পুরুষের দেহের মতই বা দেহেরই অংশ। এর ক্ষতি হলে পুরুষদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে বলে কবি মনে করেন। তাই কবি বলেনঃ

"নারী চাপা ছিল এতদিন, আজ চাপা পড়িয়াছে নর!
সে যুগ হয়েছে বাসি,
যে যুগে পুরুষ দাস ছিলনাক', নারীরা আছিল দাসী।
বেদনার যুগ, মানুষের যুগ, সাম্যের যুগ আজি,
কেহ রহিবেনা বন্দী কাহারও, উঠিছে ডঙ্কাবাজি'।
নর যদি রাখে নারীরে বন্দী, তবে এর পর যুগে
আপনারি রচা ঐ কারাগারে পুরুষ মরিবে ভুগে।"[১১৯]

সমসাময়িক সামাজিক দুরবস্থা দূরীকরণে ইসলামের আলোকে সমাজকে পথনির্দেশনা দিয়েছেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইসলামী সাহিত্যিকগণ। যা পরবর্তী সময়কালে সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

খ. ধর্মীয় অবস্থা ঃ

---

[১১৮] . কাজী নজরুল ইসলাম, *সঞ্চিতা* (কলকাতাঃ ডি, এম, লাইব্রেরী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২), পৃ. ৮৫
[১১৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

ইংরেজরা ক্ষমতায় এসে বিভিন্ন কলা-কৌশলে ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করার চেষ্টা করে। খ্রিস্টান পাদ্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে দিয়ে দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীকে খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্ড়রিত করার চেষ্টা করে। ইংরেজদের চালাকি বুঝতে বাংলার আলেম-সমাজের বেশি দেরি হয়নি। মনুশী মোহাম্মদ মেহেরচ্লণ্ডাহ'র (১৮০১-১৯০৭) অসাধারণ বাগ্মিতা ও দূরদর্শিতার কারণে ইসলাম ধর্ম গভীর ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার অভাবে ধর্ম পালনের নামে মুসলমান সমাজে ছিল অনেক কুসংস্কার ও গোঁড়ামির চর্চা, যা মুসলিম সমাজকে পতনের দ্বার প্রান্ড়ে নিয়ে যায়। "মুসলমান সমাজের অশিক্ষা ও হতাশার কারণে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার জন্মলাভ করে। মুসলমানেরা তাঁদের অধিকার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ে।

মুসলমানদেরকে সমাজে ধর্ম সম্পর্কে সচেতন করার জন্যই হাজী শরীয়তুলণ্ডাহ (১৭৮০-১৮৩৯) 'ফরায়েজী আন্দোলন' শুরচ করেন। এ আন্দোলন প্রথমে ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে শুরচ হলেও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। পূর্ব বাংলার কৃষক সমাজই এ আন্দোলনের প্রধান সমর্থক।"[১২০]

হাজী শরীয়তুলণ্ডাহ ইংরেজদের দখলীকৃত ভারত ভূ-খ-কে তাদের হাত থেকে উদ্ধার না করা পর্যন্ড় এই জমিনে জুম'আর নামাজ বৈধ হবে না বলে ফতোয়া প্রদান করেন। একে 'দারচ্ল হারব' বলে ঘোষণা দেন। এই আন্দোলন বাংলার শহর-বন্দর ও গ্রাম গঞ্জে ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাঙালি মুসলমান ঐতিহাসিকভাবেই ধর্মের ব্যাপারে অসম্ভব রকমের আবেগ প্রবণ তবে বাস্ড়ব জীবনের এ ক্ষেত্রে উদাসীন। 'ধর্মবোধ বাঙালি মুসলমানের অত্যন্ড় দৃঢ়। কিন্তু অশিক্ষা ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে তা কখনো গতিশীল, সাবলীল এবং মুক্ত জীবনের স্পর্শে উজ্জীবিত হয়নি। ধর্ম তাই প্রায়শ জীবন-বহিরস্থ কর্মকা-, মোহময় ইশারা কিংবা কিছু সংস্কারের বন্ধনমাত্র। ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা, তাকে আত্মস্থ ও বাস্ড়ব উপযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে সন্ধান করা উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের জীবনে ঘটেনি। উনিশ শতকের মুসলমান আত্মরতিমুগ্ধ, কিংবা আত্মরক্ষার জন্যই ধর্মের ব্যবহারে উৎসাহী।

---

[১২০] . মোঃ জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

মুসলমানরা মনে করতো ইংরেজরা তাদের শত্রচ এবং ইংরেজদের কাছ থেকে সুবিধা নেওয়া হিন্দুরাও শত্রচ।'[১২১]

ভালো কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ইংরেজ আগমনের ফলে বিভিন্ন মাদরাসায় সরকারী সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে বাংলার মুসলমানদের জ্ঞানার্জনের কোন ভালো সুযোগ ছিল না। মসজিদ, মকতব ও খানকাহ ইত্যাদি থেকে বিকৃতভাবে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তারা প্রাথমিক ধারণা লাভ করত। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক বই-পুস্ড়ক ও কিতাবাদি অধ্যয়ন করার সুযোগ আলেমরাও পায় নি। যদ্দরচ্গ, অন্ধ অনুসরণ ও সুবিধাভোগী একদল নামধারী আলেমের বিচরণ ঘটে মুসলিম বাংলার গ্রামে গ্রামে।

যারফলে, ইসলামের মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হয়। আসলে অধিকাংশ মোলণ্ঢা-মৌলবী চালিত ছিলেন নিজের স্বার্থ বুদ্ধি দ্বারা। অথচ সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা রাখার প্রয়োজনবোধ এরা করেনি। বরং তারা একথাই প্রচার করতেন যে দুনিয়ায় ধন-দৌলতের সুখ-ভোগ মুসলমানদের জন্য নয়। কিন্তু নিজেদের সুখ ভোগের ব্যাপারে তারা ছিলেন খুবই সচেতন।

মুসলিম সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃষ্টি না দিয়ে আত্মপরায়ণতার যে ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা তারা চালিত ছিলেন তার সমালোচনা করে শেখ হবিবুর রহমান এদের সম্পর্কে মন্ড়ব্য করেন যে, "কতকগুলি বাঁধা বুলি শুনাইয়া নজরানা ও বারবরদারী আদায় করিতে পারিলেই ইহাদের কর্তব্য শেষ হইল। মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী তো এদের সম্পর্কে পরিহাস করে লিখেছেন: 'মোলণ্ঢাদের পনের আনা উনিশ গ¨া তিন কড়া দুই ক্রান্ড়ি রকম লোকের যাহা কা¨কারখানা, যেরূপ রীতি-আচরণ তাহাতে আমাদের সমাজ হইতে মোলণ্ঢা রাজত্ব বিলুপ্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয় নতুবা আমাদের উদ্ধার নাই।"[১২২]

সুন্নী, ওয়াহাবী, মাজহাবী ও লা-মাজহাবী ইত্যাদি নিয়ে বাংলার মুসলিম সমাজে ব্রিটিশ আমলে কম মারামারি বা সংঘর্ষ হয়নি। এসব বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া-বিবাদ ও যুগের পর যুগ মামলা-

---

[১২১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[১২২] . হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯, সৈয়দ উদ্দীন খান, মোলণ্ঢা ও সমাজ, সওগাত, আশ্বিন, ১৩৩৬, উদ্ধৃত: মোস্তফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত,(ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭) পৃ. ১৭৭, কর্ম্মবীর মুনশী মেহের¨লণ্ঢাহ, (কলকাতাঃ মখদুম লাইব্রেরী, ১৯৩৪) পৃ. ৪৯-৫০, ধর্ম্ম জীবনে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, উদ্ধৃত: মোহম্মদ নসিরউদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩০২

মোকদ্দমা পর্যন্ড় কলকাতা কোর্টে চলেছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় তারা ভুলেই গিয়েছিল যে, ‘ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের একটি অন্যতম মৌলনীতি।

অথচ শিয়া-সুন্নি বিরোধ, মজহাব দ্বন্দ্ব, মোলণ্ঢা-মৌলবিদের নিজেদের মধ্যে স্বার্থগত মতানৈক্য, দলাদলি, ঝগড়া-ফ্যাসাদ ইসলামের সেই মূলনীতির মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। ফলে বিভেদ ও অনৈক্য মুসলিম সমাজকে শক্তিহীন করে রেখেছিল। শিয়া-সুন্নির বিরোধ সম্পর্কে ‘সোলতান’ সম্পাদক প্রশ্ন রেখেছিলেন বর্তমানে যেখানে ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে একই ধর্মাবলম্বী শিয়া-সুন্নিতে কি মিলন হতে পারে না ? মুসলিম নেতারা এ ক্ষেত্রে উদাসীন কেন ?’[১২৩] মোট কথা, হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা ইসলাম ধর্ম যথেষ্ট প্রভাবিত ছিল। মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনে হিন্দুদের প্রচলিত ধর্ম ও বিভিন্ন কুসংস্কার নিয়মিত পালন করা হতো।

গ. রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

রাজনৈতিক শক্তি হারানোর মাধ্যমেই ব্রিটিশ শাসনের শুরচ থেকেই উপমহাদেশের মুসলমানরা তাঁদের সব ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। অর্থনীতি, চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন ও জমিদারি ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইংরেজদের পাশাপাশি হিন্দুরা সমস্ড় অধিকার ভোগ করে আসছে। যার ফলে হাজার বছর যাবৎ একই ভূ-খ" বসবাসকারী হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘাত ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। এ বিরোধের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে ‘কোন কোন লেখক বলেছেন হিন্দু-মুসলিম বিরোধের কারণ ধর্মবোধের মধ্যে নয়, তা নিহিত ছিল মধ্যবিত্তের শক্তি ও সুবিধার দ্বন্দ্বের মধ্যে। আর সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা ব্যবহার করেছে গণশক্তিকে।

অন্যদিকে ব্যাপক সংখ্যক মুসলিম কৃষকের মনে হিন্দুদের বিরচদ্ধে যে অসন্ড়োষ জন্ম লাভ করে তারও কারণ ছিল মূলত অর্থনীতির মধ্যে। বাংলার অধিকাংশ জমিদার ও মহাজন ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের। তাদের দ্বারা হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কৃষক-প্রজা শোষিত হলেও যেহেতু এদের সিংহভাগ ছিল মুসলমান সেহেতু তারা এই শোষণকে দেখেছে হিন্দুর দ্বারা শোষণ হিসেবে।’[১২৪]

---

[১২৩] . হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০

[১২৪] . হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮, আবদুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮২) পৃ. ৩০৪

অপরদিকে সমাজ জীবনের মুসলমানগণ এত বৈষম্য ও দুর্দশার শিকার হন, যার করচন চিত্র ফুটে উঠে ইংরেজদের বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে। 'লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৮৩৩-৩৮) ফার্সী রহিত করে ইংরেজিকে রাজভাষা করেন। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮) নিয়ম করেন যে, যাদের ইংরেজিতে ডিগ্রি আছে, তারাই সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকার পাবেন। ইংরেজি জ্ঞান ছাড়া চাকুরিতে নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৩৫ সালে লর্ড টমাস ব্যাবিন্টন মেকলের পরামর্শ অনুযায়ী আইন হয় যে, কেবল ইংরেজি বিদ্যালয়গুলো সরকারি সাহায্য পাবে, অন্য প্রতিষ্ঠান পাবে না।

১৮২৮ সালের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন, ১৮৩৭ সালের রাজভাষার পরিবর্তন, ১৮৪৪ সালের নতুন চাকুরিতে নিয়োগ পদ্ধতির প্রবর্তন-পর পর এইসব নিয়মের ফলে মুসলমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায়; এতে অনেক শিক্ষক, মৌলবী, মুনশী জীবিকা হারান ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হন।'[১২৫] এ সমস্ড় কারণে মুসলমানদের মধ্যে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়।

স্যার সৈয়দ আহমদ, নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী এ সমস্ড় ব্যক্তিবর্গ ইংরেজদের সাথে আপোস-মীমাংসা করে মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের চেষ্টা করেন। ডক্টর ওয়াকিল আহমদ বলেনঃ 'এই সময় কলকাতার মুসলমান সমাজ নিষ্ক্রিয় ছিল বটে, কিন্তু গ্রামের মুসলমান সমাজ বেশ সক্রিয় ছিল। ২৪ পরগণায় তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১), ফরিদপুরের হাজী শরীয়তুলণ্ডাহ (১৭৬৪-১৮৪০) ও দুধু মিঞা (১৮১৯-১৮৮২) এবং ওয়াহাবী নেতৃবৃন্দ বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বেশ জোরেশোরে আন্দোলন করেছিলেন। এসব আন্দোলনে ধর্মের প্রভাব থাকলেও শ্রেণি সংগ্রামের একটা অন্ড়র্লীন রূপ ছিল।

'বাঁশের কেলণ্ডা' নির্মাণ করে তিতুমীর লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন (১৮৩১)। তিনি ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সন্ড়ান। সাধারণ কৃষকের সন্ড়ান হাজী শরীয়তুলণ্ডাহ ও দুধু মিঞা ফরায়েজী আন্দোলন করে জমিদার ও নীলকরদের চক্রান্ড়ে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন।

সৈয়দ আহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১) ওয়াহাবী আন্দোলনে বাংলার কৃষকেরা মুজাহিদ ও অর্থ সংগ্রহ করে সীমান্ড়ের সংগ্রামে প্রেরণ করত। 'সিপাহি বিদ্রোহে'ও এদের হাত ছিল। ব্রিটিশ সরকার কঠোর

[১২৫] . ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন, ১৯৯৭), পৃ. ৩২-৩৩

হস্ড়ে এদের দমন করেন। অনেককে ষড়যন্ত্র ও মামলায় জড়িত করে জেল, দ্বীপান্ড়র ও মৃত্যুদন্ড দেন।'[১২৬]

নওয়াব আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় মুসলমান সমাজের কিছু কিছু অংশে যখন জাগরণ শুরচ হয়েছে, ঠিক তখনই মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে ঐতিহাসিক 'বঙ্গভঙ্গে'র ঘটনা ঘটে। এই 'বঙ্গভঙ্গে'র মাধ্যমে বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক ইতিহাস ভিন্নরূপ ধারণ করে এবং বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ এই বিভাজনের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়ে যায়। 'এই ঘটনার ফলেই বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায় প্রথম ব্যাপকভাবে বিভাজিত হয়ে যায় এবং বলতে গেলে এর দ্বারাই ভবিষ্যতের বাংলা বিভাগও সূচিত হয়।

হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গের বিরচদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরচ করে। কংগ্রেস আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। অন্যদিকে মুসলিম সমাজে এর মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। ফলে বঙ্গভঙ্গের এক বছরের সামান্য কিছু বেশি সময়ের মধ্যে মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা (৩০ ডিসেম্বর, ১৯০৬)। অনেক জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরচ হয়। হিন্দুদের প্রবল আন্দোলনের চাপে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করা হয়। এতে মুসলমানরা খুব মর্মাহত হয়। তাদের এই আহত মনোভাব ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনীতিতে সুদূর প্রসারী প্রভাব রাখে।

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ফলে ইংরেজ সরকারের প্রতি মুসলিম মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। তারা ইংরেজের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে এবং বুঝতে পারে যে আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে অধিকার আদায় করা সম্ভব নয়। এর ফলে মুসলিম লীগ নেতৃত্বে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ব্রিটিশ অনুগতদের প্রভাব খর্ব হয় এবং র‍্যাডিক্যালদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ তোষণনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগের নতুন নেতৃত্ব ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে ওঠে। বলকান যুদ্ধে (১৯১২) ব্রিটেনের তুরস্কনীতি তাদের আরও ব্রিটিশবিরোধী করে তোলে।'[১২৭]

ইতিহাসের ভয়াবহতম দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরচ হয় এই ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে। হিন্দুরা মুসলমানদের মসজিদের সামনে দিয়ে ঢোল বাজনা করলে, মুসলমানরা উত্তেজিত হয়ে তাদের আক্রমণ

[১২৬] . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
[১২৭] . হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০-২১

করে, অন্যদিকে মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়ি ও মন্দিরের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেই হিন্দুরা আক্রমণ করে। একে অপরের ঘর-বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়।

পূর্বেই বলা হয়েছে ধর্মীয় কারণে এই সংঘাত সৃষ্টি হয়নি। উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দ এই অবস্থার সুষ্ঠু মীমাংসাও কিছু কিছু ক্ষেত্রে করার প্রয়াস চালিয়েছেন। এই ক্ষেত্রে গান্ধী ও দেশ বন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাসের নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে। 'হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ও সংঘাতের এরূপ রাজনৈতিক অবস্থায় দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশ বন্ধু চিত্ত রঞ্জন দাস একটি প্রশংসনীয় উদ্যাগ গ্রহণ করেন। উভয় সম্প্রদায়ের বাঙালি নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সহযোগিতায় তিনি একটি চুক্তি রচনা করেন যা 'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে পরিচিত। এই চুক্তিতে মুসলমানদের বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। মুসলিম সমাজে এই চুক্তি বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়। কিন্তু দেশ বন্ধুর অকাল মৃত্যু এবং কংগ্রেস তথা হিন্দু সমাজের বৃহদংশের বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ড় প্যাক্ট বাতিল হয়ে যায়।'[১২৮]

বঙ্গভঙ্গের ঘটনা থেকে মুসলমানরা শিক্ষা নিয়ে যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের জন্ম দিয়েছিল, তাতেও শুরুতে সমস্ড় মুসলিম নেতৃবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেনি। তাঁরা ভেবেছিলেন, কংগ্রেস ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল, এর মাধ্যমেই মুসলমানদের দাবি আদায় করা সম্ভব। কিন্তু আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে মুসলমান নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, কংগ্রেসের সদস্য থেকে বা কংগ্রেসের ভিতরে থেকে মুসলমানদের কোন অধিকার আদায় সম্ভব হবেনা। এর কারণও ছিল সুস্পষ্ট।

কেননা হিন্দু সংস্কৃতি তথা বন্দে মাতরম, রাখীবন্ধন, বীরাষ্টমী, গীতাচর্চা ও শিবাজী উৎসব ইত্যাদির দাপটে ভারতের জাতীয় আন্দোলন হয়ে দাঁড়িয়েছে হিন্দুত্ব কেন্দ্রিক। ধূর্ত সাম্রাজ্যবাদ এখানেই আবিষ্কার করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ।

'ঐতিহাসিক বাস্ড়বতা ও বৈজ্ঞানিক অন্ড়দৃষ্টি বিবর্জিত গান্ধী রাজনীতি এই সমস্যার সার্থক মোকাবেলা করতে পারেনি। এসব কারণে কংগ্রেসের আন্দোলন অধিকাংশ মুসলমানের কাছে প্রতিভাত হয়েছে হিন্দু আন্দোলন রূপে। ফলে তারা কংগ্রেস থেকে দূরে সরে গেছে এবং মুসলিম লিগের ১৯৩৭ (লখনৌ),

১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

১৯৩৮ (পাটনা) এবং ১৯৪০ (লাহোর) সালের অধিবেশনসমূহে ব্রিটিশ শাসনাবসানে ভারতে মুসলিম স্বার্থসংরক্ষণের বিষয়টি মোহাম্মদ আলী জিন্নার নেতৃত্বে ক্রমশ গুরচত্ব পেয়েছে।'[১২৯]

পরবর্তীতে মুসলিম লীগের হাত ধরেই পাকিস্ড়ানের জন্ম (১৯৪৭) হয়। কায়েদ আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বিজাতিতত্ত্ব খাড়া করেন। অবিভক্ত বাংলা নিয়ে নতুন করে গভীর ষড়যন্ত্র হয়। বাংলার মুসলমানরা দ্বিজাতিতত্ত্বকে স্বাগত জানায়।

ভারতবর্ষের মুসলমান নেতৃবৃন্দ জিন্নাহর নেতৃত্বে ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোর প্রস্ড়াব গ্রহণ করেন যা পাকিস্ড়ান প্রস্ড়াব নামেও পরিচিত। এরই পথ ধরে ভারত বর্ষের বিভাজন ও বাংলার বিভাজন হয়। বর্তমান বিভাজন বাংলার প্রস্ড়াব অনুযায়ী হয়নি। বিভাজনের সময় ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বাংলা তার প্রকৃত ভৌগোলিক মানচিত্র হারায়। 'লাহোর প্রস্ড়াব বা পাকিস্ড়ান প্রস্ড়াব মুসলমানদের কাছে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়। এর আগে বাংলায় মুসলিম লিগের তেমন জনপ্রিয়তা ছিল না। পাকিস্ড়ান প্রস্ড়াব গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম লিগ বাংলায় যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। এ ব্যাপারে ফজলুল হকের যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। যদিও জিন্না পরে তাকে মুসলিম লিগ থেকে বহিষ্কার করেন।

মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি গঠনের জন্য লাহোর প্রস্ড়াবের মূল প্রস্ড়াবে বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম এলাকা নিয়ে 'স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ' (independent states) গঠিত হবে। এতে পূর্বাঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি হয়েছিল।

বাঙালি মুসলিম নেতৃত্বের একাংশের কাছে পাকিস্ড়ান পরিকল্পনার অর্থ ছিল এই পরিকল্পনার আওতায় বাংলা হবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু কৌশলী রাজনীতিবিদ জিন্না ও তার বশংবদ ক্ষমতালোভী বাঙালি নেতারা এই আশা পূরণ করতে দেন নি। দিলিণ্ঢতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের এক কনভেনশনে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে লাহোর প্রস্ড়াবের 'independent states' প্রতিষ্ঠার প্রস্ড়াবকে পরিবর্তন করে 'a

[১২৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

sovereign states' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এটিই ছিল পাকিস্তানের প্রথম ষড়যন্ত্র, যার প্রতিক্রিয়া অনেক পরেও লক্ষ করা যায়।'[১৩০]

সমসাময়িককালে রাজনৈতিক ঘটনা মুসলিম সাহিত্যিকদেরও প্রভাবিত করেছিল। তাঁরা সাহিত্য রচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যান। 'সেকালে ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্যালোচনা করে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছিলেন পণ্ডিত রেয়াজউদ্দিন আহমদ মাশহাদী। তাঁর 'সমাজ সংস্কারক' বইটি সেকালের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেরণারূপে কাজ করেছিল।

মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতি কামনা করলেও এঁরা ছিলেন রাজনীতিক, সচেতন, প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী।'[১৩১]

ইসমাইল হোসেন সিরাজী কংগ্রেসের রাজনীতির সাথে জড়িত থেকেও সাহিত্য রচনার মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক মুক্তি চেয়েছিলেন। "ইসমাইল হোসেন সিরাজী মুসলমান সমাজের মাঝে নব-জাগরণ এনেছিলেন। তাঁর 'অনল প্রবাহ' (১৯০০) গ্রন্থে প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চেয়েছিলেন জ্ঞানে ও কর্মে মুসলমান জাতি উন্নতি লাভ করুক। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনা করে মুসলমান জাতি শিক্ষিত হয়ে উঠুক এবং জাতীয় উন্নতিতে অবদান রাখুক।"[১৩২] 'অনল প্রবাহ' গ্রন্থে কবি বাংলার মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে লিখেছেন:

"দেখ একবার ইতিহাস খুলি,
কত উচ্চে তোরা অধিষ্ঠিত ছিলি,
তথা হতে হায়! কেন রে পড়িলি,
নয়ন মেলিয়া দেখ এক বার।
বিস্মৃত হইয়া পবিত্র কোরান,

---

[১৩০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪, Harun –or- Rashid, `The 1940 Lahore Resolution: Bengal ideas of statehood' Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, June, 1994, pp. 59-60, and হারুন-অর-রশীদ, 'অখণ্ড স্বাধনী বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম)*', প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩

[১৩১] . মোঃ জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[১৩২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

হারায়ে একতা হারায়ে বিজ্ঞান,

হায়রে ! এখন হয়ে হীন প্রাণ,

এ বিশ্ব সংসার দেখিস্ আধার!"[১৩৩]

অবিভক্ত বাংলার রাজনীতিতে মৌলানা মনিরচ্জ্জামান ইসলামাবাদীও অসামান্য অবদান রাখেন। 'ধর্মপ্রচার ও সংস্কার কর্মের অভিজ্ঞতা থেকেই মনিরচ্জ্জামান ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনের সূচনা। প–িত মেরাজউদ্দিন ও প–িত রিয়াজউদ্দিন আহম্মদ মাশহাদীই ইসলামাবাদীকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেন। সমাজ সেবক ও রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে তিনি মুসলমান সমাজের দুর্দশার প্রতিকার করার জন্য নানা পরিকল্পনা নিয়ে ভাবতে থাকেন। তিনি মুসলমান সমাজের আহ্বানে বলকান যুদ্ধের সময় খেলাফত আন্দোলনে (১৯২০) জড়িয়ে পড়েন। তখন থেকেই কৃষকের দুর্দশা নিয়ে ভাবতে থাকেন।

মুহম্মদ আব্দুল হাই মন্ড়ব্য করেন: 'তিনি ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক কর্মী, সমাজ সেবক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বক্তা। ১৯২০ সালে তিনি খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। কি করলে মুসলিম জাতি তার হৃত গৌরব ফিরে পাবে সে চিন্ড়াই তাঁর মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তিনি কংগ্রেসের সভ্য হিসেবে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণও করেছিলেন এবং কৃষকপ্রজা আন্দোলনের সঙ্গেও সংশিণ্টষ্ট ছিলেন।'[১৩৪]

ইসলামাবাদী সমাজকর্ম, রাজনীতি ও ধর্মপ্রচার ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলার মুসলিম সমাজের উন্নতি চেয়েছিলেন। "প্রকৃত প্রস্ড়াবে দেশ সেবা ও রাজনীতি-চর্চাকে ইসলামাবাদী পৃথক ভাবেন নি কখনো। গঠনমূলক সবকাজকেই তিনি দেশ সেবা মনে করতেন এবং ধ্যান জ্ঞানেই তিনি সারা জীবনের কর্মী ছিলেন। সমাজ পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর চিন্ড়াবলী সমাজের সর্ব নিম্নস্ড়র পর্যন্ড় স্পর্শ করেছিল।"[১৩৫]

পরিবার থেকে সমাজ আর সমাজ থেকে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক চিন্ড়া। 'রাজনীতি সমাজ চিন্ড়ারই অংশ। বাঙালি মুসলমান ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সমাজ সম্পৃক্ত হয় এবং সমাজ সচেতনতাই তাদের রাজনীতিমুখী করে তোলে। স্বজাতি ও সমাজের কল্যাণ সাধনের সংকল্প কেবল সংস্কারবাদী আন্দোলনে

---

[১৩৩] . সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, *অনল প্রবাহ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪), পৃ. ৩৪

[১৩৪] . মোঃ জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[১৩৫] . মৌলানা মনির–জ্জামান ইসলামাবাদী, "ভূমিকা" *মৌলানা মনির–জ্জামান এছলামাবাদী রচনাবলী ১ম খ–*, মনির–জ্জামান সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

স্ড়িমিত হয়নি। মূলত অধিকার সচেতন মধ্যবিত্তের হাতেই রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে ওঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রাপ্তির আকাঙ্খা কিংবা বঞ্চিতের বোধ রাজনীতি কর্মের উদ্দীপক শক্তি।

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই বাঙালি মুসলমান অনুভব করছিল আত্মাস্বাতন্ত্র্য এবং বঞ্চিত হওয়ার কারণ হিসেবে নির্দেশযোগ্য ছিল ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন। সেই জন্য ১৯০৬ সালে শিক্ষা সম্মেলন থেকে জন্ম নেয় মুসলিম লিগের মত রাজনৈতিক সংগঠনের।'[১৩৬]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গ্রাম বাংলার মুসলমানরা রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন না। কলকাতা ও ঢাকা কেন্দ্রিক কিছু মুসলমান নেতাই ছিল তাদের নীতি নির্ধারক। হিন্দু নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসে অনেক মুসলমান সদস্য থাকলেও মুসলিম লীগ গঠিত হওয়ার পরে অনেক মুসলমানই কংগ্রেস ছেড়ে মুসলিম লীগে চলে আসেন। তবে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুসলমানরা কখনও কংগ্রেসের মাধ্যমে তাদের কোন দাবি-দাওয়া ও সুবিধা ইংরেজ সরকার থেকে আদায় করতে পারে নি। মোট কথা, রাজনৈতিক অধিকার থেকে সে সময়ে নানামুখী ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলমানরা ছিল বঞ্চিত ও শোষিত।

ঘ. অর্থনৈতিক অবস্থা ঃ

ইংরেজরা মুসলমানদেরকে শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে রাখার কারণে, অর্থনৈতিকভাবেও তারা চরমভাবে পিছিয়ে ছিল। ইংরেজরা ২০০ বছরের শাসনের ইতিহাসে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য স্থায়ী কিছু করতে চায় নি। যার ফলে ইংরেজ শাসনামলে শিক্ষা-দীক্ষায় ধীর গতির কিছু উন্নতি থাকলেও মানুষের আর্থিক উন্নয়নে তারা তেমন কল-কারখানা স্থাপন করেন নি। "ইংরাজ এদেশে কলকারখানা স্থাপন করতে চাননি, তাঁরা এদেশের কাঁচা মাল দিয়ে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে মিল চালাতেন।"[১৩৭]

অন্যদিকে, একশালা, পাঁচশালা, দশশালা এবং পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত্বের ফলে জমিদার ভূমি ও জমির প্রজার মালিক হন।[১৩৮] 'বাংলার অধিকাংশ মুসলমান ছিল কৃষিজীবি। ইংরেজের অধীনে চাকুরি করা মানে ইংরেজদের গোলামী করা এই কথা মনে করে অধিকাংশ মুসলমান চাকুরিতে যোগদান করতেন না।

[১৩৬]. মোঃ জামান খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০
[১৩৭]. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
[১৩৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

আবার মর্যাদা হানি হয়, এমন ছোট পেশাও মুসলমানরা গ্রহণ করে নি। এমতাবস্থায় রাজকার্যের চাকুরি হারিয়ে মুসলমানরা কৃষি কাজের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।'[১৩৯]

এই দেশে মোঘল আমল থেকে গ্রামে গ্রামে কুটির শিল্প ও তাঁতের কাজ চলে আসছিল। তাও ইংরেজরা সুচতুরভাবে বন্ধ করে দেয়। 'ইংরাজগণ এদেশের কুটির শিল্প ধবংস করেন, নিজ দেশের পণ্য আমদানির জন্য। তাঁরাই রাজ্যের মালিক, রাজস্বের মালিক, বাণিজ্যের মালিক। ভারতবর্ষের সমস্ড় পুঁজি কোম্পানির জাহাজে করে ইংলন্ডে গেছে এবং সেখানকার পুঁজিপতির উদর স্ফীত করেছে। কোম্পানির শাসনে বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে, জনগণের দুর্দশা চরমে ওঠে। ভারতবাসীর বস্তুগত লাভের চেয়ে ক্ষতি হয় বেশি।'[১৪০]

'নবাব মুর্শিদকুলী খানের সময় বাংলায় তিন চতুর্থাংশ জমিদার এবং অধিকাংশ তালুকদার ছিলেন হিন্দু। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এদেশীয় মুসলমানদের তেমন উৎসাহ কখনো দেখা যায় নি। মর্শিদকুলী খান বহু সংখ্যক হিন্দুকে রাজকর্মচারী হিসেবেও নিয়োগ করেন। কানুনগো বিভাগে কর্মরত সবাই ছিলেন হিন্দু। বড় বড় ব্যবসায়ী ও ব্যাংকারও ছিলেন তারাই। বহিরাগত সুলতান, সুবেদার বা নবাবরা ধর্মান্ড়রিত মুসলমানদের অর্থনৈতিক বা সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাড়তি কোনো সুযোগ সুবিধা দেন নি।'[১৪১]

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলায় মুসলমানদের একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। কিন্তু ইংরেজ সরকার ও প্রতিবেশি হিন্দুদের ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে মধ্যবিত্ত মুসলমানরা বঞ্চিত হয়। আরও মর্মান্ড়িক হলো "১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ ইংরেজি ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত করা, ১৮৬৩ সালে মুন্সেফ, দারোগা ও উকিলের পদের প্রায় অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স অথবা উচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য সংরক্ষিত করা, ১৮৬৪ থেকে সমস্ড় আইন পরীক্ষা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ও ভালো সরকারি পদ লাভের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা, ১৮৬৬ সালে কেবল আইনের

---

১৩৯ . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১৪০ . প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

১৪১ . হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৮, N.K. Sinha, *The economic history of Bengal, p.101*

গ্রাজুয়েটদের মুন্সেফ হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচনা করা ইত্যাদি ব্যবস্থার ফলে শিক্ষিত হিন্দুরাই লাভবান হয়।”[১৪২]

১৯৪৭ সালের আগে কলকাতা কেন্দ্রিক অনেক কলকারখানা গড়ে ওঠলেও বর্তমান বাংলাদেশ বা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় তেমন কোন কল-কারখানা স্থাপিত হয় নি। ‘উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বস্ত্রশিল্পের সাথে সাথে পাটের ব্যবসায়েরও উন্নতি হয়। কলকাতা থেকে নৈহাটি পর্যন্ড় গঙ্গার উভয় পাশে বহু চটকল স্থাপিত হয়। এসব কলের জন্য কাঁচামাল আসত পাটের দেশ পূর্ব বাংলা থেকে, অথচ বিভাগ পূর্বকালে সেখানে একটিও পাটের কল বসে নি বা স্থাপিত হয়নি। মূলত কলকাতাকেই কেন্দ্র করে এ শিল্পের প্রসার ঘটেছিল। বিভাগ পূর্বকালে পূর্ব বাংলায় বাণিজ্যিক কোন ব্যবস্থা প্রায় গড়েই ওঠে নি। মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অনুন্নতির এ-ও এক কারণ।’[১৪৩]

পবিত্র কুরআনে সুদকে হারাম করা হয়েছে। যার ফলে, মুসলমানরা নিজেদের সুদ থেকে দূরে রাখেন। এ দূরে থাকাটা ব্রিটিশ আমলে মুসলমানদের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার কারণ বলে অনেকে উলেণ্ডখ করেছেন। “বস্তুতই মুসলিম সমাজে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সুদ সমস্যা ছিল একটি বড় সমস্যা। ধর্মবিধির কারণে তারা সুদ-ব্যবসা থেকে দূরে থেকেছে। অথচ জীবনের প্রয়োজনে তাকেই আবার হিন্দু মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদের ঋণ নিয়ে নিজেদের দুরবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে হয়েছে। এ ব্যাপারে কৃষক থেকে জমিদার পর্যন্ড় সকলেই হিন্দু মহাজনের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছে।”[১৪৪]

যদিও সেই সময়ে কিছু প্রগতিবাদী আলেম ব্যাংকিং সুদকে আলাদা করে হালাল ‘ফতোয়া’ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ব্যাংকিং সুদকে হালাল বলে ‘ফতোয়া’ দেয়ার কারণে আলেম সমাজে তাঁকে নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়েছিল।[১৪৫] মোটকথা, ব্রিটিশ আমলে বাংলার মানুষ খেয়ে-না-খেয়ে কায়-ক্লেশে জীবন কাটিয়েছে। “কৃষি ও শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতিতে সচলতা আসতে পারে না, যদি না উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ এবং সীমাবদ্ধ পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে

---

[১৪২] . হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯,

[১৪৩] . হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯, ‘*মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

[১৪৪] . হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[১৪৫] . *মৌলানা মনির‍ুজ্জামান এছালামাবাদী রচনাবলী ১ম খন্ড*, মনির‍ুজ্জামান সম্পা'. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮

কুটির শিল্প সমাজের অর্থনৈতিক বিপণ্ডব ঘটাবার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। তবে স্বল্পতুষ্ট গ্রামীণ সমাজের চাহিদা এতে মিটে যেত।”[১৪৬]

একদিকে মুসলমানদের দরিদ্রতা, অন্যদিকে ইসলাম ধর্মীয় নির্দেশ পালন, হারাম বর্জন, সুদ বর্জন, ইসলামের শত্রচ ইংরেজদের সাথে সুসম্পর্ক সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনীহা ইত্যাদি কারণে মুসলমানদের অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। অর্ধাহারে-অনাহারে কেটেছে তাদের জীবন। অর্থনৈতিক উচ্চাভিলাষ তো দূরের কথা।

ঙ. সাহিত্য চর্চা ঃ

ইংরেজ আমলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৈন্যের মতো সাহিত্য ও সংস্কৃতিতেও দৈন্যতা ছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরচতে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্য ও সংস্কৃতির জাগরণ শুরচ হয়। বিশেষ করে ইসলামী সাহিত্য নিয়ে এক ঝাঁক মুসলিম সাহিত্য চর্চা শুরচ করেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ইংরেজ আমলে মুসলমানদের পিছিয়ে থাকার কারণ হিসেবে অনেক গবেষক ‘ইংরেজির প্রতি মুসলমানদের অনীহা’র ভাবকে দায়ী করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ ও ইসলামী ভাবধারা নিয়ে সাহিত্য রচনার অনেক উদ্যোগ দেখা যায়। ইসলামী ভাবধারা নিয়ে সাহিত্য রচনার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হচ্ছে, হিন্দুদের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী সাহিত্য রচনা।

বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম এই ঘৃণ্য আদর্শটি স্থাপন করেন তাঁর রচিত ‘দুর্গেশ নন্দিনী’র মাধ্যমে। ‘একদিকে এই প্রতিবাদের সুর তুলে এবং অপর দিকে সমাজ সংগঠনে হিন্দুয়ানি উপাদান বর্জন করে সে স্থলে ইসলামী উপাদান আমদানী করে ‘জাতীয় সাহিত্য’ নির্মাণের আন্দোলন করেছেন তাঁরা। সামাজিকভাবে মিলতে না পারলে সাহিত্যেও মিলন হয় না।

রবীন্দ্রনাথ সে যুগের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের কথাটি এভাবে বলেছেন, ‘আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানি অকস্মাৎ নারদের অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা নবোপার্জিত আর্য অভিমানকে সজারচ শলাকার মত আপনাদের চারিদিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন;

---

[১৪৬]. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

কাহারো কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। হঠাৎ বাবুর বাবুয়ানার মত তাঁহাদের হঠাৎ হিন্দুয়ানি অত্যন্ড় অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

উপন্যাসে, নাটকে, কাগজপত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাঙ্গালা শিখিতেছেন এবং বাঙ্গালা লিখিতেছেন। সুতরাং স্বভাবতই একপক্ষ হইতে ইট এবং অপর পক্ষ হইতে পাটকেল বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে।'[১৪৭]

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে হিন্দুয়ানি রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং এর সাথে স্কুল-কলেজসহ সমস্ড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে হিন্দুদের পৌত্তলিক সাহিত্য অন্ডর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা অধ্যয়ন করতে মুসলমান ছাত্ররা বাধ্য ছিল। এই কঠিন পরিস্থিতির বর্ণনা দিতে গিয়ে নওয়াব আবদুল লতিফ বলেনঃ "স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্ড়ক হতে ইসলাম বিরোধী বিষয়গুলো দূর করতে হবে, গ্রামের মুসলমানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে হবে কিন্তু সে বাংলায় আরবী-ফারসী শব্দের আমদানী করতে হবে।

আমীর আলী সরকারি অনুগ্রহ বন্টনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সুবিধা দাবি করেন। মুসলমান সমাজপতিদের এরূপ মনোভাবকে পুঁজি করে মুসলমান লেখক সাংবাদিকগণ সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।"[১৪৮]

ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য যেন বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যে ফুটে ওঠে এবং হিন্দু রচিত পৌত্তলিক সাহিত্য থেকে বাংলার মুসলিম সাহিত্য যেন সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে সেই দিকে ইঙ্গিত করে মাসিক 'মোহাম্মদী'তে লেখা হয়ঃ "জাতীয় সাহিত্যের অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। গত এক শত বৎসর ব্যাপিয়া পৌত্তলিক হিন্দুয়ানী ও মুসলিম বিদ্বেষী সাহিত্যই আমাদের কওমকে এত গয়ের ইছলামী করিয়া ফেলিয়াছে।"[১৪৯]

---

১৪৭ . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-'হিন্দু ও মুসলমান', সাধনা, চৈত্র, ১৩০১, The Indian Middle Class, p.17

১৪৮ . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

১৪৯ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫, মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, 'আমাদের জাতীয় ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার', মাঘ, ১৩৩৬, মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

সাহিত্যিক গোলাম মোস্ড়ফা (১৮৯৭-১৯৬৪) বলেনঃ “অতীত যুগের মুসলিম জ্ঞান-কর্ষণার যে আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল, আমাদিগকেও সেই আদর্শে ও লক্ষ্যে চলিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের দুইটি দিক থাকিবে, একদিকে ‘দীন’ আর একদিকে ‘দুনয়া’। সেটি সম্ভব হচ্ছেনা বলেই অর্থাৎ ইসলাম বাংলা সাহিত্যের মনি-কোঠায় আপনার স্থান করে নিতে পারছে না বলেই একজন লেখকের ধারণায় বাংলার মুসলমান সামনে অগ্রসর হওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছে না।”[১৫০]

হিন্দু ও মুসলিম সাহিত্যিকদের দ্বন্দ্ব নিরসনের যুক্তি দেখিয়ে জনৈক সাহিত্যিক বলেনঃ “আজও পর্যন্ড় হিন্দু সাহিত্যিকগণ মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া অনেক কথা লিখিতেছেন। বহুকাল তো লিখিয়া আসিয়াছেন, এখনও পর্যন্ড় লিখিতে ছাড়িতেছেন না। যদিও বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পূর্ববর্তী সকল লেখকই এরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে আমরা তত দুঃখিত নহি। কিন্তু আজিকালি সাহিত্যিক মিলন, রাজনৈতিক মিলন, জাতীয় মিলন প্রভৃতি মিলনযুগে যদি ঐরূপ লিখিত হয়, তাহা হইলে মিলন সুদূর পরাহত।

যদি কোন হিন্দু লেখক বলেন যে, মুসলমানেরাও হিন্দু-ঘৃণাজনক বাক্য লিখিয়া থাকেন। আমি বলিতে পারি, ওরূপ লিখিতে তাঁহারা শিখিয়াছেন হিন্দুদিগের নিকট। তাঁহারা যাহাতে ওরূপ না লিখেন তজ্জন্যও চেষ্টা করা চাই। জাতীয় কুৎসায় জাতীয় উন্নতি হয় না, বরং বিচ্ছেদ আরও ভীষণ ভাব ধারণ করে।”[১৫১]

অবিভক্ত বাংলায় ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশে বিভিন্ন ধরনের সভা-সমিতি ও সংঘ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংঘ সমূহ ইসলামী সাহিত্য রচনায় সাহিত্যিকদের বিভিন্নভাবে উদ্বুদ্ধ করে। ‘পাকিস্ড়ান রেনেসাঁ সোসাইটি’ ও ‘পূর্ব পাকিস্ড়ান সাহিত্য সংসদ’ ইত্যাদি সংঘ অন্যতম। ডক্টর ওয়াকিল আহমদ তাঁর গবেষণায় এরূপ কতকগুলো সংঘ ও সভা-সমিতির নাম উলেণ্টখ করেছেনঃ ‘আঞ্জমন ইসলামী’,‘মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি’ (১৮৬৩), ‘মাদ্রাসা লিটারেরী এন্ড ডিবেটিং ক্লাব’(১৮৭৫), ‘সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন’(১৮৭৮), ‘সমাজ সম্মিলনী সভা’(১৮৭৯), ‘ঢাকা মুসলমান সহৃদ সম্মিলনী’(১৮৮৩), ‘নূর-অল-ইমান সমাজ’(১৮৮৪), ‘সাতক্ষীরা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী’(১৮৮৮), ‘এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা’(১৮৮৯), ‘আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলাম’(১৮৯১), আঞ্জমনে মঈনাল এসলাম’(১৮৯১), ‘রঙ্গপুর নূরচ্ল ইমান জামায়াত’(১৮৯১), ‘কলিকাতা মহামেডান

[১৫০] . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫, মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য’ মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৩৪, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭, সৈয়দ এমদাদ আলী, ‘বাঙ্গালার মুসলমান সাহিত্য সেবীগণের প্রতি’, সাম্যবাদী, কার্ত্তিক, ১৩৩২, সাম্যবাদী সাময়িকপত্রে, পৃ. ২৫৫

[১৫১] . হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

ইউনিয়ন’ (১৮৯৩), ‘মোহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন’ (১৮৯৬), ‘আঞ্জমনে আশ-আতে ইসলাম’(১৮৯৬), ‘ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা’, ‘বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ন মুসলমান সমিতি’(১৮৯৯), ‘সুবার্বন মহামেডান এসোসিয়েশন’(১৮৯৯), ‘আঞ্জুমনে নুরুল ইসলাম’(১৮৯৯), ‘মোসলমান শিক্ষা সভা’(১৮৯৯), ‘কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা’, ‘মোসলেম ইনস্টিটিউট’(১৯০২), ‘বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি’(১৯০৩), ‘বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি’(১৯০৪), ‘আঞ্জমনে মফিদুল ইসলাম’, ‘মেদেনীপুর মোসলেম সোসাইটি’, ‘মোহামেডান লিটারেরী একাডেমী’, আঞ্জমনে ইসলামিয়া’ ।[১৫২]

ডক্টর শহীদুল ইসলাম নূরীও তাঁর গবেষণায় আরও কিছু সংগঠনের নাম উলেণ্টখ করেনঃ ‘যশোহর খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতি’(১৯১১), ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি’(১৯১১), ‘আল হেলাল সাহিত্য সমিতি’(১৯২৪), ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’(১৯২৬), ‘পূর্ববঙ্গ সাহিত্য সমাজ’(১৯৩১), কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট(১৯৩৬), ‘পূর্ব পাকিস্ড়ান সাহিত্য সংসদ’ (১৯৪২), পাবনা আঞ্জুমানে ইসলামিয়া’, ‘আঞ্জুমানে-ই-এত্তেফাক ইসলাম’, ‘আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম’, ‘আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে বাঙ্গালা’, ‘ ‘আঞ্জুমানে ওলামায়ে বাঙ্গালা’, ‘আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম বাঙ্গলা’, ‘ইসলাম মিশন’, ‘আঞ্জুমানে সুফি এ বাঙ্গলা’, ‘আঞ্জুমানে তরকীয়ে কওম বাঙ্গলা’, ‘আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে কারামাতিয়া’, ‘আঞ্জুমানে ইসলামিয়া, মাগুরা, যশোর, ‘আঞ্জুমানে-ই-ইশা‘আৎ-ই-ইসলাম’ ।[১৫৩]

সমসাময়িককালে পত্রপত্রিকার মাধ্যমেও ইসলামী সাহিত্য ও ভাবধারা নিয়মিত প্রচারিত হয়। এরূপ কিছু পত্রিকা হচ্ছেঃ “মহম্মদি আখবার’(১৮৭৭), ‘আখবারে এসলামীয়া’(১৮৮৪), ‘মুসলমান বন্ধু’(১৮৮৪), ‘আহমদী’(১৮৮৬), ‘সুধাকর’(১৮৮৯), ‘হিতকরী’(১৮৯০), ‘ইসলাম প্রচারক’(১৮৯১), ‘মিহির’(১৮৯২), ‘মিহির ও সুধাকর’(১৮৯০/১৮৯৫), ‘হাফেজ’(১৮৯২), ‘কোহিনূর’(১৮৯৮), ‘প্রচারক’(১৮৯৯), ‘লহরী’(১৯০০), ‘নূর-অল-ইমান’(১৯০০), ‘নবনূর’(১৯০৩)। [১৫৪] ‘মোসলেম হিতৈষী’, ‘আল-এসলাম’, ‘মসজেদ’, ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’, ‘ইসলাম দর্শন’, ‘মোয়াজ্জিন’, ‘আল-ইসলাহ’, ‘বাসনা’, ‘সওগাত’, ‘বঙ্গনূর’, ‘মোসলেম ভারত’, ‘সহচর’, ‘শিশু সওগাত’, ছোলতান’,

---

[১৫২] . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. তের- চৌদ্দ

[১৫৩] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, *বাংলার মুসলিম নবজাগরণ (১৯০৫-১৯৪৭)* (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৬), পৃ. ১১-১২

[১৫৪] . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. পনের

'মাসিক মোহাম্মদী', 'নওরোজ', 'বুলবুল'।[১৫৫] উপরোলেণ্ডখিত সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে ইসলামী সাহিত্য চর্চা ছড়িয়ে পড়ে। অবিভক্ত বাংলার সাহিত্য জগতে দুটি ধারা সৃষ্টি হয়। হিন্দু সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্য বা মুসলিম সাহিত্য।

শেষোক্ত ধারায় বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা গুরচ্চত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, তাঁদের মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্য হচ্ছেন- মুন্সী মহম্মদ মেহেরউলণ্ডা (১৮৬১-১৯০৭), গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০), আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), মৌলানা মুহম্মদ নইমুদ্দিন (১৮৩২-১৯১৬), দীন মুহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯১৬), শেখ আবদুল জব্বার (১৮৮১-১৯১৮), রেয়াজ আলদীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) টাঙ্গাইল , সফিউদ্দীন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২), মুহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩), নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪), খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), খান বাহাদুর তসলীমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭), সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), শেখ মোহাম্মদ জমিরচ্দ্দিন (১৮৭০-১৯৩০), সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯৩০), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) বরিশাল, শেখ ফজলল করিম (১৮৮৩-১৯৩৬), দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬), ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৪০), আবদুল করিম (১৮৬৩-১৮৪৩), আবদুল বারী কবিরত্ন (১৮৭৩-১৯৪৪), মোহাম্মদ মনিরচ্জ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), রেভারেন উইলিয়ম গোল্ডসেক (১৮৬১-১৯৫০), কাজেম আল কোরায়শী কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯ / ১৮৭১-১৯৫৩), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬), মুহাম্মদ আবদুল হাকিম (১৮৭৬-১৯৫৭), শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২), মুহাম্মদ সেরাজুল হক (১৯০৩-১৯৬৩), কাজী আকরম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩), খান বাহাদুর আবদুর রহমান (১৮৮৯-১৯৬৪), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) বেগম শামসুননাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪), খান বাহাদুর আহছানউলণ্ডা (১৮৭৩-১৯৬৫), গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৫), মুহাম্মদ হাবীবুলণ্ডাহ বাহার চৌধুরী

[১৫৫] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০-১১

(১৯০৬-১৯৬৬), মৌলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মুহাম্মদ এমদাদ আলী (১৮৯১-১৯৬৯), ড. মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) (১৮৯৮-১৯৬৯), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবদুল মওদুদ (১৯০৮-১৯৭০), নূর মুহাম্মদ আযমী (১৯০০-১৯৭২), ফররচ্খ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), মোহাম্মদ বরকতুলণ্ঢাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), কাজী নজরচ্ল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা (১৯০০-১৯৭৭), শামসুর রহমান চৌধুরী (১৯০২-১৯৭৭), প্রিন্সিপাল ইবরাাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), ডক্টর এম আবদুল কাদের (১৯০৬-১৯৮৪), শইখ শরফুদ্দীন (১৯০০-১৯৮৪), মুজিবর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪) প্রমুখ। পরবর্তী অধ্যায়ে তাঁদের পরিচিতি ও রচনাবলী সম্পর্কে আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইসলামী সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (১৯০১-১৯৫০)

মুসলিম লেখক ও সাহিত্যিকদের রয়েছে বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবন যা কালের প্রবাহে ঢাকা পড়ে গেছে। আমাদের উদাসীনতা ও অসচেতনতার কারণে এ গুণীজনদের নাম আজ ইতিহাস থেকে মুছে যাচ্ছে।

কুরআন, হাদীস, ফিক্হ বা ইসলামী বিধি-বিধান ও ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন চরিত ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অগণিত মনীষী এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। ইসলামী সহীহ আকীদা-বিশ্বাস সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত সাহিত্যিকগণ আজীবন নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। থিসিসের পরিধি ছোট করার লক্ষ্যে আলোচ্য অধ্যায়ে স্বল্প সংখক ইসলামী সাহিত্যিক ও গ্রন্থকারের পরিচয় তোলে ধরছি ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ১৯০১-১৯২০ ঃ

১. মুন্সী মহম্মদ মেহেরউলণ্ঢা (১৮৬১-১৯০৭) ঃ

উনিশ শতকের শেষ দিকে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের মধ্য থেকে স্বীয় মেধা ও পরিশ্রমের ফলে যে বিপণ্ঢবী সমাজ সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে তাঁর নাম মুন্সী মহম্মদ মেহেরউলণ্ঢা। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সমাজ-সংস্কারক, বক্তা ও ধর্মপ্রচারক। যশোর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার ঘোপ গ্রামে **১৮৬১** সালের ২৬ ডিসেম্বর মাতুলালয়ে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস একই এলাকার ছাতিয়ানতলায়। তাঁর পিতার নাম মুনসী ওয়ারেছউদ্দীন।

অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বঞ্চিত মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন যখন কূটকৌশলী ও ষড়যন্ত্রকারী খ্রিস্টান পাদ্রীদের থাবায় বিপন্ন, যখন মিষ্টি-মধুর বাক্য দ্বারা সহজ-সরল দরিদ্র মুসলমানদের খ্রিস্টান বানানোর পাঁয়তারা চলছিল, ঠিক তখনই মহান আলণ্ঢাহ এই কর্মবীরকে বর্তমান যশোর জেলায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ও লেখক হিসাবে পাঠান। তিনি ছিলেন এক অসাধারণ বাগ্মী ও সাহিত্য দরদী ব্যক্তিত্ব। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্ড়ব ও গঠনমুখী। সভা-সমাবেশ ও বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্ম প্রচার এবং খ্রিস্ট ও হিন্দু ধর্মের অসারতা প্রমাণ তাঁর মৌলিক পেশা ছিল।

ঐতিহাসিকদের মতে খ্রিস্টান মিশনারিদের সাথে সংঘর্ষের ফলেই তাঁর সাহিত্য ও লেখনী প্রতিভার জাগরণ ঘটে। "মুনসী মেহেরউলণ্ঢাহ সাহিত্যিক ছিলেন না। সাহিত্য সৃষ্টির জন্যও তিনি গ্রন্থ রচনা করেন নি। খ্রিস্টান পাদ্রীদের অযৌক্তিক ও আক্রমণাত্মক প্রচারণার জবাব দিতে এবং খ্রিস্ট ও হিন্দু ধর্মের অসারত্ব প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই তিনি গ্রন্থগুলো রচনা করেন।"[১৫৬] মেহেরউলণ্ঢা যে কয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন তার সবগুলোই ধর্ম ও সমাজ উন্নয়নমূলক গ্রন্থ ছিল। যেমন: 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা' (১৮৮৭),

[১৫৬] হোসেন মাহমুদ, *বাঙালি মুসলমানদের আলোকবর্তিকা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫) পৃ. ১১

'বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভা ার' (১৮৯৪), 'রদ্দে খ্রীস্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম' (১৮৯৫), 'মেহেরচ্ল এসলাম' (১৮৯৭), 'জয়াবোন্নাসারা' (১৮৯৮), 'হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা' (১৮৯৮), 'খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' (১৯০১) 'ইসলামী বক্তৃতামালা' (১৯০৮), 'কারামতিয়া মাদ্রাসা' (১৯০১) ও 'সাহেব মুসলমান' (১৯০১)।

খ্রিস্টানদের অপপ্রচারের বিরচদ্ধে মেহেরউলণ্ঢার প্রথম লিখিত পুস্ড়ক 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা'। খ্রিস্টধর্মের পাদ্রীদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন তিনি এই পুস্ড়কে। "ষোল পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্ড়িকায় লেখক প্রধানত খ্রিস্টীয় ধর্মের অসারতা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পান। তিনি খ্রিস্টধর্মের প্রচারকদের পরধর্ম অসহিষ্ণুতার নিন্দা করেন এবং খ্রিস্টধর্ম যে অনেক অনাচারকে প্রশ্রয় দিয়েছে-তা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে প্রচার করেন।"[১৫৭]

সেই সময় ইংরেজ শাসকদের প্ররোচনায় ইসলাম ধর্মের মেরচদ ে আঘাত হানে খ্রিস্টান মিশনারিগণ। যার ফলে "খ্রিষ্টান মিশনারীদের ইসলাম বিরোধী আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য এ গ্রন্থ লেখা হয়েছে। এতে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা হয়েছে।"[১৫৮] 'রদ্দে খ্রীস্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম' তাঁর সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এবং খ্রিস্ট ধর্ম যে অসার অলীক তা প্রমাণ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব, মানবিকতা ও কালজয়ী বৈশিষ্ট্য সমূহ দেখানো হয়েছে। এ জন্য লেখক বাইবেলসহ খ্রিস্ট ধর্ম সংক্রান্ড় অন্যান্য পুস্ড়ক-পুস্ড়িকা থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।[১৫৯] তিনি তাঁর লেখনীতে খ্রিস্টানদের ছাড় দিয়ে কথা বলেন নি। "ধোঁকাবাজ ঈসাইগণ, কোরাণ অনভিজ্ঞ মুসলমানদিগের নিকট পবিত্র কোরাণের আয়াত লইয়া, এবম্বিধ কত শত 'মন পোলাও' পাকাইয়া থাকেন, তাহার ইয়াত্তা করা যায় না।"[১৬০]

মেহেরউলণ্ঢা সম্পর্কে প্রফেসর আনিসুজ্জামান বলেন, "তিনি হাজার হাজার লোককে ইসলাম দীক্ষা দিয়েছেন। যে সময়ে খৃস্টান ধর্মপ্রচারকদের তীব্র সমালোচনায় ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ লোকসাধারণ

---

[১৫৭] আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ* (ঢাকাঃ অনন্যা, ২০১১) পৃ.১৩৪

[১৫৮] মুন্সী মেহেরউলণ্ঢা, *মুন্সী মেহেরউলণ্ঢা রচনাবলী প্রথম খ*, নাসির হেলাল সম্পা (ঢাকাঃ সুর্হৃদ প্রকাশন, ২০০৩), পৃ. ১৪ (ভূমিকা)

[১৫৯] মুন্সী মেহেরউলণ্ঢা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[১৬০] . প্রাগুক্ত, দ্বিতীয় খ পৃ. ৬২

ধর্মান্ড়রের দিকে ঝুঁকেছিল, মেহেরচলণ্ঢাহ্ তাঁর স্বল্প বিদ্যা, অমিত উদ্যম ও অসাধারণ বাগ্মিতার সাহায্যে মিশনারীদের সম্মুখীন হয়ে বাঙালী মুসলমানদেরকে সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন।”[১৬১]

মেহেরউলণ্ঢার সমসাময়িককালে একই নামের আরো দুইজন ইসলাম বিষয়ক লেখকের নাম পাওয়া যায়। এঁদের একজন সিরাজগঞ্জের অধিবাসী মুহম্মদ মেহেরচলণ্ঢাহ সানী (১২৬২-১৩২৭ বাংলা), অপরজন খুলনার মুন্সী মুহম্মদ মেহেরচলণ্ঢাহ, যাঁর জন্ম-মৃত্যু তারিখ এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। তবে উভয়ের রচিত সুপরিচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ‘ইসলামী বক্তৃতামালা’ (১৩১৫ বাংলা) ও ‘ইসলাম কৌমুদী’ (১৯১৪)।

২. গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০)ঃ

গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৩৪ সালে বাংলাদেশের বর্তমান নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাধব রায় এবং দাদার নাম রাম মোহন রায়; যিনি ফার্সী ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। তিন ভাই ও তিন বোনের মধ্যে সেন ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ।[১৬২] পিতা মাধব রায়ের হাতেই গিরিশচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়।

১৮৭৬ সালে গিরিশচন্দ্র সেন আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য ৪২ বছর বয়সে তৎকালীন ভারতের লক্ষ্ণৌ গমন করেন। ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রচারক ও পূর্ণাঙ্গ কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদকারী জনাব সেন অনেকগুলো হাদীস গ্রন্থ অনুবাদের পাশাপাশি ইসলামী বিধিবিধান ও ধর্মীয় নীতিমালা বিষয়ে বেশ কিছু বই অনুবাদ করেন এবং টিকা টিপ্পনি লিখেন। অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন একজন সাহিত্যিক যার পরিশ্রম ও সাধনার ফলে বাংলা ভাষায় ইসলাম বুঝার পথ অনেক সহজ হয়। বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থ মেশকাত শরীফের প্রথম বাংলা অনুবাদক ও প্রকাশক এর কৃতিত্বও এ সাধকেরই।

ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি অনেক বই পুস্ড়ক লিখেছেন। ‘ধর্ম ও নীতি’, (১৮৭৩) ‘ধর্ম-বন্ধু’, (১৮৭৬) ‘নীতিমালা’ (১৮৭৭) (উর্দু গ্রন্থ আকসিরে হেদায়েত থেকে অনূদিত),‘দরবেশদিগের ক্রিয়া’ (১৮৭৮) ‘দরবেশদিগের সাধন প্রণালী’, (১৮৮০) ‘তত্ত্ব-কুসুম’, (১৮৮২)‘তত্ত্বরত্নমালা’(ধর্ম) (১৮৮২), ’হিতোপাখ্যানমালা’ (১৮৭১), ’তাপসমালা’ (১৮৮০), ’কোরআন শরীফ’ (১৮৮০-১৮৮৬), ’মহাপুরুষ

[১৬১] . আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ১৯৯৯) পৃ. ২৬১-২৬২

[১৬২] . ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯) পৃ. ৫১

চরিত' (১৮৮৩), 'হাদিস পূর্ববিভাগ' (১৮৯২) ইত্যাদি গ্রন্থ ইসলামী বিধিবিধান ও সংস্কৃতির উপর রচিত তাঁর অমর রচনা ।

৩. আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০)ঃ

টাঙ্গাইল জেলার চাড়ান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পেশায় সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। ইউসুফজয়ী চিন্তা ও কর্মে ছিলেন সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের সহযোগী। তিনি 'আহমদী' (১৮৮৬) নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদন করতেন। গো-হত্যা ও হানাফী-লা-মাযহাবী প্রশ্নে 'আহমদি' এবং টাঙ্গাইলের আরেকটি পত্রিকা 'আখবারে ইসলামীয়া'র মধ্যে তর্ক-বিতর্ক, বিরোধ ও মামলা-মোকদ্দমা তৎকালীন সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 'সারসংগ্রহ' (১৮৮৭) তাঁর বিখ্যাত রচনা।

৪. মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)ঃ

ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক মীর মশাররফ হোসেন বর্তমান কুষ্টিয়া জেলার অন্তর্গত লাহিনী পাড়া গ্রামের এক সৈয়দ পরিবারে ১৯৪৭ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোয়াজ্জেম হোসেন। উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের পথিকৃত মশাররফ ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, আত্মজীবনী ও প্রবন্ধ ইত্যাদি বহু বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেন। "১৯০৫-৪৭ পর্যন্ত সময়কালে যে সকল কবি সাহিত্যিকের সুচিন্তিত অভিমত নিরন্তর কর্মপ্রয়াস ও কর্মধারা বাংলার মুসলিম জাগরণে ব্যাপক ও বহুমুখী অবদান রেখেছে মীর মশাররফ হোসেন তাঁদের পুরোধা ব্যক্তিত্বরূপে আবির্ভূত হন। ১৮৪৭ হতে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ বছর মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সার্থকভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করেন।"[১৬৩] ইসলাম বিষয়ে তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-১৮৯১), 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৩), 'বিবি খোদেজার বিবাহ' (১৯০৫), 'হযরত ওমরের ধর্ম জীবন লাভ' (১৯০৫), 'মদিনার গৌরব' (১৯০৬), 'হজরত ইউসুফ' (১৯০৮), 'ঈদের খোৎবা' (১৯০৯), 'এসলামের জয়' (১৯০৮) ও 'মোসলেম বীরত্ব' (১৯০৭)। তিনি ১৯১২ সালে ইনতিকাল করেন।

৫. মৌলানা মুহম্মদ নইমুদ্দিন (১৮৩২-১৯১৬)ঃ

---

[১৬৩] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, *বাংলার মুসলিম নবজাগরণ (১৯০৫-১৯৪৭)* (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬), পৃ. ৩১

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আরেকজন আলোচিত মুসলিম মনীষীর নাম হচ্ছে মৌলানা মুহম্মদ নইমুদ্দিন। আরবী ভাষার সারবস্তু বাংলাতে অনুবাদের জন্যে তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। "বহুদিন যাবৎ অন্তঃকরণে আশা ছিল যে অতি সরল বঙ্গভাষায় বহু বার মূল নিয়মগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করি, যাহাতে বালক, বৃদ্ধা, যুবা সকলেরই উপকার হয়"[১৬৪] তিনি একজন বিখ্যাত বক্তা ও গ্রন্থকার ছিলেন। তাঁর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'জোব্দাতুল মসায়েল', ১ম খণ্ড (১৮৭৩) সমসাময়িককালে মুসলিম সমাজে বেশ কদর পায়। লেখক বেশ শ্রম ও সাধনা দিয়ে বইখানি সমাজে উপহার দেন।

লেখক নিজেই বলেছেন: "এই 'জোব্দাতুল মসায়েল' অর্থাৎ মুসলমানী ব্যবস্থা শব্দের সার সংগ্রহে কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ করি নাই, বরং শরে বেকায়া, হেদায়া, কাজীখান, জামেয়রমুজ, কামুজ, আলমগিরি, দোররোল মুখতার প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করত লিখিত হইল। যে যে নিয়মগুলি এদেশের পক্ষে অনাবশ্যক বুঝিলাম তাহা পরিত্যাগ করা গেল"[১৬৫]। তিনি মোট চার খণ্ডে ফতুয়ায়ে আলমগিরী অনুবাদ করেন (১৮৮৪-১৮৯২), যা বাদশা আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সমাজ ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে রচিত একটি বিখ্যাত ইসলামী আইন গ্রন্থ। তাঁর আরেকটি আকায়েদ বিষয়ক গ্রন্থ হচ্ছে 'কালেমাতুল কুফর' (১৮৯১), যাতে মুসলমানদের আদব-কায়দার কথা বলা হয়েছে। 'কিরূপ কথাবার্তা, আচরণ ও মনোভাব মুসলমানকে কাফেরে পরিণত করে, এতে তারই নির্দেশ আছে'[১৬৬]।

তিনি হানাফী মাজহাবে বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও তৎকালীন মুসলমানদের ভ্রান্ত আকীদার বিরুদ্ধে লিখিত তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছে: 'ইনসাফ' (১৮৮৬), 'ধোকা ভঞ্জন' (১৮৮৯), 'গো-কাণ্ড'[১৬৭] (১৮৮৯), 'সেরাতুল মস্তকিম' (১৮৯৩), 'আদেল্লায়ে হানিফিয়া রদ্দে-লা মজহাবিয়া' (১৮৯৪), 'রফ-ইয়াদাইন' (১৮৯৬), ও 'ধর্মের লাঠি' ইত্যাদি।

---

[১৬৪] মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)*, মোমেন চৌধুরী সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৪) পৃ.৩২৭

[১৬৫] মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

[১৬৬] ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.২৪০

[১৬৭] The Cow affair "Mir Masharuf Hossain published an article in the Ahmadi newspaper on the subject of the prospects of the extinction of the Cow species. This evoked much controversy all over Bengal. The author wrote some articles against Mir Masharuf's theories and learned muhammadans gave their opinions against the Mir, some of these articles were published by the Mir, but the most important articles were omitted from that

৬. দীন মুহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯১৬)ঃ

মৌলভী দীন মুহাম্মদ একজন খ্যাতনামা বক্তা ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাম ছিল মনোরাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। ঢাকা জেলার নারায়নগঞ্জ মহকুমার ডেমরা গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনী সম্পর্কে খুব বেশি জানা যায় না। তবে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর ধর্মসভায় বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দেয়ার পেশা দীর্ঘ দিন পালন করেছেন, যা বিভিন্ন বই-পুস্ড়কে উলেণ্টখ রয়েছে।[১৬৮] 'ক্রুসেড ও জেহাদ' (১৯০৮) তাঁর বিখ্যাত রচনা। জেরুজালেম দখল নিয়ে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয় তার বর্ণনা এই গ্রন্থে বিস্ড়ারিত রয়েছে।

৭. শেখ আবদুল জব্বার (১৮৮১-১৯১৮)ঃ

সমাজ সেবক ও সাহিত্যিক হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন শেখ আবদুল জব্বার। ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলায় তাঁর জন্ম। লেখকের সমস্ড় রচনাবলীই ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে লিখিত। 'হযরতের জীবনী ও দেবী রাবেয়া' শিরোনামে লিখিত তাঁর বইখানি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক উচ্চমাধ্যমিক পাঠ্যতালিকায় দীর্ঘদিন অন্ড়র্ভুক্ত ছিল। 'মক্কা শরীফের ইতিহাস' (১৯০৬), 'মদীনা শরীফের ইতিহাস' (১৯০৭), 'ইসলামী সঙ্গীত' (১৯০৮), 'আদর্শ রমনী' (১৯০৯), 'জেরুজালেম বা বায়তুল মোকাদ্দাসের ইতিহাস (১৯১০), 'নূরজাহান' (১৯১৩) ও 'গাজী' (১৯১৭)। 'শিশু সোপান', 'সাহিত্য সোপান' ও 'আদর্শ শিশু সাহিত্য' ইত্যাদি শিরোনামে তাঁর কয়েকটি পাঠ্যপুস্ড়কও রয়েছে। 'ইসলাম আভা' নামে তিনি একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন বলেও জানা যায়। 'সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে ইসলামের খেদমত করা শেখ আবদুল জব্বারের ব্রত ছিল। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ও প্রকৃতি থেকে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়'[১৬৯]।

৮. রেয়াজ আলদীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) টাঙ্গাইল ঃ

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি মুসলমানের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের চরম সঙ্কটময় মুহূর্তে পণ্ডিত মাশহাদীর আবির্ভাব ঘটে। টাঙ্গাইল জেলার রতনগঞ্জের চারান গ্রামে তাঁর জন্ম।

---

publication. The present work is intended to supplement the defects of the Mir's work." বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৮৮৯ খ্রীঃ, ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা, ৮৯৯৩, পৃ.১৪-১৫ (সূত্রঃ *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, আলী আহমদ, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫ পৃ. ৪৬০)

[১৬৮] . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

[১৬৯] . মুহম্মদ আবদুল হাই, *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী ২য় খণ্ড*, হুমায়ুন আজাদ সম্পা. (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪), পৃ. ৯২

স্বাতন্ত্র্যধর্মী সাহিত্যধারার শ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন তিনি। ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ ছিল অতুলনীয়। প্যান ইসলামিজমের প্রবর্তক জামালুদ্দীন আফগানীর চিন্তাধারা তাঁকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বাঙালি মুসলমান সমাজকে মুসলিম ঐতিহ্য, ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস, সমাজবদ্ধ মুসলিম জীবনের সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্য ইত্যাদি সম্পর্কে জাগরণ সৃষ্টি করার আগ্রহ নিয়ে বাংলা সাহিত্যে আজীবন সংগ্রাম করেন তিনি। মানবজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি লেখালেখি করেন। ইসলাম ধর্মীয় শিষ্টাচার ও সামাজিক উৎসবাদি নিয়ে তার বিখ্যাত বই হচ্ছে 'সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' (১৮৯১, ১৮৯২)। গ্রন্থটিতে নামাজ, জুম'আা, মহররম, শবে কদর, ঈদ এবং আরও সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে ইসলামী শরীয়ার আলোকে আলোচনা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থ সম্বন্ধে ওয়াকিল আহমদ বলেন-'হিন্দুসমাজে বার, ব্রত, মাস, তিথি, পূজা-অর্চনা, শুভাশুভ, গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন, বাণিজ্যযাত্রা, পুণ্যাহ, আহার, উপবাস ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত বর্ষপঞ্জিকা বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল, মুসলমান সমাজে মুসলমানদের ধর্মকর্মে ব্যবহার উপযোগী অনুরূপ পঞ্জিকার প্রয়োজনবশে মাশহাদী প্রথম সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা প্রণয়ন করেন। তিনি স্বসমাজের কেবল চাহিদাই পূরণ করেননি, সে-সমাজের অস্তিত্ব আছে এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে সেটাও তুলে ধরেছেন। আত্মবোধের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য চেতনার যে যুগ-লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল, এতে তারই স্বাক্ষর রয়েছে।'[১৭০]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ১৯২১-১৯৪০ঃ

১. সফিউদ্দীন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২)ঃ

সফিউদ্দীন আহমদ খুলনা জেলার পিলজঙ্গ ডাকঘরের অধীন সৈয়দপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনসী ছবর উদ্দীন।[১৭১] তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন বলে তাঁর জীবনীকারগণ উল্লেখ করেছেন। এই জন্যে তাঁর লিখিত পুস্তকগুলো বিশ্বস্ত আরবী-ফার্সী গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হয়েছে বলে পরবর্তী গবেষকগণ মত প্রকাশ করেছেন।

---

১৭০. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

১৭১. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৮

ইসলামের হারানো ঐতিহ্যের পুণরচ্ধারের অভিপ্রায়ে তিনি সাহিত্য সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ ‘জাতীয় ধর্ম শিক্ষা’ (১৯১৩), ‘শাফিউল এসলাম’ (১৯১৩), ‘কনোজ কুমারী বা আর্যজীবন সন্ধ্যা’(১৯১৭), ‘সৈয়দ সাহেব’ (১৯১৭), ‘হযরত বড় পীরের জীবনী’ (১৯১), ‘দেব কাহিনী বা দেবগণের অন্তর্দ্ধান’ (১৯১৮), ‘পুণ্য কাহিনী’ (১৯১৮), ‘ছেলেদের হযরত মোহাম্মদ (দঃ); (১৯১৮), ‘মোছলেম শিক্ষা (মারফত তত্ত্ব)’ (১৩২৫ বাংলা), ‘প্রতাপ নন্দিনী’ (১৩২৬ বাংলা), ‘তওহিদ বা একতৃবাদ’ (১৯২১), ‘পাপের ফল’ (১৯২২), ‘মোতির মালা’ (১৯২২), ‘নবী নন্দিনী ফাতেমা জহরা’ (১৯৩৪) ও ‘হযরত আলী’ ইত্যাদি।

২. মুহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩)ঃ

তিনি পাবনা জেলার শাহজাদপুরের নিকটবর্তী বেলতৈল গ্রামে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম জয়েনউদ্দিন আহমদ ও মাতার নাম সোনাবানু। বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা-দীক্ষার দুর্দিনে বিশেষ করে হিন্দু প্রভাবিত সমাজে মুসলিম সাহিত্য সাধনার সঙ্কটে যে কয়েকজন মুসলিম সাহিত্য রচনা করে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য চেতনা ধরে রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে নজিবর রহমান অন্যতম।

তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল লক্ষ্য ছিল সাহিত্যের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার ও মুসলমানদের সেবা।[১৭২] “ধর্মীয় উপাদানকে নতুন আঙ্গিকে উপন্যাসে উপস্থাপন করে লেখক ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন।”[১৭৩] সমকালের গ্রামের মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর উপন্যাসের পটভূমি। উপন্যাসের আঙ্গিকে বাস্ড়ব জীবনকে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে পরিস্ফুট করেন।[১৭৪] নজিবর রহমান তাঁর স্বগ্রামে পন্ডিত সাহেবরূপে পরিচিত ছিলেন। ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের বৈশাখ মাসে তাঁর ইনতিকাল হয়।[১৭৫] লেখকের উলেণ্ঢখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ ‘আনোয়ারা’ (১৯১৪), ‘হাসন গঙ্গা বাহমনি’ (১৯১৭), ‘প্রেমের সমাধি’ (১৩২৫ বাংলা), ‘পরিণাম’ (১৯১৮), ‘দুনিয়া আর চাই না’ (১৯২৪), ‘গরিবের মেয়ে’ (১৩৩৯ বাংলা), ‘মেহেরউন্নিসা’ (১৩৩১বাংলা), ‘সাহিত্য প্রসঙ্গ’ (১৯০৪) ও ‘বিলাতী বর্জন রহস্য’ (১৯০৪)।

৩. নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪)ঃ

---

[১৭২] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২

[১৭৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

[১৭৪] . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২-৩৩, গোলাম সাকলায়েন, ‘মোহাম্মদ নজিবর রহমান, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ- চৈত্র, ১৩৬৪

[১৭৫] . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮২

তিনি টাঙ্গাইলের আটিয়া পরগণার অন্তর্ভূক্ত চারান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি একজন শক্তিশালী মুসলিম লেখক হিসাবে সাহিত্যিক মহলে পরিচিত। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে সাব রেজিস্ট্রার রূপে সরকারি চাকরিতে প্রবেশ করেন। সমকালীন প্রেক্ষাপটে মুসলমানদের দুর্দশা দেখে তিনি হতাশ হয়েছিলেন। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের দুঃখ দুর্দশায় তাঁর চিত্ত বিগলিত হতো। মুসলমান সমাজের সমস্যা ও তার সমাধানের কথা তাঁর বই-পুস্তকে আলোচিত হয়েছে।[১৭৬] তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ 'বঙ্গীয় মুসলমান', (১৮৯১), 'শৈশব কুসুম' (১৮৯৫), 'মুসলমান জাতীয় সঙ্গীত', 'সাহিত্য প্রভা' (১৯১৪) ও 'নোটস ইন মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০৩)।

৪. খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)ঃ

তাঁর জন্ম ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ৪ নভেম্বর। খুলনা জেলার গদাইপুরের কাজী বংশে। পিতার নাম কাজী আতাউল হক। 'বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে যে সকল মুসলমান সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যের সেবা করে দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছেন, কাজী ইমদাদুল হক তাঁদের অন্যতম। উপন্যাস, প্রবন্ধ, কবিতা. ছোট গল্প ইত্যাদি সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে তার অপ্রতিহত গতি ছিল।

তবে 'আবদুল্লাহ' উপন্যাস লেখে বাংলা সাহিত্যের একটি অমর অবদানের স্রষ্টা হিসাবেই তিনি দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী।'[১৭৭] আবদুল্লাহ উপন্যাসে মুসলমান সমাজে আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, পর্দাপ্রথা, পীরবাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় কুসংস্কারের চিত্র তুলে ধরে ইমদাদুল হক এসবের অবসান কামনা করেছেন, কেননা এগুলো সমাজের প্রগতির অন্তরায়।[১৭৮]

ইমদাদুল হক সমসাময়িককালে মুসলমানদের মধ্যে সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। "সমগ্র জীবন তিনি জ্ঞান সাধনা করে গেছেন। সমাজের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মুষ্টিমেয় যে ক'জন মুসলমান মনীষী লেখা-পড়া শিখে সমাজের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন, কাজী সাহেব ছিলেন তাঁদের মধ্যে আদর্শ স্থানীয়।"[১৭৯]

---

[১৭৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৪

[১৭৭]. মুসলিম সাহিত্য সেবক (ঢাকাঃ জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, পূর্ব পাকিস্তান), পৃ. ১৮৬

[১৭৮]. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৭, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২

[১৭৯]. জাফর আলম, *বাংলাদেশের স্মরণীয় বরণীয়*, (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৩), পৃ. ৭২

তিনি প্রথমে কলকাতা মাদরাসায় শিক্ষকতা শুরচ করেন, পরে ঢাকা সেকেন্ডারি শিক্ষাবোর্ডের সেক্রেটারি হয়েছিলেন। চাকরিতে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য তিনি সরকার কর্তৃক 'খান সাহেব' (১৯১৯) ও 'খান বাহাদুর' (১৯২৬) উপাধি পান।[১৮০] সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

বর্তমান বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের অবদান কোনো অংশে কম নয় একথা তিনি প্রায় শত বছর আগে তাঁর লেখনির মাধ্যমে প্রমাণ করে গেছেন। 'মুসলমানগণই আধুনিক সভ্যতার জন্মদাতা-ইমদাদুল হকের 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা' গ্রন্থের ইহাই সারকথা'।[১৮১] লেখকের উলেণ্টখযোগ্য ও সর্বাধিক পঠিত বইগুলো হচ্ছেঃ 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা' (১৩৩২ বাংলা), 'নবীকাহিনী' (১৯১৭), 'প্রবন্ধমালা' (১৯১৮), 'বোগদাদী গল্প' (১৯১৯), 'আবদুলণ্টাহ' (১৯৩২) ও 'ভূগোল শিক্ষা প্রণালী' (১৯১৩)।

৫. খান বাহাদুর তসলীমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭)ঃ

ইসলামী চিন্ড়াবিদ ও লেখক। দিনাজপুর জেলার পঞ্চগরের চন্দনবাড়ি গ্রামে তাঁর পৈতৃক নিবাস। জন্ম গ্রহণ করেন ১৮৫২ সালের ৩০ এপ্রিল পিতার কর্মস্থল দার্জিলিং এ। পিতার নাম মুন্সি মুহাম্মদ তরিকুলণ্টাহ। ওকালতি পেশা দিয়ে কর্ম জীবন শুরচ করলেও তসলিমুদ্দীন ইসলামী লেখক হিসাবেই সমাজে পরিচিতি লাভ করেন। নিজ চেষ্টায় আরবী ও ফার্সী ভাষা আয়ত্ত্ব করে পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ তাঁর পান্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। "তসলিমুদ্দীন আহমদের রচনা রীতি ক্লাসিকপন্থী। ইসলামী তত্ত্বের সার্থক রচয়িতা হিসেবে তিনি খ্যাতিমান।"[১৮২]

তাঁর জীবনীকার মোতাহার হোসেন সুফী লিখেছেন, 'তসলিমুদ্দীন আহমদের শিল্পীমানস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি ধর্মের বিষয়বস্তু ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন এবং মর্মমূলেও তিনি প্রবেশ করেছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে খ্রিষ্টান ও অমুসলিম ঐতিহাসিকদের ভ্রান্ড় সিদ্ধান্ড় তাঁর শিল্পী মনকে করেছিল বিক্ষুব্ধ। মিথ্যার কুয়াশাজাল ছিন্ন করে সত্যধর্ম ইসলামকে স্বমহিমায় ভাস্বর করার জন্যই তিনি লেখনি ধারণ করেছিলেন, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নয়। তাঁর মনোজগৎ আধ্যাত্ম চিন্ড়াধারায় ছিল পুষ্ট।[১৮৩] রচিত ধর্মীয় গ্রন্থ: 'তাবারাকালণ্টাযী সুরার বঙ্গানুবাদ' (১৯০৭), 'আমপারা' (১৯০৯), 'প্রিয় পয়গম্বরের প্রিয় কথা' (১৯১৫), 'কোরআন ১ম খন্ড' (১৯২২), '২য় খন্ড (১৯২৪), '৩য় খন্ড' (১৯২৫), 'জন্মোৎসব

[১৮০] . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫, সৈয়দ এমদাদ আলী- 'খান বাহাদুর কাজি এমদাদুল হক, সওগাত, ভাদ্র ১৩১৩

[১৮১] . প্রাগুক্ত, পৃ.৩১৬

[১৮২] . আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত পৃ. ৩৯৯

[১৮৩] . মোতাহার হোসেন সুফী, *তসলিমুদ্দীন আহমদ (জীবনী গ্রন্থমালা)* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯৩) পৃ. ৩০

বা মৌলুদ নফীসা' (১৯২৬), 'সাহাবিয়া' (১৯২৭) ও 'সম্রাট পয়গম্বর' (১৯২৮)। ১৯২৭ সালের ২৪ মার্চ তিনি ইনতিকাল করেন।

৬. সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)ঃ

১৮৬৩ সালে ময়মনসিংহ জেলার ধনবাড়ী জমিদার পরিবারে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী জন্ম গ্রহণ করেন। অবিভক্ত বাংলার তিনি প্রথম মুসলমান মন্ত্রী ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। দানশীল জমিদার হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ছিল। তিনি একাধারে আসাম বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জনসেবা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বৃটিশ সরকার তাঁকে ১৮৯৬ সালে খান বাহাদুর, ১৯৯১ সালে নবাব ও ১৯২৪ সালে নবাব বাহাদুর ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেন।[১৮৪]

মুসলমান সমাজের প্রতি তাঁর বিশেষ দরদ ছিল। মুসলমান জাগরণের সহায়তার জন্য তিনি জনৈক সাংবাদিকের একটি প্রেস খরিদ করে দেন এবং তাঁর কলকাতা বাসভবনের পার্শ্ববর্তী একটি গৃহে তা স্থাপন করেন। এই প্রেস থেকেই 'মিহির' ও 'সুধাকর' পত্রিকা প্রকাশিত হতো। তিনি সাহিত্য রসিক মানুষ ছিলেন।[১৮৫] তাঁর উলেণ্টখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছেঃ 'ঈদুল আজহা' (১৯০০), 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৩)।

৭. শেখ মোহাম্মদ জমিরচদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০)ঃ

অবিভক্ত ভারতের তৎকালীন নদীয়ার অন্তর্র্গত মেহেরপুর মহকুমার গাংনী থানাধীন গাঁড়াডোব-বাহাদুরপুর গ্রামে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেনঃ "আমার নাম শেখ মোহাম্মদ জমিরচদ্দীন। আমার পিতার নাম সুফী মোহাম্মদ আমির উদ্দিন মরহুম মগফুর সাহেব। দাদাজির নাম শেখ মোহাম্মদ বাকের উদ্দীন মরহুম মগফুর সাহেব।"[১৮৬]

জমিরচদ্দীনের মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ ও এর প্রচারের দায়িত্ব নেয়া এবং পরে আবার স্বধর্মে ফিরে আসা বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে এক অবাক কান্ড। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের ভাষায়ঃ 'দুভার্গ্যের বিষয় খৃষ্টান মিশনারীদের কুহকে পড়িয়া ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ শে ডিসেম্বর তিনি খৃষ্টান

[১৮৪] . জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[১৮৫] . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮০

[১৮৬] . মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, *মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন ঃ সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫) পৃ. ৬০, মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন, *আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত* (রাজশাহী, ১৯৬৭) পৃ. ১

ধর্মে দীক্ষিত হন। আট বৎসরকাল খৃষ্টান মিশনারীদের সংস্পর্শে থাকিয়া এবং খৃষ্টান ধর্ম সম্পর্কে পড়াশুনা করিয়া এলাহাবাদিস্থিত সেন্ট পল ডিভিনিটী কলেজ হইতে শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তিনি সৌভাগ্যক্রমে ব্রাহ্মধর্মের সংস্পর্শে আসিয়া ইসলাম ধর্মের একত্ববাদ সম্বন্ধে প্রথম প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্জন করেন। ইহার কিছু দিন পর তিনি খৃষ্টান ধর্ম ত্যাগ করিয়া পুনরায় ইসলামের সুশীতল ক্রোড়ে ফিরিয়া আসেন। তৎপর তিনি স্বসমাজের ও ধর্মের লোকদিগকে খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণের বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হন। ফলে তিনি খৃষ্টান ধর্মের অসারতামূলক বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন।'[১৮৭]

এই কয়েক বছর ব্যতীত সারা জীবন ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশে সংগ্রাম করেন শেখ জমিরদ্দিন। 'ইসলাম ধর্ম প্রচারে শেখ জমিরদ্দীন দ্বিমুখী অভিযান চালান-বক্তৃতা দান ও পুস্ড়ক প্রবন্ধ প্রণয়ন। অন্যের আঘাত-আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা, ইসলামের মহিমা প্রচার করা, অবিশ্বাসীদের ইসলামে দীক্ষা দেওয়া, ধর্মবোধে মুসলমানদের জাগ্রত করা-এক কথায় ইসলামীকরণ এবং তদ্দ্বারা সমাজের পুণর্জাগরণ- এই ছিল শেখ জমিরদ্দীনের মুখ্য ব্রত।'[১৮৮]

তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য লেখালেখির মধ্যেঃ 'হজরত ইসা কে'? (১ আশ্বিন, ১৩০৬), 'ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্ড়ব্য' (২০ শ্রাবন, ১৩০৭), 'ইসলামী বক্তৃতা' (মাঘ, ১৩১৪), 'রদ্দে সত্যধর্ম নিরূপণ ও হেদায়দুল জমিরিয়া' (১৩৩২), 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য' (শ্রাবণ, ১৩৩২), 'পাদ্ মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন' (১৩৩৪), 'গেণ্ঢারি অব ইসলাম' (১৩৩৫), 'মাসুম মোস্ড়ফা (দঃ) (পৌষ ১৩৩৫), 'মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার', তামাকের অপকারিতা', 'ইসলামের সভ্যতা' জঙ্গে কারবালা', 'জওয়াবোন্নাছারা', গৌরের ইতিহাস', 'দার্জ্জিলিং ভ্রমণ', 'চট্টগ্রাম ভ্রমণ' ও 'পলাশী ভ্রমণ' ইত্যাদি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠক মহলে সুপরিচিত।

৮. সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯৩০)ঃ

তিনি হুগলী জেলার অন্ড়র্গত বাবানাম গ্রামে ১৮৬৪ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পেশায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার ছিলেন। ডাক্তারি বিদ্যায় গভীরতার জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন। 'বঙ্কিম চন্দ্রের সাহিত্য সাধনা মুসলমানদের জন্য ভীষণ উদ্বেগের সৃষ্টি করিয়াছিল। আবুল হুসেন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতি সাহিত্যিক বঙ্কিম চন্দ্রের ইতিহাস বিদ্বেষ ও মুসলিম বিদ্বেষে দুঃখিত এবং ক্ষুব্ধ হন। ফলে আবুল হুসেন বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসগুলির বিরূপ সমালোচনা কবিতাকারে প্রকাশ করিয়া মুসলিম সমাজের মনোভাব

---

[১৮৭] . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৮

[১৮৮] . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯১

প্রকাশ করেন। তাঁহার সাহিত্য সাধনার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি মুসলমানদের জাতীয় চেতনার উদ্বোধনের জন্য ইতিহাসাশ্রয়ী ছিলেন'।[১৮৯] 'জীবন্ড় পুতুল' (১৯০৭), 'মোসলেম পতাকা', 'তারিখুল ইসলাম' (১৯০৮), 'জ্ঞান ভা ার' (১৯২৪) ও 'স্পেনে মোসলেম পতাকা বা স্পেন বিজয়' (১৯২৫) ইত্যাদি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

৯. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)ঃ

মুসলিম ভারত ও মুসলিম বাংলার এক শোচনীয় দুর্দিনে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ই আগস্ট তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন বাংলার অগ্নিপুরুষ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী।[১৯০] "সিরাজগঞ্জে জন্ম গ্রহণ করেন বলেই তিনি তাঁর নামের সঙ্গে সিরাজী যুক্ত করেন।"[১৯১] তাঁর পিতার নাম সৈয়দ আব্দুল করিম, যিনি পেশায় ইউনানি চিকিৎসক ছিলেন। পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত করে সিরাজী ভর্তি হয়েছিলেন স্থানীয় জ্ঞান দায়িনী মধ্য ইংরেজী স্কুলে। এই স্কুলে পাঠ্যাবস্থায় কিশোর সিরাজীর অনলবর্ষী বাগ্মিতা ও কবিত্ব শক্তির প্রথম স্ফূরণ হয়।

সিরাজগঞ্জের বানোয়ারীলাল স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় প্রাচ্যের অগ্নি পুরুষ সুপ্রসিদ্ধ জামাল উদ্দীন আফগানির Pan Islamism মতবাদ দ্বারা সিরাজী প্রভাবিত হন। "আফগানীর ঘটনাবহুল ও চমকপ্রদ জীবন কাহিনী ও মুসলিম আযাদীর প্রদীপ্ত আদর্শ সেকালের স্বজাতি ও স্বধর্মের একনিষ্ঠ সেবক প িত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৮) তাঁর 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থে বলিষ্ঠ ও অগ্নিময়ী ভাষায় প্রচার করেন। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে 'সমাজ ও সংস্কারক' প্রকাশিত হলে তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার অবিলম্বে তা বাজেয়াপ্ত করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। এ গ্রন্থ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সিরাজীর হাতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কিশোর মনে আগুন ধরে যায়।"[১৯২]

---

[১৮৯]. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯১-৯২

[১৯০]. খালেদ মাসুকে রসুল, *অগ্নি পুর ষ সিরাজী* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭) পৃ. ৪০

[১৯১]. সিরাজুল ইসলাম সম্পা, *বাংলা পিডিয়া ৯ম খ* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩) পৃ.৪২৬

[১৯২] খালেদ মাসুকে রসুল, প্রাগুক্ত, পৃ.৪১

সিরাজী লেখালেখি করে এবং সভা সমিতিতে বক্তৃতা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর লেখা ও বক্তৃতার প্রধান বিষয়বস্তু ছিল অনগ্রসর মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলা। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে ১৯১০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁকে দু'বছরের জন্য কারাবরণ করতে হয়।[১৯৩]

তিনি একই সাথে বেশ কিছু সংগঠন ও দলের সদস্য ছিলেন। যেমন অল ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, আঞ্জুমান-ই-উলামা-ই-বাংলা, জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ, স্বরাজ পার্টি ও কৃষক সমিতি।[১৯৪] সাময়িক পত্রিকা আল এসলাম, ইসলাম প্রচারক, প্রবাসী, প্রচারক, কোহিনূর, সুলতান, মোহাম্মদী, সওগাত, নবযুগ ও নবনূর প্রভৃতিতে সিরাজীর লেখা প্রকাশিত হতো। তাঁর অধিকাংশ লেখাতেই ইসলামী ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকারকে উদ্দীপ্ত করে তোলার প্রয়াস ছিল।[১৯৫]

তিনি ১৮৯৫ সালে তুরস্কে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জামাল উদ্দীন আফগানী ও তুরস্ক তার বালক চিত্তে একটা স্থায়ী রেখাঙ্কন মুদ্রিত করেছিল। ইসমাইল হোসেন শেষ পর্যন্ড় বাংলার প্রতিনিধি হয়ে ১৯১২ সালে তুরস্কের বলকান যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবা করার জন্যে 'অল ইন্ডিয়া মেডিকেল মিশন' নিয়ে তুরস্কে গিয়েছিলেন। তুরস্কের সুলতানের কাছ থেকে গাজী উপাধি নিয়ে পরের বছর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।[১৯৬]

শিবলি নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪) ও মুহাম্মদ ইকবালের (১৮৭৬-১৯৩৮) প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁর উপর। তাঁদের মত তিনিও অনুভব করেছিলেন যে ধর্মীয় ও সেক্যুলার চিন্ড়র মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ভারত বর্ষের অবনতিশীল হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের উন্নয়ন সম্ভব।[১৯৭]

মুসলিম জাতীয়তার পরিকল্পনায় তিনি উপরোক্ত মনীষীদের ভাবাদর্শী এবং সাহিত্য সৃষ্টিতে ইসলামী জীবন দর্শনের ব্যাখ্যাকার।[১৯৮] তাঁর উলেণ্টখযোগ্য কয়েকটি বই হচ্ছে, উপন্যাসঃ 'রায়নন্দিনী' (১৯১৫), 'তারাবাঈ' (১৯১৬), 'ফিরোজা বেগম' (১৯১৮), ও 'নূরউদ্দীন' (১৯১৯)। কাব্য ও কবিতাঃ 'অনলপ্রবাহ' (১৩০৬ বাংলা), 'উচ্ছ্বাস' (১৩২৪ বাংলা), 'নবউদ্দীপনা' (১৩১৪), 'উদ্বোধন' (১৯০৮) 'স্পেনবিজয়

---

[১৯৩] মুহম্মদ আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩১

[১৯৪] *বাংলা পিডিয়া ৯ম খ*ন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৬

[১৯৫] প্রাগুক্ত, পৃ.২৭

[১৯৬] .ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ.৩০৬

[১৯৭] *.বাংলা পিডিয়া ৯ম খ*ন্ড,, প্রাগুক্ত, পৃ.৪২৬ -২৭

[১৯৮] .মুহম্মদ আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ.১৩২

কাব্য' (১৯১৪)। প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্যরচনাঃ 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' (১৯০৭), 'তুরস্ক ভ্রমণ' (১৯১৩), 'আদব কায়দা শিক্ষা' (১৯১৪), 'সুচিন্ড়া' (১৯১৬) ও 'স্বজাতি প্রেম' (১৯৪৬)। ১৯৩১ সালের ১৭ ই জুলাই এ মহান মনীষী ইহ জগত ত্যাগ করেন।

১০. শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১)ঃ

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। ১৮৫৯ সালে পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত মুহম্মদপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা মুন্সি শেখ গোলাম এহিয়া । শেখ আবদুর রহীমের সময়কালে বাংলা ভাষাকে মুসলমানরা ঘৃণা করতেন এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। যার ফলে বাংলাভাষায় ফিকহ সম্পর্কিত বইপুস্ড়ক কেউ লিখতে সাহস করতেন না। তাঁর প্রকাশিত একটি বইয়ের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন- 'ধর্মের কথা হিব্রচ ভাষায় বল আর সিরিয়ান ভাষায়ই বল..... তাহাতে ধর্মের বা সত্যের কোন তারতম্য হয় না'।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মুসলমান সমাজের অবহেলা ও শৈথিল্যভাব তাঁকে তীব্রভাবে আহত করেছিল। এই ভাষার মাধ্যমে বাংলার অবহেলিত মুসলিম সমাজকে ইসলামের আদর্শ, আকীদা, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সর্ম্পকে বই পুস্ড়ক লিখে মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম উপহার দেয়ার সাহস দেখিয়েছেন।

ফিকহ সম্পর্কিত তাঁর লিখিত ও অনূদিত প্রত্যেকটা গ্রন্থ সমসাময়িক কালের আরবী ও উর্দু ভাষায় লিখিত ফিকহ এর কোনো গ্রন্থ থেকেই মানে ও গুণে কম ছিলনা। কিন্তু তাঁর পরবর্তী মুসলিম লেখকরা আর সেই কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। শেখ আবদুর রহীম, মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ, পন্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী ও মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় 'এসলাম তত্ত্ব' (১৮৮৮-১৮৮৯) শিরোনামে দু'খন্ডে ইসলামের সারসংগ্রহ প্রকাশিত হয়।

শরীয়ার নিয়ম কানুন ও ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর উলেণ্ডখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হচ্ছেঃ 'নামাজতত্ব বা নামাজ বিষয়ক যুক্তিমালা' (১৮৯৮), 'হজবিধি' (১ম খন্ড, ১৩১০ বাংলা), ২য় খন্ড (১৯১১), 'নামাজ শিক্ষা' (১৯১৭), 'ইসলাম নীতি' (১ম ভাগ ১৯২১), 'ইসলাম নীতি' (২য় ভাগ ১৯২৫), 'কোরআন ও হাদীসের উপদেশাবলী' (১৯২৬), 'রোজাতত্ব' (১৯২৮), ও 'খোৎবা' (১৯২৮)। 'ইসলামের ইতিবৃত্ত'

(২য় খন্ড, ১৯১০), 'আলহামরা' (১৮৯১), 'হযরত মুহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি' (১৮৮৭)। ১৯৩১ সালের ১৪ জুলাই তিনি নিজ গ্রামে ইনতিকাল করেন।

১১. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)ঃ

রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। যে সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তা অশিক্ষা, কুশিক্ষা এবং অজ্ঞানতার অন্ধকারে ছিল আচ্ছন্ন। তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য কীর্তি মুসলিম মহিলাদের অশিক্ষা ও কুশিক্ষার অভিশাপ থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য 'সাখাওয়াত মেমোরিয়েল গার্লস স্কুল' স্থাপন। শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিম নারীদের আদর্শ গৃহিনী, আদর্শ জননী, সর্বোপরি আদর্শ রমণীরূপে গড়ে তোলাই ছিল এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য।[১৯৯]

রাজা রাম মোহন রায় (১৭৭২/৭৪-১৮৩৩) এর উদ্যোগে সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) এর কল্যাণে বিধবা বিবাহ এর প্রচলন, এর পরবর্তী সময়কালটাই হচ্ছে রোকেয়ার। যে সময়ে হিন্দু সমাজের প্রভাবে মুসলিম নারী সমাজও ছিল অধিকার বঞ্চিত ও লাঞ্চিত। সে সময়ে "রোকেয়া তাঁর উদার হৃদয় দিয়ে মুসলিম নারী সমাজের দুরাবস্থা উপলব্ধি করেছেন। শিক্ষার আলো প্রবেশ না করলে মুসলিম নারী সমাজের মুক্তি নেই- এই উপলব্ধি তাঁর সহজাত ছিলো।"[২০০]

'মতিচূর', 'পদ্মরাগ' 'সুলতানার স্বপ্ন ও 'অবরোধবাসিনী' ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ যা বাংলার ঘরে ঘরে বহুল পঠিত। অনেকে মনে করেন তাঁর চিন্ড্র ইসলামী আদর্শ বিরোধী, যা আদৌ সত্য নয়। তাঁর লেখা পড়লেই তা বুঝা যায়। তিনি মূলত বাংলার মুসলিম সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন এবং এর বিলোপ সাধন চেয়েছিলেন। কুরআন-হাদীসে যেই পর্দা করার কথা নারীদেরকে বলা হয়েছে তিনি এই পর্দা প্রথার পক্ষে ছিলেন। এবং তিনি নিজেও বোরকা পরিধান করতেন এবং বোরকাকে উন্নতি-অগ্রগতির পথে বাধা মনে করতেন না। বরং বোরকা অধিক সুসভ্যতা ও শালীনতার প্রতীক জ্ঞান করতেন।

তবে পর্দার নামে যারা বাড়াবাড়ি করতো তাঁদের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর 'মতিচূর' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন ঃ "আমি অনেকবার শুনিয়াছি যে, আমাদের জঘন্য অবরোধ প্রথাই নাকি আমাদের উন্নতির

---

[১৯৯] . মোতাহার হোসেন সুফী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ২০০১), পৃ. ৩৩৬

[২০০] .আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০১

অন্দ্রায়। উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ভগ্নিদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ হইলে তাঁহারা প্রায়ই আমাকে "বোরকা" ছাড়িতে বলেন। বলি, উন্নতি জিনিসটা কি ? তাহা কি কেবল বোরকার বাহিরেই থাকে ?

যদি তাই হয় তবে কি বুঝিব যে জেলেনী, চামারনী, ডুমুনী প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্নতি লাভ করিয়াছে? সভ্যতাই (civiliztion) জগতে পর্দা বৃদ্ধি করিতেছে। যেমন পূর্বে লোকে চিঠিপত্র কেবল ভাঁজ করিয়া পাঠাইত, এখন সভ্য (civilized) লোকে চিঠির ওপর লেফাফার আবরণ দেন। চাষারা ভাতের থালা ঢাকে না; অপেক্ষাকৃত সভ্য লোকেরা খাদ্য সামগ্রীর তিন চারি পাত্র একখানা বড় থালায় (tra) রাখিয়া উপরে একটা ''খানপোষ'' বা ''সরপোষ'' ঢাকা দেন, যাঁহারা আরও বেশি সভ্য তাঁহাদের খাদ্যবস্তুর প্রত্যেক পাত্রের স্বতন্ত্র আবরণ থাকে। এইরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, যেমন টেবিলের আবরণ, বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড়-ইত্যাদি।"[২০১]

শিক্ষার নামে নারীদের অশণ্টীলতা ও বেহায়াপনার বিরোধী ছিলেন তিনি। "যে শিক্ষা অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করে, কিন্তু শালীনতা ও প্রকৃত পর্দার বরখেলাপ করেনা তেমন শিক্ষা দিয়ে বেগম রোকেয়া মুসলিম নারীদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। বেগম রোকেয়ার ভাষায় ঃ Our girls should not only obtain University degrees, but must be ideal daughters, wives and mothers- or I may say obedient daughters, loving sisters, dutiful wives and instructive mothers."[২০২]. আরেকজন গবেষক উলেণ্টখ করেছেন, 'প্রয়োজনীয় পর্দার প্রতি রোকেয়া ছিলেন নিষ্ঠাবতী।'[২০৩]

১২. মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)ঃ

কবি, প্রাবন্ধিক, গদ্যশিল্পী ও সাহিত্যিক মোজাম্মেল হকের জন্ম অবিভক্ত ভারতের নদীয়া জেলার অন্দর্গত শান্দিড়পুরের বাউইগাছি গ্রামে যা কলকাতা থেকে ৫৮ মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত।[২০৪] সমকালীন সময়ে

[২০১] . বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *রোকেয়া রচনাবলী*, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও অন্যান্য সম্পা. (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯) পৃ. ৪০-৪২

[২০২] . তাহ্মিনা আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮, Mrs, R. S, Hossain, `Educational Ideals for the Modern Indiab Girls', The Mussalman, Vol. XXV. T.W. Edition, Vol. VII, March 5, 1931, N0. 26, P.7

[২০৩] . অধ্যাপক মজির উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা* (ঢাকাঃ দিদরি পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৭) পৃ. ৬১

[২০৪] ., আজহার ইসলাম, *মোজাম্মেল হক* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) পৃ. ৯

হিন্দু কবি-সাহিত্যিকদের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিজ প্রতিভা দ্বারা সাহিত্য জগতে আসন করে নিয়েছিলেন। "যে সকল মুসলিম লেখক বাংলা সাহিত্য চর্চা দ্বারা হিন্দু মুসলমানের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কবি মোজাম্মেল হকের নাম বিশেষ উলেণ্টখযোগ্য।"[২০৫]

তাঁর উঁচু মানের বাংলা লেখা উচ্চ শিক্ষিত মহলে সাদরে সমাদৃত হয়েছিল। "সাধুভাষায় বাংলা সাহিত্য চর্চায় যে তিনজন সাহিত্যিক সে যুগে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন, তাঁরা হলেন মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১৭), কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১) এবং মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)। সাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় ছিল তাঁদের পদচারণা।"[২০৬] মানব কল্যাণে সমস্ড় জীবন কোরবানী করে দেন এই মহামনীষী। মুসলমান সমাজের দুর্দশা দূরীকরণ এবং তাঁদের মধ্যে ইসলামী চেতনাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে সেই অবহেলিত মুসলিম সমাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তিনি। 'তিনি শুধু সেকালে একজন কবি ছিলেন না, বরং ছিলেন অন্যতম সেরা সমাজ সংস্কারক ও মুসলমানদের নবজাগরণ, জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধকরণ ও সমাজ কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ। তিনি ছিলেন শিক্ষানুরাগী, শিক্ষাব্রতী ও শিক্ষা প্রবর্তক। তিনি ১৯১১ সালে কলিকাতায় 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' নামে একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। সেখানে একটি সুন্দর পাঠাগারও গড়ে তোলেন।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি সে সময় মুসলমানদের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক শূন্যতা পূরণে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। এই সমিতির পক্ষ থেকে মুসলমানদের মধ্যে চেতনা আনয়নের জন্য ১৯১৮ সালে এপ্রিল মাসে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকা' প্রকাশ করেন।'[২০৭]

তাঁর সমস্ড় রচনাবলীই মুসলমানদের জাগরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে সৃষ্টি। "মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্ড়ার, মুসলমান পাঠকদের মধ্যে পাঠস্পৃহা-সঞ্চার এবং মুসলমানদের মধ্যে ঐতিহ্যবোধ- জাগ্রত করাই ছিল তাঁর সাহিত্য সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য।"[২০৮]

তাঁর রচিত গদ্যগ্রন্থ সমূহ হচ্ছে ঃ 'মহর্ষি মনসুর' (১৮৯৬), 'তাপস জীবনী' (১৯০০), 'ফেরদৌসী চরিত' (১৮৯৮), 'মাওলানা পরিচয়' (১৯১৪), 'খাজাময়ীনউদ্দীন চিশতী' (১৯১৮), 'হাতেম তাই' (১৯১৯)

---

[২০৫] . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৫৪

[২০৬] . মোজাম্মেল হক, *মোজাম্মেল হক রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পা. (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ২০০৫) ভূমিকা

[২০৭] . জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[২০৮] . মোজাম্মেল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা

এবং 'টিপু সুলতান' (১৯৩১)। কাব্য গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ 'কুসুমাঞ্জলি' (১৮৮২), 'অপূর্ব দর্শন কাব্য' (১৮৮৫), 'জুবিলী সঙ্গীত' (১৮৯৬), 'প্রেমহার' (১৮৯৮), 'জাতীয় সঙ্গীত' (১৮৯৯) 'হজরত মোহাম্মদ' (১৯০৩), 'করোনেশন সঙ্গীত' (১৯১১), 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৯১২) ও 'ইসলাম-সঙ্গীত' (১৯২৩)। 'জোহরা' (১৩২৪ বাংলা) তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস।

১৩. মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) বরিশালঃ

মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ছিলেন একাধারে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমাজ সেবক ও ধর্মতত্ত্ববিদ। বরিশাল শহরের উপকণ্ঠে কাউনিয়ায় তাঁর জন্ম। সমাজসংস্কার ও ইসলাম ধর্মের সেবা ছিল তাঁর আজীবনের সাধনা। গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার বা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা ছিল তাঁর একটা নেশা।

সাহিত্যিকদের মতে তাঁর ভাষা ও সাহিত্যিক প্রজ্ঞা ছিল খুবই তীক্ষ্ণ। আলণ্ডাহ তা'য়ালার স্থলে ঈশ্বর, পরমেশ্বর, ভগবান- এসব শব্দের প্রয়োগ তিনি শুধু অবাঞ্চিতই মনে করেননি, অত্যন্ড় গর্হিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২০৯]

তিনিও জামালুদ্দীন আফগানী কর্তৃক প্রভাবিত একজন চিন্ড়াবিদ ছিলেন। যার ফলে তিনি আফগানী কর্তৃক লিখিত 'নেচার ও নেচারিয়া' গ্রন্থের অনুবাদ করে 'এসলাম তত্ত্ব' শিরোনামে প্রকাশ করেন। তাঁর সমসাময়িক কালে বাঙালি মুসলিম সমাজে যে সমস্ড় ধর্ম বিরচ্দ্ধ আচার-আচরণ প্রচলিত ছিল বা প্রকৃত ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল সেগুলো সংশোধনের উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষুরধার লেখনি চালিয়ে যান।

তিনি ফিকহ বিষয়ে বেশ কিছু বই-পুস্ড়ক রচনা করেন। 'তোহফাতুল মুসলেমীন' (১৮৮৬) শিরোনামে তাঁর একটি ফিকহ বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে। যাতে তিনি নামাজ, রোজা, গোসল, পাক-পবিত্রতা ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়ে বিস্ড়রিত আলোচনা করেছেন। 'বিশুদ্ধ বাংলা খোলাছাতুল মছায়েল' (১৯২৯) নামে ফিকহ শাস্ত্রের উপর লিখিত আরেকটি সুপাঠ্য বই। যা তাঁর ইসলামী জ্ঞানের গভীরতার সাক্ষ্য বহন করছে।

ফিকহ, আকীদা ও ইসলামী আদর্শ বিষয়ক তাঁর অন্যান্য বইগুলো হচ্ছেঃ 'বোধোদয়তত্ত্ব (১৮৯৭), 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ' (২য় খন্ড, ১৮৯৯), 'বিলাতী মুসলমান' (১৯০০), 'হক-নছিহত' বা ধর্মোপদেশ (১৯০৭) ও বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা (১৩০২, ১৩০৩, ১৩০৪, ১৩০৬, ১৩০৭, ১৩০৯, ১৩১০, ১৩১২, ১৩১৪,

[২০৯] আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

১৩১৫) ইত্যাদি বাংলা সনে প্রকাশিত পঞ্জিকাসমূহ। যাতে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি বিশেণ্ঢষণধর্মী আলোকপাত করেছেন।

১৪. শেখ ফজলল করিম (১৮৮৩-১৯৩৬)ঃ

১৮৮৩ সালের ১৪ এপ্রিল বর্তমান লালমনিরহাট জেলার কালিগঞ্জ থানার কাকিনা গ্রামে শেখ ফজলল করিম জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিল মোনা। তাঁর পিতার নাম আমীর উলণ্ঢা সরদার এবং মাতার নাম কোকিলা বিবি।[২১০] তিনি বংশানুক্রমে চিশতিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পীরদের মুরীদ ছিলেন বলে বিভিন্ন লেখা থেকে প্রতীয়মান হয়।

সুফী মতবাদ প্রচারই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ ছিল। "শেখ ফজলল করিমের সমস্ড় কাব্যভাবনা ও সাহিত্যানুশীলনের মৌল আবেদন হল ধার্মিকতা ও নৈতিকতা। ইসলাম ধর্মই তাঁর নীতিজ্ঞান ও আদর্শ বুদ্ধির উৎস। তিনি চিশতীয়া সুফীমতের সমর্থক ছিলেন। সুফীমতের অন্ড়শীল আবেগ ও শুদ্ধ রসবোধ তাঁর রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে। তবে তিনি যুগের আবেদন ও সমাজ-সমস্যার কথাও উপেক্ষা করেননি।"[২১১]

'মুসলিম ঐতিহ্য ও ইতিহাসের পাতা থেকে কিংবা মুসলিম ওলী-আলণ্ঢাদের জীবনী থেকে যেখানেই নীতিমূলক ধর্মাখ্যান পেয়েছেন, তা দিয়েই তাঁর সাহিত্যের ইমারত তিনি গড়ে তুলেছেন।[২১২]

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৪০ টি। এছাড়া কিছু সংখ্যক অপ্রকাশিত রচনাও রয়েছে। অজস্র গ্রন্থ রচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'বাসনা', 'জমজম', 'কলেণ্ঢালিনী' এবং 'রত্নদ্বীপ' হাতে লেখা পত্রিকা সম্পাদন করেন।[২১৩] 'পরিত্রাণ কাব্য' (১৯০৩), ভগ্নবীণা বা ইসলামচিত্র' (১৯০৩), 'মহর্ষি হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী' (১৯০৪), 'হযরত রাব্বানী সাহেবের জীবনী'(১৯০৫), 'আফগানিস্ড়ানের ইতিহাস' (১৯০৯), 'পথ ও পাথেয়' (১৯১৩), 'হারচ্ন অর রশীদের গল্প' (১৯১৭), 'চিন্ড়ার চাষ'(১৯১৬), 'সোনার বাতি' (১৯১৮), 'জোয়ার ভাটা' (১৯১৮), 'বিবি রহিমা' (১৯১৮), 'বিবি ফাতেমার জীবনী; (১৯২১), 'রাজর্ষি এবরাহিম' (১৯২৪), 'বিবি খোদেজার জীবনী' (১৯২৭), 'হাতেম তাই এর গল্প' (১৯১৩), 'খাজা বাবার জীবন চরিত' (১৯১৩), 'পৌত্তলিকতার পরিণাম ও একেশ্বরবাদ', 'মোহাম্মদ

---

২১০ . শামসুন নাহার জামান, *শেখ ফজলল করিম* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯) পৃ. ১১

২১১ . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

২১২ . মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮) পৃ. ১৫৮

২১৩ . আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

চরিত', 'বিবি আয়েশার জীবনী', ও 'হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রহ:) জীবনী' ইত্যাদি তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য গ্রন্থ।

১৫. দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬)ঃ

দাদ আলী কুষ্টিয়া জেলার আটিগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম মুহম্মদ আলী মিয়া এবং মাতার নাম সৈয়দা সাজেদান্নেসা। তিনি চিকিৎসা ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন বলে জানা যায়। ইসলাম প্রচারের জন্য মুন্সী মেহেরচলণ্ঢাহ ও মুন্সী জমিরচদ্দীন বিদ্যাবিনোদের সঙ্গে স্বীয় জেলার নানা অঞ্চলে মাহফিল করে ইসলামের জ্যোতি বিকিরণ করেন।[২১৪] 'আশেকে রাসূল' (১৯০৮), 'শান্ড়িকুঞ্জ' (১৯১৭), 'সমাজ শিক্ষা' (১৯২০), 'ফারায়েজ', ও 'উপদেশমালা' ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থ।

১৬. ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬)ঃ

জনপ্রিয় প্রাবন্ধিক, চিন্ড়শীল, কথাশিল্পী ও শিশু-সাহিত্যিক হিসাবে পরিচিত তিনি। বর্তমান মাগুড়া জেলার হাজীপুর গ্রামের বিশিষ্ট জোতদার মৌলভী মঈনউদ্দীন আহমদের পুত্র মোহাম্মদ লুৎফর রহমান একই জেলার পারনান্দুয়ালী গ্রামের মাতুলালয়ে ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন।[২১৫] আই, এ পড়া অবস্থায় পিতার বিনা অনুমতিতে তিনি বিবাহ করেন। এতে তাঁর পিতা ভয়ানক অসন্তুষ্ট হন। পিতার ভয়ে স্বীয় বাড়িতে না এসে শ্বশুরালয়ে তিনি অবস্থান করেন।[২১৬]

পেশায় ছিলেন হোমিও ডাক্তার। তাঁর জীবনী ও সাহিত্য নিয়ে বাংলা ভাষায় খুব একটা আলোচনা ও সমালোচনা হয় নি, যা অন্যান্য ছোট-খাটো কবি-সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রেও হয়েছে। "প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পর্কে আমাদের সমাজ যতটা জেনেছে, তাঁরও বেশি আছে অজানার গহবরে।"[২১৭] 'অথচ তিনি এমনই গুরচত্বপূর্ণ লেখক যে, তাঁর উলেণ্ঢখ ব্যতিত বাঙলা সাহিত্যের কোনো ইতিহাস বা আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না।'[২১৮]

"লুৎফর রহমান এর রচনায় তাঁর সমকালের বাঙালি মুসলমানের ধর্ম-ভাবনা ও ইসলাম চর্চার অকপট চিত্র পাওয়া যায়।"[২১৯] মানবতাবাদী, কুসংস্কারমুক্ত ও উদার মনের অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি দুঃস্থ

---

২১৪ . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৩১

২১৫ . ইসরাইল খান, *মোহাম্মদ লুৎফর রহমান জীবন ও চিন্তাধারা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮) পৃ. ২০

২১৬ . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৬

২১৭ . ইসরাইল খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

২১৮ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

২১৯ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

মহিলাদের স্বাবলম্বন-শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ও পতিতাদের সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য কলকাতার মীর্জাপুর স্ট্রীটে ‘নারীতীর্থ’ নামে একটি সমিতি গঠন করেন।

আত্মার পবিত্রতা, সত্য ও সুন্দরের জন্য সাধনা, মানবতার জয়গান এবং মনুষ্যত্বের জাগরণের বাণীই তাঁর সাহিত্য সাধনার মূল প্রতিবাদ্য। সাহিত্যের মাধ্যমে তিনি জীবনভর সত্য, সুন্দর ও মহত্ত্বের সন্ধান করে ফিরেছেন। তাঁর গ্রন্থের নাম করণ থেকেই এর তাৎপর্য বুঝা যায়। তিনি ছিলেন একজন চিন্ড়াশীল প্রবন্ধকার। লেখক মনুষ্যত্ব বিকাশের উপায় স্বরূপ মানুষকে জ্ঞানে-ধর্মে-কর্মে, অধ্যবসায়, উদ্যম, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা ও চরিত্র বলে উন্নত জীবনের দিকে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।[২২০]

ইসলাম ধর্মকে তিনি মানব জীবনে বাস্ড়বে কাজের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার পথ দেখিয়েছেন। এখানেই তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির বড় স্বার্থকথা। তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ ‘উন্নত জীবন’ (১৯১৯), ‘মহৎ জীবন’ (১৯২৬), ‘মানব জীবন’ (১৯২৭), ‘উচ্চ জীবন’ (১৯২৭), ‘ছেলেদের মহত্ত্ব কথা’ (১৯২৮)‘ছেলেদের কারবালা’ (১৯৩১), ‘রাণী হেলেন’ (১৯৩৪), ‘সত্য জীবন’ (১৯৪০), ‘মহাজীবন’ (১৯৭৫), ‘ধর্ম জীবন’ (১৯৮১), ‘যুবক জীবন’ (১৯৮৫), ‘সরলা’ (১৯১৮), ‘পথহারা’ (১৯১৯), ‘রায়হান’ (১৯১৯), ‘প্রীতি উপহার’ (১৯২৭) ও ‘বাসর উপহার’ (১৯৩০) ইত্যাদি।

১৭. সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮)ঃ

সৈয়দ আবুল হোসেন যশোর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নও মুসলমান মার্মডিউক পিকথলের (Muslim Culture) গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে উপমহাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছেঃ ‘বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা’ (১৯২৮), ‘মুসলিম কালচার’ (১৯২৮) ও ‘মনুষ্যত্ব’ (১৯৩৪) ইত্যাদি।

১৮. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৪০)ঃ

শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, বাগ্মী, সম্পাদক, সংগঠক ও প্রকাশক এয়াকুব আলী চৌধুরীর ব্যক্তিত্ব নানাদিকে বিকশিত হয়েছে। তিনি বর্তমান রাজবাড়ি জেলার পাংশা উপজেলার অন্ড়র্গত

[২২০] . আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৬-৪০৭

নারায়নপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এনায়েতুলণ্ঢাহ চৌধুরী ও মাতার নাম সুন্নাতুন্নেসা খাতুন। তাঁর পূর্বপুরচষের আদি নিবাস ছিল কুষ্টিয়া জেলার হরিনারায়নপুর গ্রামের সন্নিকটে।[২২১]

চিরকুমার এই সাহিত্যিক একজন সাহিত্যসেবকই ছিলেন না, একজন সমাজ সেবকও ছিলেন। তাঁর গ্রামের বাড়িতে নৈশ স্কুল ও পারিবারিক গ্রন্থাগারও স্থাপন করেছিলেন তিনি।[২২২] তাঁর চিন্ড়ার প্রসার ও গভীরতা ইসলামী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। বাংলা ভাষা ও ইসলামী সাহিত্যে তাঁর দান অতুলনীয়।

"ধর্মের পূত-পবিত্র পরিবেশ ও চিন্ড়াধারায় এয়াকুব আলী চৌধুরী তাঁর সাহিত্যিক মানস গড়ে তুলেছিলেন। সেই জন্য তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র একটি ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। সাবলীল ও প্রাঞ্জল গদ্যে বিধাতার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর হৃদয়ের অর্ঘ নিবেদন করেছেন। তাঁর গদ্যের ভাষা কাব্যরসে অভিষিক্ত।"[২২৩] তাঁকে বাংলা ভাষার ইসলামী সাহিত্যের স্রষ্টাও বলা চলে।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "ইসলামী বিষয় লইয়া ইসলামী আওতায় থাকিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় কিনা *নূরনবী ও শান্ড়িধারা*-র মধ্য দিয়া এয়াকুব আলী চৌধুরী তাহার নজির দেখাইয়াছেন।"[২২৪] 'এয়াকুব আলীর রচনার মূল উপজীব্য ইসলামী দর্শন ও সংস্কৃতি। গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব, মাধুর্যপূর্ণ ভাষা ও বলিষ্ঠ বক্তব্যের সমন্বয়ে তাঁর রচনাশৈলী অনন্য। বিশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু হবে এ বিতর্কে তিনি বাংলা ভাষাকেই সমর্থন করেন'।[২২৫] অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন তিনি।

চারটি গ্রন্থ তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা যায়ঃ 'ধর্মের কাহিনী' (১৯১৪), 'শান্ড়িধারা' (১৯২২), মানব-মুকুট' (১৯২৬) ও 'নূরনবী' (১৯১৩)। তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য কিছু প্রবন্ধ হচ্ছে ঃ 'বঙ্গ সাহিত্যে মুসলমান লেখক' (আষাঢ়, ১৩১৮, কোহিনূর), 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য' (মাঘ, ১৩২২, কোহিনূর), 'সাহিত্যসেবা' (চৈত্র, ১৩২২, কোহিনূর), 'ভারতীয় মুসলমান ও স্বাদেশিকতা' (শ্রাবন, ১৩২২, সওগাত) ও 'মুসলমানের সাম্প্রদায়িকতা ও হিন্দুর জাতীয়তা' (আষাঢ়, ১৩৩৪, সওগাত)।

---

[২২১] . মোঃ মোসলেম উদ্দীন জোয়ার্দ্দার, *এয়াকুব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০২) পৃ. ১

[২২২] প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

[২২৩] .আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০২

[২২৪] . আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৮) পৃ. ১৩৪

[২২৫] . *বাংলাপিডিয়া,* ৮ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ১৯৪১-১৯৫০ঃ

১. আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩)ঃ

শিক্ষাবিদ, লেখক ও জাতীয়তাবাদী কর্মী ছিলেন তিনি। শ্রীহট্ট জেলার পাঠানটোলায় জন্ম গ্রহণ করেন। কর্মজীবনের শেষের দিকে বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন। তাঁর অন্ড্রে অবহেলিত মুসলমান সমাজের প্রতি ছিল দরদ মাখা প্রেম ও ভালোবাসা। "কলকাতায় আবদুল করিমের দুটি বাড়ি ছিল। সেখানে তিনি সেসব দরিদ্র মুসলিম ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন, যাদের কলকাতায় থাকার ব্যবস্থা ছিল না।"[২২৬]

ইংরেজ শাসনের অধীনে চাকরি করার সুযোগে তিনি মুসলমানদের প্রকৃত দুর্দশা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে ছিলেন। নিজ যোগ্যতা ও পরিশ্রমের কারণে তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র সভাপতি নিযুক্ত হন।[২২৭] 'মুসলমান শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বাস্ড়ব অভিজ্ঞতা ও চিন্ড়ার ফসল 'মোহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) নামক ইংরাজি গ্রন্থ। এতে বাংলার তৎকালীন মুসলমান সমাজে শিক্ষাগত অবস্থার বিবরণ আছে। তিনি মাদরাসা শিক্ষার পক্ষে ছিলেন, তবে শিক্ষা পদ্ধতির সংস্কারের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। তিনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইসলামিয়াত বা ইসলাম শিক্ষা কোর্স বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারকে সুপারিশ করেন।[২২৮]

'মাদরাসা শিক্ষা সংস্কার করে নিউ স্কিম পদ্ধতি প্রবর্তন আবদুল করিমের আরেকটি উলেণ্ঢখযোগ্য কীর্তি। ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান শিক্ষাদান ছিল এ পদ্ধতির প্রধান উদ্দেশ্য। এতে মাদরাসায় শিক্ষিত ছাত্রদের চাকরি ও বৈষয়িক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়।'[২২৯]

'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' (১৮৯৮) আবদুল করিম প্রণীত প্রথম বাংলা গ্রন্থ।'[২৩০] 'প্রফেট অব ইসলাম এ্ন্ড হিজ টিচিং', ইসলাম এ ইউনিভার্সাল রিলিজিয়ন অব পীস এ্ন্ড প্রোগ্রেস' ইত্যাদি তাঁর সমসাময়িক কালে মুসলিম শিক্ষিত সমাজে বহুল পঠিত ও আলোচিত গ্রন্থ বলে জানা যায়।

২. আবদুল বারী কবিরত্ন (১৮৭৩-১৯৪৪)ঃ

---

[২২৬] . *বাংলাপিডিয়া, ১ম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

[২২৭] . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

[২২৮] . *বাংলাপিডিয়া, ১ম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

[২২৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

[২৩০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৬

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার বাবুপুর গ্রামে আবদুল বারী জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'বরিশাল সার্ভে স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন।[২৩১] ইসলামের খেদমতই তাঁর কাব্য সাধনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বাংলা ভাষার প্রতি বাংলাদেশের আরবী ফার্সী শিক্ষিত মুসলমান ও অভিজাত ধনী মুসলমান একটা অনুদার অবজ্ঞার ভাব হৃদয়ে পোষণ করে আসছেন। আবদুল বারী এই রোগের প্রতিষেধক হিসাবে সুললিত ও সুপরিচিত নিত্য ব্যবহার্য শব্দ সম্ভারের ব্যবহারের দ্বারা তাঁর বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন।[২৩২] তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছেঃ 'কারবালা' (১৯১৩), 'জরিপ শিক্ষা' (১৯০৪), 'ভারতের যুবরাজ', 'ইছালে ছওয়াব' ইত্যাদি।

৩. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)ঃ

বাংলার প্রখ্যাত রাজনীতিক, আযাদী আন্দোলনের অগ্রপথিক, শ্রেষ্ঠ আলিম, বিশিষ্ট আরবীবিদ, ঝানু সাংবাদিক, ধর্ম প্রচারক, গ্রন্থকার, প্রবন্ধকার বাগ্মী ও সমাজ সেবক মৌলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ১৮৭৫ সালের ২২ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলার বর্তমান চন্দনাইশ থানার অন্তর্গত বরমা ইউনিয়নের আড়ালিয়া গ্রামে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মতিউল্লাহ যিনি আরবী-ফার্সী শিক্ষিত প্রাইমারি স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন।[২৩৩] "ইসলামাবাদীর শিক্ষাজীবন শুরু হয় তাঁর পিতার কাছেই। পিতার প্রভাব তাঁর শিক্ষাজীবনের ওপর ছিল প্রচণ্ড। পিতা ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ও ভাষাজ্ঞানী পণ্ডিত। পিতা স্বীয় তনয়কে আপনার ভাবে গড়ে তোলার জন্য প্রথমাবধিই যত্নবান ছিলেন।"[২৩৪]

ইসলামাবাদী যুক্তিনিষ্ঠ ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। ইসলামের আদর্শ প্রচার ও মর্যাদা বৃদ্ধি তাঁর জীবনের ব্রত ছিল সত্য, কিন্তু তিনি কখনও ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেননি। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ব্যাখ্যার উপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন। 'ইসলাম ও বিজ্ঞান', 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' প্রভৃতি প্রবন্ধে তাঁর প্রমাণ আছে।[২৩৫]

---

২৩১ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৬

২৩২. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯৩-৯৪

২৩৩ . ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২) পৃ. ১৩৭

২৩৪ . মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, *মৌলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী রচনাবলী ১ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

২৩৫ . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০২

মাওলানা ইসলামাবাদী অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে মুসলমানদের জাতীয় জাগরণে ব্যাপক অবদান রাখেন। তাঁর প্রতিটি রচনাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জাগরণী বক্তব্য প্রাধান্য পেয়েছে।[২৩৬] ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার নিয়ে হিন্দুরা একটা ইসলাম বিরোধী আন্দোলন চালাতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 'ইসলাম প্রচার' নামক সুন্দর পুস্তকখানা লিখে আমাদের বৃহৎ উপকার সাধন করেছেন। T.W.Arnold প্রণীত Preaching of Islam গ্রন্থে যে চমৎকার আদর্শ স্থাপন করেছেন, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী 'ইসলাম প্রচারে' অনুরূপ বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক পন্থা অনুসরণ করেছেন।[২৩৭]

তিনি সহজ সরল ভাষায় ইসলামকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। "মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী বাংলা গদ্যের একটা বিশিষ্ট রূপ আমাদের সামনে উদঘাটিত করেছেন। মীর মশাররফ হোসেনের গদ্য বহুল পরিমাণে সংস্কৃত বহুল কিন্তু মনিরুজ্জামানের গদ্য তাদৃশ নহে, পরন্তু সহজ ও সরল।"[২৩৮] ইসলামাবাদী তাঁর সাহিত্যে প্রধানত ইসলামের তত্ত্ব ও তথ্যমূলক বিষয়কেই ভিত্তি করেছেন।[২৩৯]

সামাজিক কাজ কর্মের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন। 'চট্টগ্রামে কদম মোবারক মসজিদের পাশে ইসলাম মিশন এতিম খানা প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের অন্যতম প্রধান কাজ।'[২৪০] তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য রচনা সমগ্র হচ্ছেঃ 'মহামান্য তুরস্কের সুলতান' (১৯০১), 'কনষ্ট্যান্টিনোপল' (১৯১৩), 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪), 'ভারতে ইসলাম প্রচার' (১৯১৫), 'খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া' (১৯১৬), 'সমাজ-সংস্কার' (১৯২৩), 'সুদ সমস্যা ও মুসলমান সমাজ', (১৩৩২ বাংলা), 'কোরআনে স্বাধীনতার বাণী' (অভিভাষণ) (১৯১৩), 'নিম্ন শিক্ষা ও শিক্ষকের', 'এছলামের শিক্ষা' (১৩৫৪), 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান', খগোল-শাস্ত্রে মুসলমান', 'আওরঙ্গজেব', 'তুরস্কের বৃহৎ ইতিহাস', 'মোসলেম বীরাঙ্গনা', 'কোরআন ও বিজ্ঞান' ও 'এসলামের নীতি কথা' ইত্যাদি।

৪. রেভারেন উইলিয়ম গোল্ডসেক (১৮৬১-১৯৫০)ঃ

---

[২৩৬] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭

[২৩৭] . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৪

[২৩৮] . প্রাগুক্ত, পৃ.৪০৫

[২৩৯] . আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৫

[২৪০] . হোসেন মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

তিনি অস্ট্রেলিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর কর্ম জীবনকে খ্রিস্টান মিশনারী কাজে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে উৎসর্গ করে দেন। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন।[২৪১] রেভারেন উইলিয়াম গোল্ডসেক একজন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বাংলা ভাষা প্রেমিক ছিলেন। কোনো বিদেশীই তাঁর মতো অবিভক্ত ভারতে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিশেষ করে ইসলাম ধর্ম নিয়ে এত গবেষণা করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁর পরিচিতি সম্পর্কে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন বলেনঃ "তাঁহার আদৌ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। নানাস্থানে সন্ধান করিয়াছি কিন্তু কোন তথ্যই পাওয়া যায় নাই। তবে ধারণা করা যায় যে, তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আমাদের দেশে ছিলেন। সম্ভবত তিনি একজন খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে যশোরে ছিলেন।

উইলিয়াম গোল্ডসেকই খ্রিষ্টানদের মধ্যে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ কোরান শরীফ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনূদিত কোরান শরীফ কলিকাতা ব্যাপটিষ্ট মিশন প্রেস হইতে খৃষ্টান সাহিত্য সমিতির (বঙ্গশাখা) (৪৬ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা) দ্বারা প্রকাশিত হয়। ইহা খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হইয়া ১৯০৮ হইতে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়।"[২৪২]

৫. কাজেম আল কোরায়শী কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১)ঃ

কায়কোবাদ নবাবগঞ্জ জেলার আগলা-পূর্বপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ কাজেম আল কোরায়শী। পিতার নাম শাহমত উলণ্যাহ আল কোরায়শী। ঢাকার সেন্ট গ্রেগরী স্কুল ও ঢাকা মাদরাসায় শিক্ষা জীবন শুরচ ও শেষ হয়। মহাকাব্য রচনায় যে সমস্ড় মুসলমান কবি আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম মহাকবি কায়কোবাদের নাম স্মরণযোগ্য।[২৪৩]

যদিও কায়কোবাদ হিন্দু-মুসলমান মিলনের গান গেয়েছেন। "কিন্তু আমরা কায়কোবাদকে দেখি বরং আশ্চর্য আত্মস্থ, স্থির, ভারসাম্যরূপে এবং হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখলেও কায়কোবাদ শেষ পর্যন্ড় স্বজাতি-স্বধর্মকে বিস্মৃত হননি আদৌ।"[২৪৪]

[২৪১] . ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

[২৪২] . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩-৩৪

[২৪৩] . মোতাহার হোসেন সুফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

[২৪৪] . আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫

আধুনিক বাংলা কবিতায় কায়কোবাদই প্রথম বাঙালি-মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেন।[২৪৫] মহাশ্মশান কাব্য রচনা করে কায়কোবাদ বাংলা সাহিত্যের আসরে তার সুযোগ্য আসন গ্রহণ করেন।[২৪৬]

প্রকৃতপক্ষে কায়কোবাদই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি।[২৪৭] "মহাকবি কায়কোবাদের কাব্যচর্চার বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলে দেখা যায়-মুসলিম কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম স্বজাতির সম্মুখে তাঁদের গৌরবময় অতীত এবং মহৎ ঐতিহ্যের আদর্শ তুলে ধরেছেন। ঘুমন্ড় ও আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাগরণের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর জীবনের-স্বপ্ন।"[২৪৮] তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য রচনাসমূহ হচ্ছেঃ 'কুসুম কানন' (১৮৮১), 'অশ্রুমালা' (১৮৯৬), 'মহাশ্মশান' (১৯০৫), 'অমিয়ধারা' (১৯২৩) 'মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য' (১৯৩৩) 'উপদেশ রত্নাবলী', 'হযরত গাওস পাকের জীবনী', ও 'জোবেদা মহল কাব্য' ইত্যাদি।

৬. এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১)ঃ

তিনি পশ্চিম বঙ্গের হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অন্ডর্গত বড় তাজপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি বিলাতের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন ও ব্যারিস্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অবিভক্ত বাংলায় প্রেসিডেন্সি মেজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করেন। নবুওয়াতে বিশ্বাস ছাড়া মানুষের জীবনে অটল প্রত্যয় সম্ভবপর নয়। ইমাম গাযালীর চিন্ড়াধারাই এস. ওয়াজেদ আলীর মনে সমধিক প্রভাব বিস্ড়ার করেছিল বলে গবেষকগণ মতামত দিয়েছেন।[২৪৯]

এস. ওয়াজেদ আলী বিশ্বাস করতেন, সমাজের সেবাই হচ্ছে ধর্ম সাধনের একমাত্র পথ। ধর্মকে প্রত্যেক যুগে নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে; নব নব সমস্যার, নব নব সমাধানের ব্যবস্থা করতে হবে। নব যুগের আশার সঙ্গে, আকাঙ্খার সঙ্গে নিবিড়ভাবে তাকে সুসংযোজিত করে দিতে হবে। তা যদি করতে না পারা যায়, তাহলে ধর্ম কতকগুলো অর্থহীন বিধিনিষেধের তালিকায় পর্যবসিত হবে।[২৫০]

---

[২৪৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

[২৪৬]. মুসলিম সাহিত্য সেবক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

[২৪৭]. মোহাম্মদ সা 'দাত আলী, *সাহিত্য প্রতিভা* (ঢাকাঃ অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০০৯) পৃ. ২৫

[২৪৮]. মোতাহার হোসেন সুফী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩০

[২৪৯]. জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[২৫০]. এস. ওয়াজেদ আলি, *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী* ১, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

"তিনি মুসলিম ঐতিহ্য ও গৌরবকে পরিচ্ছন্ন গদ্যে, প্রবন্ধে ও গল্পে তুলে ধরেছেন। তাঁর সাহিত্যরস ছিল অত্যন্ড় মার্জিত।"[২৫১] এস. ওয়াজেদ আলী মূলত বোঝাতে সচেষ্ট ছিলেন যে, ইসলামের সঙ্গে দর্শন ও বিজ্ঞানের কোনও বিরোধ নাই। তিনি আরও বলেন, "কেবল অভিধান এবং ব্যাকরণের সাহায্যে ধর্ম বোঝা যায় না, অন্ড়রের সাহায্যও দরকার। যার মন যত বড় সেই ধর্মকে তত বড় ভাবে বোঝে। আর যার মন ছোট সে পন্ডিত হলেও ধর্মকে বিকৃত ব্যাখ্যা করে।"[২৫২] সাহিত্যের জন্য সাহিত্য নয়, এস. ওয়াজেদ আলী সাহিত্য সাধনা করেছেন বিশেষ একটি লক্ষ্যে। আর তা ছিল মুসলিম মানসে ইসলামী চেতনাবোধ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। মুসলিম জাগরণে ইতি বাচক ভূমিকা রাখা।[২৫৩] তাঁর উলেণ্ডখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে: 'জীবনের শিল্প' (১৯৪১), 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (১৯৪৩), 'ভবিষ্যতের বাঙালী' (১৯৪৩), 'আকবরের রাষ্ট্র সাধনা' (১৯৪৯), 'মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ' (১৯৪৯), 'ইকবালের পয়গাম' (১৩৬০ বাংলা), 'গুল-দাস্ড়া' (১৯২৭), 'মাশুকের দরবার' (১৯৩০), 'দরবেশের দোয়া' (১৯৩১), 'ভাঙ্গাবাঁশী' (১৩৩৪ বাংলা), 'গ্রানাডার শেষ বীর' (১৯৪০), 'পশ্চিম ভারতে' (১৩৫৫ বাংলা), ও 'মটরযোগে রাঁচির সফর'(১৯৪৯), 'সভ্যতা ও সাহিত্যে ইসলামের দান' (১৯৪৯), 'ইবনে খালদুনের সমাজ বিজ্ঞান' (১৯৪৯), 'ইসলামের ইতিহাস', 'সুলতান সালাদীন', 'বাদশাহী গল্প (১৯৪৪),ও 'গল্পের মজলিশ' (১৯৪৪) ইত্যাদি।

৭. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯ / ১৮৭১-১৯৫৩)ঃ

বন্দর নগরী চট্টগ্রামের বর্তমান পটিয়া উপজেলার পটিয়ার পাশের সুচক্রদন্ডী গ্রামের এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে আবদুল করিমের জন্ম।[২৫৪] চট্টগ্রাম কলেজ থেকে এফ. এ পর্যন্ড় লেখা পড়া করেন তিনি। তিনি প্রথম জীবনে গ্রামে মধ্য ইংরেজী স্কুলে শিক্ষক এবং মধ্য বয়স থেকে বিভাগীয় বিদ্যালয় পরিদর্শক অফিসে কেরানী ছিলেন।[২৫৫]

পুঁথি সংগ্রাহক হিসাবে তিনি তাঁর সাহিত্য জীবন শুরচ করেন। তিনি ছিলেন সাহিত্যের এক বড় মাপের গবেষক। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের প্রধান অবদান মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের

---

[২৫১] . মোহাম্মদ সা'দাত আলী, পৃ. ৮৮, *মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য, গদ্য* (ঢাকাঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ১৯৮৩)

[২৫২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮ (উদ্ধৃতি)

[২৫৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

[২৫৪]. আহমদ শরীফ, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০২) পৃ. ১৩

[২৫৫] . আহমদ শরীফ, *বাংলার মনীষা* (ঢাকাঃ অনন্যা, ২০০৫) পৃ. ১৪১

সৃষ্টিকর্ম উদ্ধার, সংরক্ষণ ও পর্যালোচনা। সাহিত্যবিশারদ বলেছেন, "ইসলামের সঙ্গে যদি বাংলা সাহিত্যকে রঙাইতে চাহেন, তাহা হইলে আগে ইসলামের রঙে নিজের মন ও দিলকে রঙাইয়া তুলুন। ইসলামের শিক্ষা ও মর্মবাণীকে সর্বাগ্রে নিজের মনে ও দিলে গ্রহণ করচন, হজম করচন।"[২৫৬]

"তাঁর সাধনা ও গবেষণার ফলে বাঙালি জনসাধারণ জানলো যে, বাংলা সাহিত্যের আদি কবি মুসলমান, বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তুতে বৈচিত্র্য প্রদান করে প্রথম মুসলমান কবিগণ। প্রথম মৌলিক কাব্য রচনা করেন মুসলমান কবি মরদন ও মাগন ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে প্রথম শালীনতা দান করেন মুসলমান কবি আলাওল। এক কথায় তিনিই জানিয়ে দিলেন যে, বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি, পুষ্টি ও বৈচিত্র্য সাধনের মূলে রয়েছে প্রথমত ও প্রধানত মুসলমানদের সাধনা"[২৫৭]।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই মুসলিমদের মনে জাগিয়েছিলেন আত্মসম্বিৎ, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মজিজ্ঞাসা।[২৫৮]

পুথি সম্পাদনাসহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও ইতিহাস বিষয়ক তাঁর পনেরখানি গ্রন্থ আছে। 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' (১৯০৪), 'ইসলামাবাদ' (১৯১৮), 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' (১৯৩৫), আবদুল করিম ও মুহম্মদ এনামুল হক যুগ্মভাবে রচনা করেন।[২৫৯]

৮. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)ঃ

চিন্ড়শীল মনীষী ও লেখক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী বর্তমান সাতক্ষীরা জেলার বাঁশদহা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মোহাম্মদ ইব্রাহীম ও মাতার নাম শামসুননেসা। ওয়াজেদ আলী নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা মানুষ ছিলেন।[২৬০] "সাহিত্যসেবক অনেকেই আছেন, ছিলেন এবং থাকবেন, কিন্তু ওয়াজেদ আলীর ন্যায় এমন সত্যনিষ্ঠ, নিরহঙ্কার, মহাপ্রাণ, সমাজ ও সাহিত্যের জন্য নিবেদিত চিত্ত সাহিত্য

[২৫৬]. আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

[২৫৭]. জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

[২৫৮]. মোহাম্মদ সা'দাত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[২৫৯]. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯০

[২৬০]. হাবিব রহমান, *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০৩

সেবকের দৃষ্টান্ড় সবদেশেই বিরল।"[২৬১] ধর্মীয় জীবন, সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবনের বিবিধ সমস্যাকে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী যুক্তিনিষ্ঠার সঙ্গে বিচার-বিশেণ্ঢষণ করেছেন।[২৬২]

তাঁর লেখার মধ্যে আলাদা একটা আকর্ষণবোধ পাঠকমাত্রই অনুভব করেন। "তাঁর গদ্যে আছে এমন একটি স্বাদুতা ও ললিত গতিভঙ্গি যা পাঠককে আকর্ষণ না করে পারে না।"[২৬৩] তাঁর সমস্ড় লেখনির মাধ্যমে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতার দাবি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। "মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর জীবনদৃষ্টির একটি উজ্জ্বল দিক হচ্ছে সাম্যবাদী জীবনাদর্শে গভীর বিশ্বাস। সামাজিক ও আর্থিক উভয় ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে বিভেদ লুপ্ত করে মানব জীবনে সমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখেছেন।"[২৬৪]

'সাম্যবাদী', 'দৈনিক খাদেম', 'সওগাত', 'দি মুসলমান' ও 'বুলবুল' ইত্যাদি পত্রিকা তিনি বিভিন্ন সময় সম্পাদনা করেন। তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য গ্রন্থসমূহ: জীবনী গ্রন্থ: 'মরচ-ভাস্কর', 'সৈয়দ আহমদ', 'মহামানুষ মুহসিন', 'ছোটদের হজরত মোহাম্মদ', 'নওয়াব আবদুল লতিফ' ও 'মোহাম্মদ আলী'। বাংলা একাডেমী মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধ সংকলন করে 'সমাজ ও রাষ্ট্র', 'ভাষা ও সাহিত্য', 'আলোচনা ও প্রত্যালোচনা', 'শিক্ষা' ইত্যাদি শিরোনামে *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী ১ম ও ২য় খ ন্ড* আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় ১৯৯২ সালে প্রকাশ করেছে।

৯. সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬)ঃ

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের খিলগাঁও গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সৈয়দ নাজিম উদ্দীন। ঢাকার জগন্নাথ কলেজে আই. এ. পর্যন্ড় লেখা পড়া করেন। কর্ম জীবনে তিনি পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। "সৈয়দ এমদাদ আলী গদ্য রচনার ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। নানা পত্র-পত্রিকায় তিনি চিন্ড়াশীল প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার সম্পাদিত 'নবনূর' মুসলমান সমাজে এক অভূতপূর্ব চেতনার সৃষ্টি করে।"[২৬৫]

এমদাদ আলী চিন্ড়া ও কর্মে ইসলামী মানবতাবাদী ছিলেন। অবিভক্ত বাংলার অবহেলিত মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশা দূর করে উন্নত জীবন দর্শন উপহার দেয়াই তাঁর সাহিত্য সাধনার উদ্দেশ্য ছিল। পুলিশ জীবনে

[২৬১]. জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

[২৬২]. আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯

[২৬৩]. হাবিব রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.৯২

[২৬৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

[২৬৫]. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১০

সততার জন্য তৎকালীন সরকার তাঁকে 'খান সাহেব'[২৬৬] উপাধিতে ভূষিত করেন। তাঁর উলেণ্টখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছেঃ 'ডালি' (১৯১১), 'তাপসী রাবেয়া', (১৯১৭), 'সাহিত্যকুসুম' (১৯১৯), 'সেকেন্দ্রা' (১৯১৯) ও 'হাফিজা' (১৯২৯) ইত্যাদি।

১০. মুহাম্মদ আবদুল হাকিম (১৮৭৬-১৯৫৭)ঃ

গোপালগঞ্জ জেলার মোকসুদপুর থানার নগরসুন্দরী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটে কলকাতায়। ইসলামী ভাবধারার একজন লেখক ও প্রবন্ধকার ছিলেন তিনি। তাঁর সমসাময়িক কালে 'মোসলেম হিতৈষী', 'মোসলেম', 'বঙ্গনূর', প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনার সূত্রে জড়িত ছিলেন। ১৯২৩ সালে 'ইসলাম দর্শন', 'হানাফী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন।

ইসলামের ফিকাহ বিষয়ে তাঁর উলেণ্টখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে 'সরহে বেকায়া' এর অনুবাদ। যা ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড (১৯১৮)। পবিত্র কুরআন শরীফও (১৯২২-১৯৩৮) তিনি অনুবাদ করেন।[২৬৭] 'প্রতিবাদ' (১৩২৭ বাংলা), 'মিলন' (১৩২৬) ইত্যাদি তাঁর সমাজ চেতনামূলক গ্রন্থ। সম্ভবত বর্তমানে তাঁর রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য। ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রাচীন গণ-গ্রন্থাগারগুলোতে অনেক চেষ্টা করেও তাঁর এ জাতীয় গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। ১৯৫৭ সালের ৮ জানুয়ারি স্বীয় গ্রামের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১১. শেখ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২)ঃ

সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শেখ হবিবুর রহমান যশোর জেলার গোযগাতি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। এল. টি পাশ করে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরচ করেন। 'সাপ্তাহিক মোহাম্মদী', 'বঙ্গনূর' ইত্যাদি পত্রিকায় তিনি সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। সাহিত্য জীবনে শেখ হবিবুর রহমান ছিলেন একাধারে কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিশু পাঠ্যপুস্ড়ক প্রণেতা।[২৬৮] নদীয়া সাহিত্য সভা কর্তৃক তিনি সাহিত্যরত্ন উপাধিতে ভূষিত হন।[২৬৯] 'মহাকবি শেখ সাদির বুলিস্ড়র বঙ্গানুবাদ' (১৯৩৩), 'বুস্ড়র বঙ্গানুবাদ' (১৯৩৪), 'ভারত সম্রাট বাবর' (১৯৩৬) ও 'মরনের পরে' (১৯৫০) ইত্যাদি তাঁর রচিত গ্রন্থ।

১২. মুহাম্মদ সেরাজুল হক (১৯০৩-১৯৬৩)ঃ

---

[২৬৬]. *বাংলাপিডিয়া*, ১০ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭০

[২৬৭]. কাজী দীন মুহাম্মদ *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

[২৬৮]. জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

[২৬৯]. *বাংলাপিডিয়া*, ৯ম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১১

পাবনা জেলার অন্তর্গত তাড়াশ থানায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের প্রধান ও গুরচ বন্ধু সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজীর সহবত তিনি দীর্ঘকাল লাভ করেন।[২৭০] 'সিরাজী চরিত' (১৯৩৫), 'ইসলামের বৈশিষ্ট্য', 'মোসলেম সমস্যা', 'টুটিল তিমির রাত্রি', 'শেরেক ধ্বংস ও ঈমান রক্ষা' ইত্যাদি তাঁর দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বলে জানা যায়।[২৭১]

১৩. কাজী আকরম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩)ঃ

খান জাহান আলীর স্মৃতি বিজড়িত খুলনা জেলার পয়গাম কসবায় কাজী আকরম হোসেন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি এম.এ পর্যন্ড় লেখা পড়া করেন। কর্ম জীবনে তিনি বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করেন। 'ইসলামের ইতিকথা', 'ইসলাম কাহিনী', 'নওরোজ', 'সম্ভাষণ', 'মসনবী', 'করীমা' ও 'আমপারার অনুবাদ' ইত্যাদি রচিত গ্রন্থ।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে বলেন, "তিনি বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত ইসলামী ভাবধারার প্রবর্তনে প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন"[২৭২]।

১৪. খান বাহাদুর আবদুর রহমান (১৮৮৯-১৯৬৪)ঃ

তিনি মাদারীপুর জেলার শিবচর থানার অন্তর্গত ভান্ডারীকান্দী নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ও 'ল পরীক্ষায় পাশ করেন। কর্ম জীবনের শেষের দিকে অবিভক্ত বাংলার জনশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক পদ লাভ করেন। শিক্ষা বিভাগে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য তৎকালীন সরকার তাঁকে 'খান বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। মুসলিম জাতিকে ধর্মীয় চেতনায় অনুপ্রাণিত করাই ছিল তাঁর আজীবন সাধনা।[২৭৩]

'মোসলেম নারী' (১৯২৭), 'চার ইয়ার' (১৯৩২), 'পাঁচ সুরা শরীফ (১৯৮৪), 'শেষ নবী' (১৯৪৯), 'আমপারা' (১৯৫০), 'ইসলাম পরিচিতি' (১৩৫৯ বাংলা), 'কুরআন শরীফ' (১৯৫২), 'হাদীস শরীফ' (১৯৫৫), 'ইসলামিক তমদ্দুন ও পাকিস্ড়ান' (১৯৫৬), 'নয়া খুৎবা' (১৩৬৬ বাংলা), 'সহীহ বুখারী শরীফ' (১৯৬১) ও 'জাওয়াহিরচ্ল কুর-আন' (১৯৬২) ইত্যাদি তাঁর রচিত অমূল্য গ্রন্থ।

---

২৭০ . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২

২৭১ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০২

২৭২ . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৩

২৭৩ . জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

১৫. গোলাম মোস্ড়ফা (১৮৯৭-১৯৬৪)ঃ

কবি, সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্ড়াবিদ ও দার্শনিক গোলাম মোস্ড়ফা ঝিনাইদহ জেলার শৈলকুপা থানার কুমার নদীর তীরে মনোহরপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী গোলাম রব্বানী ও পিতামহ কাজী গোলাম সারওয়ার। এঁরা উভয়ই ছিলেন শিক্ষিত ও কাব্যপ্রেমিক।[২৭৪] শিক্ষা জীবনে বি.এ., বি.টি. পর্যন্ড় লেখা পড়া করেন তিনি।

আর কর্ম জীবনে তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন হাই স্কুলে শিক্ষকতা করে জীবন কাটিয়ে দেন। সম্ভ্রান্ড় মুসলিম পরিবারের জাতক গোলাম মোস্ড়ফা ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন ইসলামী ভাবাপন্ন কিন্তু সর্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল কবি-ব্যক্তিত্ব।[২৭৫] তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সমসমায়িক কালে সকলের নিকট সমানভাবে আদরণীয় ছিল। তিনি গদ্য ও পদ্য রচনায় সমান দক্ষ ছিলেন। “তাঁর কাব্য হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল পাঠকের মনোরঞ্জন করে।”[২৭৬]

তিনি ইসলামকে ধর্ম হিসেবে যেমন আপনার করে গ্রহণ করেছেন, ঠিক তদ্রূপ ইসলামকে যারা কলুষিত করতে চেয়েছেন তাদের বিরচদ্ধে কলম ধরতে গিয়ে রাসুলের (সা.) জীবন থেকে উদাহরণ টেনে সবাইকে ইসলামের আলোকে রঞ্জিত হতে উৎসাহিত করেছেন। ইসলামী সংস্কৃতি ও দেশপ্রেম নিয়ে তিনি অনেক গানও রচনা করেছেন। ইসলামী গানের গীতিকার ও গায়ক হিসাবেও তাঁর পরিচিতি আছে।[২৭৭]

তাঁর রচিত ও অনূদিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছেঃ ‘আমার চিন্ড়াধারা’, ‘গোলাম মোস্ড়ফা প্রবন্ধ সংকলন’ (১৯৬৮), ‘ইসলাম’, ‘বিশ্বনবী’ (১৯৪২), ‘বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য’, ‘ইসলাম ও কমিউনিজম’, ‘ইসলামে জেহাদ’, ‘মরচ দুলাল’ ‘হজরত আবু বকর’, ‘রক্তরাগ’ (১৯২৪), ‘খোশরোজ’ (১৯২৯), ‘বনি আদম’ (১৯৫৮), ‘বুলবুলিস্ড়ান’ (১৯৪৯), ‘রূপের নেশা’, ‘মুসাদ্দাস-ই-হালী’ (১৯৪১), ‘কালামে ইকবাল’ (১৯৫৭), ‘শিকওয়া ও জওয়াব-ই-শিকওয়া’ (১৯৬০), ‘আল-কুরআন’ (১৯৫৮), ‘এখওয়ানুস সাফা’ (১৯২৭) ইত্যাদি।

১৬. বেগম শামসুননাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪)ঃ

---

[২৭৪] . *কবি গোলাম মোস্তফা স্মৃতি ও অবদান*, মুনশী আবদুল মাননান সম্পা (ঢাকাঃ বিশ্ব পরিচয়, ২০০৩) পৃ. ২৭০

[২৭৫] . মোহাম্মদ সা 'দাত আলী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

[২৭৬] . জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২

[২৭৭] . *বাংলাপিডিয়া*, ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

তিনি নোয়াখালী জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলভী মুহম্মদ নুরচ্লণ্ঢাহ। আর পিতামহের নাম মৌলভী ফজলুল করিম বি-এল, যিনি একজন সমাজকর্মী শিক্ষাবিদরূপে ঐ এলাকায় খ্যাতি অর্জন করে ছিলেন। শিক্ষা জীবনে শামসুননাহার ১৯৩২ সালে বি. এ. ও ১৯৪২ সালে বাংলা বিভাগ থেকে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও চিন্ড় াবিদ ছিলেন। বেগম রোকেয়া (১৮৮০-১৯৩২) এর অব্যবহিত পর অবহেলিত নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন তিনি। 'বাঙ্গালী মুসলমান মহিলাদের জাতীয় জীবনে বেগম নাহার একটি গৌরবময় ব্যক্তিত্ব-নারীদের অধিকার আদায়ের পথে তিনি এলেন দৃপ্ত বীরাঙ্গনার অবিচল পদক্ষেপে। শুধু নারীদের জন্য নয়, যেখানে মানবতার প্রতি অবিচার হয়েছে, যেখানে নৈসর্গিক দুর্বিপাকে মানবতা লাঞ্চিত হয়েছে, সেখানেই দরিদ্র প্রাণ নাহার ছুটে গেছেন সকল ব্যক্তি-স্বার্থকে তুচ্ছ করে'।[২৭৮]

বেগম সাহেবা মোট নয়খানা গ্রন্থের লেখিকা বলে জানা যায়। তাঁর উলেণ্টখযোগ্য গ্রন্থাবলী হচ্ছেঃ 'পূণ্যময়ী', 'রোকেয়া জীবনী' (১৯৩৭), 'ফুল বাগিচা', 'বেগম মহল' (১৯৩৮), 'ছেলেবেলার ব্যর্থসাধন' (১৯৩১), 'শিশুর শিক্ষা' (১৯৩৯), 'আমার দেখা তুরস্ক' (১৯৫৫) ও 'নজরচ্লকে যেমন দেখেছি' ইত্যাদি।

১৭. খান বাহাদুর আহছানউলণ্ঢা (১৮৭৩-১৯৬৫)ঃ

আহছানউলণ্ঢাহ নামে সুপরিচিত। সাতক্ষীরা জেলার নলতা গ্রামে ১৮৭৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক, সুফী, ধর্মবেত্তা, শিক্ষাসংস্কারক ও সমাজসেবক। বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর আজীবন সংগ্রাম ও সততার সাথে দায়িত্ব পালনের জন্য বৃটিশ সরকার তাঁকে ১৯১১ সালে 'খানবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তিনি ছিলেন একজন সুফী ও নিবেদিত প্রাণ মুসলমান। মানবসেবাকে তিনি সবচেয়ে বেশি গুরচ্ত্ব দিতেন। তিনি ১৯৩৫ সালে মানবসেবার মহান ব্রত নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন আহ্ছানিয়া মিশন, যা আজ বাংলাদেশে হাজার হাজার আর্তপীড়িত মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। আহ্ছানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালও প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। "সুদীর্ঘ তেত্রিশ বছরের চাকরির জীবনে আহ্ছানউলণ্ঢা একদিকে ছিলেন

---

[২৭৮] . অধ্যাপক মজির উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা* (ঢাকাঃ দিদার পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৭) পৃ. ৯১

আদর্শবাদী ও কর্তব্যনিষ্ঠ, অন্যদিকে ছিলেন অবহেলিত ও পশ্চাৎপদ মুসলমানদের শিক্ষা সম্প্রসারণে অত্যন্ড়ু তৎপর। তিনি মুসলমানদের শিক্ষার উন্নয়নে নানাবিধ কল্যাণমুখী ও সুদূরপ্রসারী সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেন। তিনিই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাদরাসার শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির মানোন্নয়ন করে মাদরাসা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের উচ্চ শিক্ষালাভের পথ উন্মুক্ত করেন। তিনি স্কুল ও কলেজে হিন্দু পণ্ডিতের সমতুল্য মৌলবি পদ সৃষ্টি ও টেকস্টবুক কমিটিতে মুসলিম সদস্যপদ রাখার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন"।[২৭৯]

তাঁর লিখিত ও প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে ইসলামী আকীদা ও নীতি বিষয়ক বইগুলো হচ্ছে: 'নীতি ও ধর্ম শিক্ষা এবং চরিত্র গঠন' (১৯২৯), 'আল-ইছলাম' (১৯৩০), 'মোসলেমের নিত্য-জ্ঞাতব্য (ধর্ম) মাছআলা সম্বলিত' (১৯৪৯), 'ইসলামের মহতী শিক্ষা' (১৯৬৩), 'দোয়া ও দরূদ' (১৯৪৯), 'ইসলাম ও জাকাত' ১৯৫১) ও 'নামাজ শিক্ষা' ফেকাহ (১৯৬৬) । তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, আত্মজীবনী, ধর্ম ও সৃষ্টিতত্ত্ব হযরত মোহম্মদের জীবনী ও পাঠ্যপুস্ড়ক সহ প্রায় ৮০ টি গ্রন্থ রচনা করেন। উলেণ্ঢখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য', 'ইসলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ' (১৯২৬), 'হেজাজ ভ্রমণ' (১৯২৯), 'শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান' (১৯৩১), 'তরিকত শিক্ষা' (১৯৪০) ও History of the Muslim World (১৯৩১) ।

১৮. গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৫)ঃ

যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে তিনি শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। তিনি একাধারে কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। 'গোলাম হোসেন কবি হিসেবে ছিলেন ক্লাসিকরীতি প্রিয়-মধুসুদন, হেম-নবীন ও কায়কোবাদের উত্তর সাধক, কিন্তু তাঁর গদ্যরীতি ছিল অনাড়ম্বর ও প্রাঞ্জল'।[২৮০] তাঁর গ্রন্থসমূহ হচ্ছে, 'বঙ্গবীরাঙ্গনা কাব্য' (১৯০৬), 'কাব্যযুথিকা' (১৯৬০), 'বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান' (১৯১০), 'দিলণ্টী-আগ্রা ভ্রমণ' ও 'নীতি প্রবন্ধ মুকুল' ইত্যাদি।

১৯. মুহাম্মদ হাবীবুলণ্ঢাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬)ঃ

[২৭৯] *বাংলাপিডিয়া ১ম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

[২৮০] . মুহম্মদ আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২

রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ক্রীড়াবিদ ও সংগঠক হাবিবুলণ্ঢাহ বাহার চৌধুরীর জন্মস্থান নোয়াখালি শহরে। পৈতৃক নিবাস নোয়াখালি জেলার পরশুরাম থানার গুথুমা গ্রামে। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন।

মুসলিম লীগের জাতীয় নেতা ছিলেন তিনি। ১৯৫৪ সালে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তনে আজীবন সংগ্রাম করে যান এ কর্মবীর। সাহিত্য সাধনারও মূল উদ্দেশ্য ছিল তাই। "সেকালের মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তুলে আত্মসচেতন করে তোলার ব্যাপার তাঁর অবদান অপরিসীম। জীবনের সব দিক দিয়ে সেকালের মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন এবং 'বুলবুল' সাময়িকীর মাধ্যমে জাগরণ আনয়নের চেষ্টা চালান। তাঁর এই অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে আমাদের জাতীয় ইতিহাসে।"[২৮১] তিনি মহা মনীষীদের জীবনী, সাহিত্য ও ইতিহাসের উপর অনেক গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে: 'ওমর ফারচক' (১৯৩১), 'আমীর আলী' (১৯৩৪), 'কবি ইকবাল' (১৯৩৪), 'মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ', 'পাকিস্ড়ান', 'কবি ইকবাল ও পাকিস্ড়ান', 'মুহম্মদ মহসিন', 'মুহম্মদ আলী', 'সৈয়দ আহমদ', 'সলিমুলণ্ঢাহ', 'মিশর বিজয়', 'রাজস্বনীতি', 'ইতিহাসের আহ্বান', 'গুলিস্ড়ার গল্প', 'ওমর খৈয়াম', 'আমাদের সাহিত্য', ও 'নজরচ্ল ইসলাম' ইত্যাদি।

২০. মৌলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)ঃ

১৮৬৮ সালের ৭ জুন বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার হাকিমপুর গ্রামে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল বারী খাঁ ও তাঁর মাতার নাম রাবেয়া খাতুন। তাঁর পিতা আরবী ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষিত ও সুপন্ডিত ও আহলে হাদীস[২৮২] সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

আকরম খাঁ একাধারে উপমহাদেশের ধর্মতত্ত্ববিদ, সমাজ সংস্কারক, সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। পশ্চাদপদ বাঙালি মুসলমানদের কুসংস্কার ও ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরচদ্ধে যুক্তিবাদী লেখক ছিলেন আকরম

---

[২৮১]. জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

[২৮২]. আহলে হাদিস মুসলমানদের মধ্যে একটি বিশেষ সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় ব্যক্তি বিশেষ বা ইমামগণের বক্তব্য অন্ধ অনুসরণের পূর্ণ বিরোধী। আলণ্ঢাহর একত্ববাদের ধারণার কিঞ্চিত ব্যাঘাত ঘটাতে পারে এমন যে কোন ধর্মীয় বিশ্বাসের ও তাঁরা বিরোধী। তথ্য সূত্রঃ *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫) পৃ. ৮ ও *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খন্ড* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২) পৃ. ৯৫

খাঁ। ব্রিটিশ ও পাকিস্ড়ান আমলে তাঁর লেখনি জনগণের মধ্যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি করে। তাঁর লিখিত সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও কবিতা সবই ইসলাম ও বাঙালি মুসলমানের জীবন ধারার ব্যাখ্যা।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য যে কয়েকজন ব্যক্তি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন, জনাব খাঁ তাঁদের অন্যতম। তাঁর সময়কালে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে কবিরাজ, ঝাড়-ফুক ও তাবিজ-তোমার এর প্রভাব ছিল খুব বেশি । আকীদা বিশ্বাসে ছিল নানা ধরনের কুসংস্কার। আকরম খাঁর ভাষায়: "অলি ইমামকে নবীর আসনে ও নবীকে আলণ্ঢার আসনে বসাইয়া দিতে সে সততই উৎসুক, অন্যথায় তার ধর্ম সাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়। মুছলমানেরা জাতীয় ভাবধারার প্রত্যেক স্ড়রে এই মহাব্যাধি অতি মারাত্মকরূপে সংক্রমিত হইয়া পড়িয়াছে।"[২৮৩]

এ সমস্ড় বিষয়ে কুরআন-হাদীস অনুযায়ী সঠিক-স্বচ্ছ ধারনা মুসলমানদের মধ্যে প্রচারের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। আর এরই অংশ হিসাবে তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনি চালিয়ে যান। তাঁর অনেকগুলো লেখনির মধ্যে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস নিয়ে নিম্নলিখিত বইগুলো উলেণ্ঢখযোগ্য: 'যীশু কি নিস্পাপ' (১৯১৫), 'এসলাম মিশন' (১৯১৭), 'সমস্যা ও সমাধান' (১৯৩৯), 'বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃস্টান ধর্ম' (১৯৬২), 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' (১৯৬৫)। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থাবলীঃ 'কোরআন শরীফ-বঙ্গানুবাদ' (১৯০৫), 'উম্মুল কেতাব' (১৯২৯), 'মোস্ড়ফা চরিত' (১৯২৫), 'মোস্ড়ফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য' (১৯৩১), 'তাফছীরচ্ল কোরআন (প্রথম-পঞ্চম, ১৯৫৯) ইত্যাদি।

২১. মুহাম্মদ এমদাদ আলী (১৮৯১-১৯৬৯)ঃ

পিরোজপুর জেলার ভান্ডারিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ভান্ডারিয়ার মাইনর স্কুলেই লেখাপড়া করেন। দরিদ্র্যতার কারণে লেখাপড়ায় বেশি দূর যেতে পারেন নি তিনি। কর্মজীবনে তিনি কিছুকাল মুহুরিগিরি ও শিক্ষকতাও করেন। একজন প্রাবন্ধিক হিসেবে সাহিত্য মহলে তাঁর পরিচিত রয়েছে। তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে: 'তরিকুল ইসলাম বা মোসলেম নীতি' (১৯১৭), 'মোসলেম মালা' (১৯২০), 'হুক্কা-বিনাশ বা ধূমপানের অপকারিতা' (১৯২১), 'জুমার দ্বিধাভঞ্জন' (১৯১৮), 'কুরীতি বর্জন' (১৯২৩), 'হক কথা' (১৯২৮), 'উপদেশমালা' (১৯৩০), 'ওয়াজে ইসলাম' (১৯৩০), 'স্বভাব দর্পণ' (১৯৩৫), 'এজহারচ্ল হক বা জুমার লিখিত বাহাছ' (১৯৩৬), 'হজরতের ভবিষ্যৎ বাণী বা বর্তমান দশা' (১৯৩৭), 'নামাজ শিক্ষা বা দীনিয়াত শিক্ষা' (১৯৩৭), 'জবেহ প্রণালী' (১৯৩৮), 'চারি তরিকার সংক্ষিপ্ত অজিফা'

---

[২৮৩]. *মওলানা আকরম খাঁ*, আবু জাফর সম্পা. (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭) পৃ. ৩৫৬

(১৯৩৯), 'স্বামী স্ত্রীর তর্ক যুদ্ধ বা শান্ড়িসোপান' (১৩৪৭ বাংলা) ও 'আমার সৌভাগ্য জীবন' (১৯৫৪) ইত্যাদি।

২২. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্চাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)ঃ

অবিভক্ত বাংলার চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার অন্ড়র্গত পেয়ারা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মফিজউদ্দিন আহমদ ও মাতার নাম হুরচন্নেসা। পিতার কর্মস্থল হাওড়াতে হওয়ায় তিনি হাওড়া স্কুলে এন্ট্রান্স পর্যন্ড় লেখাপড়া করেন।[২৮৪] "এন্ট্রান্স পাশ করার আগেই সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহ ও চেষ্টায় তিনি গোটা সাতেক ভাষা মোটামুটি রকম পড়তে শিখে ফিলেন।"[২৮৫] এন্ট্রান্স পাশ করার পর তিনি কলকাতা মাদরাসায় এফ.এ. পড়ার জন্য ভর্তি হন। কলকাতা মাদরাসা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

সেই অর্থে তিনি ১৯০৬ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ. পাশ করেন।[২৮৬] এই কলেজ থেকেই সংস্কৃতে বি.এ. পাশ করেন।

কিন্তু যখন তিনি একই বিষয়ে এম.এ. করার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন, তখন এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। ডঃ সুকুমার সেনের বর্ণনায়ঃ "শহীদুলণ্চাহ কলেজের ভালো ছাত্র ছিলেন। সংস্কৃতিতে অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেছিলেন, তারপর তিনি যথারীতি এম.এ. পড়ার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ভর্তি হলেন বটে, কিন্তু ক্লাস করতে পারলেন না। যে পন্ডিত এম.এ. ক্লাসে বেদ পড়াতেন তিনি শহীদুলণ্চাহর মতো অহিন্দু ছাত্রকে বেদ পড়াতে রাজি হলেন না। শহীদুলণ্চাহ আশু বাবুর শরণ নিলেন, কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারলেন না। তারপর আশুতোষের উপদেশেই তিনি কম্প্যারাটিভ ফিললজি বিভাগে নাম লেখালেন।"[২৮৭]

১৯১২ সালে মুহম্মদ শহীদুলণ্চাহ তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে এম.এ পাশ করেন। মুহম্মদ শহীদুলণ্চাহর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাজীবন যেমন অখন্ড এবং অব্যাহত ছিল না, ঠিক তেমনি পেশাগত জীবনে নানা উত্থান

---

[২৮৪] . মনসুর মুসা, *মুহম্মদ শহীদুলণ্চাহ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) পৃ. ৩

[২৮৫] . মোরশেদ সফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া* (ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী, ২০০৭) পৃ. ১১২

[২৮৬] . প্রাগুক্ত, পৃ.৪

[২৮৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪, সুকুমার সেন= শক শাস্ত্রবিদ মুহম্মদ শহীদুলণ্চাহ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুলণ্চাহ স্মারক গ্রন্থ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ.৬৩

পতন ঘটেছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছুটেছেন কলেজে আবার সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এসেছেন। কিন্তু থেমে থাকেন নি। বন্ধ হয়নি জ্ঞান সাধনা ও ধর্ম-সাধনা।[২৮৮]

বহু ভাষাবিদ, সাধক, পণ্ডিত ও জ্ঞানতাপস এই ইসলামী চিন্তাবিদ ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি তিনি ইসলাম ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত লেখনির মাধ্যমে ইসলামের সেবা করার চেষ্টা করে গেছেন। "শহীদুল্লাহর কর্ম জীবন বহুধা বিভাজিত। পেশা হিসেবে অধ্যাপনাকে গ্রহণ করলেও মিশন হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন ইসলাম প্রচারকে। ১৯২৩ সালের গ্রীষ্মবকাশে 'মালাকান' রাজপুতদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য রাজপুতনা গমন করেন। বছরের শেষ দিকে 'আঞ্জুমান-ই-ইশা-আৎ-ই-ইসলাম' নামে ইসলাম প্রচার সমিতি গঠন করেন। ঢাকায় কতিপয় অমুসলমানকে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষা দান করেন।"[২৮৯]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রতি শুক্রবার ধর্মীয় বক্তৃতার আয়োজন করতেন এবং প্রতি রোববার বিকালে কুরআন শিক্ষা ক্লাসের ব্যবস্থা করতেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের এই সাংস্কৃতিক কর্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কর্ম বলে উল্লেখিত হয়েছে। এই সময়ে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ 'পীস' নামে একটি ইংরেজি সাময়িকী প্রকাশ করতেন।[২৯০] শহীদুল্লাহর চিন্তাচর্চার বড় অংশ জুড়েই ছিল ভাষা ও সাহিত্য। এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে ও বৃহত্তর অর্থে সংস্কৃতির প্রশ্নটি এসেছে। এ ছাড়া ধর্মও ছিল তাঁর একটি প্রধান অনুধ্যানের বিষয়, যা শেষ বিচারে সংস্কৃতিরই অঙ্গীভূত।[২৯১]

তিনি বাস্তব জীবনে ইসলামের আচার-অনুষ্ঠান পালন করার ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও তা বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাহিরে তিনি কোন কাজকে শরীয়ত বিরোধী কাজ বলে মনে করতেন। হালাল ও পরিশুদ্ধ জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা সজাগ ছিলেন। ব্যক্তিগত

---

[২৮৮]. জাফর আলম, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৬

[২৮৯]. মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[২৯০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[২৯১]. মোরশেদ সফিউল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে প্রায় গোঁড়া বা রক্ষণশীল অবস্থান বজায় রেখেও ভিন্ন ধর্ম ও মতের প্রতি উদার ও সহিষ্ণু মনোভাব গ্রহণ আমরা শহীদুলণ্ঢাহকে দেখতে পাই।[২৯২]

শহীদুলণ্ঢাহ ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদেও বিশ্বাসী ছিলেন।[২৯৩] তিনি ছিলেন ইসলামের উদার মানবতাবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। সমাজের উঁচু নিচু যে কোন স্ড়রের মানুষের দাওয়াতে সুযোগমতো তিনি যেতেন।[২৯৪]

বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য মাতৃভাষায় বই-পুস্ড়ক রচনার প্রয়োজনীয়তা তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন। 'বাংলার মুসলমানকে ইসলামী ঐতিহ্যে পুষ্ট ও ইসলামী অনুশাসন প্রতিপালনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কীয় পুস্ড়কাদি বাংলা ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেন। এ লক্ষ্যে ১৯৪০ সালে অনুষ্ঠিত All India Muslim Education Conference এর পুনা অধিবেশনে তিনি এক প্রস্ড়াব উত্থাপন করেন যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল সাহেব এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন।'[২৯৫]

সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, ভাষা ও সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি নিয়মিত প্রবন্ধ, নিবন্ধ ও বই-পুস্ড়ক লিখেছেন। ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য রচনাসমগ্র হচ্ছে: 'অমীয় বাণী শতক' (১৯৪১), 'দীওয়ান-ই-হাফিজ' (১৯৩৮), 'রূবাইয়াত-ই-উমরখয়াম' (১৯৪২), 'শিকওয়াহ ও জওয়াব-ই-শিকওয়াহ (১৯৪২), 'ইকবাল' (১৯৪৬), 'মহাবাণী', 'বইয়াতনাম' (১৯৪৮), 'প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থে শেষ নবী', 'হজ্বের ও রওযা পাকের যিয়ারতের দোআ দরূদ' (১৯৫৭), 'তাজরীদুল বোখারী' (১৯৫৮), 'কুরআন প্রসঙ্গ' (১৯৬৯), 'শেষ নবীর সন্ধানে' (১৯৬০), 'মহরম শরীফ' (১৯৬২), 'ছোটদের রাসুলুলণ্ঢাহ' (১৯৬২), 'রোযাহ, ঈদ ও ফিৎরা (১৯৬৩), 'অমর কাব্য' (১৯৬৩), 'ইসলাম প্রসঙ্গ' (১৯৬৩), 'ঈদুল আযহা কুরবানীর আহকাম; (১৯৬৩), 'কুরআন ও ইসলাম সম্বন্ধীয় প্রবন্ধের সংকলন' (১৯৬৯), 'নবী করীম হযরত মুহম্মদ (দঃ)' (১৯৭৫), 'কুরআন শরীফ' (১৯৪৯), 'ইসলামী বিশ্বকোষ' (সম্পা.), প্রবন্ধ মঞ্জরী' (১৯২৪), 'ছোটদের ইসলাম শিক্ষা' (১৯৩৪), 'আদর্শ বঙ্গ সাহিত্য' (১৯৩৪), 'ইতিহাস মঞ্জরী' 'Tales from the Quran (1970)', 'Pearls from the Holy Prophet'

---

[২৯২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

[২৯৩] . অধ্যাপক মোঃ আব্দুল লতিফ, *আধুনিক মুসলিম মনীষা* (ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিরদ, ২০০৪) পৃ. ১০০

[২৯৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১

[২৯৫] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫-৩৬

(1970), 'Traditional Culture in East Pakistan' (1961), 'Hundreds Sayings of the Holy Prophet' (1949), 'Essays on Islam' (1975)

২৩. মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯)ঃ

ভাষাবিদ ও গবেষক মুহম্মদ আবদুল হাই অবিভক্ত বাংলার মুর্শিদাবাদ জেলার রাণীনগর থানার মরিচা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আবদুল গণি ও মাতার নাম মায়মুন্নিসা খাতুন। তাঁর বাল্য জীবন ইসলামী পরিবেশেই গড়ে উঠেছিল। তাঁর মাতার ইচ্ছা পূরণে তাঁকে কিশোর বয়সেই হাফিজিয়া মাদরাসায় ভর্তি করানো হয় এবং তিনি তিন পারা কুরআন শরীফ মুখস্থ করেছিলেন। পরে তিনি রাজশাহী মাদরাসায় ভর্তি হন ১৯৩২ সালে। ১৯৩৮ সালে ঢাকা ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে পাশ করে ড. মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) এর অনুরোধে তিনি বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। এই বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ পরিমাণ নম্বর পেয়ে তিনি ভালো ফলাফল করেন।

বিভিন্ন কলেজে শিক্ষাদানের মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরচ হয়। চট্টগ্রাম কলেজ থেকে তিনি চলে গিয়েছিলেন পশ্চিম বাংলার মুর্শিদাবাদের কৃষ্টনগর কলেজে। দেশ ভাগ হওয়ার পর তিনি মাতৃভূমি মুর্শিদাবাদ ছেড়ে দিয়ে পূর্ব-পাকিস্ড়ানে চলে আসেন। তাঁর ভাষায়ঃ "১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্ড়ান প্রতিষ্ঠিত হলো। আমি তখন কৃষ্টনগর কলেজে। প্রাথমিক ভাগ অনুসারে নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ পাকিস্ড়ানের অন্ড়র্ভুক্ত ছিল। সুতরাং নদীয়া জেলার প্রধান শহর হিসেবে কৃষ্টনগরও পাকিস্ড়ানে পড়লো। আমরা কৃষ্টনগর কলেজে পাকিস্ড়ানী পতাকা তুললাম। এর পর র‌্যাডক্লিফ রোয়েদাদে সব বানচাল হয়ে গেল। নদীয়া, মুর্শিদাবাদ পশ্চিম বাংলার অন্ড়র্ভুক্ত হলো। আমাদেরও কৃষ্টনগর ছেড়ে আসতে হলো।"[২৯৬] দেশভাগের পর তিনি রাজশাহী কলেজে এবং ১৯৪৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে প্রভাষক পদে যোগদান করেন।

মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা ভাষাভাষী কবি ও সাহিত্যিকদের পরিচয় ও অবদান নিয়ে রচনা করেন 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' আধুনিক যুগ (১৯৫৬)। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিস্মৃত ও অপরিজ্ঞাত মুসলিম লেখকগণের পূর্ণাঙ্গ ইতিবৃত্ত প্রথম তিনিই রচনা করেন।[২৯৭] তাঁর উলেণ্টখযোগ্য রচনাগুলো হচ্ছেঃ 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' (১৯৪৯), 'বিলেতে সাড়ে সাতশ দিন' (১৯৫৮), 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (১৯৬৫),

[২৯৬] . মনসুর মুসা, *মুহম্মদ আবদুল হাই* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ১২-১৩

[২৯৭] . মনসুর মুসা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ (১৯৫৬), ‘তোষামোদ ও রাজনীতির ভাষা’ (১৯৬৯), ‘ভাষা ও সাহিত্য’ (১৯৬০), ‘আশারায়ে মুব্‌শ্‌শারা বা দশ জান্নাতী’ (১৯৫৬) ও ‘ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব’ (১৯৬৪) ইত্যাদি।

২৪. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) (১৮৯৮-১৯৬৯)ঃ

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্ড়াবিদ, শিক্ষাবিদ, আধ্যাত্মিক সাধক ও সুপ্রসিদ্ধ ওয়ায়েয মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী বৃহত্তর ফরিদপুরের বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার গওহরডাঙ্গা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুন্সী মুহাম্মদ আবদুলণ্ডাহ ও মাতার নাম আমেনা খাতুন। স্থানীয় স্কুল-কলেজে লেখা পড়া শেষ করে তিনি কলকাতা আলীয়া মাদরাসায় এ্যাংলো ফার্সীয়ান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯২০ সালে এন্ট্রান্স পাশ করার পর তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। এ সময় তিনি নিজের চেষ্টায় কুরআন-হাদীস অধ্যয়ন করার চেষ্টা করেন।

এক পর্যায়ে তিনি সরকারি সিলেবাসের লেখা-পড়া ত্যাগ করে দরসে নিজামী ধারার লেখা-পড়ার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি ভারতের সাহারানপুর মাদরাসায় গমন করেন। তারপর তিনি ভারতের দেওবন্দ মাদরাসায় গমন করেন। এ সময় পৃথিবী বিখ্যাত কয়েকজন আধ্যাত্মিক সাধক ও ইসলামী চিন্ড়াবিদের সাথে তাঁর যোগাযোগ করার সুযোগ হয়। তারা হচ্ছেনঃ আশরাফ আলী থানবী (১৮৬৩-১৯৪৩), আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (১৮৭৫-১৯৩৩)ও হুসাইন আহমদ মাদানী (১৮৭৮-১৯৫৭) প্রমুখ। পরবর্তীতে তিনি আশরাফ আলী থানবী এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন এবং তাঁর খেলাফত প্রাপ্ত হন।[২৯৮] কর্ম জীবনে তিনি অনেক মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় কওমী মাদরাসা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। যাঁর সমাজকর্মই প্রমাণ করে তিনি একজন যুগস্রষ্টা ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন। শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেছেন এই আলণ্ডামা। তন্মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্যঃ ‘তাফসীরচ্ল কুরআন’, ‘প্রশ্ন উত্তরে তাসাউফ’, ‘মুক্তির পথ’, ‘নামাজের অর্থ’, ‘বেদআত ও ইজতেহাদ’, ‘জেহাদের আহ্বান’ ‘মাতৃজাতির মর্যাদা’, ‘আজল বা জন্ম নিয়ন্ত্রণ’ ‘শরীয়তের দৃষ্টিতে পারিবারিক আইন’, ‘ঈদ ও চাঁদ সমস্যার সমাধান’, ‘নেতার কর্তব্য’, ‘ওমর ইবনে আবদুল আজিজ’, সংক্ষেপে ইসলামী জিন্দেগী’, ‘ভোটারের দায়িত্ব’, ‘আলণ্ডাহর পরিচয়’, মানুষের

[২৯৮] . মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী এর শিক্ষাজীবন, *আলণ্ডামা শামছুল হক স্মরণিকা* (গোপালগঞ্জঃ খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭) পৃ. ৩-৪

পরিচয়', 'হালাল ও হারাম', 'যুদ্ধের সময় দেশবাসীর কর্তব্য', 'অসৎ আলেম ও পীর', 'এই জামানায় ইসলামী নেজাম সম্ভব নয় কি?', 'খেদমতে খালক বা দুঃস্থ মানবতার সেবা', 'জনসেবা' 'ভুল সংশোধন' 'হক্কানী তাফছীর' ও 'জনগণের কর্তব্য' ইত্যাদি।

২৫. কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০)ঃ

ফরিদপুর জেলার পাংশা অন্তর্গত বাগমারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী সগীর উদ্দীন। রবীন্দ্রনাথের ভক্ত বা শিষ্য হিসেবে তাঁর সাহিত্য মহলে বেশ পরিচিতি আছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তিনি পশ্চিমবঙ্গে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন।

ইসলামী সাহিত্যে তাঁর বড় অবদান হচ্ছে 'পবিত্র কোরআন' এর বঙ্গানুবাদ ও 'হজরত মুহম্মদ ও ইসলাম' নামক দুটো বই। তাঁর ভাষায় "পবিত্র কোর্‌আনের বাংলা অনুবাদ করবো-একথা কখনো ভাবি নি। হযরত মোহাম্মদের একটি জীবনী লিখবো- সেকথা বহুদিন থেকে ভেবে এসেছি। কিন্তু সেই জীবনীতে যখন প্রকৃতই হাত দিতে পারলাম তখন দেখলাম, কোরআনের সঙ্গে যেসব পাঠকের পরিচয় নেই তাঁদের পক্ষে হযরতের চরিত্র উপলব্ধি করা দুরূহ-কতকটা অসম্ভব।"[২৯৯] কুরআন অনুবাদেও তাঁর স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। মূলের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই তিনি কুরআন অনুবাদ করেছেন চলিত বাংলায়।[৩০০]

২৬. আবদুল মওদুদ (১৯০৮-১৯৭০)ঃ

ইসলামী প্রবন্ধকার ও মুসলিম চরিত রচয়িতা হিসেবে খ্যাত আবদুল মওদুদ। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী: 'ইসলাম যা ইউরোপকে শিখিয়েছে' (১৩৫৫ বাংলা), 'মুসলিম মনীষা' (১৯৫৫), 'শাহ আবদুল ভিটাই' (১৯৬৪), 'হজরত ওমর' (১৯৬৭), 'মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ: সংস্কৃতির রূপান্তর' (১৯৬৯), 'ওহাবী আন্দোলন' (১৯৬৯), ও `The Indian Musalman'(১৩৭০ বাংলা) ইত্যাদি।

২৭. নূর মুহাম্মদ আযমী (১৯০০-১৯৭২)ঃ

ফেনী জেলার সিলোনিয়া এলাকার নিযামপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শেখ আলী আজম। নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম এর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনি লেখাপড়া করেন। ১৯২৫ সালে জামাতে উলা পাশ

---

[২৯৯] . খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪) পৃ. ৩৯০

[৩০০] . খোন্দকার সিরাজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০

করেন। শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরচ করেন তিনি। 'হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস', 'মিশকাত শরীফের ভূমিকা ও অনুবাদ' (১৯৬৬) ইত্যাদি বাংলা ভাষায় রচিত সুপরিচিত গ্রন্থ।

২৮. ফররচখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)ঃ

বৃহত্তর যশোর জেলার মাগুরার অন্তর্গত মাঝআইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী ও মাতার নাম রওশন আখতার। কিছুকাল স্কটিশ চার্চ কলেজে দর্শনে অনার্স ও সেন্টপল কলেজে ইংরেজিতে অনার্স পড়েন। কলেজে পড়ার সময় বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হন।

পরবর্তীতে তাঁর ভিতরে ইসলামী চেতনার জাগরণ হয় এবং তিনি বাংলাভাষায় ইসলামী আদর্শ ও বিশ্বাসের উপর এত নির্ভরযোগ্য লেখালেখি করেন, যার ফলে তাঁকে ইসলামী রেনেসাঁর কবি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। 'ইসলামের মৌল আদর্শের প্রতি অবিচল বিশ্বাস তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবন পরিচালিত করে।[৩০১] ফররচখ আহমদ ইসলামের কবি, মুসলমানের কবি এবং মানবতার কবি হিসেবে সমকালে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন।

মুসলিম গৌরব, ঐতিহ্য নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে তাঁর উপমাবহুল আলঙ্কারিক কবিতাসমূহে।[৩০২]

আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে ইসলাম যেমন শুধু আরব বিশ্বে নয়, সমগ্র পৃথিবীতে এক বিপণ্ঢবী পরিবর্তন এনেছিল; সেই ইসলামী আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে ঘুণে ধরা, জরাগ্রন্ড়, অধঃপতিত আধুনিক বিশ্ব আজো মুক্তির নব দিগন্ড়ে উপনীত হতে পারে। সেই ঈপ্সিত কল্যাণময় বিশ্ব গড়ার স্বপ্নই দেখে গেছেন কবি ফররচখ আহমদ।[৩০৩] তাঁর বিখ্যাত কাব্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে: 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), 'সিরাজাম মুনীরা'(১৯৫২)। "ফররচখ আহমদের তৃতীয় কবিতাগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'র প্রকাশকাল ১৯৫২ হলেও এই বই এর কবিতাগুলো লেখা হয়েছিলো অনেক আগে। 'সাত সাগরের মাঝি'র সমকালে ও উত্তরকালে, ১৯৪৩-৪৬ কাল পর্যায়ে। কবি হিসেবে ফররচখ আহমদের প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৯৩৭ হলেও তার ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত নতুন কবিতা ফররচখ লিখতে শুরচ করেন ১৯৪৩ সালে।'[৩০৪]

---

[৩০১] . আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২৮

[৩০২] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

[৩০৩] . মোহাম্মদ জিলণ্ঢুর রহমান, *বাংলা সাহিত্যে আলোর মিছিলে যাঁরা* (ঢাকাঃ অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০০৮) ১৭৬

[৩০৪] . ফররুখ আহমদ, *ফররুখ আহমদ রচনাবলী*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পা. (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫) পৃ. বার

২৯. মোহাম্মদ বরকতুলণ্ডাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)ঃ

বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর থানার ঘোড়াশাল গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হাজী মোহাম্মদ আজম আলী। দর্শনশাস্ত্রে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এম.এ. ডিগ্রি লাভ করার পর বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কালেক্টর এবং এসডিও হিসেবে অবিভক্ত বাংলার নানা জায়গায় চাকুরি করার সুযোগ হয় মোহাম্মদ বরকতুলণ্ডাহর। দেশ-বিভাগের সময় তিনি ছিলেন খুলনার বাগেরহাট মহকুমার এসডিও। খুলনা জেলা প্রথমে ভারতের অংশে পড়ায় ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বরকতুলণ্ডাহ মহকুমা প্রশাসক হিসেবে বাগেরহাটে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের পতাকা উত্তোলন করেন।[৩০৫] ১৯৫১ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্ড়ান সরকারের শিক্ষাবিভাগের উপসচিব নিযুক্ত হন। ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমীর সভাপতি মনোনীত হন।

বরকতুলণ্ডাহ সাহেব বই পড়ে পড়ে একটি চেতনা লাভ করেছিলেন ছাত্রাবস্থাতেই। জাতয়াতাবাদী চেতনায় মুসলমানরা সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে, এটা তাকে বেদনা দিয়েছিল। মুসলমানদের উন্নতির জন্য চিন্ড়া করতেন এবং মুসলিম ঐতিহ্য তুলে ধরার জন্য পরিশ্রমও করেছেন অসাধারণ; যার ফলশ্রচতিতে 'পারস্য প্রতিভা' আজ আমাদের আদরের বস্তু।[৩০৬] "যে সকল লেখক বঙ্গ সাহিত্যকে স্বাবলম্বী হইতে সহায়তা করিয়াছেন, 'পারস্য প্রতিভার লেখক বরকতুলণ্ডাহ সাহেব তাঁদের অন্যতম। লেখকের ভারতীয়, ইসলামীয় ও পাশ্চাত্য দর্শনে ব্যুৎপত্তি কোথাও তাহার স্বাধীন চিন্ড়াকে ব্যাহত করে নাই-বরং তাহাকে পুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছে।"[৩০৭]

"তৎকালে পারস্য দেশের কবি ও কাব্য সম্পর্কে আলোচনামূলক কোন পুস্ড়ক বাংলা সাহিত্যে ছিলনা। পারস্য প্রতিভায় কবি ফেরদৌসী, ওমর খৈয়াম, শেখ সাদী, হাফিজ, জালালুদ্দীন রচমী, ফরিদুদ্দীন আত্তার, নিজামী এবং জামীর কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে বিস্ড়ারিত আলোচনা সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।"[৩০৮] 'বরকতুলণ্ডাহর রচনার বৈশিষ্ট্য ইতিহাস, দর্শন ও ধর্মীয় চিন্ড়াধারার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি। তিনি ছিলেন চিন্ড়াশীল ও

[৩০৫] . মোরশেদ সফিউল হাসান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

[৩০৬] . মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পা. *মোহাম্মদ বরকতুলণ্ডাহ রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১) পৃ.৪৪৯

[৩০৭] . মোহাম্মদ বরকতুলণ্ডাহ, *মানুষের ধর্ম্ম* (ঢাকাঃ হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১১) পৃ. ভূমিকা

[৩০৮]. মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮) পৃ. ১৬৬

দার্শনিক প্রবন্ধকার। পরিমার্জিত ভাব এবং বেগবান ও সাবলীল গতি সম্পন্ন ভাষার সাহায্যে তিনি তাঁর চিন্ড়্রধারাকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর রচনায় ভাবের গভীরতা লক্ষ্য করা যায়।[৩০৯]

ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর রচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছেঃ 'কারবালা ও ইমাম বংশের ইতিবৃত্ত' (১৯৫৭), 'নবী গৃহ সংবাদ' (১৯৬০), 'নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ' (১৯৬৩), 'হযরত ওসমান' (১৯৬৯), 'পারস্য প্রতিভা ১ম ও ২য় খন্ড' (১৯২৬, ১৯৩২) 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৪) ও 'বাংলা সাহিত্যের মুসলিম ধারা' (১৯৬৯)।

৩০. কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)ঃ

অবিভক্ত বাংলার বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে প্রাচীন কাজী বংশে বিদ্রোহী ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকীর আহমদ। মাতা জাহেদা খাতুন। তাঁর ডাক নাম ছিল দুখু মিয়া। আট বছর বয়সে তাঁর পিতা মারা যান। পিতার অবর্তমানে আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে নজরুল লেখাপড়ার সুযোগ পান নি। পারিবারিক অসচ্ছলতার কারণেই মাত্র দশ বছর বয়স থেকে মকতবে শিক্ষকতা এবং মসজিদের মোয়াজ্জেনি ও ইমামতির দায়িত্ব পালন শুরু করেন।

তবে এই সময়ে তিনি উর্দু ও ফার্সী ভাষা শেখার সুযোগ পান। আসানসোলে চা-রুটির দোকানে কিছুদিন চাকরি করেন। তারপর পুলিশ ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহর সহযোগিতায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানার অন্তর্গত কাজীর সিমলা গ্রামে নিয়ে এসে দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করিয়ে দেয়া হয়। এখানে দুই-তিন মাস থেকে তিনি তাঁর নিজ এলাকায় শিয়ালসোল রাজ স্কুলে গিয়ে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই পর্যন্তই নজরুলের প্রাতিষ্ঠানিক লেখা পড়া।

১৯১৯ সাল থেকে নজরুল লেখালেখি শুরু করেন। মাত্র ২২ বছর সাহিত্যিক জীবন তাঁর। ১৯৪১ সালে দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে যান তিনি। আর লিখতে পারেন নি। কিন্তু এই ২২ বছরে যা তিনি সৃষ্টি করে গেছেন তা শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নয়, বিশ্ব সাহিত্যেরও অমূল্য সম্পদ। ইসলামী সাহিত্যে তাঁর দান অতুলনীয়।

তিনি অল্প সময়ে অবিভক্ত বাংলার ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে অবদান রেখেছেন, তা গত হাজার বছরেও কেউ রাখতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। ইসলামী চিন্তা-চেতনা ও বিপ্লবী ভাব নিয়েই মূলত

---

৩০৯ . আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

তাঁর সাহিত্যিক ও কাব্য জীবন শুরচ হয়। প্রখ্যাত নজরচ্ল গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ (জ. ১৯৪৩-) এর ভাষায়-“১৯১৯ সালে কাজী নজরচ্ল ইসলাম সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। ঐ প্রথম বছরেই তাঁর লেখায় ইসলামী আবহ লক্ষ্য করা যায়।”[৩১০] তারপর শুরচ হয় তাঁর কলমের যুদ্ধ। ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে একের পর এক কবিতা লিখে বাংলার যুবকদের প্রেরণা আর উৎসাহ দিতে থাকেন।

কবিতার মাধ্যমে ইসলামী সংস্কৃতিকে আবেগময় ভাষায় তিনি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। ১৯২০ সালে নজরচ্ল লেখেন ‘খেয়াপারের তরণী’। হযরত মুহম্মদ (স.) এর আবির্ভাব ও তিরোভাব নিয়ে লেখেন ‘ফাতেহা-ই-দোয়াজ দহম’ যুগ্ম কবিতা। এরপর ১৯৩০ সালে নজরচ্ল হযরত মুহম্মদ (স.) এর পূর্ণাঙ্গ জীবন চরিত শুরচ করেন ‘মরচ-ভাস্কর’ নামে।[৩১১] যদিও এতে নবীজীর (স.) জীবনের ২৫ বছর পর্যন্ড় বর্ণনা তিনি শুধু দিতে পেরেছেন।

১৯৩১ সালে নজরচ্ল বিধিবদ্ধভাবে ইসলামী গান রচনা শুরচ করেন এবং উত্তরকালে তিনি নব্বই এর অধিক না’ত লেখেন। বলাবাহুল্য এর আগেই ইসলাম বিষয়ক বহু কবিতা ও গদ্য লিখেছেন তিনি। তাঁর পূর্বে আলণ্ঢাহ এবং রাসুলকে নিয়ে বাংলা ভাষায় এত সুন্দর হামদ, না’ত ও গজল কেউ রচনা করতে পারে নি। তাঁর প্রতিটি গানের লাইন শিরক ও বিদ’আত মুক্ত বলে মনে হয়। তাঁর গদ্য ও পদ্যের মূল্যায়ন করলে বলতে হবে যে, “কাব্যে যেমন তিনি বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তেমনি সঙ্গীতেও রেখেছেন অতলস্পর্শী অবদান।

নজরচ্ল ইসলামের গান প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। তাঁদেরকে আলণ্ঢাহ ও নবী প্রেমে পরিসিক্ত করে, ঈমানী দীপ্তিতে পণ্ঢাবিত হয় তাদের অন্ড়র্লোক।”[৩১২] সঙ্গীত রচনার আগে শুধু শিক্ষিত ও সুধীজনেরা নজরচ্লকে চিনতো। সঙ্গীত ও ইসলামী গান রচনার পরে কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মুসলমান তাঁকে চিনতে শুরচ করে। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি বাংলার সাধরণ মানুষের হৃদয়ে আসন গ্রহণ করেন।

---

[৩১০] . আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[৩১১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

[৩১২] . আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পা, *নজরু্ল ইসলাম: ইসলামী গান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭) পৃ. [তিন]

'সঙ্গীতে নজরচ্লের আবির্ভাব যেন এক নবযুগের সূচনা করলো। মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সুর ও বাণীর ঐতিহ্য নজরচ্ল বাংলার ঘরে ঘরে এনে স্থান দিলেন, আলণ্ডাহ ও রাসুল প্রেমের অমিয়ধারা সিক্ত করলো বাঙালি মুসলমানের হৃদয়-মন'[৩১৩]। না'তে নবী জীবনের বা সিরাতের বিভিন্ন ঘটনা হৃদয়বিদারক ভাষায় তিনি তুলে ধরেছেন। "না'ত গুচ্ছে রসুল (সা.) এর আবির্ভাব, শৈশব, কৈশোর, বক্ষবিদারণের ঘটনা, মি'রাজ, মদিনায় হিজরত, তিরোভাব ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে। বিবি আয়েশা (র.), কন্যা ফাতেমা (র.), নাতি হাসান, হোসেন, চার খলীফা বদরের যুদ্ধ ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসেছে।"[৩১৪]

এখনও পর্যন্ড় বাংলা ভাষাভাষী মানুষের বিভিন্ন সভা-সমাবেশে যে সমস্ড় হামদ ও না'ত মানুষের বিবেককে শ্রদ্ধায় বিনীত করে, হৃদয়ে কাঁপুনি দিয়ে চোখের অশ্রচ ঝড়ায়, এর মধ্যে নজরচ্লের হামদ-না'তের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। "সমগ্র বিচারে নজরচ্ল ইসলামই বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ না'ত রচয়িতা।"[৩১৫]

১৯৩৩ সালে নজরচ্লের 'কাব্য আমপারা' অনুবাদ বইটি প্রকাশিত হয়। এই উপমহাদেশের মুসলমানরা যে সমস্ড় ইসলামী উৎসব; সামাজিক ও ধর্মীয়ভাবে উদযাপন করে থাকেন এ সমস্ড় বিষয় নিয়ে তিনি কবিতা রচনা করে মুসলমানদের মন জয় করেছেন। 'ইসলামী শৌর্যবীর্যের প্রতীক হযরত উমর (রা) ও খালেদ (রা) এবং কারবালা, মহররম, আযান ও ঈদের মত ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলোকে বাংলার মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মুসলমানের রাষ্ট্রশক্তির পুনরচ্ত্থান প্রয়াসী বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন এবং রচনার বিষয়বস্তু, শব্দ চয়ন, উপমা ও চিত্রকল্প প্রয়োগেও ইসলামী ঐতিহ্যকে আশ্চর্যজনকভাবে তুলে ধরেছেন।'[৩১৬]

তাঁর সময়কালে বিশ্বনন্দিত মুসলিম নেতাদের প্রশংসা গেয়েও তিনি কবিতা লিখেন, বাংলার মুসলমানদের মধ্য থেকে এরূপ নেতা আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখেন। যাঁরা ঘুণে ধরা এ মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তুলবে। "কাজী নজরচ্ল ইসলাম ইসলাম ও মুসলমানদের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করেছেন এমন বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গের নামে কবিতা রচনা করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। ওমর ফারচক, খালেদ, আনোয়ার পাশা, কামাল পাশা, জামাল

---

[৩১৩]. আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পা, প্রাগুক্ত, পৃ. [চার]

[৩১৪]. আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

[৩১৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২

[৩১৬]. ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬, জি.এম. হালিম সম্পা, *নজরচ্ল মানস পরীক্ষা* (ঢাকাঃ পূবালী প্রকাশনী, ১৯৬৮) পৃ. ৫৩-৫৪

উদ্দীন, আমানুলণ্ঢাহ, চিরঞ্জীব জগলুল, মাওলানা মোহাম্মদ আলী, মিসেস এম. রহমান, মোহাম্মদ মহসিন ইত্যাদি শিরোনামে কবিতা লিখেছেন। বাংলার মুসলমানদের ঐতিহ্যিক, আদর্শিক ও সংগ্রামী প্রেরণা প্রদানই এর মূল উদ্দেশ্য ছিল।"[৩১৭]

আচার ধর্মে নজরুল ছোটবেলায় নিষ্ঠা থাকলেও পরিণত বয়সে তা ছিলেন না। এ কারণে অনেক মুসলমান নজরুলকে ইসলামী জাগরণের কবি হিসেবে স্বীকার করতে চান না। ব্যক্তি জীবনে নজরুল হয়তো এলোমেলো ছিল, স্বেচ্ছাচারিতা ছিল, কিন্তু তাঁর সাহিত্যিক জীবন স্বভাব ও সচেতনতায় বিস্ময়কর রকম স্বচ্ছ।[৩১৮] তিনি একজন হিন্দু মেয়েকে বিবাহ করে ঘর-সংসার করেছেন, অমুসলিম ব্যক্তিদের সাথে বন্ধুত্ব করে চলেছেন, তাঁকে দেখতে ধার্মিক ব্যক্তির মত মনে হয়নি, অথচ রবীন্দ্রনাথকে দেখলেও ধার্মিকের মতো মনে হয় ইত্যাদি নানা অভিযোগ এনে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়ও নজরুলের বিরুদ্ধে বিষোদগার ছড়ানো হয়।

নজরুলকে নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন, প্রবেশ করেছেন তাঁর সাহিত্যের গভীরে; তাঁদের কলমে ফুটে উঠেছে তাঁর প্রকৃত পরিচয়। "নজরুল কোনক্রমেই সাধারণ একজন কবি নন, বরং তিনি প্রতিভার প্রাচুর্য-ধন্য অসামান্য কবি। বিদ্রোহ, স্বাধীনতা ও মানবতার কবি নজরুলকে ইসলামী জাগরণের কবি বলে মেনে নিতে কারো কারো মধ্যে অনীহা আছে। অথচ সত্য যে ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য ভিত্তিক বহু কবিতা তিনি লিখেছেন যার মধ্যে মুসলমান সমাজ দেখতে পেয়েছে তাঁদের আশা-আকাঙ্খার প্রকাশ।

বাস্তব অর্থে নজরুলের বড় পরিচয় যে তিনি জাতীয় কবি-মুসলমান হিন্দু-খ্রিস্টান-বৌদ্ধ প্রভৃতি সকলেরই।"[৩১৯]

নজরুল নিজেই লিখেছেন: "আমি মুসলমান কিন্তু আমার কবিতা সকল দেশের, সকল কালের এবং সকল জাতির।"[৩২০] 'একজন মহান কবি হিসেবে, ইসলামী নবজাগরণের কবি হিসেবে এবং আমাদের জাতীয় কবি হিসেবে নজরুল আমাদের সবিশেষ আকর্ষণ ও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু'।[৩২১]

---

[৩১৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

[৩১৮] . আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

[৩১৯] . হোসেন মাহমুদ, *বাঙালি মুসলমানের আলোকবর্তিকা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* , প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[৩২০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

[৩২১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

নজরুলের ইসলামী গান ও কবিতা নিয়ে আলাদা করে গ্রন্থাকারে কোন বই তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয় নি। তাঁর রচিত সাধরণ গ্রন্থের মধ্যেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল ইসলামী রচনা সম্ভার। তবে তাঁর মৃত্যুর পর অনেক প্রকাশনীই তাঁর ইসলাম বিষয়ক রচনা নিয়ে আলাদা করে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। যেমন: 'নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান' (১৯৮০), 'ইসলামী কবিতা'। বাংলা একাডেমী আবদুল কাদির সম্পাদিত *নজরুল রচনাবলী* বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশ করেছে।

৩১. মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা (১৯০০-১৯৭৭)ঃ

বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ ও লেখক। পৈতৃক নিবাস মুর্শিদাবাদের মৌ গ্রামে। জন্ম গ্রহণ করেন পশ্চিম বঙ্গের বীরভূম জেলার মারগ্রা গ্রামে। পিতার নাম শাহ আবদুল মুকিত ও মাতার নাম ফাসিহা খাতুন। কুরআনে হাফেজ হওয়ার উদ্দেশ্যে মাত্র ছয় বছর বয়সে মা-বাবার ইচ্ছা পূরণে স্থানীয় ফোরকানিয়া মাদরাসায় লেখা পড়া শুরু করেন তিনি। পবিত্র কুরআন থেকে সাত পারা মুখস্থও করেন তিনি। পরে তাঁর মামার উদ্যোগে স্থানীয় এক মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া শুরু করেন এবং ১৯১৮ সনে প্রবেশিকা পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হন। ১৯২৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসয়ান শাস্ত্রে কৃতিত্বের সাথে এম.এস.সি পাশ করেন।

কর্মজীবনে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের সভাপতি, বিজ্ঞান গবেষণাগারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় শিক্ষাকমিশনের চেয়ারম্যান ইত্যাদি পদে দায়িত্ব পালন করেন।

ভারত বিভাগের পর তিনি ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে চলে আসেন। বাংলাভাষায় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই তাঁর অবদান। কিন্তু ছোট বেলায় কুরআনের কিছু অংশ মুখস্থ ও ধর্মভাবাপন্ন পারিবারিক পরিবেশে বড় হওয়ার কারণে তাঁর মনে ইসলাম নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। "বিজ্ঞানের লোক হয়েও তিনি ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে দ্বীনিয়াত ও বাংলায় কুরআন তরজমার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তাঁর এ অবদান নিঃসন্দেহে পবিত্র কুরআনের মহাবাণীর অন্তর্নিহিত মর্ম যুগের পরিপ্রেক্ষিতে জানার ও বোঝার

প্রয়াস আছে। বাংলায় কুরআন চর্চার ক্ষেত্রে ড. কুদরত-ই-খুদা কৃত ‘পবিত্র কুরআনের পুতঃকথা’ (১৯৪৫) বিশেষ ভাবে উলেণ্ডখযোগ্য।”[৩২২] বেশকিছু ধর্মীয় পুস্ড়ক তিনি রচনা করেন।

৩২. শামসুর রহমান চৌধুরী (১৯০২-১৯৭৭)ঃ

সাংবাদিক, কথা সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক শামসুর রহমান চৌধুরী ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার চম্পকনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় স্কুলে সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ড় লেখা পড়া করে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন। কলকাতার ‘মোসলেম বাণী’ পত্রিকার মাধ্যমে তাঁর কর্মজীবন শুরচ হয়। পরবর্তীতে ‘হানাফী’, ‘মাসিক তবলীগ’ ও ‘মাসিক হেলাল’ ইত্যাদি পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় বের হয়।

ইসলামী ভাবধারা ও সংস্কৃতি নিয়ে তিনি প্রচুর লেখালেখি করেন। তাঁর উলেণ্ডখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ ‘ফকিরের কারামত’ (১৯২৪), ‘মাদ্রাজী দাতার প্রকৃত পরিচয়’ (১৯২৪), ‘বেহেস্ড়ি সওগাত’ (১৯২৫), ‘ইমাম আজম’ (১৯২৬), ‘ইসলাম প্রচার’ (১৯২১), ‘মোহাম্মদ আলী’ (১৯৩২), ‘মুসাফির’ (১৯৫৫), ও ‘নিষিদ্ধ ফল’ (১৯৬০)।

৩৩. প্রিন্সিপাল ইবরাাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)ঃ

বর্তমান টাংগাইল জেলার ভূয়াপুর থানার বিরামদি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাবাজ খাঁ ও মাতার নাম রতন খানম। পিংনা হাইস্কুল থেকে ১৯১২ সালে এন্ট্রান্স, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ থেকে ১৯১৪ সালে আই.এ., কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯১৯ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. এবং ১৯২৩ সালে আইন পাশ করেন। তিনি কংগ্রেস ও খেলাফত আন্দোলনের উৎসাহী নেতা ছিলেন।

তিনি হাইস্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কর্মজীবন শুরচ করলেও বর্তমানে সাদত বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ১৯২৬ সাল থেকে প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর তিনি প্রিন্সিপাল নিযুক্ত হন এবং একটানা ২২ বছর তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত

[৩২২] . ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯) পৃ. ৪০৩, মুহাম্মদ ইমদাদুল হক, *বীরভূমের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র*, বুলবুল, কলকাতা, ১০ম বর্ষ, ডিসেম্বর, ১৯৭৭

ছিলেন।[৩২৩] আসাম ও অবিভক্ত বাংলায় সাদত কলেজ মুসলমান প্রতিষ্ঠিত প্রথম কলেজ এবং ইবরাহীম খাঁ ছিলেন প্রথম মুসলমান প্রিন্সিপাল।[৩২৪]

তাঁর এই ব্যস্ড় জীবনের ফাঁকে তিনি একজন সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। দরদ ও প্রেমমাখা লেখা হচ্ছে তাঁর সাহিত্যের মূল আকর্ষণ। গ্রাম বাংলার কৃষক ও সাধারণ মানুষের ভাষা তিনি তাঁর সহিত্যে তুলে ধরেছেন। "ইবরাহীম খাঁর রচনায় একটি দরদী শিল্পী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর চিন্ড়ধারা মার্জিত এবং ভাবোদ্দীপক। তাঁর রচনার ভাষা মর্মস্পর্শী, প্রাঞ্জল এবং সাবলীল গতি সম্পন্ন।"[৩২৫]

ইসলামের মর্মবাণী সহজ সরল ভাষায় তিনি তাঁর রচনায় উপস্থাপন করেছেন। তিনি নিজেও একজন ইসলামের নিষ্ঠাবান পাবন্দী ছিলেন। "বস্তুত ইসলাম ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে আধুনিক সময় ও সমাজ বিশেষ করে যুবমনে যে নতুন নতুন প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে জাগতে পারে তার সহজ সরল জবাব দিয়েছেন ইবরাহীম খাঁ।"[৩২৬] তাঁর রচিত উলেণ্ঢখযোগ্য রচনা সমগ্র হচ্ছে: 'আলু-বোখরা', 'উস্ড়াদ', 'মানুষ', কাফেলা','কামাল পাশা' 'আনোয়ার পাশা' 'বাতায়ন', 'লিপি সংলাপ', 'ইস্ড়াম্বুল যাত্রীর পত্র', 'নয়া চীনে এক চক্কর', নূর মহল', 'ইতি কাহিনী', 'আরব জাতির ইতিকথা', 'ইউরোপীয় বিজয়ী সোলায়মান', 'ইতিহাসের আগের মানুষ', 'চেঙ্গিস খাঁ', 'সিন্ধাবাদ জাহাজী', 'আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা', 'ইসলামের মর্মকথা', 'ইসলাম সোপান ১ম ও ২য় খ-' ও 'বাতায়ন' ইত্যাদি।

৩৪. আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯)ঃ

সাংবাদিক, আইনজীবী, সাহিত্যিক ও প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ আবুল মনসুর আহমদ ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল থানাধীন ধানীখোলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম আবদুর রহিম ফরাযী ও মাতার নাম মীর জাহান খাতুন। ছাত্রজীবনে সকল স্ড়রে কৃতিত্বের সাথে পাশ করে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে আইন পাশ করেন। রাজনীতি ও সমাজ নিয়ে তাঁর অসংখ্য রচনা রয়েছে। সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার নিয়ে হাস্যরসাত্মক ও বিদ্রূপাত্মক অনেক রচনা তিনি রচনা করেছেন। ইসলাম বিষয়ে তাঁর রচনা অল্প হলেও সাহিত্যিক বিচারে খুবই জনপ্রিয়। 'ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া' (১৯৫০),' মুসলমানী

---

[৩২৩]. মোহাম্মদ জিলণ্ঢুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

[৩২৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

[৩২৫]. আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

[৩২৬]. *ইবরাহীম খাঁ রচনাবলী প্রথম খ-*, মোহাম্মদ আবদুল মজিদ সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪) পৃ. [ষোল]

কথা'(১৯২৪), 'কোরআনের নসিহৎ' (১৯৭৫), ও 'সত্যমিথ্যা' (১৯৫৩) ইত্যাদি ইসলামী সাহিত্য তাঁর অমর সৃষ্টি।

৩৫. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২)ঃ

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি থানার অন্তর্গত বক্তপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্য বয়সেই আরবী, ফার্সী, ইংরেজি ও বাংলা ভাষার উপর পিতা মাওলানা আমিন উলণ্ঢাহ এর নিকট হাতেখড়ি লাভ করেন। তাঁর রয়েছে এক বর্ণাঢ্য শিক্ষাজীবন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যে উচ্চশিক্ষা লাভ করলেও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি 'Sufism in Bengal' থিসিস লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন এবং ১৯৩৪ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

ইসলাম ধর্মীয় আচার-আচরণ এবং নীতি-নৈতিকতার উপর নির্ভরযোগ্য ও যুক্তিপূর্ণ বই-পুস্তকের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন মুহম্মদ এনামুল হক। এই অভাববোধ থেকে তিনি উর্দু ভাষায় লিখিত মৌলানা লুৎফুর রহমান প্রণীত 'দীন ইসলাম' শিরোনামে বইখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি অনুবাদক হলেও উচ্চাঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য ব্যবহার করে বাংলার মুসলমানদেরকে আকীদা ও ধর্মবিশ্বাস সম্বলিত একটি বাস্তবমূখী জীবন্ত ইসলামের রূপরেখা অঙ্কিত একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। বইটি সর্ব প্রথম ভারতের মালদহ জেলার রহমানিয়া প্রেস থেকে ১৯৫৭ সালে মুদ্রিত হয়।

বইয়ের ভূমিকা থেকে সেই যুগের আলেম ও তাঁদের ইসলামচর্চা সম্পর্কে একটা আভাষ পাওয়া যায়। "আমি দেখিতাম, আলেম সমাজের প্রচারিত ইসলাম অনেক ক্ষেত্রে হয় আমার ধারণার বিরোধী, না হয় তদপেক্ষা সঙ্কীর্ণ। বিশেষতঃ আমার প্রায়ই মনে হইত, 'ফিকার কফিনে' (ইসলামী-সংহিতার শবাবরণে) আচ্ছাদিত হইয়া জীবন্ত ইসলাম যেন 'জানাজা' রূপে (শবদেহ-রূপে) আলেম সমাজের কাঁধে চড়িয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অভিনয় সমাধা করিবার জন্য গোরস্তানের পথে আগাইয়া চলিয়াছে। ইসলামের নামে এই মর্মান্তিক প্রহসন আমার কখনও ভাল লাগিতনা।, "দীন ইসলামের" এই বঙ্গানুবাদ ইসলামের প্রকৃতরূপের অনেকখানির সহিত বাংলাভাষী মুসলমান ও অমুসলমানকে পরিচিত করিয়া তুলিতে সাহায্য করিবে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"[৩২৭]

[৩২৭] . মনসুর মুসা সম্পা, *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩) পৃ. ১৪৮, ১৪৯

ইসলাম ধর্মে সুনির্দ্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে এবং আরো রয়েছে প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় দিকনির্দেশনা বা মাযহাব, যা কেউ এড়িয়ে চলতে পারেনা। ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক তাঁর এই গ্রন্থে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এইভাবে 'মানব-বসতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই দেখা যাইবে অধিকাংশ মানুষ কোন-না-কোন ধর্ম্মমতের সহিত সংশিণ্টষ্ট। ইহা হইতেই প্রকাশ পায় যে, ধর্ম্মমত (মঝহব) গ্রহণ মানুষের পক্ষে এক সহজাত একান্ড় কর্তব্য।

বাহ্যতঃ যাঁহাদিগকে ধর্ম্মমতের বিরচ্চ্ববাদী বলিয়া মনে হয়, তাঁহারা কি সত্যই ধর্ম্মমত- বিরোধী, না স্বার্থপর লোকদের দ্বারা প্রদত্ত ধর্ম্মমত নামে পরিচিত কতকগুলো বানানো কথার প্রতিবাদী, তাহা বিচার ও বিবেচনা করিয়া দেখিবার বিষয় বটে। এতৎসত্ত্বেও গোড়া হইতেই কতিপয় লোক ধর্ম্মমত (মঝহব) বিরোধী রহিয়াছে। কিন্তু ধর্ম্মমতানুগামী লোকদের বিপুল সংখ্যাধিক্যের তুলনায় বিরচ্চ্ববাদীদের সংখ্যাল্পতা উপেক্ষারই যোগ্য। তথাপি বিরচ্চ্ববাদিগণের কোন কোন যুক্তির উলেণ্টখ করিয়া দেওয়া এখানে সঙ্গত মনে করি।'[৩২৮]

'বঙ্গে সুফী প্রভাব' তাঁর আরেকটি গুরচত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ। এতে তিনি ইসলামী শরীয়ার আলোকে সুফী মতবাদের ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন ইসলামিক পন্ডিতদের মতবাদ ও দর্শন উলেণ্টখ করে, সুফী মতবাদ যে একটি আদর্শ ও কল্যাণমূলক মতবাদ তিনি তাঁর গ্রন্থে তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। যা কুরআন-হাদীসের সাথে কখনও সাংঘর্ষিক নয়। ইসলাম বিষয়ে তাঁর আরও অনেক বই রয়েছে। যেমনঃ 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', 'পূর্ব পাকিস্ড়নে ইসলাম' 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৭), 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (১৯৩৫),'History of the Sufism in Bengal' ইত্যাদি। এ মহা মনীষী ১৯৮২ সালের ১৬ ফেব্রচ্চয়ারি ইনতিকাল করেন।

৩৬. আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩)ঃ

তিনি চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া থানার অন্ড়র্গত কেওচিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা ফজলুর রহমান এবং মাতার নাম গুলশান আরা। ১৯২৩ সালে চট্টগ্রামের সরকারি হাই মাদরাসা থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৯২৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. এবং ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন।

---

[৩২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে কর্ম জীবন শুরচ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদ পর্যন্ড় তিনি অলঙ্কৃত করেছিলেন।[৩২৯] তাঁর চিন্ড়াধারা প্রগতিশীল ধ্যানধারণার সাথে সংশিণ্টষ্ট। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে থেকে তিনি প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে ধর্মের বিরূপ সমালোচনাও করেছেন। ইসলাম বিষয়ক তাঁর রচনার মধ্যে রয়েছেঃ ‘কোরআনের বাণী’ (১৯৪৯), ‘হাদীসের বাণী’ (১৩৮০ বাংলা), ও ‘হযরত আলী’ (১৯৬৮) ইত্যাদি।

৩৭. ডক্টর এম আবদুল কাদের (১৯০৬-১৯৮৪)ঃ

নোয়াখালি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩১ সালে বি.এ. পাশ করে আবদুল কাদের বেঙ্গল সুপিরিয়র সার্ভিসে যোগদান করে মেজিস্ট্রেট হন। ইসলামের প্রতি তাঁর অসম্ভব রকমের প্রেম ও দরদ ছিল। ব্যক্তিজীবনে বই প্রেমিক হওয়ায় প্রচুর ইসলামী বই-পুস্ড়ক অধ্যয়ন করেন তিনি। অর্জন করেন গভীর জ্ঞান ও পান্ডিত্য। ইসলাম ও ইসলামী তত্ত্ব সম্পর্কে বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেন তিনি।[৩৩০]

তাঁর উলেণ্টখযোগ্য রচনাবলীর মধ্যে রয়েছে: ‘ইসলাম ও বহুবিবাহ’ (১৯২৯), ‘ইসলাম ও পর্দা’ (১৯৩০), ‘মোসলেম কীর্তি’ ১ম খন্ড (১৯৩১), ২য় খন্ড (১৯৩১) ও ৩য় খন্ড (১৯৩৪), ‘টিপু সুলতান’ (১৯৩২), ‘হায়দর আলী’ (১৯৩২), ‘স্পেনের ইতিহাস’ ১ম খন্ড (১৯৩৫), ‘মুর সভ্যতা’ (১৯৩৬), ‘তুরস্কের ইতিহাস, ১ম খন্ড (১৯৩৮), ২য় খন্ড (১৯৩৯), ‘সোলতান সালাউদ্দীন’ (১৯৪০), ‘ইসলামের নীতি’ (১৯৫০), ‘বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা’ (১৯৫৩), ‘কামাল পাশা’, ‘ইসলাম ও তালাক’ ইত্যাদি।

৩৮. শইখ শরফুদ্দীন (১৯০০-১৯৮৪)ঃ

সিরাজগঞ্জ জেলার ফুলবাড়িতে তাঁর জন্ম। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, গবেষক ও ইসলামী চিন্ড়াবিদ হিসেবে তিনি খ্যাত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৩ সালে আরবীতে এম.এ. ও ১৯২৫ সালে ফার্সীতে এম.এ. করেন এবং ১৯৩২ সালে ওকালতিও পাশ করেন তিনি। পেশাগত জীবনে বিভিন্ন কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন তিনি। বাংলা একাডেমীতেও ফারসী ও উর্দু ভাষা সংশিণ্টষ্ট বিষয়ে কাজ করেন তিনি।[৩৩১]

---

[৩২৯] . খোন্দকার সিরাজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫

[৩৩০] . আজহার ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৮

[৩৩১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯-২০

তাঁর রচিত ইসলাম বিষয়ক রচনাগুলো হচ্ছেঃ ‘পবিত্র জীবন’ (১৯৭৮), ‘বাংলাদেশে সুফী প্রভাব ও ইসলাম প্রচার’, ‘আরবী ভাষা ও সাহিত্য’ (প্রাচীন যুগ),‘The nation of Evolution through the Ages’ (1977), ‘The Hijrah and the Charter’, ‘Lectures on Islam ইত্যাদি।

৩৯. মুজিবর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪)ঃ

প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পর্যন্ড় পড়াশুনা করেন। সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। ‘পাকিস্ড়ান’ (১৯৪২), ‘সাহিত্য ও সাহিত্যিক’ (১৯৭১), ‘মহানবী’ (১৯৮০), ‘গাজী ও শহীদ’ ইত্যাদি বই-পুস্ড়ক রচনা করেন তিনি।

৪০. মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭)ঃ

পাবনা জেলার সুজানগর থানার অন্ড়র্গত মুরারিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় খলিলপুর স্কুল থেকে ১৯২১ সালে এন্ট্রান্স, পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ১৯২৩ সালে আই.এস.সি, রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯২৬ সালে বি.এ. এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৮ সালে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন। কর্মজীবনে বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা ও পত্রিকার সম্পাদনা ইত্যাদির দায়িত্ব পালন করেন তিনি।

বাংলা লোকসাহিত্যের সংগ্রাহক হিসেবে তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তেরোটি খন্ডে প্রকাশিত লোকগীতির সংকলন গ্রন্থ ‘হারামণি’ শিরোনামে ১৯৩০ থেকে ১৯৮৪ সাল সময়ে বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে ছাপানো হয়। ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা’ তিন খন্ডে প্রকাশিত একটি গবেষণা গ্রন্থ যা তাঁকে সাহিত্য মহলে ও সুধী সমাজে সুপরিচিতি দান করে। বাংলা একাডেমী থেকে ড. মোমেন চৌধুরীর সম্পাদনায় মুহাম্মদ মনসুরউদ্দীন রচনাবলী ২০০৪ সাল থেকে পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে। মুসলিম বাংলা সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনিই সর্বপ্রথম অবিভক্ত বাংলার গ্রামে-গঞ্জে লুকিয়ে থাকা কবি-সাহিত্যিকদের পরিচিতি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। বর্তমানে ‘বাংলা পিডিয়া’ ও ‘বাংলা সাহিত্য কোষ’ যেভাবে আমাদের জাতীয় সাহিত্যিকদের জীবনী উপস্থাপন করছে, সেই কাজ মনসুরউদ্দীন শুরচ করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর শুরচর দিকে।

৪১. সুফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৭)ঃ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার বিটঘর ইউনিয়নের ভাতুরিয়া গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় বিদ্যাকুট উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ৭ম শ্রেণি পর্যন্ড় লেখাপড়া করেন। ১৯১৭ সালে কলকাতায় গিয়ে ব্রিটিশ

সামরিক বাহিনীতে যোগ দেন। সামরিক দায়িত্ব পালনের সুযোগে দেশ বিদেশ ভ্রমণ করার সুযোগ হয় তাঁর। কবি নজরুলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন তিনি।[৩৩২] নজরুলের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে তিনি সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। অনেক প্রবন্ধও রচনা করেন তিনি। 'ভাঙ্গা তলোয়ার' (১৯৪৫), 'ফাতেয়া-ই-দোয়াজ দহম' (১৯৪৭), 'ফের বানাও মুসলমান' (১৯৫৯), 'জেহাদের আহ্বান' (১৯৬৫), 'সিপাহী' (১৯৭৮), 'আশরাফুল মাখলুকাত' (১৩৮৭ বাংলা) ইত্যাদি।

ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে আরো যাঁরা এই সময়ের মধ্যে (১৯০০-১৯৫০) কম-বেশি সাহিত্য রচনা করেছেনঃ

আবদুর রহমান খাঁ, পীর আবদুল খালেক (মৃত্যু:১৯৫৫), রামপ্রাণ গুপ্ত, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, কুমুদনাথ মলিণ্ঢক, সৈয়দ বদরোদ্দজা (১৮৯৭-১৯৭৪), গোলাম কিবরিয়া (১৮৪৩-), আবদুল লতিফ (১৮৭৪-১৯৩৬), আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২), সফিউদ্দিন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২?), আলাউদ্দিন আহমদ (১৮৫১-১৯১৫?). আবদুল বারী (১৮৭২-১৯৪৪), কিরণগোপাল সিংহ, মীর ফজলে আলী, নাজির আহমদ চৌধুরী, শেখ ওসমান আলী, গাজী শামছুর রহমান (১৯২১-১৯৯৮), মুহাম্মদ নুরল ইসলাম, সুফি মাওলান রূহুল আমিন (১৮৮২-১৯৪৫), খন্দকার ফয়েজউদ্দিন আহমদ (১৮৯৯-১৯৩৪), গাজী শামছুর রহমান (১৯২১-১৯৯৮), মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.) (১৯১৯-১৯৮৭), (১৮৯৫-১৯৮৭), মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (১৮৮৮-১৯৩৯), মতীয়র রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৭), মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (১৮৮৮-১৯৩৯), এম. আকবর আলী (১৯১১-২০০১), দৌলত আহমদ (১৮৭০-১৯৪৪), শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৪):, সুফী মাওলানা রূহুল আমিন (১৮৮২-১৯৪৫), আবদুল গফুর সিদ্দিকী (১৮৭২-১৯৫৯), গোলাম মকসুদ হিলালী (১৯০০-১৯৬১):, হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯), গোলাম রহমান, আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদামুদ্দীন (-মৃত্যু-১৯৭২), নুরূন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪-১৯৭৫), বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪), আবুল হাসানাত (১৯০৫-১৯৮৫), আলী আহমদ (১৯১০-১৯৮৭), কাজী আবদুল মান্নান (১৯২৮-১৯৯৪), দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯), মনিরুদ্দীন ইউসূফ (১৯১৭-২০০০), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯১৪-), কাজী দীন মুহাম্মদ (১৯২৭-২০১১) ও মুহম্মদ নূরুল হক (১৯০৭-১৯৮৭)।

[৩৩২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯৯

এমনিভাবে ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত আরও অনেক কবি-সাহিত্যিক রয়েছেন, যাঁদেরকে আমাদের গবেষণার সময় ও সীমাবদ্ধতার কারণে এই গবেষণার আওতায় আনা সম্ভব হয় নি। অত্যন্ড় দুঃখের বিষয়, অসংখ্য মনীষীর লিখিত ইসলামী সাহিত্য প্রকাশিত হওয়ার পর সংরক্ষণের কোনো ব্যবস্থা হয় নি। তাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁদের রচিত সাহিত্যও হারিয়ে গেছে। ইসলামী ভাবধারা সম্পন্ন রচিত সাহিত্য সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা বা ইসলামী সাহিত্যিকদের কর্ম ও জীবন নিয়ে 'জাতীয় কোষ' রচনার কোনো উদ্যোগ আজও পর্যন্ড় ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, সরকার বা কোন পক্ষ থেকে গৃহীত হয় নি। যা বাঙালি মুসলিম জাতির সুন্দর ভবিষ্যতে নির্মাণে একান্ড় প্রয়োজন ছিল।

বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে যে সমস্ড় ইসলামী সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের রচিত ইসলামী সাহিত্য পুনরুদ্ধার করে পুনঃ প্রকাশ করে জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারলে, জাতি ইসলামের মর্ম ও সুধা পেয়ে জ্ঞানে-গুণে ও সভ্যতায় উন্নত জাতির কাতারে দাঁড়াতে পারতো।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলামী সাহিত্যের উপর প্রকাশিত উলেণ্টখযোগ্য গ্রন্থসমূহ ও রচনাবলী (১৯০১-১৯৫০)

এ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় লিখিত ইসলাম বিষয়ক সাহিত্য কর্মকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে আলোচনা করার চেষ্টা করেছিঃ

প্রথম পরিচ্ছেদঃ

ক. কুরআন বিষয়ক রচনা (১৯০১-১৯৫০)

খ. সীরাত ও হাদীস বিষয়ক রচনা (১৯০১-১৯৫০)

ক. কুরআন বিষয়ক রচনা (১৯০১-১৯৫০)ঃ

উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ড় পবিত্র কুরআনের উপর বাংলা ভাষায় তেমন উলেণ্ঢখযোগ্য কর্ম দেখা যায় না। এর পেছনে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও ধর্মান্ধতা কাজ করেছে। যদিও বাংলা ভাষায় ১২০০-১৮০০ সাল পর্যন্ড় আমরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত অনেক লেখালেখি দেখতে পাই; কিন্তু সরাসরি কুরআনের অনুবাদ বা তাফসীর আমরা দেখতে পাই না। এর অন্যতম কারণ হতে পারে 'বাংলা ভাষায় কুরআনের অনুবাদ করা পাপ' এ ধরনের মানসিকতা।

ইতঃপূর্বে উর্দু ও ফার্সী ভাষায় পবিত্র কুরআন শরীফের অনুবাদ করে অনেক আলেম-ওলামাই সামাজিক ধিক্কার পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে শাহ ওয়ালিউলণ্ঢাহ মুহাদ্দিস দেহলভীও (র.) (১৭০৩-১৭৬২) ফার্সী ভাষায় কুরআন অনুবাদের কারণে সামাজিক ও ব্যক্তি আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন। তাঁর লিখিত 'ফাতহুর রহমান' প্রকাশিত হলে এক শ্রেণির রক্ষণশীল আলেম তাঁকে কাফের বলে ফতোয়া দেন এবং তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেন। এই সমস্ড় নজীর দেখে কুরআন অনুবাদে বাঙালি মুসলিম সাহিত্যিকরা তেমন সাহস দেখান নি।

বাঙালি মুসলমানদের এ উদাসীনতা ও অবহেলার সুযোগ হাত ছাড়া করেন নি এ উপমহাদেশের সমসাময়িক খ্রিস্টান ও হিন্দু সাহিত্যিকগণ। "মুসলমানদের এহেন দুর্দিনে খ্রিস্টান মিশনারিদের তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। মিশনারিগণ ইসলাম ও পবিত্র কুরআনের বিরচদ্ধে বেপরোয়া প্রচার শুরচ করেন। এদের মধ্যে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিদের নেতা প্রাচ্য-বিদ্যাবিশারদ উইলিয়াম কেরিই ছিলেন বিখ্যাত।"[৩৩৩]

বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গোলাম আকবর আলী ও আমিরচদ্দিন বসুনিয়া এবং অমুসলিম লেখকদের মধ্যে রাজেন্দ্রনাথ মিত্র ও গিরিশচন্দ্র সেন কুরআন অনুবাদে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। কলকাতার মির্জাপুরের পাটোয়ার বাগানের অধিবাসী শ্রী গোলাম আকবর আলী ১২৭৫ বাংলা সনে পবিত্র কুরআনের অংশ বিশেষ 'আমছে পারা' বা ত্রিশতম পারা অনুবাদ করেন। এটাই বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম লিখিত অনুবাদ বলে

---

[৩৩৩] . মোফাখ্‌খার হুসেইন খান, *পবিত্র কোরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭) পৃ.২২

, J.C. Marshman, Life and time of Cary, marsh man and ward, London, 1856

বাঙালি কুরআন গবেষকদের অভিমত। পুস্ড়কটি বর্তমানে বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। পুস্ড়কটির আখ্যা পৃষ্ঠা নিম্নরূপঃ

''॥ শ্রী শ্রী হাক নাম ॥/॥ এই কেতাবের নাম ॥/॥ তরজমা আমছে পারা ॥/॥ আধিন শ্রী গোলাম আকবর আলি ॥/॥ সাকিন ম্রেজাপুর পাটওা ॥/॥ রের বাগান লোকের খাহেস ॥/॥ দেখিয়া বহুত কোসেসি সহি ॥/॥ করিয়া হাজি ছৈএদ আব্দুলণ্ঢা ॥/॥ মরহুম ছাহেবের আহাম্মদি ॥/॥ ছাপাখানায় শ্রীযুক্ত মৌলবি ॥/ আছগর হোছেন ছাহেবের ॥/ দ্বারায় ছাপাইলাম ॥/ [মোহরের বণ্ঢক] আকবোর আলি ॥/॥ এই কেতাব কেহ আমার বিনে ॥/॥ হুকুমে ছাপিবে নাই সন ১২৭৫ সাল ॥/।''[৩৩৪]

কুরআনের শেষ খ- আমপারার আদি বাংলা অনুবাদক হিসেবে আরেক জনের নাম কোন কোন কুরআন বিশেষজ্ঞ উলেণ্ঢখ করেছেন। তিনি হলেন রংপুরের আমির উদ্দিন বসুনিয়া। 'বর্তমানে বসুনিয়া অনূদিত আমপারার কোন কপিরই সন্ধান নাই। ফলে এ সম্বন্ধে যত আলোচনাই হয়েছে, তা হয়েছে পরোক্ষ তথ্য ভিত্তিক'।[৩৩৫] ১৮৬৬ সালের পরে কোন এক সনে বসুনিয়া অনূদিত আমপারা প্রকাশিত হয় বলে মোফাখ্খার হুসেইন মতামত দিয়েছেন।[৩৩৬] "মটকপুর গ্রামের অধিবাসী আমীর উদ্দীন বসুনিয়া আমপারার একখানা বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ছাপার ধরন দেখিয়া অনেকেই অনুমান করেন এটাই কুরআন মজীদের প্রথম অনুবাদ। কিন্তু ইহাতে উক্ত অনুবাদ প্রকাশের সন-তারিখ উলেণ্ঢখ নাই।

সুতরাং ইহার প্রকাশকাল সম্পর্কে নিশ্চিতরূপে কিছুই বলা যায় না।''[৩৩৭]

এদিকে গিরিশচন্দ্র সেনের তিন বছর আগে ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কুরআনের প্রথম পারার অনুবাদ করেন রাজেন্দ্রনাথ মিত্র। "রাজেন্দ্রনাথ মিত্র অনূদিত কুরআন শরীফ প্রথম খ- ও প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল: ১৯ মার্চ ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ। এটি স্বয়ং অনুবাদক কর্তৃক কলকাতা ১৪৬, লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ আয়ুর্বেদ প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মুদ্রাকরের নাম মিহির চন্দ্র রায়। এর সর্বস্বত্ব কলকাতার ৬৯, কালী প্রসাদ দত্ত স্ট্রীটস্থ রাজেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক সংরক্ষিত।''[৩৩৮]

---

[৩৩৪] . মোফাখ্খার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

[৩৩৫] .প্রাগুক্ত, পৃ.২৮

[৩৩৬] .প্রাগুক্ত, পৃ.৩২

[৩৩৭] . ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯) পৃ. ৩৬, শায়ের গোলাম আকবর অনূদিত এবং মুহম্মদ আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত ও পুন:মুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

[৩৩৮]. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

এই ভাবে বিক্ষিপ্ত আকারে কুরআনের অংশ বিশেষ যুগে যুগে অনূদিত হতে থাকে । কোন কোন প্রাচীন কবি ও সাহিত্যিক কুরআনের ভাবার্থ নিয়ে পুঁথিও রচনা করেন, যা কুরআনের সরাসরি অনুবাদ ছিলনা। ‘‘আমরা যদি শাহ মুহম্মদ সগীরের (১৩৮৯-১৪১০ খ্রি.) কাব্যকে কুরআনের পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দেখি তবে দেখতে পাব যে তাঁর ‘ইছুফ জলিখা’ কাব্য সুরা ইউসুফের মা’নির অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নয়। কুরআন বলেঃ ... তারপর যখন সেই স্ত্রীলোকেরা ইউসুফকে দেখল, তখন ইউসুফের রূপ যৌবনের প্রতি এরূপ আসক্তি জাগল যে তারা অন্যমনস্কতাবসত ফল কাটতে গিয়ে নিজেদের হাত কেটে বসল এবং বলতে লাগল: আলণ্ঢাহর ফেরেস্ড়্র।

শাহ মুহম্মদ সগীরের অনুবাদ হলোঃ

দেখিলেন্ড় পরতেখ কিবা এ স্বপন

এক দৃষ্টে নেহালন্ড় পাসরি আপন॥

হাতেত তুরঞ্জ ফল কাতি খরসান।

হস্ড় সম সমে ফল কাটে মনে নাহি জ্ঞান॥

কেহো ফল কাটিতে অঙ্গুলি কাটে নিল।

কিবা কর কিবা ফল এক ন জানিল॥

স্ড্রি সবে বোলে এহি মনুষ্য মুরতি ।

স্বর্গ মর্ত পাতালি জিনিয়া রূপ খ্যাতি॥ ।’’[৩৩৯]

এই ভাবে অনেক অজ্ঞাত লেখক এবং সৈয়দ সুলতান, আমীর উদ্দিন বসুনিয়া, গোলাম আকবর আলী, মীর ওয়াহিদ আলী, নাসির উদ্দিন আহমদ ও কারী নাসির প্রমুখ গিরিশচন্দ্রের আগে পবিত্র কুরআনের খন্ডাংশের অনুবাদ বা ভাবার্থ লেখেন। এবার আমরা আলোচনা করব কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ নিয়ে। এই ক্ষেত্রে পথিকৃৎ হচ্ছেন গিরিশচন্দ্র সেন।

‘কোরআন শরীফ (কোরআন)’ [১২ ই ডিসেম্বর, ১৮৮১ থেকে প্রকাশারম্ভ], গিরিশচন্দ্র সেন

গিরিশচন্দ্র সেন ১৮৩৪ সালে বর্তমান নরসিংদী জেলার পাঁচদোনা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাধব রায় এবং দাদার নাম রাম মোহন রায়; যিনি ফার্সী ভাষায় পন্ডিত ছিলেন। তিন ভাই ও তিন

[৩৩৯] . মোফাখ্খার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

বোনের মধ্যে সেন ছিলেন সর্ব কনিষ্ঠ।[৩৪০] পিতা মাধব রায়ের হাতেই গিরিশচন্দ্রের হাতেখড়ি হয়। শেখ সাদি (১১৭৫-১২৯৫) এর 'পান্দে নামা' তাঁর বাবার হাতেই শিক্ষা নেন। স্থানীয় মুন্সীদের কাছে পড়াশুনা শেষ করে সেন ময়মনসিংহের এক সংস্কৃত পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখান থেকে আবার পাঁচদোনা এলাকায় চলে আসেন এবং স্থানীয় নর্মাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হোন।[৩৪১]

পেশাগত জীবনে তিনি হার্ডিঞ্জ স্কুলের নিম্ন শ্রেণির শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হোন। অতঃপর ময়মনসিংহ জিলা স্কুলেও কিছুকাল শিক্ষকতা করেন।[৩৪২] তিনি শিক্ষকতার পাশাপাশি সাংবাদিকতা ও সাহিত্যচর্চায়ও আত্মনিয়োগ করেন। তিনি 'সুলভ সমাচার' ও 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক এবং মাসিক মহিলা (১৩০২) পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।[৩৪৩] গিরিশ বাবুর সময়টা ছিল ব্রাহ্ম ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের যুগ। ১৮৬৯ সালে কেশবচন্দ্র সেন[৩৪৪] (১৮৩৮-১৮৮৪) ও তাঁর ভক্তবৃন্দ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারার্থে ময়মনসিংহ জেলায় আগমন করেন। তখন গিরিশবাবু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হোন।

অতঃপর এই কেশবচন্দ্র সেনের নির্দেশক্রমেই তিনি কুরআন মজিদের বাংলা তরজমার কাজে হাত দেন। টিকা-টিপ্পনী লেখার ব্যাপারে মোলণ্ডা ওয়ায়েজ কাসেফী (মৃ. ১৫০৪ খ্রি.) এর 'তাফসিরে হুসাইনি' এবং শাহ আব্দুল কাদের সাহেব (১৭৫৩-১৮২৭ খ্রি.) এর উর্দু তরজমাই ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন।[৩৪৫] ১৮৭৬ সালে গিরিশচন্দ্র সেন আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য ৪২ বছর বয়সে তৎকালীন ভারতের লক্ষ্ণৌ গমন করেন। সেখানে মাওলানা এহসান আলীর কাছে তিনি একবছর যাবৎ আরবী ব্যাকরণ ও ভাষা শিক্ষা লাভ করেন। অতঃপর দেশে ফিরে ঢাকা নগরীর মাওলানা আলীম উদ্দিন সাহেবের কাছেও তিনি আরবী সাহিত্য, ইতিহাস, তাফসীর ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করেন।[৩৪৬]

---

[৩৪০] . ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ . ৫১

[৩৪১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[৩৪২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

[৩৪৩] . বাংলা পিডিয়া ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

[৩৪৪] . উনিশ শতকের বাংলার একজন বুদ্ধিজীবী ও ব্রাহ্ম ধর্মীয় নেতা যিনি ১৮৮০ সালে 'নববিধান' নামে সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮৬৯ সালে কেশবচন্দ্র এমন একটি মন্দির তৈরি করেন; যাতে খ্রিস্টানদের গির্জা, মুসলমানদের মসজিদ ও হিন্দুদের মন্দিরের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে। বিস্তারিত : বাংলা পিডিয়া ২য় খন্ড, সিরাজুল ইসলাম সম্পা. (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩) পৃ. ৪৬৩

[৩৪৫] . ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ . ৫৩ P.C Mozoomdar: The life and teachng of Keshabchandra Sen: 2nd edition (Calcutta, 2891) p. 31

[৩৪৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২

জনাব সেন ১৮৮১- ১৮৮৬ এই ছয় বছরের মধ্যে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করেন। ১৮৮২ সাল থেকেই খ-াকারে তাঁর অনুবাদ প্রকাশ হতে থাকে। 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের এই বাংলা তরজমার কয়েক খ- প্রকাশ পাওয়ার পরই তদানীন্তন মুসলিম সমাজে এর একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। জনৈক মুসলিম তাঁকে কতল করার হুমকি দিয়েছিলেন। অপরাধ শুধু এই যে, বিধর্মী হয়ে তিনি মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থের তরজমা করেছিলেন।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুসলমানই গিরীশবাবুকে তাঁর এই বাংলা তরজমার জন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছেন। কলকাতার আহমদুল্লাহ সাহেব ও কলকাতা মাদরাসার ভূতপূর্ব আরবী উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র বৃত্তিধারী জনাব আবদুল আলা ও আবদুল আযীয সাহেবান ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চে গিরীশ বাবুকে উচ্ছসিত কণ্ঠে অভিনন্দন জানিয়ে ইংরেজিতে পত্র[৩৪৭] লিখেছিলেন। এই প্রশংসা পত্র সমকালীন সংবাদ

---

[৩৪৭] . "To the author of the Bengali translation of the Koran, Calcutta.

REVD. SIR

We the undersigned have most carefully and attentively read and compared with original of the first two parts of your valuable production. Viz the Bengali translation of the Koran, and our curiosity is not less excited to find it to be such faithful and literary translation from a classic language as the Arabic which varies so widely in its construction from all other languages of the world. As we are Mohamedans by faith and birth, our best and hearty thanks are due to the author for the disinterested and patriotic effort and the great trouble he has taken to diffuse the deep meaning of our Holy and sacred religious Book – the Koran to the public.

The version of the Koran above quoted has been such a wounderful success that we would wish the author would publish his name to the public, to whom he has done such a valuable service, and thus gain a personal regard from the public.

Lastly, in our humble and poor opinion we think that the book may be useful, particularly to the Mohamedan, if the style could be rendered a little easier so as to be understood by the less erudite.

We have the honour to be

REVD. SIR.

Your most obedient servant

AHMUDULLAH

পত্রে প্রকাশিত হয় এবং গিরীশচন্দ্রের অনূদিত কুরআন মজীদের প্রথম খণ্ডের শুরুতেও সংযোজিত হয়।'[৩৪৮]

গিরিশচন্দ্রের এই দুঃসাহসিক কাজে সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাবিদরা বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছেন, সমর্থন যুগিয়েছেন। এর প্রমাণ তাঁর লিখিত প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় সুস্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। "আমি আরব্য ভাষায় শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইলে অনেক বন্ধু বংগ ভাষায় মূল কোরান অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আমাকে অনুরোধ করেন। এ বিষয়ে কোন কোন মোসলমান বন্ধু কর্তৃকও আমি বিশেষ ভাবে অনুরূদ্ধ হইয়াছি। কোরান অধ্যয়ন ও তাহা অনুবাদ করাই আরব্য ভাষা অধ্যয়ন আমার প্রধান উদ্দেশ্য। বন্ধুদিগের আগ্রহে ও স্বীয় কর্তব্যানুরোধে ঈশ্বর কৃপায় এইক্ষণ কোরান বংগ ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"[৩৪৯]

অনুবাদের সমসাময়িক কালে পবিত্র কুরআন ও ভারতীয় মুসলমানদের অবস্থা তাঁর লেখায় ফুটে উঠে। "পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় বাইবেল পুস্তক অনুবাদিত হইয়া সর্বত্র সকল জাতির মধ্যে প্রচার হওয়ায় সাধারণের পক্ষে যাহা যারপর ন্যায় সুলভ হইয়াছে। কিন্তু বিধানমণ্ডলীভুক্ত ভূমণ্ডলের একটি প্রধান ও পরাক্রান্ত জাতি মোসলমান, তাহাদের মূল বিধান পুস্তক কোরান শরীফশুদ্ধ তাহাদের মধ্যেই দুরূহ আরব্য ভাষারূপ দুর্ভেদ্য দুর্গের ভিতরে বদ্ধ রহিয়াছে। অন্য জাতির নিকট মোসলমানেরা কোরান বিক্রয় পর্যন্ত করেন না, অপর লোকে তাহা পড়িবে দূরে থাকুক, স্পর্ষ করিতেও পায় না। অন্য জাতির মধ্যে আরব্য ভাষার চর্চাও বিরল। কেহ কোরান হস্তগত করিতে পারিলেও ভাষা জ্ঞানের অভাবে তাহার মর্ম কিছুই অনুধাবন করিতে সক্ষম হয় না।"[৩৫০]

Late Arabic senior scholar of the Calcutta Madrashah.

Cacutta

ABDUL ALA

ABDUL AZIZ

The 2nd march 1882."

৩৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮

৩৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৩৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

গিরিশ বাবুর অনুবাদ বের হওয়ার পর অনেকেই তাঁর সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ কুরআন অনুবাদের ক্ষেত্রে তিনিই পথিকৃৎ। সমসাময়িককালে তাঁর অনুবাদের সাথে তুলনা করার মত আর কারও অনুবাদ ছিল না। তাঁর মত এত মনোযোগী বা আবেগী হয়ে কোন মুসলমানই সেই সময়ে কুরআন অনুবাদের চিন্‌্ড়া করেন নি। সুতরাং এখন বাংলা ভাষায় সফল কুরআন অনুবাদক হিসাবে সমস্‌্ড় কৃতিত্ব গিরিশ চন্দ্র সেনেরই, এই কথা বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের মেনে নিতেই হবে।

প্রখ্যাত কুরআন গবেষক ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান বলেনঃ ‘গিরিশ চন্দ্রের তরজমার কিছু কিছু ভ্রম প্রমাদ ও ত্রচটি বিচ্যুতি থাকলেও এ কথা তর্কাতীত যে, বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ কুরআনের অনুবাদক হিসেবে কুরআন সাহিত্যসেবীদের তিনিই পথিকৃৎ। তাঁর আগে অবশ্য মুসলিম লেখকরা তরজমা তাফসীরের কাজে হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলোর একটিও পূর্ণাঙ্গ গদ্যানুবাদ ছিল না। বরং ছিল আংশিক এবং পদ্যানুবাদ।

গিরীশ চন্দ্র তাই কুরআন, ইসলামী সাহিত্য ও মুসলিম সমাজের মহৎ উপকার সাধন করে গেছেন। বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে যে দৃঢ় সংকল্প ও একাগ্রতা নিয়ে অনন্য মনে তিনি বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাব ধারার সংযোগ করে গেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তিনি এমন সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন হিন্দুরা ইসলাম সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ ও উদাসীন আর মুসলমানরা শিক্ষা দীক্ষায় একান্‌্ড় পশ্চাৎপদ ও শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে অধঃপতনের অতল তলায় নিমজ্জিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এই যুগসন্ধিক্ষণে কুরআন সাহিত্যের দুর্গম পথে পদচারণা করা গিরীশ বাবুর পক্ষে ছিল সত্যিই এক দুঃসাহসের ব্যাপার।’[৩৫১]

বাংলা সাহিত্যের আরেকজন শ্রেষ্ঠ পুরচষ মৌলানা আকরম খাঁ (১৮৬৭-১৯৬৮) এই অনুবাদ সম্পর্কে মন্‌্ড়ব্য করেছেনঃ “গিরিশ চন্দ্রের এই অসাধারণ সাধনা ও অনুপম সিদ্ধিকে জগতের অষ্টম আশ্চর্য বলিয়া উলেণ্টখ করা যাইতে পারে।”[৩৫২] বাংলা ভাষার আরেকজন কুরআন গবেষক ড. মোফাখ্‌খার হুসেইন খান বলেনঃ ‘গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ যত দুর্বোধ্য ও অনির্ভরযোগ্যই হোক না কেন, বাংলা সাহিত্যের দৃষ্টিকোন থেকে এটি তাঁর একটি অনবদ্য অবদান।

---

৩৫১ . প্রাগুক্ত, পৃ.৬৭

৩৫২. গিরিশ চন্দ্র সেন অনূদিত (কোরআন শরীফ, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৩৬) মুখবন্ধে মৌলানা আকরম খাঁ এর শ্রদ্ধা নিবেদন

তদুপরি এটি দ্বিধাগ্রস্ড় মুসলমান আলেমদের মধ্যে একপ্রকার আত্মবিশ্বাসের অনুপ্রেরণা যোগায়। তাঁরা বুঝতে পারেন যে, গিরিশচন্দ্রের মতো একজন অমুসলমান যদি সমগ্র কুরআন তরজমা করতে পারেন, তবে তারা কেন এ কাজে অনগ্রসর থাকবেন বা সাফল্য লাভ করতে পারবেন না। ফলে, গিরিশ চন্দ্রের অনুবাদ প্রকাশের দু'বছরের মধ্যেই কুরআন অনুবাদে আমরা মুসলমান আলেম নইমূদ্দীনকে এগিয়ে আসতে দেখি। তাঁর অনুবাদের প্রথম অংশটি ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত হয়। তারপর মওলানা আব্বাস আলি, খান বাহাদুর তসলিমুদ্দিন আহমদ ও খোন্দকার আবুল ফজল আব্দুল করিম ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গ কুরআন অনুবাদের ধারা অব্যাহত রাখেন। ফলে আজ বাংলা ভাষায় আমরা অন্যূন্য ত্রিশটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ পাঠ করার সৌভাগ্য লাভ করেছি।'[৩৫৩]

ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার ও প্রসার করতে গিয়ে গিরিশ বাবু স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন। এতে ব্রাহ্ম ধর্মের চেয়ে ইসলাম ধর্মই বেশি উপকৃত হয়েছে বলে মনে হয়। তিনি শুধু কুরআন অনুবাদই করেন নি; সমসাময়িককালের বিখ্যাত অনেক মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের লেখা উর্দু ও ফার্সী ভাষা থেকে অনুবাদ করেছেন।

১৮৮১ সালে তাঁর অনূদিত কুরআনের প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়। ১৮৮৬ সালে তাঁর অনুবাদের শেষ খন্ড প্রকাশিত হয়। ১৯০৮, ১৯৩৬, ১৯৭৭, ১৯৭৯ এই সময় কালে পশ্চিম বঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে পূর্ণাঙ্গ কুরআন শরীফের অনুবাদ এক বলিউমে প্রকাশিত হয়ে সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছতে থাকে।[৩৫৪] তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত ইসলাম সম্পর্কে অন্যান্য গ্রন্থসমূহ অভিসন্দর্ভের বিভিন্ন অধ্যায়ে উলেণ্টখ করেছি।

'বঙ্গানুবাদিত কোরআন শরীফ' [২৬ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯১ খ্রি.থেকে প্রকাশারম্ভ] নইমুদ্দিন

ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী গিরিশচন্দ্র সেন এর পবিত্র কুরআন অনুবাদ তৎকালীন শিক্ষিত মুসলমানদের ঘুম ভেঙ্গে দেয়। গিরিশচন্দ্রের অনুবাদ মুসলমানদের আত্মসচেতন করে তুলে। যার ফলে গিরিশ বাবুর অনুবাদের পরে অনেক মুসলমানই কুরআন অনুবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং কুরআন অনুবাদে এগিয়ে আসেন। তাঁদেরই একজন নইমুদ্দিন। তিনি ১৮৩৮ সালে বর্তমান টাংগাইল জেলার সুরচজ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার হাতেই প্রথম হাতে খড়ি হয়। ১৮৪৬ সালে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়ে ঢাকা,

---

[৩৫৩] . মোফাখ্খার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০

[৩৫৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭

মুর্শিদাবাদ, জৌনপুর, আগ্রা ও দিলিণ্ঢ ইত্যাদি স্থান ভ্রমণ করে খ্যাতনামা আলেমদের সান্নিধ্যে থেকে 'আলিমুদ-দহর' উপাধি লাভ করে দেশে ফিরেন।[৩৫৫]

কর্ম জীবনে তিমি মোমেনশাহীর অন্তর্গত ভাওয়ালিয়ায় গ্রাম্য স্কুলে পণ্ডিতের পদে কাজ করেন। তিনি ৭০ বছর বয়সে ১৯০৮ সালে টাংগাইলের করটিয়ায় ইনতিকাল করেন।[৩৫৬]

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম কুরআনের সবচেয়ে বেশি অংশ অনুবাদ করেন এই নইমুদ্দিন। তৎকালীন টাংগাইলের জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদের অনুপ্রেরণায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি কুরআন অনুবাদে উৎসাহিত হন এবং প্রকাশ করতেও সক্ষম হন। "মোমেনশাহীর হিন্দু জমিদাররা যেমন হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি আন্দোলনের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন ঠিক তেমনি ইসলামী সাহিত্য, ঐতিহ্য, কুরআন চর্চা, সংস্কৃতি এবং মুসলিম জীবন চেতনার ক্ষেত্রে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন করটিয়া, দেলদুয়ার ও হযরত নগরের জমিদার পরিবার।

শুধুমাত্র করটিয়ার জমিদার মাহমুদ আলীই নন, বরং ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীও (১৮৬৩-১৯২৯) ইসলামী সাহিত্য তথা কুরআন চর্চার জন্যে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে একটি প্রেস কায়েম করে দান করেছিলেন। এখান থেকেই বের হতো 'মিহির' ও 'সুধাকর' পত্রিকা।"[৩৫৭] নইমুদ্দিন কুরআন অনুবাদ শুরচ করেন ১৮৮৭ সালে। ২২ বছর যাবৎ তিনি কুরআন অনুবাদের পিছনে সময় দেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ২৩ পারা পর্যন্ড় অনুবাদ করতে সক্ষম হোন। ত্রিশতম এবং ঊনত্রিশতম পারার কয়েকটি সুরাও তিনি অনুবাদ করেন।

তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলমান। তৎকালীন খ্রিস্টান ও ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতারণা থেকে ইসলামকে রক্ষা করে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা ও সমসাময়িক মুসলমানদের ঈমান আকীদা রক্ষা করাই ছিল তাঁর এই অনুবাদের উদ্দেশ্য। 'বঙ্গবাসী ভ্রাতা-ভগ্নিগণকে কোরান শরীফের মর্ম অবগত করানোর মানসেই' নইমুদ্দীন তরজমায় হাত দেন। তাঁর পূর্বে রাজেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৭৯), পাদ্রি তারাচাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

---

[৩৫৫] . ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯, অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ: মৌলভী নইমূদ্দীন, 'মাহে নও' চৈত্র', ১৩৬৫ সাল এবং অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনঃ মুহাম্মদ নইমুদ্দীন 'দিলরুবা', জৈষ্ঠ্য ১৩৬০; মাসিক মাহে নও, চৈত্র সংখ্যা ১৩৬৫ সাল এবং আব্দুল গফুর সিদ্দিকী: মাওলানা মুহাম্মদ নইমুদ্দীন (প্রবন্ধ) মাসিক 'মোহাম্মদী', শ্রাবাণ সংখ্যা, ১৩৬২

[৩৫৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১, উলেণ্ঢখ্য টাংগাইলেরই অন্তর্গত গণটিয়া নিবাসী আরও একজন মাওলানা নইমুদ্দীন ছিলেন, যিনি 'ইসলাম ও বিজ্ঞান' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

[৩৫৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১

(১৮৮২) এবং গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৮১-১৮৮৫) বাংলা ভাষায় কোরআন অনুবাদ করেন। এঁদের তরজমাগুলো 'অনধিকার চর্চা এবং অমার্জনীয় দুঃসাহস' নামে অভিহিত। ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 'ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকৃত ভ্রম প্রমাদপূর্ণ, দুর্বোধ্য মন্ত্রবৎ-অস্পষ্ট অনুবাদ গুলো বাঙালি মুসলমানদের কোন কাজে আসা তো দূরের কথা বরং যখন তাঁদের বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিচ্ছিল তখনই এগিয়ে আসেন মওলানা নইমুদ্দীন তাঁর তরজমা নিয়ে।[৩৫৮]

'কোরআন মজিদ মুতরজম (কোরআন)' [১৮ ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০৮], মওলানা আব্বাছ আলী (১৮৫৯-১৯৩২)

বর্তমান ভারতের চব্বিশ পরগণা জেলার বশিরহাট মহকুমার অন্তর্গত দক্ষিণ চাত্রা ডাকঘর এবং বাদুড়িয়া থানাধীন চন্ডিপুর গ্রামে ১৮৫৯ সালে মাওলানা আব্বাস আলী জন্ম গ্রহণ করেন। পরিবারের লোকজনের কাছেই তাঁর হাতে খড়ি হয়। টাংগাইলের দেলদুয়ার জমিদার বাড়ির মাদরাসায় মাওলানা আব্দুর রহমান কান্দাহারির নিকট দীর্ঘ ১৫ বছর কুরআন, হাদীস ও তাফসীর ইত্যাদি বিষয় গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। কর্মজীবনে তিনি উলেণ্ডখিত প্রতিষ্ঠানে উস্তাদের নির্দেশে শিক্ষকতা করেন এবং পরে নিজ গ্রাম চন্ডিপুরে শিক্ষকতা করেন।[৩৫৯] তিনি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বই-পুস্তক লিখেন। এগুলোর মধ্যে 'কোরআন মজিদ মুতরজম (কোরআন)' তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান। আব্বাস আলী অনূদিত সমগ্র কুরআনের প্রকাশকাল ১৩১৬ / ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে, প্রকাশক: মুনশি করিম বখশ। অনূদিত গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য। এর আখ্যা পৃষ্ঠা নিম্নরূপ:

"কোরাণ শরিফ / মৌলভী মোহাম্মদ আব্বাছ আলি / কর্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত / ও / ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তফছীর ও ছহি হাদিছ অবলম্বনে / টিকা লিখিত / মৌলভী মহাম্মদ বাবর আলী ছাহেবের দ্বারা কবির কাশ্যাফ ইত্যাদি / তফছীর অবলম্বনে সংশোধিত ও টীকা লিখিত। কলিকাতা / ৩৩ নং বেনে পুকুর রোড / আলতাফী প্রেসে / মুন্‌শী করিম বখশের দ্বারা মুদ্রিত / ১৩১৬।"[৩৬০]

মুসলমান অনূদিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ কুরআন হিসাবে বাংলার মুসলমানদের ঘরে ঘরে এর কদর ছিল খুবই বেশি। তাছাড়া তিনি একজন সুপরিচিত আলেম ছিলেন। কুরআন গবেষক ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান

---

[৩৫৮] . মোফাখ্‌খার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪, মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ও আলি হাসান, কোরান শরিফ (কলিকাতা: ১৯৩৮), পৃ. [১] এবং মোহাম্মদ তাহের, আল কুরআন (কলিকাতাঃ ১৯৭০), পৃ. ১০

[৩৫৯] . ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ.. ১৪১

[৩৬০] . মোফাখ্‌খার হুসেইন খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

বলেন: "মাওলানা আব্বাস আলি একদিকে যেমন ছিলেন উর্দু থেকে বাংলা অনুবাদের জনক, অন্যদিকে তেমনি ছিলেন মূল আরবীসহ কুরআন মজীদের পূর্ণাঙ্গ বাংলা তরজমা ও তাফসীরের প্রথম মুসলিম পথিকৃত। তাঁর আগে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান ইত্যাদি মিলে অনেকেই কুরআন করীমের পূর্ণাঙ্গ ও আংশিক বঙ্গানুবাদ করেছেন বটে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে মূল আরবীসহ কুরআনের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ তাঁর আগে কেউ করেন নি। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য সম্ভার এবং বিশেষত এই কুরআন সাহিত্যের ক্ষেত্রে মওলানা আব্বাস আলীর এইসব বিচিত্র অবদানের ফলশ্রচতি হিসেবেই হয়তো তাঁর এই সুনাম সুখ্যাতি শুধু যে বাংলার ঘরে ঘরেই সীমাবদ্ধ তা নয়, বরং বাংলার গন্ডি পেরিয়ে বিদেশ-বহির্দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল।"[৩৬১]

'তাফছীরুল কোরআন (কোরআন) [কোরআন শরীফ, (কোরআন), কোরআন শরীফ, আমপারা' ইত্যাদি শিরোনাম, ১৯৫৯, ১৯২৪ ও ১৯০৫ সাল], মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ

১৮৬৮ সালের ৭ই জুন বর্তমান পশ্চিম বঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলার বশির হাট মহকুমার অন্তর্গত হাকিমপুর গ্রামে আকরম খাঁ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মওলানা আবদুল বারী খাঁ এবং মাতার নাম রাবেয়া খাতুন। তিনি আহলে হাদীস সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।[৩৬২] তৎকালীন প্রথামত বালক আকরম খাঁ তাঁর পিতা-মাতার কাছে 'পবিত্র কুরআন', 'গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ', (শেখ সাদি) ইত্যাদি অধ্যয়ন করেন। তাঁর এগারো বছর বয়সে ১৮৭৯ খিস্টাব্দে মাতা-পিতা দুই জনই একই দিনে কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।[৩৬৩] তিনি কিছুকাল জুবিলী ইংরেজি স্কুলে পড়াশুনা করেন। পরে ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অনীহার কারণে ১৮৯৬ সালে তিনি কলকাতা আলীয়া মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ১৯০০ সালে এফ. এম. পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হোন। এখানেই তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ইতি ঘটে।

সাংবাদিকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরচ হলেও, আকরম খাঁ অচিরেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। "১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ বাতিল হওয়ার পর রাজনীতির নতুন প্রেক্ষাপটে তিনি মুসলিম লীগের সঙ্গেও

---

[৩৬১] . ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

[৩৬২] . এ টি এম আতিকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ২

[৩৬৩] . এ টি এম আতিকুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

যুক্ত হন।"[৩৬৪] তাঁর কর্মময় জীবনে পাক–ভারত উপমহাদেশের সবচেয়ে আলোচিত এবং সুপরিচিত মানুষ ছিলেন তিনি। এই কর্মবীর ১৯৬৮ সালের ১৮ ই আগস্ট ঢাকায় ইনতিকাল করেন।

আকরম খাঁ এর স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে তদীয় ভক্ত বলেন: "এক শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ জুড়ে তাঁর কর্ম জীবনের বিস্ড়ার। অতি ক্ষুদ্র থেকে এক বৃহৎ মহীরূহে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। কী ধর্মীয় ক্ষেত্রে, কী রাজনীতিতে, কী সামাজিক ক্ষেত্রে, কী সাহিত্য সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে- এক কথায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ক্ষেত্রে তাঁর জীবন ছিল বাঁধা বিঘ্ন, সংঘাত-সংঘর্ষ, দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম মুখর।"[৩৬৫]

আকরম খাঁ মূলত ১৯০৫ সাল থেকেই কুরআন অনুবাদে আত্মনিয়োগ করেন। সর্বপ্রথম সুরা ফাতিহার অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁর কুরআন অনুবাদের যাত্রা। ১৯২১ সালে 'অগ্রসর' শীর্ষক একটি জ্বালাময়ী প্রবন্ধ লেখা ও ছাপানোর অপরাধে তদনীন্ড়ন সরকার তাঁকে আলীপুরের সেন্ট্রাল জেলে আবদ্ধ করেন। এই জেল খানায় বসেই আমপারার তাফসীর বা 'কারাগারের সওগাত' লিখেন। যা ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯২২ সাল থেকে ১৯৫৮, ১৯৫৯ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে রাজনৈতিক ও সাংবাদিকতার ব্যস্ড়তার মধ্যে তিনি পূর্ণাঙ্গ কুরআন অনুবাদ করেন। তাঁর অনূদিত কুরআনের সর্বশেষ খন্টি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।[৩৬৬]

মৌলানা আকরম খাঁ'র অসংখ্য কীর্তির মধ্যে অন্যতম কীর্তি হচ্ছে পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ; যা 'তাফছীরুল কোরআন' নামে আখ্যায়িত। সুললিত ভাষায় তিনি পবিত্র কুরআনের বঙ্গানুবাদ করেন। তিনি তাঁর তরজমা ও তাফসীরে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর পূর্বেকার কোন তফসীরকারকের বা অনুবাদকের অন্ধ অনুকরণ করেন নি। বিশেষ করে পাক–ভারত উপমহাদেশে এই অন্ধ অনুকরণের কারণে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যায় ইহুদি-নাসারাদের মতামত মুসলমানদের অজান্ড়েই প্রবেশ লাভ করেছে। "মাওলানা সাহেবের এই তাফসীরের একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, এতে নবী, রাসূল, ফেরেস্ড়া ইত্যাদি সম্বন্ধে সাধারণ তাফসীরকারগণ তাদের তাফসীর সাহিত্যে যে সমস্ড় ঈসরাইলিয়াত বা বনী ইসরাঈল সম্পর্কিত অযৌক্তিক উপকথা ও কল্পিত উপাখ্যানের অবতারণা করে থাকেন, সেগুলোর বিরুদ্ধে মওলানা সাহেব তাঁর যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যামূলক বহু টীকা-টিপ্পনী সংযোজিত করেছেন।

---

[৩৬৪]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

[৩৬৫]. আবু জাফর (সংকলিত ও সম্পাদিত), *মওলানা আকরম খাঁ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭) পৃ. ২৮

[৩৬৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

পূর্ববর্তী তাফসীরকারদের অবহেলা ও গতানুগতিকতার প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বলেছেন যে, পূর্বে অধিকাংশ তাফসীরকারকের অভ্যাস ছিল তাঁরা অনুমানের পাখার উপর ভর করে বহু ভিত্তিহীন অমূলক কথা স্বীয় তাফসীরে জুড়ে দিতেন। এছাড়া ইহুদী-নাসারার বহু ধর্মীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও কিংবদন্ড়ী ইসলামে অনুপ্রবেশ করেছে।”[৩৬৭]

আকরম খাঁ এর তফসীর পূর্ববর্তী সমস্ড় তফসীরকারদের তুলনায় ভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসে। এ সম্পর্কে গবেষক ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান বলেনঃ “মাওলানা আকরম খাঁ কৃত ‘তাফসীরচ্ল কোরআন’ এ রয়েছে প্রত্যেক সুরার মূল আরবীসহ তার সাবলীল বাংলা তরজমা, দুরূহ শব্দমালার যুক্তিশাসিত টীকা ও তার সাধারণ তাফসীর। আধুনিক কালের বহু যুগ-সমস্যা ও জীবন জিজ্ঞাসার তিনি আলোচনা করেছেন এই তাফসীরের মাধ্যমে।”[৩৬৮]

তিনি আরবী ও বাংলা উভয় ভাষারই পন্ডিত ছিলেন। বিশেষ করে অনুবাদের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা জ্ঞান বেশি প্রয়োজন হয়। এক ভাষার অলঙ্কার ও ব্যাকরণের সাথে অপর কোন ভাষারই সম্পর্ক থাকে না। তিনি তাঁর ‘তাফসীরচ্ল কোরআনে’ “একদিকে যেমন আরবী ভাষার লীলাধর্ম, রীতিধারা, বাকপ্রণালী, বাচনভঙ্গি, ব্যবহার বিধি ইত্যাদির প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রেখেছেন, অন্যদিকে ঠিক তেমনি বাংলা ভাষার সাহিত্য রীতির সঙ্গে একটা সুসঙ্গতি রেখে অগ্রসর হতে চেয়েছেন।”[৩৬৯] তাঁর অনুবাদখানা সহজ সাবলীল হওয়ার কারণে একটি আয়াতের অনুবাদ পড়লে; অপর আয়াত পাঠের জন্য পাঠককে একটি অদৃশ্য আকর্ষণ সামনে টেনে নিয়ে যায়।

ব্যাখ্যা ও টীকা-টীপ্পনীর ক্ষেত্রে তিনি যে যুক্তি ও চিন্ড়া দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন; তাতে আধুনিক পন্থী ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় শিক্ষিত লোকদের কুরআন পাঠে আকৃষ্ট করবে বলে মনে হয়।

এইভাবে খান বাহাদুর তসলীম উদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭), খন্দকার আবুল ফজল আব্দুল করিম (১৮৭৫-১৯৪৭), রূহুল আমিন (১৮৯২-১৯৪৫), আব্দুল হাকিম (১৮৮৭-১৯৫৭), ফজলুর রহিম চৌধুরী (১৮৯৬-১৯২৯), ড. মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা (১৯০১-১৯৭৭) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পবিত্র কুরআনের আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ আমাদের সামনে পেশ

[৩৬৭]. ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

[৩৬৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১

[৩৬৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

করেন। অন্য দিকে পাকিস্ড়ান আমলে ইসলামিক একাডেমী বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পবিত্র কুরআনের একটি সরল অনুবাদ প্রকাশ করে। যার ফলে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য এখন কুরআন বুঝার পথ অনেক সহজ হয়ে গেছে।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত (অনূদিত) কুরআন ও এ বিষয়ক কিছু সাহিত্য গ্রন্থ (১৯০১-১৯৫০)ঃ

বাংলা ভাষায় ১৮৮১-১৮৮৬ এই সময়ের মধ্যে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ কুরআনের অনুবাদ রচনা করেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০)। তাঁর অনূদিত গ্রন্থটির নাম 'কোরআন শরীফ (কোরআন)'। ১৯০১-১৯৫০ এই সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত কুরআন বিষয়ক কিছু গুরচত্বপূর্ণ গ্রন্থের পরিচিতি উলেণ্টখ করছি, যা অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নে সহায়ক হবে। এতে লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করছিঃ

ক্রমিক নং	গ্রন্থের নাম / শিরোনাম	লেখক (জন্ম-মৃত্যু)	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
১.	কোরআন	রাজেন্দ্রনাথ মিত্র	আয়ুর্বেদ প্রেস, কলিকাতা, ১৮৭৯
২.	কোরাণ শরিফ, প্রথম খন্ড, মূল কোরাণ শরিফ হইতে অনুবাদিত	গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০)	গহর সেরপুরঃ চারচযন্ত্রে শ্রীতারিণীচরণ বিশ্বাস কর্তৃক মুদ্রিত, ১৮৮১
৩.	কোরাণ শরিফ	গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০)	দেবযন্ত্র, কলিকাতা, (১৮৮১-১৮৮৬ সব খন্ড প্রকাশিত), ১৮৮৯
৪.	মূল কোরআন শরিফ হইতে অনুবাদিত ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তাফসির অবলম্বনে টীকা লিখিত	ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অনুবাদিত	হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৯
৫.	বঙ্গানুবাদিত কোরাণ শরিফ প্রথম খন্ড	নইমূদ্দীন (১৮৩৮-১৯০৮)	করটিয়ঃ মাহমুদীয়া যন্ত্রঃ মীর আতাহার আলী, ১৮৮৭
৬.	বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত ও ভিন্ন ভিন্ন প্রসিদ্ধ তফসীর অবলম্বনে লিখিত টীকাসহ কোরাণ শরীফ	উইলিয়াম গোল্ডস্যাক (১৮৬১-১৯৫০)	ব্যাপ্টিস্ট মিশন প্রেস, ১৯০৮-১৯০২০
৭.	সরল, প্রাঞ্জল এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ কোর-আন শরীফ	মৌলভী খন্দকার আবুল ফজল আব্দুল করিম (১৮৭৫-১৯৪৭)	দেলদুয়ার, টাংগাইল ও এসলামীয়া লাইব্রেরী, ঢাকাঃ ১৯১৪
৮.	কোরান শরীফ	মুনশী করিম বখশ	তরিকা-ই-ইসলাম প্রেস, জাননগর, ইন্টালি, কলিকাতা, ১৯১৬
৯.	কোরাণ শরিফ; মূল আরবিসহ	মোহাম্মদ আবদুল	প্রথম সংস্করণ: মোহাম্মদ ফাজেল

	বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ ও বিস্ড়ৃত তফসীর পারা	হাকিম (১৮৮৭-১৯৫৭) ও মোহাম্মদ আলি হাসান অনূদিত ও সঙ্কলিত	এন্ড সন্স, ১৯২২-১৯৩৮
১০.	কোরআন শরিফ আম-পারা (বিস্ড়রিত টীকা, অনুবাদ ও ভাবার্থ সম্বলিত)	মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)	মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯২২
১১.	সরল বাংলা অনুবাদ ও বিস্ড় ারিত তাফছীর সহ কোরআন শরীফ (সর্বমোট পঞ্চম খন্ড, সুরা ফাতিহা থেকে সুরা নাস)	মোহাম্মদ আকরম খাঁ	ঢাকা: ঝিনুক পুস্ড়িকা, ১৩৮২ বাংলা
১২.	কোরআন শরীফ (১ম খন্ড, বঙ্গানুবাদ ১-১৫, ২য় খন্ড, ১৬-৩০	মরহুম মৌলভী ফজলুর রহিম চৌধুরী (১৮৯৬-১৯২৯)	বরিশাল: উলানিয়া: এসলামিয়া লাইব্রেরী, ১৯৩৫
১৩.	মূল আরবী ও উহার বাংলা উচ্চারণ ও তফছীরসহ বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ	মোহাম্মদ নকীব উদ্দীন খাঁ (জ. ১৩০১ বাংলা) কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও সঙ্কলিত	কলিকাতা: মিনার কোম্পানী, হাজী লেন, ১৯৩৮-১৯৪৯
১৪.	পবিত্র কোরান	ওষমান গণী	সলদা আঝাপুর, বর্ধমান, ১৯৪৭
১৫.	তাফসীরে আশরাফী (বঙ্গানুবাদ)	মওলানা আশরাফ আলী থানভী (১৮৬৩-১৯৪৩)	১ম সংস্করণ, ঢাকা: এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৫০-১৯৬০
১৬.	বঙ্গানুবাদ কোরআন শরীফ / উর্দু ভাষায় মূল অনুবাদক / হযরত মওলানা আশরাফ আলী থানভী [বাংলা অনুবাদকঃ সেখ আবদুল ওয়াহীদ]		প্রথম সংস্করণ- কলিকাতা: দারুল এশায়াত ইসলামিয়া, মহরম, ১৩৮৪ হি; ১৯৬২ ইং
১৭.	আল-কুরআন (বাংলা তর্জমা), সুরা ফাতিহা ও সুরা বাকারার শেষ পর্যন্ড় অনুবাদ	গোলাম মোস্ড়ফা (১৮৯৭-১৯৬৪)	ঢাকা: মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, ১৯৫৭
১৮.	কোরআন শরীফ: প্রয়োজনীয় টীকা সহ সমগ্র কোরআন শরীফের বঙ্গানুবাদ, আরবী মূলহীন বঙ্গানুবাদ	মোবারক করীম জওহর	প্রথম প্রকাশ: কলকাতা: হরফ প্রকাশনী, ১৯৭৪
১৯.	পবিত্র কোরআন, প্রথম ভাগ ১ থেকে ১৪, দ্বিতীয় ভাগ ১৫-৩০	কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৬-১৯৭০) অনূদিত	ভারতী লাইব্রেরী, ১৯৬৬
২০.	আল-কুরআনুল করীম : সুরা	সম্পাদনামন্ডলী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,

	ফাতিহা হইতে সুরা নাস		১৯৮৬

এই ধারাবাহিকতায় বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুরআন অনুবাদের যে আবদ্ধ দুয়ারটি খোলে যায় এর প্রভাবে ইসলামের অন্যান্য সাংস্কৃতিক দিকও উন্নতি লাভ করে। কুরআন ভিত্তিক বিভিন্ন ওয়াজ-মাহফিল, তাফসীর-তরজমা ইত্যাদি বাংলার মুসলিম সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করে। মানুষ ইসলামের সুমহান আদর্শের সাথে পরিচিতি লাভ করার সুযোগ পায়। কুরআনের শিক্ষা নিয়ে গ্রাম বাংলায় ব্যাপকভাবে মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানা বা সদকায়ে জারিয়ার কাজ চলতে থাকে। যা অবহেলিত বাংলার মুসলিম সমাজের উন্নয়নে এক গুরচত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখে।

খ. সীরাত ও হাদীস বিষয়ক রচনা (১৯০১-১৯৫০)ঃ

'সীরাত' আরবী শব্দ। এ শব্দের বহুবচন হচ্ছে 'সিয়ার'। মূল শব্দ 'সাইরচ্ন'। এর অর্থ চাল-চলন, গতি ইত্যাদি। সীরাত এর আভিধানিক অর্থ হলো কোনো ভালো মানুষের বা নেককার মানুষের চাল চলন উঠা বসা, কাজ, মেজাজ, মর্জি। এক কথায় জীবন পদ্ধতি বা জীবন চরিত। ইসলামী বিশ্বকোষ 'সীরাত'এর অর্থ লিখেছে- সুন্নাহ, কীর্তি, কাহিনী, প্রাচীনদের জীবনী ও ঘটনাবলীর বর্ণনা। পারিভাষিক অর্থে- ''মহানবী (সা.) এর সার্বিক জীবন চরিতকে সীরাত বলে। রাসূল (সা.) এর বিখ্যাত জীবনী গ্রন্থগুলোর নামের সাথে এই 'সীরাত' শব্দটি সম্পৃক্ত দেখা যায়। যেমন- সীরাতে ইবনে ইসহাক, সীরাতে ইবনে হিশাম।"[৩৭০] মূলত সীরাত সাহিত্যে বিশুদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক পন্থায় সংরক্ষিত নবীজীর জীবন চরিত উপস্থাপন করা হয়।

বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক সাহিত্য কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করার আগে এর একটি পটভূমি আলোচনা করছি। নবীজীর (সা.) সীরাত চর্চার ক্ষেত্রে সাহাবী[৩৭১], তাবেয়ী[৩৭২], তাবেতাবেয়ীগণ[৩৭৩] অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। তবে তাঁদের উলেণ্ঢখযোগ্য লিখিত কোন বই আমাদের হাতে পৌছায়নি। তাদের লেখা ছিল

---

[৩৭০] নাসির হেলাল (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫) পৃ.৭

[৩৭১] সাহাবী ঐ ব্যক্তি, যিনি ঈমান সহকারে রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.) এর সাথে সাক্ষাত লাভ করেছেন, এবং ইসলামের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন।

[৩৭২] তাবেয়ী তিনি, যিনি সাহাবীগণের সংস্পর্শে ছিলেন।

[৩৭৩] . যিনি কোন তাবিয়ীর সংস্পর্শে ছিলেন কিংবা তাঁর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন, অথবা তাঁর সাক্ষাত লাভ করেছেন।

অগোছালো, বিচ্ছিন্ন। উরওয়া ইবনে যুবাইর (২৩-৯৪ হিজরি) নবীজীর (সা.) প্রথম জীবনীকার নামে ঐতিহাসিকরা উলেণ্টখ করেছেন।

ইসলামের পঞ্চম খলীফা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীযের পরামর্শক্রমে, রাসুলের ওফাতের ৮৫ বছর পর ইমাম শিহাব আল যুহরী (৫১-১২৪ হিজরী) সীরাত চর্চা শুরচ করেন। তাঁর লিখিত সীরাত বিষয়ক বইটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে প্রথম সীরাতকার হিসাবে বর্তমান বিশ্বে যিনি সুপরিচিত তিনি হলেন, ইবনে ইসহাক (৮৫-১৫১ হিজরি)। নবীজীর পরকালে যাত্রার মাত্র ৭৪ বছর পর রচিত 'সীরাত রাসুলুলণ্টাহ' সীরাত বিষয়ক সর্বাধিক প্রাচীনতম ও পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য গ্রন্থ।[৩৭৪] এভাবে সীরাত চর্চার ধারা আরবের গন্ডি পেরিয়ে বিভিন্ন মহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে; শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসছে। এ ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় বাঙালি মুসলমান কবিরা ঈর্ষণীয় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। চর্তুদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের মধ্যে অন্দড়ত ৫০ টির মত সীরাত বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ তাঁরা রচনা করেছেন।[৩৭৫]

এ ক্ষেত্রে উপমহাদেশের ইসলামী চিন্দড়বিদগণও পিছিয়ে থাকেন নি। তাঁরাও সীরাতকার হিসাবে উলেণ্টযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেনঃ আলণ্টামা শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪), সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী (১৮৮৪-১৯৫৩), কারী মোহাম্মদ দেওবন্দী (১৩১৫ হিজরি), আবুল আলা মওদুদী (১৯০৩-১৯৭৯), মুফতী মুহম্মদ শফী (১৮৯৭-১৯৭৬), মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), কবি গোলাম মোস্দড়ফা (১৮৯৭-১৯৬৪), এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৬-১৯৪০), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৯) ও কাজী নজরচ্ল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)।

বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চাঃ

বাংলা ভাষায় কবে থেকে সীরাত চর্চা শুরচ হয়েছে তার সন তারিখ উলেণ্টখ করা সম্ভব নয়। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমরের (রা.) সময়কাল থেকেই মৌখিকভাবে সীরাতচর্চা শুরচ হয়, ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে। ১৪০০-১৯০০ এই সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হয় নবী (সা.) জীবনীর উপর এবং উপমহাদেশে উর্দু ও ফার্সী ভাষায় রচিত সীরাতের উপর অনেক গ্রন্থই বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে বাঙালি লেখক ও পাঠকদের খোরাক যোগিয়েছে। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের প্রথম মুসলমান কবি

[৩৭৪]. নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

[৩৭৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

হলেন-শাহ মুহম্মদ সগীর (১৩৩৯-১৪০৯)। তিনি রসুল প্রশস্ড়ি করে তাঁর কাব্য শুরচ করেছেন। 'ইউসুফ জুলয়খা' কাব্যে তিনি লিখেছেন-

"জিবাত্মা পরমাত্মা মোহাম্মদ নাম
প্রথম প্রকাশ তথা হৈলা য়নুপাম
যত ইতি জিব আদি কৈল ত্রিভোবন
তারপর মোহাম্মদ মাণিক্য সৃজন।"[৩৭৬]

বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস দুশো বছরের হলেও কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছরের পুরোনো। প্রাচীন বাঙালি কবিদের প্রায় সবাই মুহাম্মদ (সা.) এর প্রশংসা করে কবিতা লিখেছেন। উলেণ্ডখযোগ্য কয়েকজন কবির কবিতার কিছু পংক্তি তুলে ধরছি। সপ্তদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি আলাওল তাঁর কাব্যের শুরচতেই লিখেছেনঃ

"পূর্বেতে আছিল প্রভূ নৈরূপ আকার
ইচ্ছেলেক নিজ সখা করিতে প্রচার
নিজ সখা মহাম্মদ প্রথমে সৃজিলা
সেই সে জ্যোতির মূলে ভবন নিরমিলা।"[৩৭৭]

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'মৌলুদ শরীফ' গ্রন্থে লিখেছেন:

"তুমি হে এছলাম রবি
হাবিবুলণ্ডাহ শেষ নবী
নতশিরে তোমার সেবি
মোহাম্মদ এয়ারাছুলুলণ্ডাহ।"[৩৭৮]

কবি গোলাম মোস্ড়ফাও গীতি কবিতা রচনা করেছেন। যেমন-

"নিখিলের চির সুন্দর সৃষ্টি

---

[৩৭৬] . প্রাগুক্ত, পৃ.১৭
[৩৭৭]. প্রাগুক্ত, পৃ.১৯
[৩৭৮] . প্রাগুক্ত, পৃ.১৯

আমার মোহাম্মদ রসূল।

কুলমাখলুকাতের গুলবাগে

যেন একটি ফোটা ফুল।"[৩৭৯]

বর্তমানে বাঙালি মুসলমানের ঘরে ঘরে মিলাদ মাহফিলে এসব গীতি পড়া হয়। যা মুসলমানদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাব সৃষ্টি করে। তারপর কবি কাজী নজরচ্ল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), ফররচখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), জসিম উদ্দীন (১৯০৩-১৯৭৬), বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩), তসলিম হোসেন, সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২-) ও আল মাহমুদ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকগণ রাসুলের প্রশংসা করে কলম ধরে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

বাংলা গদ্য সাহিত্যে সীরাত বিষয়ে ১৮৮৭ সালে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেন শেখ অবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১)। গ্রন্থটির নাম 'হযরত মুহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি'। ১৯০১-১৯৫০ এই সময়ের মধ্যে বাংলা ভাষায় রচিত ও প্রকাশিত সীরাত বিষয়ক কিছু গুরচত্বপূর্ণ গ্রন্থের পরিচিতি উলেণ্ডখ করছি, যা অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য বাস্ড়বায়নে সহায়ক হবে। এতে লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থের পরিচিতি তুলে ধরার চেষ্টা করছিঃ

বাংলা ভাষায় সীরাত সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থঃ

ক্রমিক নং	গ্রন্থের নাম	লেখক (জন্ম-মৃত্যু)	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
১.	মহাপুরচষ মহাম্মদের (দ) জীবন চরিত (১ম খন্ড)	গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০)	নববিধান সমাজ, কলকাতা, ১৮৮৬
২.	মহাপুরচষ মহাম্মদের (দ) জীবন চরিত (২য় খন্ড)	গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০)	নববিধান সমাজ, কলকাতা, ১৮৮৭
৩.	মহাপুরচষ মহাম্মদের (দ) জীবন চরিত (৩য় খন্ড)	গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০)	নববিধান সমাজ, কলকাতা, ১৮৮৭
৪.	হযরত মুহম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি	শেখ আব্দুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩৩)	মোহিনী মোহন মজুমদার, কলকাতা, ১৮৮৭
৫.	হযরত মোহাম্মদ (সা.)	মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৯)	শান্ড়িপুর, নদীয়া, ১৯০৩
৬.	হযরত পয়গম্বরের জীবনী (নবীজীর যুদ্ধাবলী	শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)	মুন্সী মুহম্মদ মেহেরচল্লাহ, যশোর, ১৯০৪

[৩৭৯] .প্রাগুক্ত, পৃ.২১

৭.	নবী সম্রাট	মোবারক করিম জওহর	খাঁন ব্রাদার্স এন্ড কোং, ১৯১৩
৮.	মোস্তফা চরিত	মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)	মহম্মদী বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯২৫
৯.	মানব মুকুট	মো: এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)	বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, কলকাতা, ১৯২৬
১০.	শেষ প্রেরিত নবী (কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিবাদে)	খোন্দকার আব্দুর রশীদ	প্রকাশক, গ্রন্থকার, লাহোর, ১৯২৬
১১.	হযরত মোহাম্মদ (দ.)	খান বাহাদুর আহসানুল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫)	বদরুদ্দোজা, কলকাতা, ১৯৩১
১২.	মোস্তফা চরিতের বৈশিষ্ট্য	মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮)	মহম্মদী বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৩২
১৩.	মরু-ভাস্কর	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)	বুলবুল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯৪১
১৪.	বিশ্বনবী	কবি গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)	মাহফুজা খাতুন, ভূদেব ভবন, চুচূড়া, ১৯৪২
১৫.	রাসুলুল্লাহর সৈনিক জীবন	এ,এফ.এম.আব্দুর মজিদ রুশদী	সৈয়দ আবুল ফজল, পুরানা নওয়াব বাড়ী, কুমিল্লা, ১৯৪৬, অন্য মুদ্রণ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৭৯
১৬.	নবী কাহিনী	সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)	কথা বিতান, কলকাতা, ১৯৪৯
১৭.	ছাইয়েদুল মুরছালীন (১ম খণ্ড)	মাওলানা আব্দুল খালেক (মৃত্যু:১৯৫৫)	ইস্ট বেঙ্গল বুক সিন্ডিকেট, ঢাকা, ১৯৫১, অন্য মুদ্রণ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪
১৮.	ছাইয়েদুল মুরছালীন (২য় খণ্ড)	মাওলানা আব্দুল খালেক (মৃত্যু:১৯৫৫)	ইস্ট বেঙ্গল বুক সিন্ডিকেট, ঢাকা, ১৯৫১, অন্য মুদ্রণ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৪
১৯.	বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য	গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪)	আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬০
২০.	নবী গৃহ সংবাদ	মুহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)	গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ১৯৬০, অন্য মুদ্রণ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮
২১.	শেষ নবীর সন্ধানে	ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬১)	রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬১
২২.	নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ	মুহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৮-১৯৭৪)	গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ১৯৬০

২৩.	হযরত মোহাম্মদ (সা.) (১ম খণ্ড)	সৈয়দ বদরুদ্দোজা (১৮৯৭-১৯৭৪)	প্রকাশক, গ্রন্থকার, কলকাতা, ১৯৬৬
২৪.	হযরত মোহাম্মদ (সা.) (২য় খণ্ড)	সৈয়দ বদরুদ্দোজা (১৮৯৭-১৯৭৪)	প্রকাশক, গ্রন্থকার, কলকাতা, ১৯৬৬
২৫.	হযরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর শিক্ষা ও অবদান	সৈয়দ বদরুদ্দোজা (১৮৯৭-১৯৭৪)	প্রকাশক, গ্রন্থকার, কলকাতা, ১৯৬৬; গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ১৯৬০, অন্য মুদ্রণ: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭
২৬.	বিশ্বনবীর বিশ্বসংস্কার	আবুল হোসেন ভট্টাচার্য (১৯১৬-১৯৮৩)	খন্দকার মজিদ আলী, বগুড়া, ১৯৬৯
২৭.	বিশ্বে ভ্রাতৃত্বে মোহাম্মদ (দ)	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী	জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, ঢাকা, ১৯৬৯
২৮.	বাংলা সাহিত্যে রসূল চরিত	মুহম্মদ মজির উদ্দীন মিয়া	বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩
২৮.	আমিতো দিয়েছি তোমাকে কাউসার	ড. কাজী দীন মুহাম্মদ (জ. ১৯২৭-	প্রীতি প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৩
৩০.	হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন	শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন (১৯০৫-১৯৯৫)	ইসলামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ১৯৯৮
৩১.	বাংলা ভাষায় সীরাত চর্চা	মো: আবুল কাশেম ভূইয়া	তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৯৮
৩২.	মহানবীর ভাষণ	আব্দুল কাইয়ুম নদভী	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৪
৩৩.	সীরাত বিশ্বকোষ (১ম খণ্ড-১০ম খণ্ড)	সম্পাদনা পরিষদ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০০-২০০৫

সীরাত বিষয়ক সাহিত্য কর্ম (১৯০১-১৯৫০) (কাব্য গ্রন্থ)

ক্রমিক নং	**গ্রন্থের নাম**	**লেখক (জন্ম-মৃত্যু)**	**প্রকাশক ও প্রকাশকাল**
১.	হযরত মহাম্মদ	মোজাম্মেল হক (১৮৬২-১৯৩৩)	মোহাম্মদীয়া লাইব্রেরী , শান্তিপুর, ১৯০৩
২.	পরিত্রাণ কাব্য	শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)	মুনসী মহম্মদ মেহেরউলণ্যা, যশোহর, ১৯০৩
৩.	মদিনার গৌরব	মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯১২)	গ্রন্থকার, কলকাতা, ১৯৩৬
৪.	মহাম্মদ	রামকানাই দত্ত (১৮৫২-১৯২২)	গ্রন্থকার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, ১৯০৯

৫.	মরচ-ভাস্কর	কাজী নজরচ্ল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬)	প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫০
৬.	সিরাজাম মুনীরা	ফররচ্খ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)	তমুদ্দন প্রেস, ঢাকা, ১৯৫২
৭.	নজরচ্ল কাব্যে নবী মোস্ত্ফা	মো: আব্দুল কুদ্দুস (১৯০৮-১৯৮৮)	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,১৯৮০
ছোটদের উপযোগী নবীজীর (সা.) জীবনী গ্রন্থ			
১.	হযরতের জীবনী	গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০)	
২.	নূরনবী	মো: এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০)	মঈনুদ্দীন হোসাইন, তালতলা, কলকাতা,১৯১৮
৩.	পেয়ারা নবী	খান বাহাদুর আহছানুলণ্টাহ (১৮৭৬-১৯৬৫)	মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহছানুলণ্টাহ বুক হাউস লি
৪.	ছোটদের হযরত মোহাম্মদ (দ)	মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)	দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ১৯৪৯
৫.	আমাদের নবী	বন্দে আলী মিয়া (১৯০৭-১৯৭৯)	প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৪৭
৬.	মরচ দুলাল	কবি গোলাম মোস্ত্ফা (১৮৯৭-১৯৬৪)	মুসলিম বেঙ্গল লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৪৮
৭.	ছেলেদের মহানবী	খান বাহাদুর আহছানুলণ্টাহ (১৮৭৬-১৯৬৫)	আহছানিয়া লাইব্রেরী, খুলনা, ১৯৫১
৮.	ছোটদের নবী কথা	ড. মুহম্মদ শহীদুলণ্টাহ (১৮৮৫-১৯৬৯)	প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬১
৯.	ছোটদের নবী কাহিনী	আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)	ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬১
১০.	ছোটদের মহানবী	অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)	আইডিয়েল পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৬১
১১.	আমাদের মহানবী	অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮)	,,
১২.	আমাদের শেষ নবী	আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫)	ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬২
১৩.	নবী কথা	সেকান্দার আবু জাফর (১৯১৮-১৯৭৮)	১৯৬৩
১৪.	আমার রাসূল	কবি ফররচ্খ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)	

বিবিধ গ্রন্থ ও লেখক			
১.	হযরত মোহাম্মদ (দ.)	মৌলভী মেয়ারাজউদ্দীন আহম্মদ,	কলকাতা,১৯১১
২.	পরশমণি (গদ্যে নবী জীবনী)	শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)	
৩.	আইন প্রণেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)	এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১০	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা

আলোচিত সময়কালের পর বিভিন্ন ভাষা থেকে সীরাত বিষয়ক অসংখ্য মৌলিক গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়। যেমন কিছু অনূদিত সীরাত গ্রন্থঃ

অনূদিত সীরাত বিষয়ক সাহিত্য কর্ম (১৯০১-১৯৫০)

ক্রমিক নং	গ্রন্থের নাম	লেখক (জন্ম-মৃত্যু)	প্রকাশক ও প্রকাশকাল
১.	আল আদাবুল মুফরাদ	মূল:ইমাম বুখারী, অনুবাদক: ইসলামিক ফাউন্ডেশন	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪
২.	পয়গামে মোহাম্মদী	মূলঃ মাওলানা সাইয়্যেদ মোহম্মদ আলী আল কাদেরী আল মুঙ্গেরী, অনুবাদক: কবি মুহাম্মদ গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪)	মহম্মদী বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯২২
৩.	রাসূলুলণ্ঢাহর বিপণ্ঢবী জীবন	মূলঃ আবু সলিম মোহাম্মদ আব্দুল হাই, অনুবাদকঃ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	ইসলামিক পাবলিকেশন্স ঢাকা, ১৯৬৩
৪.	সিরাতুন্নবী	মূল:আলণ্ঢামা শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৫), অনুবাদক ও সম্পাদক: মাওলানা মহিউদ্দীন খান	প্যারাডাইস লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৪
৫.	সীরাতে রাসূলুলণ্ঢাহ (সা.)	মূলঃ ইবনে ইসহাক, অনুবাদক: শহীদ আখন্দ	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০
৬.	সীরাতে খাতিমূল আম্বিয়া	মূলঃ মুফতী মুহম্মদ শফী (১৩১৪-১৩৯৬ হিজরী), অনুবাদক: মোঃ সিরাজুল হক	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০
৭.	সীরাতে সারওয়ারে আলম	মূলঃ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী (১৯০৩-), অনুবাদক: আব্বাস আলী খান	সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী রিসার্চ একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩

		(১৯১৪-২০০০)	
৮.	আনওয়ারে আম্বিয়া	ইদারায়ে তাসনিফ ও তালিফ সম্পাদিত, অনুবাদক: এম,এম, সিরাজুল ইসলাম	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৭
৯.	বিশ্বনবীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	মূল: ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়্যেব, অনুবাদক: মোহাম্মদ আনিসুল হক	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭
১০.	হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনী বিশ্বকোষ (১ম খন্ড)	মূল:আফজালুর রহমান (লন্ডন), অনুবাদ কামিটি: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৯
১১.	জিহাদের ময়দানে হযরত মুহাম্মদ (সা.)	মূল: ড: মো: হামিদুল্লাহ (১৯১০-১৯৯৮), অনুবাদক: মুহম্মদ লুৎফুল হক	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯১
১২.	সীরাতুল মোস্তফা (সা.)	মূল: ইদ্রিস কান্দলভী (১৩১৭-১৩৯৪ হিজরি), মাওলানা বশির উদ্দীন	মোহাম্মদী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৯১
১৩.	কাছাছুল কোরআন, (৫ম খন্ড) হযরত মোহাম্মদ (সা.)	মূল: মাওলানা হিফযুর রহমান (১৯৬৭-১৯১৫), অনুবাদক: মাওলানা নূরুন্নর রহমান	এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯১
১৪.	দি স্পিরিট অব ইসলাম	মূল: সায়্যিদ আমীর আলী, অনুবাদক: অধ্যাপক মহম্মদ দরবেশ আলী খান	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৩
১৫.	মহানবী (সা.) এর জীবন চরিত	মূল: ড: মুহাম্মদ হোসাইন হায়কল, অনুবাদক: মাওলানা আব্দুল আওয়াল	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,২০০১
১৬.	রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর সরকার কাঠামো	মূল: ড:মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী, অনুবাদ কামিটি: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা
১৭.	হযরত রাসূলে কারীম (সা.) :জীবন ও শিক্ষা	অনুবাদকবৃন্দ, ইসলামী বিশ্বকোষ প্রকল্প	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা,১৯৯৭

উল্লেখিত গ্রন্থাবলী থেকে কয়েকটির উপর সংক্ষেপে আলোচনা ও সমালোচনা করেই এ বিষয়ের ইতি টানবো।

এক. **'হযরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি', শেখ আবদুর রহীম, মোহিনী মোহন মজুমদার, কলকাতা, ১৮৮৭**

ঊনবিংশ শতাব্দীতে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবনের উপর বাংলা ভাষায় লিখিত সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থ হচ্ছে 'হযরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি' (১৮৮৭)। কোন কোন গবেষক এটিকে বাংলা ভাষায় লিখিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ সীরাত গ্রন্থ হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। গ্রন্থকারের অনেকগুলো রচনার মধ্যে এটিই বেশি খ্যাতি লাভ করেছে। "এই গ্রন্থ বিশ্বস্ড় কি না তাহার প্রমাণের জন্য কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার আরবী ও ফার্সীর অধ্যাপকদের নিকট হইতে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করিতে হয়। ইহাই বাংলার মুসলমানদের লিখিত হযরত মুহাম্মদের সর্বপ্রথম জীবন চরিত।"[৩৮০]

এই বইতে তাঁর অসাধারণ পরিশ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর আছে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ আরবী ও ফার্সী গ্রন্থ ছাড়াও স্যার সৈয়দ আহমদ ও সৈয়দ আমীর আলীর রচনা থেকে তিনি সাহায্য গ্রহণ করেন এবং ইউরোপীয় প িতদের মতামত আলোচনা করেন। যাঁদের রচনাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে ইমাম গাজ্জালী, শাহ ওয়ালীউলণ্ঢাহ, চিরাগ আলী, শিবলী নোমানী, মওলানা মোহাম্মদ আলী এবং টি ডবিণ্ঢও আর্নল্ডের নাম উলেণ্ঢখযোগ্য।

তাঁর ব্যবহৃত গ্রন্থাবলী থেকে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, ইসলাম জগতে যেসব ভাব আন্দোলন ঘটেছিল, তার সঙ্গে আবদুর রহীমের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এবং সেই পরিবর্তনশীল ভাবধারা তাঁকে আন্দোলিত করেছিল। তাই জীবন চরিতে তাঁকে যেমন ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম বিশুদ্ধতার সম্মান করতে দেখি, তেমনি যুক্তিধর্মী চিন্ড়ার প্রয়াস এতে লক্ষ্য করা যায়।[৩৮১]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি যখন নতুন নতুন বিস্ময় রচনা করছিল, আবদুর রহীম তখন এই গ্রন্থ রচনা করেন। এর প্রভাবে সে যুগে হিন্দু ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুরচ হয়েছিল। জীবন চরিতে এর সমান্ড়রাল চেষ্টা দেখা যায়, ঐশী বাণীর প্রমাণ উপস্থিত করার জন্যে তিনি 'ত্বরিত বার্তাবহ', 'তারহীন টেলিগ্রাফ' 'টেলিফোন', 'গ্রামোফোন', প্রভৃতির আলোচনা করে বলতে চেয়েছেন যে এইগুলো সম্ভব হলে ঐশী বাণী অসম্ভব হবে কেন? আলণ্ঢাহর অস্ড়িত্ব প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা এবং সৌর জগতের রহস্য সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হন।[৩৮২]

---

[৩৮০] .মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা দ্বিতীয় খ* (ঢাকাঃ হাসি প্রকাশালয়, ১৩১১), পৃ. ১১৭

[৩৮১]. ড. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম সাধনা ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)* (ঢাকাঃ লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের গবেষণা গ্রন্থ, ১৯৬৪)

[৩৮২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩-৩০৪

আবদুর রহীমের প্রতিটা বক্তব্যই ছিল যুক্তিধর্মী ও গবেষণামূলক। তাঁর লেখা ছিল তৎসম শব্দ প্রধান ও ধ্বনিময় গদ্যরচনা। যুক্তিধর্মী হওয়ার প্রচেষ্টা ছাড়াও জীবন চরিতের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য এর ভাষা সম্পদ, ক্লাসিকেল গদ্যরীতির ছাপ সেখানে সুস্পষ্ট।[৩৮৩]

মাত্র আটাশ বছর বয়সে রচিত 'হযরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি' শেখ আবদুর রহীমের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বাঙালি মুসলমান রচিত হযরত মোহাম্মদের প্রথম জীবনী গ্রন্থ বলে শুধু নয়, উপকরণের সংগ্রহে ও পরিবেশনের নৈপুণ্যে এটি আমাদের সাহিত্যের স্মরণীয় রচনা।[৩৮৪] লেখক ১৩২০ বাংলা সনে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন-"আজ প্রায় ২৫ বৎসর হয়, এই গ্রন্থখানি প্রথমবার মুদ্রিত হইয়াছিল। তৎকালে বঙ্গদেশের মুসলমানদিগের মধ্যে বর্তমান সময়ের ন্যায় বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার প্রচলন ছিল না, তথাপি সেই সময়ে বঙ্গীয় হিন্দু ও মুসলমান ভাতৃগণের নিকট ইহা সাদরে গৃহীত হইয়াছিল এবং খৃষ্টান পাদ্রিগণও ইহা অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন। 'হযরত মুহাম্মদের এরূপ সম্পূর্ণ জীবন চরিত বঙ্গ ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে' বলিয়া কলিকাতা গেজেটে সমালোচিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া লন্ডনের এশিয়াটিক সোসাইটির কর্তৃপক্ষগণ ইহার কয়েকগুণ খ ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন।"[৩৮৫]

দুই. 'নূরনবী', মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী, মঈনুদ্দীন হোসাইন, তালতলা, কলকাতা, ১৯১৮

মরহুম এয়াকুর আলী চৌধুরী রচিত 'নূরনবী' গ্রন্থখানির তুল্য গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিরল। শিশুদের জন্য এত সুন্দর, সুস্বাদু ও সুললিত ভাষায় কোন বাঙালিই নবী চরিত রচনা করতে পারেনি। গ্রন্থটির ভাষা ও ভাব পাঠককে মাদকের নেশার মত টানে ও ধরে রাখার চেষ্টা করে। বাচ্চাদের জন্য রচিত হলেও যে কোন বয়সী পাঠক বইটি পড়লে; মহাপুরুষ হযরত মোহম্মদ (সা.) এর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অন্ড়র থেকেই জেগে উঠবে। বইটি গ্রন্থকারের অসামান্য কীর্তি তাতে কোন সন্দেহ নাই।

গ্রন্থটি পাঠের পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখককে উৎসাহিত করেছিলেন এইভাবে-" 'নূরনবী' পাঠ করিয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার ভাষা সরল ও সুন্দর এবং ইহার বিষয় ও রচনাপ্রণালী শিশু পাঠকদের

---

[৩৮৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

[৩৮৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৩৮৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

পক্ষে মনোরম। এইরূপ সহজ বাংলা ভাষায় লেখা কঠিন কাজ। আপনি তাহাতে সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।”[৩৮৬]

বহু ভাষাবিদ ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ ‘নূরনবী’ পড়ে প্রাণ খুলে তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করেছিলেন: “মওলবী মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী কেবল একজন লেখক নহেন, তাঁহার অন্তরঙ্গেরা জানেন যে, তিনি একজন সাধক। তাঁহার প্রত্যেক পুস্তকেই সাধনার ছাপ আছে। ‘নূরনবী’ তাঁহার সাধনার অমৃত ফল। বইখানি কালিকলমে লেখা নয়, সে মনঃপ্রাণ দিয়ে রচা। তাঁহার ভাব মধুর, ভাষার ভঙ্গি মনোহর। রূপকথার ছলে মহাপুরুষের জীবন গাঁথা ইহা অতি চমৎকার। গ্রন্থকার ‘বেহেস্তের মেওয়া’ দুনিয়ায় বিলাইয়াছেন। ছেলে-বুড়ো সকলেই তাহাতে ধন্য হইবে।”[৩৮৭]

আসলেই শিশুতোষ গ্রন্থ হিসাবে ‘নূরনবী’ একখানি উচ্চাঙ্গের গ্রন্থ, যা তৎকালের সাহিত্য মহলেই মর্যাদা পেয়েছে। বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত হয়েছে এই গ্রন্থটি। সমকালীন মুসলমান সমাজের শিশু-কিশোরদের মানস গঠনে গ্রন্থটি যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, সে সম্পর্কে ‘মাসিক মোহাম্মদী’তে বলা হয়েছে: “এই পুস্তক পাঠ করিলে এক দিকে বালকগণ সৎসাহসী, কর্তব্যপরায়ণ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং কর্তব্য পালন অটল হইবে, অন্যদিকে ধর্মভীরু, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী, নিয়মপালনকারী হইয়া গুরুজনে ভক্তিশীল হইবে এবং কালে তাহারা যথার্থ মানুষরূপে দেশের, ধর্মের, আত্মীয়-স্বজনের কাজে লাগিতে পারিবে।

পক্ষান্তরে আদর্শহীন অবস্থায় কেবল তোতা পাখির ন্যায় স্কুলের বই মুখস্থ করিয়া সমাজে যে অকর্মন্য উদ্দেশ্যহীন, অলস অক্ষম দলের সৃষ্টি হইতেছে, সে পথ প্রতিরোধ্য হইয়া আসিবে। বালকগণ ব্যতিত উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিরাও এই পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।”[৩৮৮]

এয়াকুব আলী চৌধুরীর জীবনী ও সাহিত্য গবেষক মো: মোসলেম উদ্দীন জোয়ার্দার ‘নূরনবী’ গ্রন্থখানি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লেখেন- ‘তৎকালীন মুসলিম শিশু-কিশোরদের আদর্শ ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলার চিন্তা অনেকের মত এয়াকুব আলী চৌধুরীও করতেন। কিভাবে তারা সত্য সুন্দর ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে পারে- এসব কথা তিনিও ভাবতেন। আগামী দিনের নাগরিকদের চরিত্র

---

[৩৮৬] . মো: মোসলেম উদ্দীন জোয়ার্দার, *এয়াকুব আলী চৌধুরীঃ জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০২) পৃ.৭৪

[৩৮৭] . প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪

[৩৮৮] . প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫

সুন্দর ও মহৎ করে গড়ে তোলার জন্য ইসলামের সুমহান আদর্শকে তাদের সামনে তুলে ধরলেন পরম যত্নে।

লেখক শিশুর মনের সুক্ষ্ম দিকগুলো সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। শিশুর ভালো লাগা-মন্দলাগা, তাদের খেলা, হাসি-খুশি, মজা-কৌতুকের সঙ্গে সঙ্গে সৎজীবন গঠন, সৎপথে পরিচালনা করাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য'।[৩৮৯] আঠারোটি পরিচ্ছেদে গ্রন্থটি লেখা। 'আঁধারপুরী' নামক পরিচ্ছেদে লেখকের ভাষা উপস্থাপনার ধরনঃ

''সে অনেক দিনের কথা। তেরশ বছর, কি তারও আগে, সেই সাত সমুদ্র পার, তের নদীর ধার, সেই সোনা হীরার গাছ, আর মুক্তা মনির ফুল... না ছিল ফুলে ফুলে পরীর মেলা, আর না ছিল সব দেশে দেশে রাজপুত্রের খেলা। সে ছিল এক আঁধারের যুগ। ...লোকের না ছিল ধর্ম না ছিল জ্ঞান। মানুষ পূজা, কি পুতুল পূজা, গাছেরই সেজদা করে, না পাথরেই মাথা রাখে, তার কিছুই ঠিক ছিলনা"।[৩৯০] এমনি প্রাণকাড়া ভাষা দিয়ে পুরো বইটি রচনা করা হয়েছে। নবীজীর (সা.) জীবনের শুরচ থেকে শেষ পর্যন্ড় চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক এই গ্রন্থে। সে বর্ণনা যেমন লোভনীয় তেমনি চিত্তাকর্ষক।

তিন. **'মানব মুকুট' মোঃ এয়াকুব আলী চৌধুরী, বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি, কলকাতা, ১৯২৬**

'মানব মুকুট' মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর সাহিত্য সাধনার আরেকটি অসাধারণ কীর্তি। মহাপুরচষ হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর জীবন ও আদর্শকে আমাদের বাস্ড়বিক জীবনে বা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করার পথ দেখিয়েছেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে। গতানুগতিক লেখকের মত 'মানব মুকুটে'র লেখক কিচ্ছা কাহিনী বা আজগুবি গল্প লেখে পাঠকদের মন কাড়ার চেষ্টা করেন নি।

গ্রন্থটি অত্যন্ড় গবেষণালব্ধ ও গভীর চিন্ড়াপ্রসূত। 'একথা সত্য যে বাংলা সাহিত্যে হজরত মোহাম্মদের জীবন চরিত অপ্রতুল নয়। তবে 'মানব মুকুট' সে সব গ্রন্থের মধ্যে ব্যতিক্রম। শুধু ভাষায় পরিপাট্য নয়, বিষয়বস্তুর পরিবেশনেও নৈপুণ্য ও অভিনবত্ব রয়েছে। বস্তুত গ্রন্থটি তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির এক মহান

[৩৮৯] . প্রাগুক্ত, পৃ.৮২

[৩৯০] . নাসির হেলাল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৫-২৬

নিদর্শন। বর্তমানে মানব জীবন নানা সমস্যায় জর্জরিত। লেখক এর সমাধানের সন্ধান দিতে চেয়েছেন মহানবীর জীবনাদর্শে।'[৩৯১]

মানব জীবনে মারামারি হানাহানি চলছেই, ধর্মে ধর্মে, বর্ণে বর্ণে, আজ বিশ্বজগতে মানুষের মধ্যে যে ব্যবধান তৈরি হয়েছে, লেখক 'মানব মুকুট' লেখার মাধ্যমে তা দূর করার চেষ্টা করেছেন। "আধুনিক জগতের যে জীবন সমস্যা, তার উপযুক্ত সমাধান মিলবে হযরত মোহাম্মদের জীবনাদর্শে। অর্থাৎ জীবনের সকল দিক দিয়েই হযরত মোহাম্মদ (সঃ) যে শ্রেষ্ঠ মানব, তা নানা যুক্তি প্রমাণ দিয়ে লেখক আলোচ্য গ্রন্থে দেখাতে চেষ্টা করেছেন।"[৩৯২]

অন্যান্য ধর্মগুরচ ও প্রবর্তকদের সাথে হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর মৌলিক পার্থক্য কোথায়, গ্রন্থকার এয়াকুব আলী চৌধুরী তা বিশেণ্ঢষণ করে 'মানব মুকুটে' প্রমাণ করেছেন, সত্যিই হযরত সর্বশ্রেষ্ঠ মানব। জাগতিক জীবনে মানুষের সমস্যার শেষ নাই। মানুষ রাস্ড়া-ঘাটে, স্টেশনে, ফুটপাথে রাত্রি যাপন করে। ঘর নাই, বাড়ি নাই। মাথা গোঁজার ঠাঁই নাই। ফুটপাথে যাদের জন্ম অথবা আফ্রিকার মরচভূমি অঞ্চলের যেই মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় মাটি ও গাছের চামড়া ভক্ষণ করে; তাদের নিকট ধর্মের বাণীর কোন গুরচত্ব নাই। তাদের ক্ষুধার যন্ত্রণা দূর করার ব্যবস্থা করেই তাদের নিকট ধর্মের বাণী পৌঁছাতে হবে।

'কারণ ক্ষুধার্ত লোকের কাছে ধর্মের কথা বললে কোন ফলোদয় হবেনা। সুতরাং জীবন সমস্যার সমাধান করে ধর্মের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠাই মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম ও লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্য অর্জনে যিনি মানুষকে সহায়তা করেছেন, নিজ জীবনে জীবন সমস্যার সমাধান করে মানুষকে দেখিয়েছেন, তিনি মানুষের প্রকৃত ত্রাণকর্তা।

তাই যীশু খ্রিষ্ট-বুদ্ধদেব-শংকরাচার্য-শ্রীচৈতন্যের জীবন যতই জ্ঞানপ্রেমে উজ্জ্বল হোক না কেন, জীবন সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে তারা নীরব। তাঁরা এ বিষয়ে আমাদের অনেক মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন

[৩৯১] . মোঃ মোসলেম উদ্দীন জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ.৬১, খান মুহম্মদ সালেক (সম্পাদিত), *এয়াকুব আলী গ্রন্থাবলী* (ঢাকাঃ আদিল ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৪)

[৩৯২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২, কাজী আব্দুল ওদুদ,*শাশ্বত বঙ্গ* (ঢাকাঃ ব্রাক প্রকাশনা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩), ৩৭৬-৭৭, পাকিস্তান পাবলিকেশনস (সম্পাদিত) (ঢাকাঃ পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৬) পৃ.৫৩

সত্য, কিন্তু তাঁরা নিজেদের জীবনে তা প্রতিফলিত করে মানুষকে দেখাননি। তাই গৃহবাসী সাধারণ মানুষ তাঁদের ভক্তি করতে পারে, ভালোবাসতে পারে; কিন্তু তাঁদেরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করতে পারে না।’[৩৯৩]

‘মানব মুকুট’ গ্রন্থে লেখকের অসাধারণ পান্ডিত্যের ছাপ রয়েছে। যারা বুদ্ধিবান, যারা চিন্তাশীল, এই বইটি পাঠের মাধ্যমে তাঁদের মনের দুয়ার খুলে নিতে পারে। বিশেষত ইসলাম ধর্ম ও হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর প্রতি যাদের কোন বিষয়ে সন্দেহ আছে, তারা যত বুদ্ধিমানই হোক না কেন, এই বইটি পাঠে তাঁদের ভুল ভাঙতে সহায়ক হবে।

চার. **‘নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ’, ‘নবী গৃহ সংবাদ’, মুহম্মদ বরকতুলণ্ঢাহ, গ্রেট ইস্ট লাইব্রেরী, ১৯৬০, অন্য মুদ্রণঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৮৮**

মুহম্মদ বরকতুলণ্ঢাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) লিখিত ‘নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মুহম্মদ’ নবী জীবনী গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম। ভাষার মাধুর্য্য ও ভাবের উদ্দীপনা গ্রন্থখানাকে আলাদা বৈশিষ্ট্য দান করেছে। গ্রন্থটির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় লেখকের সাহিত্য কীর্তির স্বাক্ষর রয়েছে। রয়েছে নবীজীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ও ভালবাসা। যুক্তি ও উপমা দিয়ে লেখক বাঙালি মুসলমানদেরকে ইসলাম ধর্মের মর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। গ্রন্থের এক জায়গায় লেখক বলেছেন-“কর্মই জীবন। যে নদীর প্রবাহ নাই সে নদী নদীই নয়। তেমনি যে জীবন কর্মশূন্য সে জীবন বৃথা। তবে সকল কর্মই কর্মযোগের পর্যায়ে আসে না। আহার বিহারও কর্ম, কিন্তু সেগুলিতে চিত্তের যোগ সাধিত হয় না পরমাত্মার সহিত। যোগ অর্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ।”[৩৯৪]

হযরত মোহাম্মদের (সা.) জীবনে মানব জাতির জন্য কী দান রয়েছে, তাঁর সংগ্রাম ও কষ্টের বিনিময়ে মানবজাতি কী পেল এগুলোর সারাংশ বরকতুলণ্ঢাহ এই গ্রন্থে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন। লেখক এই গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন-“তিনি এই নয়াজাতিকে শুধু শক্তিমন্ত্রে নয়, কর্মযোগেও দীক্ষা দিয়া তাহাদের ভিতর জাগ্রত করিলেন, অদম্য জ্ঞান ও কর্মস্পৃহা, যার ফলে তাহারা গ্রীক দর্শন, পদার্থ বিদ্যা, রসায়ন,

---

৩৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫

৩৯৪. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পা. *মোহম্মদ বরকতুলণ্ঢাহ রচনাবলী দ্বিতীয় খন্ড* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১) পৃ. ২১৫

বিজ্ঞান, গণিত ও জ্যামিতি ইত্যাদি শাস্ত্র মন্থন করিয়া পৃথিবীর জ্ঞানগুরুর আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিল এবং ভৌগোলিক বিজয়ের বহু পূর্বেই মনোরাজ্যের দিক দিয়া পৃথিবী জয়ে সক্ষম হইয়াছিল।"[৩৯৫]

'নবী গৃহ সংবাদ' নবীজীর প্রিয়তমা প্রথমা স্ত্রী খাদিজা (রা.) এর জীবনী নিয়ে লেখা বরকতুলণ্ঢাহর আরেকটি মূল্যবান গ্রন্থ। নবীজীর জীবনে যার অবদান সবচেয়ে বেশি, যিনি তাঁর দুর্দিনে সহযোগিতা করেছেন। খাদিজাকে (রা.) ছাড়া নবীজীর জীবনী লেখা একেবারেই অসম্ভব। অথচ অনেক সীরাতকারই তা এড়িয়ে গেছেন।

লেখক নিজেই গ্রন্থের ভূমিকায় এর কৈফিয়ত দিয়েছেন এইভাবে- "নবী চরিত্র বাদ দিয়া প্রথমে খদিজা চরিত্র কেন লিখিয়াছিলাম, তার কারণ-নবী চরিত্র সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তথা বাংলা ভাষাতেও অসংখ্য গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, কিন্তু খদিজা চরিত্র সম্বন্ধে স্বতন্ত্র আলোচনা এ যাবৎ খুব অল্পই হইয়াছে। অথচ নবী চরিত্রের বিকাশ এবং ইসলামের উন্মেষের ব্যাপারে খদিজার অবদান অবিস্মরণীয়। বিভিন্ন জাতির যত নারী চরিত্র পাঠ করিয়াছি তার মধ্যে খদিজার চরিত্র আমার সবচাইতে ভাল লাগিয়াছে। এই মহিমময়ী রমণীর নির্মল চরিত্র, প্রগাঢ় স্বামী ভক্তি ও অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ যে কোন যুগে নারী সমাজের আদর্শ স্থানীয় বলিয়া গণ্য হইতে পারে, ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।"[৩৯৬]

নবী-রসুলদের জীবনী লিখতে গেলে কুরআন-হাদীসে গভীর জ্ঞান থাকতে হয়। গ্রন্থকার বরকতুলণ্ঢাহ এ ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলেই মনে হয়। তাঁর প্রত্যেকটা বক্তব্যের পিছনে বুখারী, মুসলিম, বিখ্যাত সীরাত গ্রন্থ ও মনীষীদের বক্তব্য তুলে ধরে দলীল দেওয়ার চেষ্টা রয়েছে। যার ফলে গ্রন্থটির গ্রহণযোগ্যতা পাঠক মহলে অনেক বেড়ে গেছে। তিনি নিজেই বলেছেন-"নবী চরিত অঙ্কন অতি দুরূহ ব্যাপার। মনুষ্য বুদ্ধির অতীত তাঁহার রহস্য-ঘেরা ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে রেওয়ায়েতে অনেক অলৌকিক কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমার এ বই কোনও ভক্তিবাদ মূলক বা প্রচার ভিত্তিক গ্রন্থ নহে। কাজেই কোন অলৌকিকত্বের অবতারণা করি নাই।"[৩৯৭]

পাঁচ.**'বিশ্বনবী', কবি গোলাম মোস্ত্মফা, মাহফুজা খাতুন, ভূদেব ভবন, চুচূড়া, ১৯৪২**

---

[৩৯৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

[৩৯৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩ (তিন)

[৩৯৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩ (তিন)

Dhaka University Institutional Repository

কবি ও সাহিত্যিক গোলাম মোস্তফার শ্রেষ্ঠ কীর্তি হচ্ছে 'বিশ্বনবী' গ্রন্থখানি। এত চমৎকার নবী জীবনী; সংস্কৃত বর্জিত, আধুনিক বাংলা ভাষায় লিখিত, আরবী ভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষায় লিখিত সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ এত পাঠক প্রিয়তা পেয়েছে কি না আমাদের জানা নেই। বাংলা ভাষায় লিখিত বহুল প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'বিশ্বনবী'র সংস্করণ প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলোর কাতারে রয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। "এটা কোন গতানুগতিক জীবনী গ্রন্থ নয়; লেখকের প্রগাঢ় নিষ্ঠা, গভীর ভক্তি-ভাব, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, ইতিহাস-চেতনা সর্বোপরি কবিত্বময় সাবলীল ভাষা গ্রন্থটিকে যেমন অনবদ্য করে তুলেছে, তেমনি করেছে একে সর্বশ্রেণীর নিকট গ্রহণযোগ্য।"[৩৯৮]

গ্রন্থকার মুসলিম বাঙালিদের সামনে এত দরদ ও প্রেম দিয়ে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন কাহিনী উপস্থাপন করেছেন, যাতে পাঠক মাত্রই বইটি হাতে নিলে পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত তৃপ্তি পায় না। "জীবনী গ্রন্থ হিসাবে এর অনন্যতা অস্বীকার করার মতো নয়। খুব সাধারণ পাঠকের কাছে এই গ্রন্থ জনপ্রিয় নয়, যারা মুসলমান তাদের কাছে শুধু এই গ্রন্থ জনপ্রিয় নয়; এ-গ্রন্থ জনপ্রিয় বুদ্ধিজীবী, সুধী ও পণ্ডিত বোদ্ধাদের কাছে। এর কারণ বইটি একটি সুপরিকল্পিত ছাঁচে ঢেলে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর রাসূল (সা.) এর জীবন ও চরিত্র নিয়ে সন্দেহ ভিত্তিক প্রতিটি প্রশ্নের যুক্তি ভিত্তিক উত্তর দিয়ে রাসূল (সা.) এর মহত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।"[৩৯৯]

বাংলা ভাষায় সীরাত সাহিত্যের উপরে অনূদিত গ্রন্থসহ প্রকাশিত প্রায় এক হাজারের উপরে গ্রন্থ রয়েছে।[৪০০] প্রত্যেক গ্রন্থের গ্রন্থকারই নবীজীর জীবন চরিত ও শিক্ষা চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী করে আমাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

বাংলা ভাষায় অনূদিত বা কোন কোন ক্ষেত্রে লিখিত সীরাত বিষয়ক গ্রন্থগুলো পাঠ করলে দেখা যায়, এগুলোর মধ্যে সাহিত্যের কোনো রস নেই। তাছাড়া অনুবাদে সাহিত্যের রস আসে না, ধর্মগুরুর জীবনীর মধ্যে ভাব-ভক্তি ও আধ্যাত্মিক মর্ম না থাকলে, জীবনী পাঠে শিষ্যদের কৌতূহল সৃষ্টি হয় না। এ ক্ষেত্রে গোলাম মোস্তফা ছিলেন একজন সফল নবী জীবনী লেখক।

---

[৩৯৮]. মুহম্মদ মতিউর রহমান, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২) পৃ. ৯৮
[৩৯৯]. মুনশী আবদুল মাননান সম্পা, *কবি গোলাম মোস্তফা স্মৃতি ও অবদান* (ঢাকাঃ বিশ্ব পরিচয়, ২০০৩) পৃ. ১৬৯
[৪০০]. নাসির হেলাল (সংকলন ও সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

তিনি 'বিশ্বনবী' গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে লিখেছেন-"হজরতের জীবনী সংক্রান্ড় আরবী-উর্দু-ইংরেজী-বাংলা বহু গ্রন্থ দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছে; কিন্তু সেইগুলোর মধ্যে একটা বিষয়ের অভাব লক্ষ্য করিয়া নিরাশ হইয়াছি। অনুভূতির আবেদন খুব কম গ্রন্থেই দেখতে পাওয়া যায়। ফলে অধিকাংশ লেখাই হজরতের জীবনীর সৌন্দর্যলোকে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

মহাপুরুষের জীবনী শুধু ঘটনার ফিরিস্ড়ি নহে; শুধু যুক্তি-তর্কের শয্যাও নহে; সে একটা ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিস্ময় ও অনুভবের বস্তু; তাহাকে বুঝিতে হইলে একদিকে যেমন চাই সত্যের আলোক ও বিজ্ঞানের বিচারবুদ্ধি, অপরদিকে ঠিক তেমনি চাই ভক্তের দরদ, কবির সৌন্দার্যনুভূতি, দার্শনিকের অন্র্ড়্দৃষ্টি, আর চাই প্রেমিকের প্রেম। আশেকে রাসূল না হইলে সত্যিকার রাসূলকে দেখা যায় না।"[৪০১]

গোলাম মোস্ড়ফার যখন সাহিত্যের জগতে আবির্ভাব, তখন রবীন্দ্র সাহিত্যের, বঙ্কিম সাহিত্যের প্রভাব খুবই বেশি ছিল। সেই প্রভাব অন্যান্য লেখকের মতো গোলাম মোস্ড়ফাকে প্রভাবিত করলেও, ইসলামী সাহিত্যিক হিসাবে লেখকের মৌলিকত্বের উপর প্রভাব বিস্ড়ার করতে পারে নি। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন, "রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ হিন্দু কবি-সাহিত্যেকেরা গোলাম মোস্ড় ফাকেই আধুনিক কবিরূপে প্রথমে স্বীকৃতি দেন। বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ভাবধারার রূপায়নই তাঁহার সাহিত্য সাধনার প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে আজ পর্যন্ড় তিনি অবিচল আছেন।

রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ হিন্দু মনীষীর আওতায় পড়িয়াও তিনি তাঁহার স্বকীয়তা বিসর্জন দেন নাই।

এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ এবং পরবর্তীতে নজরুল ইসলাম দ্বারা তিনি অনেকাংশে প্রভাবান্বিত হইলেও, তাঁহার মৌলিকত্ব বা স্বকীয়তা তিনি হারান নাই।"[৪০২] বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যতদিন বেচেঁ থাকবে; নবী প্রেমিকদের হৃদয়ে 'বিশ্বনবী'ও ততদিন অমর হয়ে থাকবে।

এমনিভাবে হাজার হাজার সীরাত বিষয়ক বাংলা গ্রন্থের বর্ণনা দেয়া যায়, যা বাংলা ভাষায় রচিত ও অনূদিত হয়ে বাঙালি মুসলমানের নিকট আজ এক বিশেষ নিয়ামত সম্ভার। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবের জীবনী আজ বাঙালি মুসলমান সহজেই মাতৃভাষায় অধ্যয়ন করার সুযোগ পাচ্ছে, তাঁর

[৪০১]. মুহম্মদ মতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯

[৪০২]. ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮) পৃ. ২০৬

জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে রচিত এই জীবনী গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে আমাদের আদর্শ মানব জীবন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

হাদীস বিষয়ক রচনাঃ

বিংশ শতাব্দীর শুরচ থেকেই সকল সিহাহ সিত্তাহ (ছয়টি বিশুদ্ধ হাদীসগ্রন্থ) এর বাংলা অনুবাদ বাঙালি পাঠকদের হাতে চলে আসে। হাদীসকে যেহেতু কুরআনের ব্যাখ্যা বলা হয়ে থাকে, সেহেতু কুরআনের তাফসীর, সীরাত বিষয়ক রচনা, ইসলামী সাহিত্য ও ফিকহ ইত্যাদি গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে ইসলামী সাহিত্যিক ও লেখকগণ বিভিন্ন দিক থেকে হাদীসের অনুবাদ ও ভাবানুবাদ ব্যবহার করেছেন।

হাদীসের তত্ত্ব ও তথ্যের উপর রচিত হয়েছে অগণিত বই-পুস্ড়ক। ভুল হাদীস, জাল হাদীস ও সঠিক হাদীস বের করার কলাকৌশলের উপর লেখা হয়েছে আরও অনেক কিতাব। বাংলা সাহিত্যে মূলত গিরিশচন্দ্র সেনের মাধ্যমে কুরআন, হাদীস ও ফিকহ ইত্যাদি আরবী কিতাবাদি অনুবাদের বন্ধ দরজাটি খুলে যায়। এর পর বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত এ কাজ চলতে থাকে। প্রিন্টিং ও প্রকাশনার কাজ সহজলভ্য হওয়ার পর থেকে এ বিষয়ে প্রচুর পরিমাণে কাজ অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ

ক. ফিক্হ বা ইসলামী বিধি বিধান ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা (১৯০১-১৯৫০)

খ. ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন চরিত ও অন্যান্য রচনা (১৯০১-১৯৫০)

ক. ফিক্হ বা ইসলামী বিধি বিধান ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা (১৯০১-১৯৫০)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এক বিরাট অংশ দখল করে আছে ইসলামী ফিকহ বা বিধিবিধান সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ। অন্যান্য সাহিত্যকর্মের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও উৎসব পার্বণ পালনের

নিয়ম কানুন লিখতে গিয়ে মুসলিম লেখকগণ এক বিরাট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন এই বাংলায়। যদিও এ জাতীয় লেখা সাহিত্যের মানদন্ডে লেখা সম্ভব নয়; তারপরেও তাদের লেখা প্রাথমিকভাবে বাংলা ভাষার পুষ্টি সাধনে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। হালাল-হারাম, আধ্যাত্মিকতা, আকীদা, মাসালা-মাসায়েল, সুফীবাদ, ইসলামী সভ্যতা ও নীতিমালা ইত্যাদি বিষয়ে অসংখ্য বই-পুস্তক বিংশ শতাব্দীর শুরুতে লেখা হয়েছিল। সম্ভবত এর প্রভাবেই পরবর্তীতে দলে দলে ইসলাম প্রচারক, লেখক, গবেষক ও চিন্তাবিদ জন্ম লাভ করে। নিম্নে উলেণ্টখিত সময়কালের কয়েকজন কবি, সাহিত্যিক, লেখক, গবেষক, ফিকাহবিদ ও ইসলামী চিন্তাবিদদের নাম ও তাঁদের উলেণ্টখযোগ্য কর্ম সংক্ষেপে উলেণ্টখ করছিঃ

গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০) ঃ

ইসলামের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি বহু বই-পুস্তক লিখেছেন। 'ধর্ম ও নীতি', (১৮৭৩) 'ধর্ম-বন্ধু', (১৮৭৬) 'নীতিমালা' (১৮৭৭) (উর্দু গ্রন্থ আকসিরে হেদায়েত থেকে অনূদিত),'দরবেশদিগের ক্রিয়া' (১৮৭৮) 'দরবেশদিগের সাধন প্রণালী', (১৮৮০) 'তত্ত্ব-কুসুম', (১৮৮২)'তত্ত্বরত্নমালা'(ধর্ম) (১৮৮২) ইত্যাদি গ্রন্থ ইসলামী বিধিবিধান ও সংস্কৃতির উপর রচিত তাঁর অমর রচনা ।

শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১) ঃ

শরীয়ার নিয়ম কানুন সম্পর্কে তাঁর উলেণ্টখযোগ্য কয়েকটি বই হচ্ছেঃ 'নামাজতত্ব বা নামাজ বিষয়ক যুক্তিমালা' (১৮৯৮), 'হজবিধি' (১ম খন্ড, ১৩১০ বাংলা), ২য় খন্ড (১৯১১), 'নামাজ শিক্ষা' (১৯১৭), 'ইসলাম নীতি' (১ম ভাগ ১৯২১), 'ইসলাম নীতি' (২য় ভাগ ১৯২৫), 'কোরআন ও হাদীসের উপদেশাবলী' (১৯২৬), 'রোজাতত্ব' (১৯২৮), ও 'খোৎবা' (১৯২৮)।

মৌলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) ঃ

তাঁর অনেক ধরনের লেখার মধ্যে ইসলামী আকীদা বিশ্বাস নিয়ে নিম্নলিখিত বইগুলো উলেণ্টখযোগ্যঃ 'যীশু কি নিস্পাপ' (১৯১৫), 'এসলাম মিশন' (১৯১৭), 'সমস্যা ও সমাধান' (১৯৩৯), 'বাইবেলের নির্দেশ ও প্রচলিত খৃস্টান ধর্ম' (১৯৬২), 'মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস' (১৯৬৫)

মৌলানা মুহম্মদ নইমুদ্দিন (১৮৩২-১৯১৬) ঃ

'জোব্দাতুল মসায়েল', ১ম খন্ড (১৮৭৩) এ বইয়ের লেখক নিজেই বলেছেনঃ "এই 'জোব্দাতুল মসায়েল' অর্থাৎ মুসলমানী ব্যবস্থা শব্দের সার সংগ্রহে কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ করি নাই, বরং শরে

বেকায়া, হেদায়া, কাজীখান, জামেয়রমুজ, কামুজ, আলমগিরি, দোররোল মুখতার প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করত লিখিত হইল। যে যে নিয়মগুলি এদেশের পক্ষে অনাবশ্যক বুঝিলাম তাহা পরিত্যাগ করা গেল।"[৪০৩]

তিনি মোট চার খন্ডে ফতুয়ায়ে আলমগিরী অনুবাদ করেন (১৮৮৪-১৮৯২), যা বাদশা আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সমাজ ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে রচিত একটি বিখ্যাত ইসলামী আইন গ্রন্থ। তাঁর আরেকটি আকায়েদ বিষয়ক গ্রন্থ হচ্ছে 'কালেমাতুল কুফর' (১৮৯১), যাতে মুসলমানদের আদব-কায়দার কথা বলা হয়েছে। 'কিরূপ কথাবার্তা, আচরণ, ও মনোভাব মুসলমানকে কাফেরে পরিণত করে, এতে তারই নির্দেশ আছে'।[৪০৪]

তিনি হানাফী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও সমসাময়িক মুসলমানদের ভ্রান্ত আকীদার বিরূদ্ধে লিখিত তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলো হচ্ছে: 'ইনসাফ' (১৮৮৬), 'ধোকা ভঞ্জন' (১৮৮৯), 'গো-কান্ড'[৪০৫] (১৮৮৯), 'সেরাতুল মস্তাকিম' (১৮৯৩), 'আদেল্লায়ে হানিফিয়া রদ্দে-লা মজহাবিয়া' (১৮৯৪), 'রফ-ইয়াদাইন' (১৮৯৬), ও 'ধর্মের লাঠি' ইত্যাদি।

রেয়াজ আলদীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) টাঙ্গাইল ঃ

মানবজীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি লেখালেখি করেন। ইসলাম ধর্মীয় শিষ্টাচার ও সামাজিক উৎসবাদি নিয়ে তার বিখ্যাত বই হচ্ছে 'সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' (১৮৯১, ১৮৯২)। গ্রন্থটিতে নামাজ, জুমা, মহররম, শবে কদর, ঈদ এবং আরও সামাজিক ও ধর্মীয় বিষয়ে ইসলামী শরীয়ার আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থের মূল্যায়ন করতে গিয়ে ওয়াকিল আহমদ বলেন- তিনি স্বসমাজের কেবল চাহিদাই পূরণ করেননি,

---

[৪০৩] . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন রচনাবলী (প্রথম খন্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭

[৪০৪] . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০

[৪০৫] . The Cow affair "Mir Masharuf Hossain published an article in the Ahmadi newspaper on the subject of the prospects of the extinction of the Cow species. This evoked much controversy all over Bengal. The author wrote some articles against Mir Masharuf's theories and learned muhammadans gave their opinions against the Mir, some of these articles were published by the Mir, but the most important articles were omitted from that publication. The present work is intended to supplement the defects of the Mir's work." বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৮৮৯ খ্রীঃ, ৩য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ক্রমিক সংখ্যা, ৮৯৯৩, পৃ.১৪-১৫ (সূত্র: বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী, আলী আহমদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা:১৯৮৫ পৃ. ৪৬০)

সে-সমাজের অস্তিত্ব আছে এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে সেটাও তুলে ধরেছেন। আত্মবোধের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য চেতনার যে যুগ-লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল, এতে তারই স্বাক্ষর রয়েছে।[৪০৬]

মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) বরিশাল ঃ

জামালউদ্দীন আফগানী কর্তৃক প্রভাবিত একজন ইসলামী চিন্তাবিদ ছিলেন তিনি। যার ফলে তিনি আফগানী কর্তৃক লিখিত 'নেচার ও নেচারিয়া' গ্রন্থের অনুবাদ করে 'এসলাম তত্ত্ব' শিরোনামে প্রকাশ করেন। তিনি ফিকহ বিষয়ে বেশ কিছু বই-পুস্তক রচনা করেন। 'তোহফাতুল মুসলেমীন' (১৮৮৬) শিরোনামে তাঁর একটি ফিকহ বিষয়ক বই রয়েছে। যাতে তিনি নামাজ, রোজা, ওজু, গোসল, পাক-পবিত্রতা ইত্যাদি ধর্মীয় বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'বিশুদ্ধ বাংলা খোলাছাতুল মছায়েল' (১৯২৯) নামে ফিকহ শাস্ত্রের উপর লিখিত আরেকটি সুপাঠ্য বই। যা তাঁর ইসলামী জ্ঞানের গভীরতার সাক্ষ্য বহন করছে।

ফিকহ ও আকীদা বিষয়ক তাঁর অন্যান্য বইগুলো হচ্ছেঃ 'হক-নছিহত' বা ধর্মোপদেশ (১৯০৭) ও বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা (১৩০২, ১৩০৩, ১৩০৪, ১৩০৬, ১৩০৭, ১৩০৯, ১৩১০, ১৩১২, ১৩১৪,১৩১৫) ইত্যাদি বাংলা সনে প্রকাশিত পঞ্জিকাসমূহ। যাতে ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি বিশ্লেষণধর্মী আলোকপাত করেছেন।

মুন্সী মহম্মদ মেহেরউল্লা (১৮৬১-১৯০৭) ঃ

মেহেরউল্লা যে কয়খানি গ্রন্থ রচনা করেন তার সবগুলোই ধর্ম ও সমাজ উন্নয়নমূলক গ্রন্থ ছিল। যেমন: 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা' (১৮৮৭), 'বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার' (১৮৯৪), 'রদ্দে খ্রীস্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম' (১৮৯৫), 'মেহেরুল এসলাম' (১৮৯৭), 'জয়াবোন্নাসারা' (১৮৯৮), 'হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা' (১৮৯৮), 'খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' (১৯০১) ও 'ইসলামী বক্তৃতামালা' (১৯০৮)।

খ্রিস্টানদের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে মেহেরুল্লার প্রথম লিখিত পুস্তক 'খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা'। খ্রিস্টধর্মের পাদ্রীদের মুখোশ উন্মোচন করে দেন তিনি এই পুস্তকে। 'রদ্দে খ্রীস্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম' তাঁর সবচেয়ে আলোচিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থটিতে খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা

[৪০৬]. . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৬

করা হয়েছে এবং খ্রিস্ট ধর্ম যে অসার অলীক তা প্রমাণ করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হয়েছে। এ জন্য লেখক বাইবেলসহ খ্রিস্ট ধর্ম সংক্রান্ড় অন্যান্য পুস্ড়ক-পুস্ড়িকা থেকে উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন।[৪০৭]

মেহেরউলণ্ঢার সমসাময়িককালে একই নামের আরো দুজন ইসলাম বিষয়ক লেখকের নাম পাওয়া যায়। এঁদের একজন সিরাজগঞ্জের অধিবাসী মুহম্মদ মেহেরচলণ্ঢা সানী (১২৬২-১৩২৭ বাংলা), অপরজন খুলনার মুন্সী মুহম্মদ মেহেরচলণ্ঢা, যাঁর জন্ম-মৃত্যু তারিখ এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। তবে উভয়ের রচিত সুপরিচিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে যথাক্রমে 'ইসলামী বক্তৃতামালা' (১৩১৫ বাংলা) ও 'ইসলাম কৌমুদী' (১৯১৪)।

মুহাম্মদ আবদুল হাকিম (১৮৮৭-১৯৫৭) ঃ

১৯২৩ সালে 'ইসলাম দর্শন', 'হানাফী' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ইসলামের ফিকাহ বিষয়ে তাঁর উলেণ্ঢখযোগ্য কীর্তি হচ্ছে 'সরহে বেকায়া' এর অনুবাদ। যা ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খন্ড (১৯১৮)। পবিত্র কুরআন শরীফও তিনি অনুবাদ করেন।[৪০৮] সম্ভবত বর্তমানে তাঁর রচনাবলী দুস্প্রাপ্য। ঢাকা ও চট্টগ্রামের প্রাচীন গণ-গ্রন্থাগারগুলোতে অনেক চেষ্টা করেও তাঁর এ জাতীয় গ্রন্থ পাওয়া যায় নি।

মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২) ঃ

তিনি উর্দু ভাষায় লিখিত মৌলানা লুৎফুর রহমান প্রণীত 'দীন ইসলাম' শিরোনামে বইখানি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি অনুবাদক হলেও উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের ভাষা ব্যবহার করে বাংলা ভাষার মুসলমানদেরকে আকীদা ও ধর্মবিশ্বাসের উপর একটি গুরচত্বপূর্ণ গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। 'বঙ্গে সুফী প্রভাব' তাঁর আরেকটি গুরচত্বপূর্ণ ও গবেষণামূলক গ্রন্থ। এতে তিনি ইসলামী শরীয়ার আলোকে সুফী মতবাদের ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টা করেছেন। প্রাচীন ইসলামী পন্ডিতদের মতবাদ ও দর্শন উলেণ্ঢখ করে, সুফী মতবাদ যে একটি আদর্শ ও কল্যাণমূলক মতবাদ তিনি তাঁর গ্রন্থে তা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। যা কুরআন-হাদীসের সাথে কখনও সাংঘর্ষিক নয়। ইসলাম বিষয়ে তাঁর আরও অনেক বই রয়েছে। যেমন: 'মুসলিম বাংলা সাহিত্য', 'পূর্ব পাকিস্ড়ানে ইসলাম' ইত্যাদি।

খান বাহাদুর আহছানউলণ্ঢা (১৮৭৩-১৯৬৫) ঃ

---

[৪০৭] . মুন্সী মেহেরউলণ্ঢা রচনাবলী প্রথম খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৪০৮] . কাজী দীন মুহম্মদ, *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯

তাঁর লিখিত ও প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে ইসলামী আকীদা ও নীতি বিষয়ক বইগুলো হচ্ছে: ‘নীতি ও ধর্ম শিক্ষা এবং চরিত্র গঠন’ (১৯২৯), ‘আল-ইছলাম’ (১৯৩০), ‘মোসলেমের নিত্য-জ্ঞাতব্য (ধর্ম) মাছআলা সম্বলিত’ (১৯৪৯), ‘ইসলামের মহতী শিক্ষা’ (১৯৬৩), ‘দোয়া ও দরূদ’ (১৯৪৯), ‘ইসলাম ও জাকাত’ ১৯৫১) ও ‘নামাজ শিক্ষা’ ফেকাহ (১৯৬৬)।

স্বল্প লেখকবৃন্দ (ফিক্হ বা ইসলামি বিধি বিধান-১৯০১-১৯৫০) ঃ

ডক্টর এম আবদুল কাদের (১৯০৬-১৯৮৪) ঃ

ইসলাম ও ইসলামী তত্ত্ব সম্পর্কে বেশ কিছু বই রচনা করেন। যেমন: ‘ইসলাম ও বহুবিবাহ’ (১৯২৯), ‘ইসলাম ও পর্দা’ (১৯৩০), ‘ইসলামের নীতি’ (১৯৫০), ‘বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পর্দা’, (১৯৫৩) ও ‘ইসলাম ও তালাক’ ইত্যাদি গ্রন্থ।

মুহাম্মদ এমদাদ আলী (১৮৯১-১৯৬৯) ঃ

একজন প্রাবন্ধিক হিসেবে সাহিত্য মহলে পরিচিত। ফিকহ বিষয়ে তাঁর উলেণ্টখযোগ্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে: ‘তরিকুল ইসলাম বা মোসলেম নীতি’ (১৯১৭), ‘জুমআর দ্বিধা ভঞ্জন’, (১৯১৮), ‘ওয়াজে ইসলাম’ (১৯৩০), ‘এজহারচ্ছল হক বা জুমুআর লিখিত বাহাছ’ (১৯৩৬), ‘নামায শিক্ষা বা দীনিয়াত শিক্ষা’ (১৯৩৭), ‘জবেহ প্রণালী’ (১৯৩৮) ও ‘চারি তরিকার সংক্ষিপ্ত অজিফা’ (১৯৩৯) ইত্যাদি।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্টাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ঃ

বহু ভাষাবিদ, সাধক,প–িত ও ইসলামী চিন্‌ড়বিদ। ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি তিনি ইসলাম ধর্ম নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্‌ড় লেখনির মাধ্যমে ইসলামের সেবা করার চেষ্টা করে গেছেন। ‘ ইসলাম প্রসঙ্গ’ তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ফিকাহ ও আকীদা সম্পর্কে তাঁর বইগুলো হচ্ছেঃ ‘হজ্জের ও রওযাঃ পাকের যিয়ারত ও দো’আ দরূদ’ (১৯৫৭), রোযাহ্‌, ঈদ ও ফিতরা (ফেকাহ)’ (১৯৬৩)।

ফিকাহ সম্পর্কিত আরও কিছু গ্রন্থ ও গ্রন্থকার ঃ

সুফী মাওলান রূহুল আমিন (১৮৮২-১৯৪৫) ঃ ‘ফৎওয়া’ (১৯২০), ‘কেয়াছুল মোজতাহেদীন বা কেয়াছের অকাট্য দলিল’ (১৯১৬)।

খন্দকার ফয়েজউদ্দিন আহমদ (১৮৯৯-১৯৩৪) ঃ ‘ফৎওয়া’ (১৯২৫) মূল লেখক: শাহ আব্দুল আজিজ দেহলভী (১৭৪৭-১৮২৩)।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) (১৮৯৫-১৯৬৯) ঃ ‘ছাফাইয়ে মোআমালাত বা হালাল রুজী’ (১৯৫৯), মূল লেখক ঃ আশরাফ আলী থানবী (১৮৬৩-১৯৪৩)। বিংশ শতাব্দীর শেষের দিক পর্যন্ড় এ ধারা অব্যাহত থাকে। এ পর্যায়ে উলেণ্টখযোগ্য ব্যক্তিরা হচ্ছেন ঃ

গাজী শামছুর রহমান (১৯২১-১৯৯৮), মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.) (১৯১৯-১৯৮৭), মুহম্মদ নুরল ইসলাম, নূর মুহাম্মদ আযমী (১৯০০-১৯৭২), মাওলানা মুহাম্মদুলণ্টাহ হাফেজ্জী হুজুর (র.), মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (১৮৮৮-১৯৩৯), মাওলানা আব্বাস আলী খান (১৯১৪-১৯৯৯) প্রমুখ।

মূলতঃ ফিকহ বিষয়ে বাংলা ভাষায় যে বই-পুস্ড়ক রচিত ও অনূদিত হয়েছে, তা ইসলামী সাহিত্যে এক বিশাল ভান্ডার। কোন ইসলামী প্রতিষ্ঠানে আরবী ভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে পূর্ণাঙ্গভাবে বাংলা ভাষায় ফিকহ সংক্রান্ড় বিষয়ে শিক্ষাদান সম্ভব, যা ইসলামী সাহিত্যিকদের নিরলস প্রচেষ্টার কারণে সম্ভব হয়েছে।

খ. ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন চরিত ও অন্যান্য রচনা (১৯০১-১৯৫০) ঃ

এক্ষেত্রে ইসলামী চিন্ড়া-চেতনা ও ভাবধারা নিয়ে যে সমস্ড় গদ্য, পদ্য, গল্প ও উপন্যাস রচিত হয়েছে তার একটা বর্ণনা দেয়ার চেষ্টা করছি। যা অভিসন্দর্ভের গঠন পরিকল্পনাটিকে আরো স্পষ্ট করে উপস্থাপন করবে। উলেণ্টখ্য, এখানে নির্বাচিত লেখকদের নাম তাঁদের মৃত্যু সাল অনুযায়ী সাজানো হয়েছে।

নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩) ঃ

‘রূপজালাল’ (১৮৭৬), ‘তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত’ (১৮৮৭), ‘সঙ্গীত সার’, ও ‘সঙ্গীত লহরী’।

গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০) ঃ

‘হিতোপাখ্যান মালা’ ১ম খন্ড (১৮৭১), ‘ধর্ম-বন্ধু’ (১৮৭৬), ‘হাফেজ বা হাফিজ’ জীবনী (১৮৭৭), ‘নীতিমালা’ ১ম খন্ড (১৮৭৭), ‘দরবেশদিগের ক্রিয়া’ (১৮৭৮), ‘প্রবচনাবলী’ (১৮৮০), ‘তাপসমালা’ জীবনী (১৮৮০), ‘মহাপুরুষ চরিত’ (১৮৮৪), ‘ইমাম হাসান ও হোসাইন’ (১৯০১), ‘মহাপুরুষ

মোহাম্মদ এবং তৎপ্রবর্তিত এছলাম ধর্ম' (১৯০৬), 'ধর্মবন্ধুর প্রতি কর্তব্য' (১৯০৬), 'ধর্ম সাধন নীতি' (১৯০৬), 'চারিটি সাধ্বী মোসলমান নারী' (১৯১৩) এবং বুখারী মুসলিমসহ বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থসমূহের বঙ্গানুবাদও তিনি করেছেন।

আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০) ঃ

কাব্য গ্রন্থঃ 'বিরাগ সঙ্গীত' (১৮৯০), 'প্রবোধ সঙ্গীত' (১৮৯১), 'প্রেমিক উদাসী' (১৮৯২), 'উদাসী' প্রথম খন্ড, (১৯০১) ও ইতিহাস গ্রন্থঃ 'বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদি বৃত্তান্ড়' (১৮৯৯) ও নীতি বিষয়ক গ্রন্থঃ 'সার সংগ্রহ'।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১) ঃ

মীর মশাররফ হোসেন তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রথম দিকে ইসলাম ধর্মভিত্তিক বই-পুস্ড়ক তেমন লিখেন নি। বরং 'গো-জীবন' (১৮৮৯) লিখে তিনি মুসলিম সমাজে বিতর্কিত হয়েছিলেন এবং তাঁর বিরঙ্গে এ নিয়ে বৃটিশ আদালতে মামলা পর্যন্ড় হয়েছিল। ছোট-বড় সব মিলিয়ে ৩৮ খানা গ্রন্থের পরিচয় এযাবৎ পাওয়া গেছে।[৪০৯] যাহোক, জীবন সায়াহ্নে তিনি সম্ভবত সেই ভুল বুঝতে পেরে ইসলাম ধর্মীয় বেশকিছু বই-পুস্ড়ক রচনা করে গেছেন, যা বাংলা সাহিত্যের আজ অমূল্য সম্পদ।

তাঁর ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধীয় রচনাগুলোর মধ্যে কাব্যগ্রন্থ: 'হজরত ওমরের ধর্ম জীবন লাভ' (১৯০৫), 'বিবি খোদেজার বিবাহ' (১৯০৫), 'হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ' (১৯০৫), 'মদিনার গৌরব' (১৯০৭), 'মোস্লেম বীরত্ব' (১৯০৭), জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'হজরত বেলালের জীবনী' (১৯০৫), 'হজরত ইউসুফ' (১৯০৮), ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ: 'এসলামের জয়' (১৯০৮), মিলাদ: 'মৌলুদ শরীফ' (১৮৯৪), বিখ্যাত উপন্যাস: 'বিষাদ -সিন্ধু' (১৮৮৭), ও খুৎবা: 'ঈদের খোতবা' (১৯০৯)।

দীন মুহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯১৬) ঃ

'ক্রুসেড ও জেহাদ' (১৯০৮), 'কলিকাতায় গো-কোর্বানী হাঙ্গামা' (১৯১১)।

শেখ আবদুল জব্বার (১৮৮১-১৯১৮) ঃ

---

[৪০৯] . আলী আহমদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫) পৃ. ৬০৬

'মক্কা শরীফের ইতিহাস' (১৩১৩), 'ইসলাম চিত্র ও সমাজ চিত্র' (১৩২৭ বাংলা), 'মদিনা শরীফের ইতিহাস' (১৯০৭), 'ইসলাম সঙ্গীত' (১৩১৫), 'আদর্শ রমণী' (১৯১৭), 'জেরুসালম বা বয়তুল মোকাদ্দসের ইতিহাস' (১৯১০), 'হজরতের জীবনী' (১৯১৪), 'আদম ও হাওয়া' (১৩৩২ বাংলা)।

সফিউদ্দীন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২) ঃ

'জাতীয় ধর্ম শিক্ষা' (১৯১৩), 'শাফি-উল-এসলাম' (১৯১৩), 'হজরত বড় পীরের জীবনী' (১৯১৭), 'ছেলেদের হযরত মোহাম্মদ (দঃ)' (১৯১৮), 'মোসলেম শিক্ষা' বা মারফত তত্ত্ব (১৩২৫), 'তওহিদ বা একত্ববাদ' প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড (১৯২১), 'পাপের ফল' (১৯২২), 'মোতির মালা' (১৯২২), 'নবী নন্দিনী ফাতেমা জহরা' (১৯৩৪) ও 'হজরত আলী'

মুহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩) ঃ

উপন্যাসঃ 'আনোয়ারা' (১৯১৪), 'হাসনগঙ্গা বাহমণি' (১৯১৭), 'প্রেমের সমাধি' (১৩২৫ বাংলা), 'পরিণাম' (১৯১৮), 'দুনিয়া আর চাইনা' (১৯২৪), 'গরীবের মেয়ে' (১৩৩৯ বাংলা), ও 'মেহেরউন্নিসা' (১৩৩১ বাংলা), প্রবন্ধ পুস্তকঃ 'বিলাতী বর্জন রহস্য' (১৯০৪) ও 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' (১৯০৪)।

নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪) ঃ

'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১), 'মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত', 'সাহিত্য প্রভা' (১৯১৪), 'উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি' (১৯০১), 'উচ্চ শিক্ষা' (১৯১৫), 'নোটস অন মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০৩)।

খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬) ঃ

জীবনীঃ 'নবীকাহিনী' প্রথমভাগ (১৯১৭), প্রবন্ধঃ 'প্রবন্ধমালা' প্রথমভাগ, (১৯১৮) শিশু সাহিত্যঃ 'বোগদাদী গল্প' (১৯১৯), উপন্যাসঃ 'আবদুল্লাহ' (১৯৩২), বিজ্ঞানঃ 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা' (১৩১১ বাংলা)।

খান বাহাদুর তসলীমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭) ঃ

কুরআন অনুবাদঃ 'তাবারাকাল্লাজী সুরার বঙ্গানুবাদ' (১৯০৭), 'কোরআন' প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খন্ড (ত্রিশ পারা) (১৯২২, ১৯২৪, ১৯২৫), 'আমপারা' (১৯০৯),' জন্মোৎসব বা মৌলুদ নফীসা' (১৯২৬), জীবনীঃ 'সাহাবিয়া' (১৯২৭),'সম্রাট পয়গম্বর' (১৯২৮)।

সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯) ঃ

‘ঈদুল আজহা’ (১৯০০), ‘মৌলুদ শরীফ’ (১৯০৩), ‘প্রাইমারী এডুকেশন ইন রূরাল এরিয়াজ’ (১৯০৬), ‘মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়’ (১৯১১), ‘সভাপতির অভিভাষণ’ (১৯১৯)।

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০) ঃ

ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থ: ‘হযরত ইসা কে ?’ (১৯০৮), ‘ইসলামী বক্তৃতা’ (১৯০৮), ‘শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদরীর ধোঁকা ভঞ্জন (১৯১৭), ‘রদ্দে সত্য-ধর্ম নিরূপণ ও হেদায়াতুল খৃস্টান (১৯২৬) ও ‘পাদ্রি মন্‌রো সাহেবের ধোঁকা ভঞ্জন’ (১৯২৭), ‘ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য’ (১৯০১)।

জীবনীমূলক গ্রন্থ ঃ ‘আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত’, জীবনী (১৮৯৮), ‘মেহের চরিত’ (১৯০৯), ‘মাসুম হযরত মোহাম্মদ (দঃ) অর্থাৎ হজরতের নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্কতা’ (১৯১৭), ইতিহাস ও কবিতা: ‘জঙ্গেকারবালা’ (১৯০৪), ‘কোথা চলি গেলে’ কবিতা (১৯০২)।

সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯৩০) ঃ

‘মোসলেম পতাকা’, ‘হজরত মোহাম্মদের জীবনী’ (১৯০৮), ‘বঙ্কিম সমালোচনা’ (১৯২২), ‘মোসলেম পতাকা, তারিখুল ইসলাম, ১ম ও ২য় খণ্ড (১৯২৪), ‘বাংলা মউলুদ শরীফ’ (১৯২৪), ‘বিবাহ বিভ্রাট’ (১৯২৭) ও ‘নূরজাহান’ (১৯৩৩)।

শেখ আবদুর রহীম (১৮৫৯-১৯৩১) ঃ

‘এসলাম তত্ত্ব’ প্রথম খণ্ড, ধর্ম (১৮৮৯), [এম.আর.আহমদ ও শেখ এ. রহীম প্রণীত], ‘এসলাম তত্ত্ব’ ২য় খণ্ড, ধর্ম (১৮৮৯), [মুহম্মদ রিয়াজ উদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহীম প্রণীত], ‘ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজসংস্কার’ ইতিহাস, (১৮৯০) [মৌলভী মেয়রয়াজ উদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহীম প্রণীত], ‘আলহামরা’ উপন্যাস (১৮৯১), ‘প্রণয়যাত্রী’ উপন্যাস (১৮৯২), ‘ইসলাম’ ধর্ম (১৮৯৬), ‘ইসলাম ইতিবৃত্ত’ ১ম খণ্ড, ইতিহাস (১৯১০), ‘ইসলাম ইতিবৃত্ত’ ২য় খণ্ড, ইতিহাস (১৯১১), ‘ইসলাম নীতি’ প্রথম ভাগ, ধর্ম (১৯২৫), ‘ইসলাম নীতি’ ২য় ভাগ, ধর্ম (১৯২৫)।

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) ঃ মুসলিম ঐতিহ্য প্রচারের মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সিরাজী বিবিধ বিষয়ক গদ্য, পদ্য ও উপন্যাস রচনা করেছেন। সিরাজীর কাব্য গ্রন্থগুলো হচ্ছে ঃ

'অনল প্রবাহ' (১৯০০), 'আকাঙক্ষা' (১৯০৬), 'উচ্ছাস' (১৯০৭), 'উদ্বোধন' (১৯০৭), 'স্পেন বিজয় কাব্য' (১৯১৪), 'সঙ্গীত সঞ্জীবনী' (১৯১৬), 'প্রেমাঞ্জলী' (১৯১৬)। তাঁর উলেণ্টখযোগ্য উপন্যাসগুলো হচ্ছে: 'রায়নন্দিনী' (১৯১৫), 'তারাবাঈ' (১৯১৬), 'ফিরোজা বেগম' (১৯১৮) ও 'নূরচ্নদ্দিন' (১৯১৯)।[৪১০] তাঁর পাঠক নন্দিত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলো হচ্ছে: 'তুরষ্ক ভ্রমণ' (১৯১৩), 'আদব কায়দা শিক্ষা' (১৯১৪), 'স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৬), 'সুচিন্ড়া', 'স্বজাতি প্রেম' (১৯১৯), 'তুর্কী নারী জীবন', 'স্ত্রী শিক্ষা ও কারা কাহিনী' ইত্যাদি।[৪১১]

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) ঃ

'মতিচূর' প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড, 'পদ্মরাগ', 'অবরোধ-বাসিনী', 'অগ্রন্থিত প্রবন্ধ', 'ছোটগল্প ও রস-রচনা' ' চিঠিপত্র', ' প্রবন্ধ'এবং 'অগ্রন্থিত কবিতা' 'Sultana's Dream' ইত্যাদি শিরোনামে বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে ১৯৯৯ সালে পুনর্মুদ্রণ হয় রোকেয়া রচনাবলী।

মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) ঃ

জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'মহর্ষি মনসুর' (১৮৯৬), 'ফেরদৌসী চরিত' (১৮৯৮), 'তাপস কাহিনী' (১৯০০), 'মাওলানা পরিচয়' (১৯১৪), 'খাজা ময়ীনউদ্দীন চিশতি', কাব্যগ্রন্থ: কুসুমাঞ্জলি' (১৮৮২), 'মহারাণা' (১৮৮৪), 'অপূর্ব দর্শন' (১৮৮৫), 'জুবিলী সঙ্গীত' (১৮৯৮), 'প্রেম-হার' (১৮৯৮), 'হজরত মাহম্মদ' ১ম খন্ড (১৯০৩), 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৯১২), উপন্যাস: 'জোহরা' (১৯১৮), 'দরাফ খান গাজী' (১৯১৯), শিশু সাহিত্য: 'হাতেম তাই', ইসলাম ধর্ম ও গান: 'আলণ্ডার শত নাম ও নামের মাহাত্ম', 'ইসলাম সঙ্গীত' (১৩২২ বাংলা), ও ইতিহাস: 'শাহনামা' ১ম খন্ড (১৯০৯)।

শেখ ফজলল করিম (১৮৮৩-১৯৩৬) ঃ

জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'মানসিংহ' (১৯০৩), 'হজরত এমাম রব্বানী মোজাদ্দাদে আলফসানী' (১৯০৫), 'মহর্ষি খাজা মইনুদ্দীন চিশ্‌তী (রাঃ) জীবন-চরিত' (১৯১৪), 'বিবি রহিমা' (১৯১৮), 'রাজর্ষি এবরাহীম' (১৯২৫), 'বিবি খদিজা' (১৯২৭), 'বিবি ফাতেমা' (১৯২৭), কাব্যগ্রন্থ: 'তৃষ্ণা' (১৯০০), 'পরিত্রাণ কাব্য' (১৯০৪), 'ভগ্নবীণা বা ইসলাম চিত্র' (১৯০৩), 'ভক্তি পুষ্পাঞ্জলী' (১৯১১), 'গাঁথা' (১৯১৩), 'জোয়ার ভাটা' (১৩২৫), উপন্যাস: 'লায়লী মজনু' (১৯০৪), ইতিহাস: 'আফগানিস্ড়ানের ইতিহাস'

---

[৪১০]. *বাংলা পিডিয়া ৯ম খন্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৭

(১৯২৭), তাসাউফ: 'এসবাত-উস-সামা বা সামাতত্ত্ব' (১৯০৩), ধর্ম ঃ 'পথ ও পাথেয়' (১৯১৮), 'চিন্ড়ার চাষ' (১৯১৬) ও শিশু সাহিত্য: 'সোনার বাতি' (১৯১৮), 'হারচন্দ-অর-রশিদের গল্প' (১৯১৬)।

দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬) ঃ

মূলত তিনি কবি ছিলেন। কাব্যগ্রন্থ সমূহ ঃ 'ভাঙ্গা প্রাণ' প্রথম খন্ড (১৯০৭), 'আশেকে রসূল' প্রথম খন্ড (১৯০৮), ২য় খন্ড (১৯১০) 'আখেরে মওত বা অন্ড়িমে মৃত্যু' (১৯১০), 'সমাজ শিক্ষা' (১৯৬৯), 'শান্ড়িকুঞ্জ' (১৯১৭), 'ভাঙ্গা প্রাণ', 'দেওয়ানে দাদ', 'ফরায়েজ' (ফিকহ), 'সঙ্গীত' 'উপদেশমালা' ইত্যাদি।

ডাঃ মুহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬) ঃ

প্রবন্ধ গ্রন্থ: 'উন্নত জীবন' (১৯১৯), 'মহৎ জীবন' (১৩৩৩ বাংলা),'মানব জীবন' (১৯২৮), 'সত্য জীবন' (১৯৪০), 'উচ্চ জীবন' (১৩৬৯ বাংলা), কাব্যগ্রন্থ: 'প্রকাশ' (১৯১৬), উপন্যাস: 'পথহারা' (১৯১৯), 'রায়হান' (১৩২৬ বাংলা), 'সরলা' (১৩২৬ বাংলা), 'প্রীতি উপহার' (১৯২৭), 'বাসর উপহার' (১৯৩৬) ইত্যাদি।

মতীয়র রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৭) ঃ

'মোসলেম বধ' (১৩০৮ বাংলা), 'স্বপ্ন' (১৯২৬), 'দিলণ্টীনামা' (১৯০০) ও 'সম্রাট নাসিরুদ্দীন' (১৯২৮)।

রেভারেন উইলিয়ম গোল্ডসেক ঃ

তাঁর জন্ম-মৃত্যু সাল সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। খ্রিস্টানদের মধ্যে সর্বপ্রথম উইলিয়াম গোল্ডসেকই সম্পূর্ণ কুরআন শরীফ বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন।[৪১২] 'কোরআন শরীফ' প্রথম খন্ড-৩০শ খন্ড (১৯০৮-১৯২০), 'ইসলামে কোরআন' (১৯০৬)।

আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮) ঃ'মুসলিম কালচার' (১৯২৮), 'মনুষ্যত্ব' (১৯৩৪)।

মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৪০) ঃ

[৪১২] . . মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪

প্রবন্ধ গ্রন্থ: 'ধর্মের কাহিনী' (১৯১৪), 'শান্তিধারা' (১৯১৯), শিশুসাহিত্য: 'নূর নবী' (১৯১৮), জীবনী: 'মানব মুকুট' (১৯২২), 'এয়াকুব আলী চৌধুরী অপ্রকাশিত রচনা' (১৯৯৩)।

আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩) ঃ'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' (১৮৯৮)।

দৌলত আহমদ (১৮৭০-১৯৪৪) ঃ 'নামজের উপদেশ' (১৯০৪), 'সমাজ-সংস্কার' (১৯১৪) ও 'কুসুমমঞ্জরী' (১৮৮৬)।

শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৪) ঃ

'দরবেশ কাহিনী' (১৩৩৪ বাংলা), 'শিশুদের সিদ্দিক' (১৩৪৯), 'শিশুদের মোস্তফা' (১৩৪৯), 'শিশুদের জিন্নুরায়েন' 'নূরজাহান', 'শিশুদের ফারূক'।

আবদুল বারী কবিরত্ন (১৮৭৩-১৯৪৪) ঃ 'কারবালা' (১৯১৩), 'ভারতের যুবরাজ', ও 'ইসালে সওয়াব'।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০) ঃ

ইতিহাস বিষয়কগ্রন্থ: 'কনষ্টান্টিনোপল' (১৯১৩), 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪), 'ভারতে ইসলাম প্রচার' (১৯১৫), জীবনী: 'মহামান্য তুরস্কের সুলতান' (১৯০১), 'খাজা নেজামুদ্দীন আওলিয়া' (১৯১৬), 'আওরঙ্গজেব' 'মোসলেম বীরাঙ্গনা', প্রবন্ধ ও অভিভাষণ বিষয়ক গ্রন্থ: 'সমাজ সংস্কার' (১৯২৩), 'সুদ সমস্যা মুসলমান সমাজ' (১৩৩২ বাংলা), 'কোরআনে স্বাধীনতার বাণী' (১৯৩৯), 'এছলামের শিক্ষা' (১৩৫৪), 'ভূগোল শাস্ত্রে মুসলমান', 'খগোল শাস্ত্রে মুসলমান', 'এছলাম জগতের অভ্যুত্থান' ইত্যাদি।

কাজেম আল কোরায়শী কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১) ঃ 'অশ্রুমালা' (১৩০২ বাংলা), 'মহাশ্মশান' (১৯০৫), 'অমিয়ধারা' (১৯২৩), 'মহরম শরীফ বা আত্মবিসর্জন কাব্য' (১৯৩৩)।

এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১) ঃ

অভিভাষণ:'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' (১৯২৬), 'সভাপতির অভিভাষণ' (১৯৩০), প্রবন্ধ গ্রন্থ: 'জীবনের শিল্প' (১৯৪১), 'ভবিষ্যতের বাঙালি' (১৯৪১), 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' (১৩৫১ বাংলা), 'সভ্যতা ও সাহিত্যে মুসলমানদের দান' (১৩৫৫বাংলা), 'ইবনে খালদুনের সমাজবিজ্ঞান' (১৩৫৬ বাংলা), 'মুসলিম সংস্কৃতির আদর্শ', ইতিহাস গ্রন্থ: 'গ্রানাডার শেষ বীর' (১৯৪০), 'আকবরের রাষ্ট্র সাধনা' (১৯৪৯), 'ইসলামের ইতিহাস', গল্প গ্রন্থ: 'গুল-দাস্তা' (১৯২৭), 'মাশুকের দরবার' (১৯৩০), 'দরবেশের দোয়া' (১৯৩১), 'বাদশাহী গল্প' (১৯৪৪), 'ভাঙ্গা বাঁশী', 'গল্পের মজলিস', 'পীর-পয়গম্বরদের কথা', 'ইরাণ-তুরাণের গল্প' ইত্যাদি।

আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯ বা ১৮৭১-১৯৫৩) ঃ

'ইসলাম ইতিবৃত্ত' (১৯০৪), 'ইসলামাবাদ' (১৯১৮), 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (১৯৩৫), 'প্রাচীন মুসলমান কবিগণ' (১৯০৬)', 'মধ্যযুগের কবি ও কাব্যবিষয়ক অগ্রন্থিত প্রবন্ধ', ইতিহাস বিষয়ক অগ্রন্থিত প্রবন্ধ', ও 'লোকসংস্কৃতি বিষয়ক অগ্রন্থিত প্রবন্ধ' ইত্যাদি শিরোনামে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ রচনাবলী ১ম খন্ড, আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪) ঃ

জীবনীমূলক গ্রন্থ: 'মোহাম্মদ আলী' (১৯২২), 'মহামানুষ মুহসিন' (১৯৩৪), 'সৈয়দ আহমদ' (১৯৩৫), 'নবাব আবদুল লতিফ' (১৯৩৬), মরচ-ভাস্কর হজরত মোহাম্মদ (১৯৪১), 'কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ' 'ছোটদের হজরত মোহাম্মদ', 'ছোটদের হাতেম তাই' 'ছোটদের শাহনামা' ও অন্যান্য গ্রন্থ: 'সিন্দাবাদ-হিন্দবাদ', 'স্মার্ণা নন্দিনী' ও 'মণি-চয়নিকা'।

সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৮০-১৯৫৬) ঃ

'তাপসী রাবেয়া' (১৯১৭), 'সাহিত্যকুসুম' (১৯১৯), 'হাফেজা' (১৯২৯), 'ডালি' (১৯১২)।

মুহাম্মদ আবদুল হাকিম (১৮৮৭-১৯৫৭) ঃ

'প্রতিদান', (১৩২৭ বাংলা), 'ইসলাম সঙ্গীত' (১৩৩১ বাংলা), 'কোরআন শরীফ' (১৯২২-১৯৩৮), 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজীনে হানিফিয়া বাঙ্গালার উদ্দেশ্য' (১৯২৩)।

শেখ হবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২) ঃ

ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ: 'মালাবারে ইসলাম প্রচার' (১৯১৯), 'আলমগীর' (১৯১৯), 'ভারত সম্রাট বাবর' (১৯৩৬), ধর্ম: 'চেতনা' (১৯১৫), 'মরণের পরে' (১৯৫৫), 'ইসলাম ও অন্যধর্ম', জীবনী: 'আমার সাহিত্য জীবন' (১৯২৭), 'কর্মবীর মুন্সি মেহেরচল্লা' (১৯৩৪) ও 'ছেলেদের হজরত মুসা' (১৯৩৪), শিশুসাহিত্য: 'ছোটদের গল্প' (১৯৩৫), 'জেনপরী' (১৯২৮), 'পরীর কাহিনী' (১৯১৬)।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী (১৮৭২-১৯৫৯) ঃ

'শহীদ তীতুমীর' (১৩৬৮ বাংলা)।

গোলাম মকসুদ হিলালী (১৯০০-১৯৬১) ঃ

জীবনীমূলক গ্রন্থ: ‘হজরতের জীবন নীতি’ (১৯৬৫), ‘আলবেরুনী’ (১৯৩৭), ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়: ‘ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতা’ (১৯৭৪), ‘বাংলায় ফারসী-আরবী উপাদান (১৯৬৭), ‘জাহানারা’, ‘ইরান ও তুরান’ ইত্যাদি।

মুহাম্মদ সেরাজুল হক (১৯০৩-১৯৬৩) ঃ

‘শিরাজী চরিত’ (১৯৩৫), ‘ইসলামের বৈশিষ্ট্য’ (১৯৩৮), ‘আমার জীবন কাহিনী’ (১৯৬৬)।

কাজী আকরম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩) ঃ

ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ: ‘ইসলামের ইতিহাস’ (১৯২৪), ‘ইসলাম কাহিনী’ (১৯৩১), ‘ইসলামের ইতিকথা’ (১৯৩২) ইত্যাদি।

খান বাহাদুর আবদুর রহমান (১৮৮৯-১৯৬৪) ঃ

জীবনীমূলক গ্রন্থ: ‘মোসলেম নারী’ প্রথম খ, (১৯২৮), ‘চার ইয়ার’ (১৯৩২), ‘শেষ নবী’, ধর্ম ও কুরআন হাদীসের বঙ্গানুবাদ: ‘শিক্ষা বিজ্ঞান’ (১৯৩৫), ‘ইসলাম পরিচিতি’ (১৩৫৯ বাংলা), ‘ইসলামিক তমুদ্দুন ও পাকিস্ড়ান’ (১৯৫৬), ‘নয়া খুতবা’, ‘জওয়াহিরচ্চ কুর-আন’ এবং কুরআন-হাদীসের প্রচুর অনুবাদ।

গোলাম মোস্ড়ফা (১৮৯৭-১৯৬৪) ঃ

‘ইসলাম ও জেহাদ’ (১৯৪৭), ‘মরচ-দুলাল’, (১৯৪৮), ‘ইসলাম ও কম্যুনিজম’ (১৯৪৬), ‘বিশ্বনবীর বৈশিষ্ট্য’ (১৯৬০), ‘অবিস্মরণীয় বই’ (১৯৬০), ‘আমার চিন্ড়াধারা’ (১৯৬২), ‘হজরত আবুবকর’ (১৯৬৫)।

বেগম শামসুননাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪) ঃ

‘পুণ্যময়ী’ (১৩৩১বাংলা), ‘বেগম মহল’ (১৯৩৬), ‘নূরন্নেসা খাতুন’ (১৮৯৪), ‘খয়েরচন্নেসা খাতুন’।

খান বাহাদুর আহছানউলণ্যা (১৮৭৩-১৯৬৫) ঃ

‘বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য’ (১৯১৮), হেজাজ ভ্রমণ’ (১৯২৫), ‘মোসলেম জগতের ইতিহাস’ (১৯২৫), ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরচ্ষ’ (১৯২৬), ‘হজরত মোহাম্মদ’ (১৯৩১), ‘ইছলামের ইতিবৃত্ত’ (১৯৩৪), ‘দরবেশ জীবনী (১৯৩৪) ‘ভক্তের পত্র’ (১৯৬৭), ‘হজরতের রচনাবলী’ (১৯৪০), ‘কোরআনের সার’ (১৯৪১), ‘বিশ্বশিক্ষক’ (১৯৪৯), ‘সৃষ্টিতত্ত্ব’ (১৯৪৯), ‘রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোসলেম সভ্যতা’ (১৯৪৯), ‘হজরত মহর্ষি রচ্মী’ (১৯৫০), ‘ইসলামের দান’ (১৯৫৮) ইত্যাদি আরও গ্রন্থ রয়েছে।

গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৫) ঃ

‘বঙ্গদেশীয় হিন্দু-মুসলমান’ (১৯১১), ‘দিলণ্টী-আগ্রা ভ্রমণ’ (১৯১২), ‘নীতি-প্রবন্ধ মুকুল’।

মুহাম্মদ হাবিবুলণ্ঢাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬) ঃ

জীবনীমূলক গ্রন্থঃ ‘আমীর আলী’ (১৯৩০), ‘ওমর ফারচক’ (১৯৩১), ‘কবি ইকবাল’, ‘সৈয়দ আহমদ’, ‘মুহম্মদ আলী’, ‘মরচ-ভাস্কর’ ইতিহাসঃ ‘মিশর বিজয়’, ‘বন্দীবীর, ‘পাকিস্ড়ন’ ইত্যাদি।

মৌলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮) ঃ

‘সমস্যা ও সমাধান’ ‘১৯৩১), ‘মোস্ড়ফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্য’ (১৯৩২), ‘উম্মুল কেতাব’ (১৯২৯), ‘মোছলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস’ (১৯৬৫), ‘তাফছীরচ্ল কোরআন’ (১৯৫৯), ‘বাইবেল নির্দেশ ও প্রচলিত খৃষ্টান ধর্ম’ (১৯৬২)।

মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯) ঃ

‘বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত’ (সৈয়দ আলী আহসান সহযোগে, ১৯৫৬), ‘ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান’।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) ঃ

‘ইসলাম প্রসঙ্গ’ (১৯৬৩), ‘শেষ নবীর সন্ধানে’ (১৯৬১), ‘মহরম শরীফ’ (১৯৬২), ‘প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে শেষনবী’ (১৯৫২), ‘বাংলায় ইসলামী বিশ্বকোষ’, ‘বাংলা সাহিত্যের কথা’ (১৯৬৫)।

মুহাম্মদ এমদাদ আলী (১৮৯১-১৯৬৯) ঃ

‘তরিকোল ইসলাম বা মোসলেম নীতি’ (১৯১৭), ‘জুমার দ্বিধাভঞ্জন’ (১৯১৮), ‘মোসলেমমালা’ (১৯২০), ‘মিলনযুগ বা নীতিরহস্য’ (১৯২১), ‘কুরীতি জীবন’ (১৯২৩), ‘হক কথা’ (১৯২৮),

'উপদেশমালা' (১৯৩০), 'ওয়াজে ইসলাম' (১৯৩০), 'স্বভাব দর্পণ' (১৯৩৫), 'হজরতের ভবিষ্যৎ বাণী বা বর্তমান দশা' (১৯৩৭), 'স্বামী-তর্কযুদ্ধ বা শান্ড়িসোপান (১৩৪৭ বাংলা), 'চারি তরিকার সংক্ষিপ্ত অজিফা' (১৯৩৯), 'আমার সৌভাগ্য জীবন' (১৯৫৪)।

হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯) ঃ 'মোসলেম রাজনীতি' (১৯৪৩)।

কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০) ঃ

'হজরত মোহাম্মদ ও ইসলাম' (১৯৬৩), 'পবিত্র কোরআন' প্রথম খন্ড, (১৯৬৬), 'মক্তব সাহিত্য' (১৯৩৬) ইত্যাদি।

আবদুল মওদুদ (১৯০৮-১৯৭০) ঃ

'ইসলাম যা ইউরোপকে শিখিয়েছে' (১৩৫৪ বাংলা), 'কামেল নবী (১৩৫৫ বাংলা), 'মুসলিম মনীষা' (১৯৫৫), 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' (১৩৭০), 'শাহ আবদুল ভিটাই' (১৯৬৪), 'হযরত ওমর' (১৯৭৮), মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্ড়র' (১৯৬৯), 'ওহাবী আন্দোলন' (১৯৬৯) ইত্যাদি।

গোলাম রহমান (১৯৩১-১৯৭২) ঃ 'নেতা ও নবী' (১৩৩২ বাংলা), 'পানুর পাঠাগার' (১৯৫৯)।

আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদামুদ্দীন (-মৃত্যু-১৯৭২) ঃ 'তহফতুল ফালাসিফা' (১৩৭১ বাংলা)।

ফররচখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪) ঃ 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), সিরাজাম মুনিরা' (১৯৫২)।

মোহাম্মদ বরকতুলণ্ঢাহ (১৮৯৮-১৯৭৪) ঃ

'পারস্য প্রতিভা' ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড (১৯২৪, ১৯৩২), 'মানুষের ধর্ম' (১৯৩৪), 'কারবালা' (১৯৫৭), 'নবীগৃহ সংবাদ' (১৯৬০), 'নয়াজাতি স্রষ্টা হজরত মুহম্মদ' (১৯৬৩), 'হজরত ওসমান (১৯৬৯)।

নুরচন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪-১৯৭৫) ঃ

'ভারতে মোসলেম বীরত্ব' (১৯২৪), 'মোসলেম বিক্রম ও বাংলার মোসলেম রাজত্ব' (১৯২৯)।

কাজী নজরচল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ঃ

'কাব্যে আমপারা' (১৯৩৩), 'অগ্নিবীণা' (১৯২৮), 'যুগবাণী' (১৯২২), 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' (১৯২৩), 'দুর্দিনের যাত্রী' (১৯২৬), 'রচদ্র মঙ্গল' (১৯২৭), 'সাম্যবাদী' (১৯২৫), 'সঞ্চিতা' (১৯২৮), 'নজরচলের

প্রবন্ধ সমগ্র' (১৯৯৭), 'সঞ্চিতা' (১৩৬২ বাংলা) নবম সংস্করণ, 'নজরচ্ল ইসলাম ইসলামী কবিতা' (১৯৮২), 'মরচ-ভাস্কর' (১৯৩০)।

মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা (১৯০০-১৯৭৭) ঃ 'পবিত্র কোরাণের পূত কথা' (১৩৫২ বাংলা)।

শামসুর রহমান চৌধুরী (১৯০২-১৯৭৭) ঃ

'ফকিরের কারামত' (১৯২৪), 'বেহেস্ড়ের সওগাত' (১৯২৫), 'ইমাম আজম' (১৯২৬), 'ইসলাম প্রচার' (১৯২১), 'মোহাম্মদ আলী' (১৯৩২) ইত্যাদি।

প্রিন্সিপাল ইবরাাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮) ঃ

'সোনার শিকল' (১৯৩৯), 'ইস্ড়াম্বুল যাত্রীর পত্র' (১৩৬১ বাংলা), 'বাদশাহ বাবর' (১৯২৭), 'সম্রাট ছালাহউদ্দীন' (১৯২৭), 'ইসলামের বাণী' (১৯৩৯), 'ইসলামের ঔদার্য' (১৯৪৮), 'জঙ্গী জীবন' (১৯৫৩), 'আরব জাতির ইতিকথা' (১৯৫৯), 'মহিয়সী নারী' (১৯৫৯), 'ইসলামের মর্মকথা' (১৯৫৯), 'চেঙ্গীস খাঁ' (১৯৫৯), 'ছোটদের মহানবী' (১৯৬১), 'হজরত ওমর ফারচক (১৯৬১) ইত্যাদি।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) ঃ 'মুসলমানী কথা' (১৯২৮), 'ছোটদের কাসাসুল আম্বিয়া' (১৩৬১ বাংলা)।

মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২) ঃ

'বঙ্গে সুফী প্রভাব' (১৯৩৫), 'পূর্ব পাকিস্ড়ানে ইসলাম' (১৯৪৮), 'মুসলিম-বাংলা সাহিত্য' (১৯৫৭) ইত্যাদি।

বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩) ঃ 'ইসলাম ও কম্যুনিজম' (১৯৪৫)।

শইখ শরফুদ্দীন (১৯০০-১৯৮৪) ঃ 'পবিত্র জীবন' (১৯৭৮)।

ডক্টর এম আবদুল কাদের (১৯০৮-১৯৮৪) ঃ 'মোসলেম কীর্তি' (১ম, ২য়, ৩য় খন্ড), 'টিপু সুলতান' (১৯৩২), 'হায়দর আলী' (১৯৩২), 'স্পেনের ইতিহাস' (১৯৩৫), 'মুর সভ্যতা' (১৯৩৬), 'তুরস্কের ইতিহাস' ১ম ও ২য় খন্ড', 'সোলতান সালউদ্দীন' (১৯৪০) ও 'ইসলামের নীতি' (১৯৫০)।

আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪) ঃ ‘বাংলা কাব্যের ইতিহাসঃ মুসলিম সাধনার ধারা’ (১৯৭০), ‘কবি নজরচ্ল’ (১৯৭০)।

মুজিবর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪) ঃ ‘সাহিত্য ও সাহিত্যিক’ (১৯৭১), ‘মহানবী’ (১৯৮০)।

আবুল হাসানাত (১৯০৫-১৯৮৫) ঃ ‘তরিকৎ বা খোদাপ্রাপ্তি’ (১৯৩৮)।

মুহম্মদ নূরচ্ল হক (১৯০৭-১৯৮৭) ঃ ‘শেষ নবীর বাণী’ (১৯৭০), ‘বিগত যুগের আদর্শ’ (১৯৮১)।

আলী আহমদ (১৯১০-১৯৮৭) ঃ ‘বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী’ (১৯৮৭)।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (১৯০৪-১৯৮৭) ঃ ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা’ (১ম, ২য়, তয়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম খ-), ‘ইরানের কবি’ (১৯৬৮)।

কাজী আবদুল মান্নান (১৯২৮-১৯৯৪) ঃ ‘আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা’ (১৯৬১)।

সুফী জুলফিকার হায়দার (১৮৯৯-১৯৮৭) ঃ

‘জেহাদের আহ্বান’ (১৯৬৫), ‘বিপণ্ডব বিপণ্ডব সত্যের বিপণ্ডব’ ‘আশরাফুল মাখলুকাত’ (১৩৮৭ বাংলা), ‘নজরচ্ল জীবনের শেষ অধ্যায়’ (১৯৭০)।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯) ঃ

‘তমুদ্দনের বিকাশ’ (১৯৪৯), ‘সত্যের সৈনিক আবু জর’ (১৯৫২), ‘জীবন সমস্যার সমাধানে ইসলাম’ (১৯৫৯)।

আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯১৪-) ঃ

‘তাপস কাহিনী’ (১৯৩৯), ‘আবু বকর সিদ্দিক’ (১৯৪৬), ‘মহা কবি ইকবাল’ (১৯৫৩), ‘হজরত ইউসুফ’ (১৯৬২), ‘ইসলাম পরিচিতি’ (১৯৬৩), ‘সংঘাতের মুখে ইসলাম’ (১৯৬৩), ‘ইসলামের মুক্তপন্থা’ (১৯৬৯)।

মনিরচ্দ্দীন ইউসুফ (১৯১৭-২০০০) ঃ

‘হজরত ফাতেমা’ (১৩৭১ বাংলা), ‘হজরত আয়েশা’ (১৩৭৫ বাংলা), ‘আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি’ (১৩৮৫ বাংলা), ‘বাংলা সাহিত্যে সুফী প্রভাব’, ‘সুফীবাদ ও আমাদের সমাজ’, ‘সংস্কৃতি চর্চা’ ইত্যাদি।

আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩) ঃ ‘কোরানের বাণী’ (১৯৪৯), ‘হযরত আলী’ (১৯৬৮), ‘সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধাবলী’ (১৯৮০)।

কাজী দীন মুহম্মদ (১৯২৭-) ঃ ‘মানব জীবন’ (১৯৭০), ‘ইসলামী সংস্কৃতি’ (১৯৭০), ‘সুফীবাদের গোড়ার কথা’ (১৯৮১)।

ইসলাম ধর্মকে কেন্দ্র করে আরো যাঁরা এই সময়ের মধ্যে সাহিত্য রচনা করেছেন ঃ

রামপ্রাণ গুপ্ত (১৮৬৯-১৯২৭) ঃ ‘হজরত মোহাম্মদ’ (১৯০৪), ‘ইসলাম কাহিনী’ (১৯১১)।

কৃষ্ণ কুমার মিত্র (১৮৫২-১৯৩৬) ঃ ‘মহম্মদ চরিত ও মুসলমান ধর্মের সংক্ষিপ্ত বিবরণ’ (১৮৮৬)।

কুমুদনাথ মলিণ্ঢকঃ ‘হজরত মোহাম্মদ’ (১৯১৬)।

সৈয়দ বদরোদ্দজা (১৮৯৮-১৯৭৪)ঃ ‘হজরত মোহাম্মদ (দ) তাঁর শিক্ষা ও অবদান’।

গোলাম কিবরিয়া (১৮৪৩-), আবদুল লতিফ (১৮৭৪-১৯৩৬), আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২), সফিউদ্দিন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২?), আলাউদ্দিন আহমদ (১৮৫১-১৯১৫?), আবদুল বারী (১৮৭২-১৯৪৪), আবদুর রহমান খাঁ, কিরণগোপাল সিংহ, মীর ফজলে আলী, আবদুল খালেক, নাজির আহমদ চৌধুরী, শেখ ওসমান আলী। ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জীবন চরিত নিয়ে অনেক মুসলিম ও অমুসলিম সাহিত্যিকগণ কলম ধরে ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস ও ঐতিহাসিক ভূমিকা আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। যদিও তাঁদের অনেকেই ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলেন নি। কিন্তু ইসলামের সত্য ইতিহাস ও গৌরবময় ঐতিহ্য প্রকাশ করতে তাঁরা কৃপণতা করেন নি। যা আজ নিঃসন্দেহে ইসলামী সাহিত্যের বিশাল সম্পদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ইসলামী ভাবধারায় লিখিত ও প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা (সাপ্তাহিক, পাক্ষিক মাসিক ও ষান্মাসিক) (১৯০১-১৯৫০) ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ড় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে মুসলমান সম্পাদিত ও প্রচারিত পত্র-পত্রিকার অবদান বিশেষভাবে উলেণ্ঢখযোগ্য। বাংলার নবজাগরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম ছিল পত্র-পত্রিকা। নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর যৌথ প্রয়াসের ফলে সংবাদপত্র-শিল্পের উদ্ভব হয়। সভা-সমিতির গোষ্ঠীচেতনার মত পত্র-পত্রিকার গোষ্ঠীভাবনাও সামাজিক বিবর্তনের ফল।

বাংলার মুসলিম নব জাগরণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হলে সাময়িকপত্রের আলোচনা আবশ্যক। বিশেষত সাময়িকপত্র সমকালীন সমাজজীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। সমাজ মানুষের ভাব-আবেগ, চিন্ড়া-চেতনা, ধ্যান-ধারণার কথা পত্র-পত্রিকায় স্থান পেয়ে থাকে।[৪১৩] এ ধারায় মীর মশাররফ হোসেন সম্পাদিত 'আজীজন নাহার' প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। এরপর পর্যায়ক্রমে 'হিতকরী' (১৮৯০), 'সুধাকর' (১৮৮৯), 'মিহির' (১৮৯২), 'হাফেজ' (১৮৯৮) ইত্যাদি পত্রিকা মুসলমানদের হাতে ও আদর্শে সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। এই পত্রিকাগুলো বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকাগুলোর পূর্বসুরী হিসেবে ভূমিকা রাখে। 'এসব পত্রিকা একদিকে যেমন জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের সহায়ক হয়েছে, মুসলমানের সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চেতনায় দীক্ষিত করার প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় ঐতিহ্য ও বিবিধ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিশুদ্ধ সাহিত্যও সৃষ্টি করেছে।

ভাষার সৌকর্য বিধানের অনুশীলন ও বিকাশ ধারায় আধুনিক সমাজের মুসলিম বৈশিষ্ট্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পত্রিকাগুলোর দান অস্বীকার করার উপায় নেই।'[৪১৪] ব্রিটিশ কর্তৃক সৃষ্ট হিন্দু-মুসলিমের বৈরীতা দূরীকরণে এবং মিলনে এ সমস্ড় পত্রিকা গুরচ্ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের আশা-আকাঙ্খার প্রতীক হয়ে ওঠে এই পত্রিকাগুলো।

নব্য ইসলামী সাহিত্যিকদের রচনা প্রচার ও প্রসারেও এ সমস্ড় পত্র-পত্রিকা গুরচ্ত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সমাজ জীবনে এ সমস্ড় পত্রিকার চাহিদার কারণেই ইসলামী সাহিত্যিকগণ ইসলামী সাহিত্য রচনায়

[৪১৩] . ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৯

[৪১৪] . ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, "বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬

উৎসাহ বোধ করেন ও আত্মনিয়োগ করেন। ‘সুধাকর’, ‘সওগাত’, ‘মোহাম্মদী’ মুসলিম-সম্পাদিত প্রায় সব প্রধান পত্রিকা কলকাতা থেকেই বেরিয়েছিল।

মুসলিম-সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে-রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল, ভূজংগধর রায় চৌধুরী, অন্নদাশংকর রায় মাঝে মাঝে অবতীর্ণ হয়েছেন। যেমন নজরুল, জসীম উদ্‌দীন, প্রমুখ হিন্দু সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে। কিন্তু মোটামুটিভাবে হিন্দু-সম্পাদিত পত্রিকাগুচ্ছে হিন্দু আদর্শ এবং মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে মুসলিম আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। অন্য মুসলিম লেখকদের প্রসংগ দূরে থাক, হিন্দু-মুসলিম মিলনের শ্রেষ্ঠ অগ্রদূত নজরুল ইসলামও আশ্চর্য-প্রধানত প্রকাশিত হয়েছেন মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকা নিচয়েই।

মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকা নিচয়ের ছিলো তিনটি বিশিষ্টতাঃ এক. মুসলিম ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রচার-প্রসার; দুই. বাঙালি মুসলমানের ভাষা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও জবাব; তিন. হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামিতা। হিন্দু সম্পাদিত পত্রিকাসমূহে নয়, আশ্চর্য মুসলিম সম্পাদিত পত্রিকাসমূহেই হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হতো।

মীর মোশাররফ হোসেন সম্পাদিত ‘হিতকরী’ ছিলো হিন্দু-মুসলমানের মিলনকামী। এস.কে.এম. মোহাম্মদ রওশন আলী সম্পাদিত ‘কোহিনূর’ পত্রিকার প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছিলোঃ ‘হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতার অনাথ আশ্রমের সাহায্যার্থে ‘কোহিনূর’ প্রচারে ব্রতী হইয়াছি। সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত ‘নবনূরে’র সম্পাদকীয় থেকে উদ্ধৃতি, ভারতবর্ষে অদৃষ্ট ফলকে হিন্দু-মুসলমানের সুখ-দুঃখ এখন একই বর্ণে চিহ্নিতঃ বিজয়দৃপ্ত মুসলমান এখন হিন্দুর ন্যায়ই বিজিত। এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের শুভাশুভ নির্ভর করে।[৪১৫]

গবেষক ইসরাইল খান ১৯৩১-১৯৪৭ এই সময়কালে বিভিন্ন আদর্শে বিভক্ত চলমান কতকগুলো সাহিত্য পত্রিকার কথা উলেণ্টখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘মুসলমান সমাজে পত্রিকা প্রকাশের যে জোয়ার সৃষ্টি হয়, তার ফলে শতাধিক পত্রিকার নাম আমরা পাই। এই পত্রিকাগুলো ১৯৩১ থেকে ১৯৪৭ সময়কালের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশে বহুমাত্রিক ভূমিকা পালন করেছে। সেকালে এগুলোর সামাজিক ও

---

[৪১৫] . আবদুল মান্নান সৈয়দ, “আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশে মুসলমানদের অবদান”, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

রাজনৈতিক ভূমিকাও গৌণ ছিল না।'[৪১৬] রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ভূমিকা পালনের প্রবণতা লক্ষ্য করে তিনটি বিভাগে ভাগ করে তিনি পত্রিকাগুলো প্রকাশের সন-তারিখসহ আমাদের দেখিয়েছেন। যেমনঃ

ক. অসাম্প্রদায়িক (সমন্বয়বাদী) প্রগতিশীল ধারাঃ

১. সওগাত (কলকাতা, ১৩২৫-৫৫), ২. শিখা (ঢাকা, ১৩৩৩-৩৮)' ৩. জয়তী (কলকাতা, ১৩৩৭-৩৯), ৪. প্রাতিকা (কলকাতা, ১৩৩৭), ৫. বুলবুল (কলকাতা, ১৩৪০-৪৫), ৬. ছায়াবীথি (কলকাতা, ১৩৪০-৪৩), ৭. চতুরঙ্গ (কলকাতা, ১৩৪৫-বর্তমানেও), ৮. রূপায়ন (কলকাতা, ১৩৪৭-৪৮), ৯. ত্রিকাল (কলকাতা, ১৩৪৯-৫২)।

খ. মধ্যপন্থী, উদারনৈতিক, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল ধারাঃ

১০. মোয়াজ্জিন (কলকাতা, ১৩৩৫-৫০), ১১. গুলিস্ড়াঁ (কলকাতা, ১৩৩৯-৫৪), ১২, সবুজ বাঙলা (নারায়ণগঞ্জ, ১৩৪১-৪৫), ১৩. মৃত্তিকা (কলকাতা, ১৩৪৮-৫৪), ১৪. পূরবী (চট্রগ্রাম, ১৩৪৪৩-৪৫), ১৫. বঙ্গভূমি (ঢাকা, ১৩৪৪-৪৫) ১৬. শীশ-মহল কলকাতা, (১৩৪৬-৫০), ১৭. প্রতিভা (চট্রগ্রাম, ১৩৪২), ১৮. নব্য বাংলা (? ১৩৩৯), ১৯. রূপরেখা (কলকাতা, ১৩৩৯-৪২), ২০.বর্ষবাণী (কলকাতা, ১৩৪২-৫৭), ২১. অভিযান (ঢাকা, ১৩৪০)।

গ. মুসলিম জাতীয়তাবাদী (স্বাতন্ত্র্যবাদী), ধর্মীয় পুনর্জাগরণবাদী ধারাঃ

২২. মোহাম্মদী (কলকাতা, ১৩৩৪-৫৪), ২৩. আল-ইসলাহ (সিলেট, ১৩৩৯-৫৪), ২৪. প্রভাতী (সিলেট, ১৩৪৮-৫৪), ২৫. আল আমান (সিলেট, ১৩৪৯-৫৪), ২৬. নওরোজ (দিনাজপুর, ১৩৪৮-৫৪), ২৭.জাগরণ (কলকাতা, ১৩৪৭-৫৪), ২৮. নয়াজামানা (সিরাজগঞ্জ, ১৩৪৫-৫০)।

ঘ. শিশু-কিশোর পত্রিকাঃ

২৯. শিশু সওগাত (কলকাতা, ১৩৪৪-৫৪), ৩০. গুল বাগিচা (কলকাতা, ১৩৫০-৫৪), ৩১. সবুজ পাতা (সিলেট, ১৩৪৯-)।[৪১৭]

---

[৪১৬] . ইসরাইল খান, *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (১৯৩১-১৯৪৭)* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৫) পৃ. ৮১

[৪১৭] . ইসরাইল খান, *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (১৯৩১-১৯৪৭),* প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২

ইসরাইল খান পাকিস্ড়নের আদর্শে বিশ্বাসী, ইসলামী পুনর্জাগরণবাদী সরকারি ও বেসরকারি প্রধান সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে 'মোহাম্মদী' (১৯০৩-৭০),'আল-ইসলাহ' (১৯৩২-৭১),'মাহে নও' (১৯৪৯-৭১), 'দিলরচবা' (১৯৪৯-৬৪), 'নওবাহার' (১৯৪৯-৫৩), 'তাহজিব' (১৯৫০), 'দ্যুতি' (১৯৪৯-৫০) ইত্যাদি পত্রিকাগুলোকেও তাঁর অপর একটি গবেষণায় উলেণ্টখ করেন।[৪১৮] ১৯০০-১৯৫০ এই সময়কালে যে সব বাংলা পত্রিকা (বিভিন্ন শ্রেণীর) মুসলমানদের সম্পাদনায় পাওয়া যায় এবং ইসলামী সাহিত্য সংস্কৃতি বিকাশে গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তার একটি তালিকা দিয়েছেন ড. ওয়াকিল আহমদ:

সময়	পত্রিকা	শ্রেণী	সম্পাদক	স্থান
১৯০০	লহরী	(মাসিক)	মোজাম্মেল হক	শান্ড়িপুর
১৯০০	নূর-অল ইমান	(মাসিক)	মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	রাজশাহী
১৯০১	মোসলমান পত্রিকা	(মাসিক)	মাহাতাবউদ্দীন	যশোহর
১৯০১	সোলতান	(মাসিক)	এম. নাজিরচদ্দীন আহমদ	কুমারখালি
১৯০১	নূরচল ইসলাম	(বার্ষিক)	মোহাম্মদ মেহেরচলণ্ঢা	যশোহর
১৯০১	বালক	(সাপ্তাহিক)	এ.কে. ফজলুল হক ও নিবারণচন্দ্র	বরিশাল
১৯০৩	নবনূর	(মাসিক)	সৈয়দ এমদাদ আলী	কলিকাতা
১৯০৩	মোহাম্মদী	(মাসিক)	মোহাম্মদ আকরম খাঁ	কলিকাতা
১৯০৩	হানিফি	(মাসিক)	নূরচল হোসেন কাসিমপুরী	ময়মনসিং
১৯০৪	সুহৃদ	(মাসিক)	এ.ডি. খান	কটক[৪১৯]
১৯০৬	এ্যবব গঁংঁধষসধহ	(সাপ্তাহিক)	আবুল কাসেম	কলিকাতা
১৯০৮	বাসনা	(মাসিক)	শেখ ফজলুল করিম	কাকিনা, রংপুর
১৯০৮ ও ১৯১১	ইসলাম প্রচারক	(মাসিক)	মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৯১১	মোসলেম হিতৈষী	(সাপ্তাহিক)	শেখ আবদুর রহীম	কলিকাতা
১৯১৫	আল্-এসলাম	(মাসিক)	মোহাম্মদ আকরম খাঁ ও মৌলানা মনিরচজ্জামান ইসলামাবাদী	কলিকাতা

[৪১৮] . ইসরাইল খান, *বাংলা সাময়িক পত্র: পাকিস্তান পর্ব* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৪) পৃ. পনের-ষোল

[৪১৯] . ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭) পৃ. ৩৭৮, আরও দেখুন: 'মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র' ও 'সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত'

১৯১৮	বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা	(ত্রৈমাসিক)	মৌলভী মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক	কলিকাতা
১৯১৮	সওগাত	(মাসিক)	মোহম্মদ নাসিরুদ্দিন	কলিকাতা
১৯১৯	বঙ্গনূর	(মাসিক)	শেখ হবিবুর রহমান	কলিকাতা
১৯১৯	সাধনা	(মাসিক)	আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ আবদুর রশীদ সিদ্দীকী	চট্টগ্রাম ও কলিকাতা
১৯২০	মোসলেম ভারত	(মাসিক)	মোজাম্মেল হক	কলিকাতা
১৯২০	ইসলাম দর্শন	(মাসিক)	মৌলভী মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	কলিকাতা
১৯২১	আন্নেসা	(মাসিক)	বেগম সুফিয়া খাতুন	চট্টগ্রাম ও কলিকাতা
১৯২২	সহচর	(মাসিক)	সৈয়দ নওশের আলী, শাহাদাৎ হোসেন, মোহাম্মদ লুৎফর রহমান ইমদাদ আলী খান	কলিকাতা
১৯২২	শিশু সওগাত	(সাপ্তাহিক)		
১৯২২	ধূমকেতু	(মাসিক)	কাজী নজরুল ইসলাম	কলিকাতা
১৯২৩	ছোলতান	(সাপ্তাহিক)	মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ও সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (পরিচালক)	সিরাজগঞ্জ
১৯২৪	শরীয়ত	(মাসিক)	আহমদ আলী এনায়েতপুরী	কলিকাতা
১৯২৬	শরিয়তে-এসলাম	(মাসিক)	আহমদ আলী এনায়েতপুরী	কলিকাতা
১৯২৭	নওরোজ	(মাসিক)	মো: আফজাল-উল-হক	কলিকাতা
১৯২৭	শিখা	(বার্ষিক)	আবুল হোসেন ঢাকা কাজী মোতাহার হোসেন মোহাম্মদ আবদুর রশীদ ও আবুল ফজল	কলিকাতা
১৯২৭	তবলীগ	(মাসিক)	শেখ মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান	ফরিদপুর
১৯২৮	মোয়াজ্জিন	(ত্রৈমাসিক সাহিত্য	সৈয়দ আবদুর রব	কলিকাতা

		পত্রিকা)		
১৯২৮	জাগরণ	(মাসিক)	এম . আহমদ আলী	ঢাকা[৪২০]
১৯৩৩	বুলবুল	(ত্রৈমাসিক)	মুহম্মদ হবীবুলণ্ঢাহ ও বেগম শামসুন্নাহার	কলিকাত
১৯৪৯	আল্-ইসলাহ		মুহম্মদ নূরচ্ল হক	সিলেট[৪২১]
১৯৪৯	মাহে নও	(মাসিক)	তালিম হোসেন	ঢাকা
১৯৪৯	দিলরুবা	(মাসিক)	এ. এইচ. এম. আবদুল কাদের,	ঢাকা
১৯৪৯	নওবাহার	(মাসিক)	মাহফুজা খাতুন	ঢাকা
১৯৪৯	দ্যুতি	(মাসিক)	এ. কিউ. এম. মোসলেহউদ্দীন	ঢাকা
১৯৫০	তাহজিব	(মাসিক)	সৈয়দ আবদুল মান্নান (প্রকাশক)	ঢাকা
১৩২৪	(বাংলা) মস্জেদ (হানিফি)	(মাসিক)	মুনশী গোলাম রহমান সাহেব (প্রকাশক)	সাতক্ষীরা, খুলনা

‘বাঙালি মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদী চেতনা সৃষ্টির জন্য প্রকাশিত পাকিস্ড়ান আন্দোলনের মুখপত্র এবং অসাম্প্রদায়িক মানবতাবাদী চেতনার পৃষ্ঠপোষক সাহিত্যপত্রগুলোর কয়েকটি ত্রিশ ও চলিণ্ঢশের দশকে অনন্য সাধারণ ভূমিকা পালন করে। এগুলোর মধ্যে কর্মসূচি ও চিন্ড়াধারাতে মাত্রাগত প্রভেদ থাকলেও তখনকার সওগাত, মোহাম্মদী, মোয়াজ্জিন, আল-ইসলাহ, প্রায় গোটা পাকিস্ড়ানী আমল জুড়ে প্রকাশিত হয়।

আজাদী লাভের পরে পাকিস্ড়ান সরকারের অর্থ দফতর থেকে মাহেনও (এপ্রিল, ১৯৪৯, চৈত্র ১৩৫৫) প্রকাশের পর থেকে আরও একগুচ্ছ পত্রিকা এগুলোকে অনুসরণ করে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এদেশের সাহিত্য জগতকে সক্রিয় ও সরব করে তোলে। এই ধারার পত্রিকার দার্শনিক ভিত্তি ইসলাম এবং জিন্নাহর ‘দ্বিজাতিতত্ত্ব’। তবে বিভিন্ন সাহিত্যিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটকালে এঁদের মূল আদর্শের ক্ষেত্রে অভিন্নতা দেখা গেলেও বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে বৈচিত্র ছিল।’[৪২২]

---

[৪২০] . তাহমিনা আলম, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ ১৯০০-১৯৪৭* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯৮) পৃ. ৫-১২

[৪২১] . ড. মো: শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৪

[৪২২] . ইসরাইল খান, *বাংলা সাময়িক পত্র: পাকিস্তান পর্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

গবেষক তাহমিনা আলম বিংশ শতাব্দীর পত্র-পত্রিকায় নারীদের অবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করতে গিয়ে লিখেছেনঃ 'বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হতেই বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতনতার উদ্রেক হয় এবং সমাজে বাঙালি মুসলিম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের চিন্ড়্র-ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে মুসলমানদের সম্পাদনায় ইসলাম প্রচারক, নবনূর, মাসিক মোহাম্মদী, আল-এসলাম, সওগাত, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, সাধনা, আন্নেসা, সহচর, ধূমকেতু, শরিয়ত, শরিয়তে এসলাম, শিখা, তবলীগ, নওরোজ, মোয়াজ্জিন, জাগরণ, বুলবুল, নূর, ছোলতান, কোহিনূর, হেদায়াত, মোসলেম দর্পণ, আল-ইসলাহ প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় যেগুলির উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সসমাজের নারীর সার্বিক উন্নয়ন।'[৪২৩]

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালি মুসলমানের নিকট বই-পুস্ড়্ক এতটা সহজলভ্য ছিল না, যতটা সহজলভ্য ছিল পত্র-পত্রিকা। পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেই বাঙালি ইসলামী সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাধনা পাঠকের সামনে প্রচার করেছেন। উপরোলেণ্ডখিত পত্রিকাগুলো ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে ঐতিহাসিক ও গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে অবহেলিত বাংলার মুসলমানদের সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে পত্র-পত্রিকার ভূমিকার সাথে আর কোন কিছুর তুলনা হতে পারে না।

[৪২৩] . তাহমিনা আলম, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারীসমাজ*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮) পৃ. ৪,

চতুর্থ অধ্যায়

গুরচত্বপূর্ণ বইগুলোর সংক্ষিপ্ত সাহিত্যিক মূল্যায়ন

বিংশ শতাব্দীর শুরচতে ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর অসংখ্য বই-পুস্ড়ক রচিত হয় এবং এর ধারাবাহিকতায় পাকিস্ড়ান আমলে ও বর্তমান বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশনসহ আরও অনেক প্রকাশনাই ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপরে অগণিত বই-পুস্ড়ক প্রকাশ করছে। এর মধ্যে আরবী ও উর্দু ভাষা থেকে অসংখ্য অনূদিত বই-পুস্ড়কও রয়েছে। শুধু ইসলামিক ফাউন্ডেশনই ২০০৪ সাল পর্যন্ড় প্রায় তিন হাজার শিরোনামের পুস্ড়ক প্রকাশ করেছে। যার মোট ফর্মা সংখ্যা ঃ ৪৯২৩৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫,৫৮৬৭৪ এবং মুদ্রণ সংখ্যা ঃ ১, ১৭, ৪৬৭৫০ কপি। ‘পুস্ড়ক প্রকাশনা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের একটি চলমান কাজ। প্রায় প্রতিদিন নতুন নতুন পুস্ড়ক প্রকাশিত হচ্ছে।’[৪২৪] বাংলা একাডেমী থেকেও দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ও পরে অনেক ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে গুরচত্বপূর্ণ পাঁচটি গ্রন্থের মূল্যায়ন করার চেষ্টা করছি।

ইসলামী সাহিত্যের উপর নির্বাচিত পাঁচটি গ্রন্থঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ‘অনল প্রবাহ’, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ক. ‘ইসলামী কবিতা’, কাজী নজরচল ইসলাম

খ. ‘নজরচল ইসলাম’ ঃ ইসলামী গান

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ক. ‘ধর্ম জীবন’ ডাঃ লুৎফর রহমান

খ. ‘মানব জীবন’ ডাঃ লুৎফর রহমান

---

[৪২৪] . *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত পুস্তক তালিকা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ৪

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ 'অনল প্রবাহ', সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী

প্রকাশক: মুহাম্মদ মেহেরচলণ্ঢা, ছাতিয়ানতলা, যশোহর, মুদ্রক: মুহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ ঃ ২৯ শে জানুয়ারী, ১৯০১, পৃ. ৩৯, মূল্য-দুই আনা, গ্রন্থসত্ব ঃ প্রকাশক, ছাতিয়ানতলা, যশোহর।

অবিভক্ত বাংলার ঘুমন্ড় মুসলমানদের হৃদয়ে যে সমস্ড় বই-পুস্ড়ক জাগরণ সৃষ্টি করেছে, ব্রিটিশদের অপশাসন ও দুঃশাসনের বিরচদ্ধে মুসলমানদের আন্দোলিত করেছে, *'অনল প্রবাহ'* সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি রচনা। ১৮৯৯ সালে এ কাব্য গ্রন্থ বা পুস্ড়িকাটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। বাংলার মুসলমানদের ঘুম ভাঙ্গানোর ক্ষেত্রে এবং তাঁদেরকে দিয়ে ব্রিটিশদের বিরচদ্ধে বিপণ্ঢব সৃষ্টি করার কাজে সিরাজীর এ গ্রন্থ অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে।

সম্ভবত বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের মধ্যে সিরাজীই প্রথম ব্যক্তি যিনি মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জাগরণ মূলক গ্রন্থ লেখা ও প্রকাশ করার কারণে কারাবরণ করেছেন এবং ব্রিটিশদের রোষানলে পড়ে তাঁকে আমৃত্যু কষ্ট করতে হয়েছে। শিরাজী গবেষক হোসেন মাহমুদ বলেন: "উপমহাদেশে সিরাজীই প্রথম কবি, যিনি কাব্য রচনা করে রাজরোষের শিকার হয়ে কারাদন্ডে দন্ডিত হন।"[৪২৫]

'অনল প্রবাহ' গ্রন্থখানি ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করেন। অথচ বইখানি পড়লে দেখা যায়, তৎকালীন সরকারের বিরচদ্ধে বা হিন্দুদের বিরচদ্ধে এই বইয়ের মধ্যে তেমন কিছুই লেখা নেই। লেখক শুধু মুসলমানদের জাগরণের কথা বলেছেন। এ অজুহাতেই যদি ব্রিটিশ সরকার একটি বই বাজেয়াপ্ত করতে পারেন এবং এর লেখককে জেল দিতে পারেন; তাহলে এর থেকেই অনুমান করা যায় মুসলমানদের উপর ব্রিটিশ শাসকেরা কি পরিমাণ শোষণ করেছিল।

'অনল প্রবাহ' বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার সমস্ড় জেলা ও মহকুমার ছোট ছোট বই বিক্রয় কেন্দ্র থেকেও *'অনল প্রবাহ'*এর কপি জব্দ করে নিয়ে নেন।[৪২৬] কিন্ড়ু এই সময়ের মধ্যে এই বইখানা

---

[৪২৫] .হোসেন মাহমুদ, *বাঙালি মুসলমানদের আলোকবর্তিকা ও অন্যান্য প্রবন্ধ*, প্রাগুক্ত, পৃ.২৩

[৪২৬] .কলকাতার তৎকালীন চিফ প্রেসিডেন্সি মেজিস্ট্রেট ডেভিট সুইনহো ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ই সেপ্টেম্বর 'অনল প্রবাহ' বই লেখা ও প্রকাশের কারণে তাঁকে দুই বছর কারাদন্ড দেন ও তাঁর বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। আত্মগোপনে থাকা সিরাজীকে গ্রেফতার করার জন্য ৫শ টাকা ঘোষণা করা হয়। পরে তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন এবং দুই বছর জেল খাটেন।

শিক্ষিত মুসলমানের মনে আগুন ধরিয়ে দেয়। সরকারের গুপ্তচরের অগোচরে এই বই মুসলমান যুবকরা পড়তে থাকে। শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক লিখেছেন: "শিরাজী সাহেবের '*অনল প্রবাহ*' বাজেয়াপ্ত হইবার পরে, লোহার সিন্দুকে আটকাইয়া রাখিয়া আবার রাত্রিতে বাহির করিয়া বারে বারে পাঠ করিয়াছি, অন্ড়রে ঐতিহাসিক অনুপ্রেরণা অনুভব করিয়াছি।"[৪২৭]

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন: "শিরাজী ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। তাঁহার সমগ্র জীবনই ছিল অনলপ্রবাহ, আমার রচনা সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রকাশ।" [৪২৮] এই জন্যই একজন গবেষক বলেছেন: 'অনলপ্রবাহ' ও 'অগ্নিবীণা'র মর্মমূলে টোকা দিলে একই সুর বাজে।'[৪২৯]

'অনলপ্রবাহ' কাব্যখানি লেখার পর তিনি ইসলামের গৌরব ও ভবিষ্যত মুসলমান যুবকদেরকে তা উৎসর্গ করেছেন। মুসলমানদের অলস ও নির্জীব জীবন সিরাজীকে আহত করেছে এবং ইসলামের পুনরুত্থানের ও সংস্কারের চেতনায় তিনি মুসলিম জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। মুসলমান যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেম, স্বাধীনতা ও ইসলামী মূল্যবোধ সৃষ্টি ও ঘুমন্ড় যুবকদেরকে জাগিয়ে তুলতে তিনি উৎসর্গ পাতায় লিখেন:

"ইসলামের গৌরবের বিজয় কেতন
হে মোর আশার দীপ নব্য যুবগণ!
মোসলেমের অভ্যুত্থানে
ইসলামের জয়গানে
আবার লভুক বিশ্ব নূতন জীবন।
জাগাতে অতীত স্মৃতি
জাগাতে জাতীয় প্রীতি

১৯১০ সালে বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর 'অনল প্রবাহ' দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে। ১৯৪৭ সালে উপমহাদেশ বিভক্ত হওয়ার পর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ৪৩ বছর পর তৎকালীন সরকারের অনুমোদনক্রমে অনল প্রবাহ পুন: প্রকাশিত হয়। (.হোসেন মাহমুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪)

[৪২৭] .শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক, ''গৌরবের মশাল হারাইয়াছি'', *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী* , হোসেন মাহমুদ সম্পা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩) পৃ. ৩

[৪২৮] . আব্দুল মান্নান সৈয়দ, *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

[৪২৯] . মুজীবর রহমান খাঁ, *শিরাজী ও অনল প্রবাহ*, হোসেন মাহমুদ সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২০

অনলপ্রবাহ খানি করিয়া রচন,
বড় আশে বড় সাধে,
দিনু তোমাদের হাতে
হউক অনলময় অলস জীবন।
আবার উত্থান লক্ষ্যে,
বহাও জগত বক্ষে
নব-জীবনের খর প্রবাহ পণ্ঢাবন।
আবার জাতীয় কেতু,
উড়াও মুক্তির হেতু
উঠুক গগনে পুন রক্তিম তপন।"[৪৩০]

'অনল প্রবাহ'

'অনল প্রবাহ' কাব্যের প্রথম কবিতার নামও 'অনল প্রবাহ'। ৭৪ টি স্ড়বকে বিভক্ত এই কবিতাটি। তাঁর শুরচটাই ছিল আবেগময়ী। ভারতবর্ষের মুসলমানদের জাগরণ ও স্বাধীনতা অর্জনের আহ্বান জানিয়ে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী তাঁর ঐতিহাসিক কাব্যগ্রন্থ 'অনল প্রবাহ' লেখা শুরচ করেন। স্বাধীনতার আগুন যাদুর মত উচ্চারিত হল তাঁর এই কাব্য গ্রন্থে। পাঠক মাত্রই তাঁর লেখায় আকর্ষণ বোধ করবেন, সন্দেহ নেই। তিনি বলেনঃ

"আর ঘুমিওনা নয়ন মেলিয়া
উঠরে মোসলেম উঠরে জাগিয়া
আলস্য জড়তা পায়েতে ঠেলিয়া,
পূত বিভু নাম স্মরণ করি।
যুগল নয়ন করি উন্মীলন,
কর চারদিকে কর বিলোকন,
অবসর পেয়ে দেখ শত্রচগণ,

৪৩০ . আবদুল কাদির সম্পা. *শিরাজী-রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৩) পৃ.৪৪৩

করেছ কীদৃশ অনিষ্ট সাধন,

দেখরে চাহিয়া অতীত স্মরি।"[৪৩১]

দীর্ঘ এই কবিতাটির মাঝে মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য, হারানো সোনালী যুগ ইত্যাদির কথা তিনি ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আত্মবিস্মৃত মুসলমানদের মনে সিরাজীর এই কবিতা আত্মপ্রত্যয় ফিরিয়ে এনেছে। হারানো ঐতিহ্যকে কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় সেই পথও তিনি বাতলিয়ে দিয়েছেন। হিন্দু জাতি অল্পসময়ের মধ্যে কিভাবে উন্নতির শিখরে আরোহণ করেছেন, তাও তিনি তাঁর কাব্যে উলেণ্টখ করেছেন এবং একই সাথে ভারতবর্ষের মুসলমানরা বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের ভয়ঙ্কর পরিণতি দেখে তিনি দুঃখ বোধ করেছেন। তাঁর ভাষায়ঃ

"দেখরে চাহিয়া কত নীচ জাতি,

তারাও জ্বালিছে উন্নতির ভাতি

তারাও ছুটিছে কিবা দ্রূতগতি,

নবীন উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া।

সহস্র বর্ষের পতিত দলিত,

শতধা বিচ্ছিন্ন ঘোর অবনত

অই হিন্দু জাতি হয়ে একমত,

সাধিতেছে কিবা মহা অভ্যুত্থান"[৪৩২]

কিন্তু মুসলমানদের দুর্দশা দেখে তিনি বড় মর্মাহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অলসতা ও কুসংস্কার দেখে তিনি লিখেছেনঃ

"কিন্তু হয়ে তোরা বীর কুলোদ্ভব,

আজি যেন হায়! মৃতপ্রায় সব,

উচ্চ লক্ষ্য আশা উন্নত ধারণা,

[৪৩১] . সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, *অনল প্রবাহ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪) পৃ. ২৩

[৪৩২] . সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

বিসর্জন দিয়া উন্নত কল্পনা

হয়েছে অধম ঘৃণিত হীন।”[৪৩৩]

তারপর লেখকের আফসোস আর দুঃখবোধ চলতে থাকে পরবর্তী পংক্তিগুলোতে। যেই মুসলমানরা পৃথিবীকে প্রায় একহাজার বছর শাসন করলো এবং এই ভারতবর্ষও মুসলমানদের দানে পৃথিবীতে পরিচয় লাভ করলো; সেই পবিত্র স্থানে মুসলমানদের দুরবস্থা দেখে তিনি লেখেনঃ

“যে জাতি জগতে আলো ছড়াইল,

বীরদাপে যার ভুবন কাঁপিল,

জগৎ যাঁদের চরণে লুটিল,

তাঁরা আজি বিশ্বে ঘোর হতমান!

যাও দেশে দেশে কর দরশন

আছে কত কীর্তি ধরণী শোভন

মিনার মসজিদ প্রাসাদ, ভবন

দুর্গ, গড়খাই, সেতু, উপবন

কত বিদ্যালয়, কত শিল্পশালা,

দীঘি সরোবর কত খাল নালা,

হইয়াছে এবে ভগ্ন জীর্ণ অস্ণ্ঢান।”[৪৩৪]

মুসলমানদের অতীত ইতিহাস ভুলে শতবর্ষ যাবৎ ভারতবর্ষে তারা ঘুমিয়ে আছে। তাদের মর্যাদা, জ্ঞান-গরিমার কথা ভুলে তারা ভারতবর্ষের অবহেলিত ও পতিত জাতিতে পরিণত হয়েছে। পবিত্র কুরআন আজ আর তাদের স্মৃতিতে নেই। নেই মুসলমানদের একতা ও ভ্রাতৃত্ব বোধ। তাই কবি দুঃখ করে লিখেছেনঃ

“দেখ একবার ইতিহাস খুলি,

কত উচ্চে তোরা অধিষ্ঠিত ছিলি,

তথা হতে হায়! কেন রে পড়িলি,

---

[৪৩৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৪৩৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

নয়ন মেলিয়া দেখ এক বার।

বিস্মৃত হইয়া পবিত্র কোরান,

হারায়ে একতা হারায়ে বিজ্ঞান,

হায়রে ! এখন হয়ে হীন প্রাণ,

এ বিশ্ব সংসার দেখিস্ আধার!"[৪৩৫]

হযরত ওমরের শাসনামল থেকে মুসলমানরা প্রায় অর্ধপৃথিবীতে শাসন করেছে। আটলান্টিক থেকে প্রশান্ড় মহাসাগর পর্যন্ড় মুসলমানদের একচ্ছত্র অধিকার ছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানেও তাঁদের ভূমিকা ছিল পৃথিবীর সব জাতির চেয়ে বেশি। ইউরোপবাসী সেই সময়ের মুসলমানদের নিকট জ্ঞানের জন্য ঋণী ছিল। আর আজ ভারতের মুসলমানদের কি করচ্প দশা! তারা কি হীন ও নীচ জাতি! কবি তাঁর স্বগোত্রীয় ভাইদের সাহস দিয়ে বলেনঃ

"অতীতের দিকে দেখ চেয়ে হায়!

তোরাই ছিলিরে প্রধান ধরায়,

তোদের চরণ সেবিত সবায়,

কৃতাঞ্জলি পুটে বিনত-শিরে।

আটলান্টিক হতে প্রশান্ড় সাগর,

তোরাই ইহার ছিলি একেশ্বর,

তোদের প্রতাপে থর থর থর,

কাপিত বসুধা অতীপ অধীরে।"[৪৩৬]

পৃথিবীর মানুষ আবার দেখুক মুসলমানরা তাঁদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে পাওয়ার উদ্দেশ্যে আবার জেগে উঠেছে। অলসতা ও জড়তা দূর করে কর্তব্য সাধনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে অবিভক্ত বাংলার মুসলমানদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেনঃ

"জাগ্ তবে সবে জাগ্ একবার

[৪৩৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৪৩৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

গভীর নিনাদে ছাড়িয়া হুঙ্কার

আলস্য জড়তা করি পরিহার,

কর্তব্য সাধনে ধাওরে সবে।

দেখুক জগত বিস্ময়ে চাহিয়া

সুষুপ্ত মোসলেম শয়ন ত্যজিয়া

উঠিল যুগল নয়ন মেলিয়া

রাখিল প্রধান বিপুল ভবে।"[৪৩৭]

ইবনে সিনা, ইমাম গাযালী, আলবেরুনী, সালাউদ্দীন আইউবী তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানী-গুণীদের শিক্ষক হিসেবে পরিচিত। তাঁদের উত্তরসুরি হয়েও মুসলমানদের কি দুরবস্থা! দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প-বাণিজ্য, সমরদক্ষতা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমানদের যে গৌরবময় ভূমিকা ছিল সে কথা মুসলমানদের তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। সমুদ্রে বাণিজ্য প্রথা মুসলমানরাই প্রচলন করেন। কবি মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলেনঃ

"কোথা দর্শনের তত্ত্ব আলোচনা?

কোথা বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম গবেষণা?

চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোথা সে সাধনা?

সকলি কি সেই অতীত গরভে ?

কোথা হায়! সেই শিল্পে নিপুণতা?

কোথা হায়! সেই সমর দক্ষতা?

কোথা শত্রুপাতে ঘোর প্রমত্ততা?

বাণিজ্য গৌরব কোথায় এবে!"[৪৩৮]

আর আজ মুসলমানরা তাঁদের ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিয়ে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ভারতবর্ষে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। কবি বড় আফসোস করে বলেনঃ

---

[৪৩৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

[৪৩৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

"যে সকল জাতি ছিলরে গোলাম,

তাদের কাছেও আজি হতমান,

ভূনত জানুতে অবনত শিরে,

থাকিত যাহারা তোদের অবনত শিরে,

থাকিত যাহারা তোদের হুজুরে,

তোরাই আজি রে তাহাদের দ্বারে

দাঁড়াইয়া দীন ভিখারী সাজে।"[৪৩৯]

কবির দুঃখের শেষ নেই। তাঁর অন্ড়রে বড় বেদনা। মুসলমানরা কেন আজ এই দুর্দশাগ্রস্থ। কবি আরও দুঃখ করে বলেনঃ

"সম্রাটের জাতি ভিখারী সমান।

আহা কি দুর্দশা ফেটে যায় প্রাণ

কি বিষম লাজ ! কি যে অপমান

দেখ একবার দেখরে ভেবে।

তোরাই ছিলেরে ধরার প্রধান,

কোন জাতি ছিল তোদের সমান?

তোদের সভ্যতা বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান,

লয়ে এ জগত উন্নতি এবে।"[৪৪০]

বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের অতীত অবদান সম্পর্কে কবি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। অমুসলিম পন্ডিতগণ আজ বিশ্বসভ্যতায় মুসলমানদের অবদানের কথা স্বীকার করতে চান না। মুসলমানরাও তাঁদের অতীত গৌরব ভুলে গেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানবজাতির উন্নয়নে মুসলমানরা যে অবদান রেখেছেন তা তিনি আমাদের সামনে সংক্ষেপে তুলে ধরেছেন এইভাবেঃ

"পারস্যের অগ্নি তোমরা নিভালে,

---

৪৩৯ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

৪৪০ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

ভারতের মূর্তি তোমরা ভাঙ্গিলে,

চীনের নাস্ড়িক্য তোমরা তুলিলে

য়ুরোপের ত্রিত্ব তোমরা নাশিলে

জড় উপাসনা তোমরা ভস্মিলে।

নাশিলে তোমরা ঘৃণ্য ব্যভিচার,

জাতিভেদ প্রথা করিলে সংহার,

মদ-বেশ্যা-সুদ করিলে ছারখার,

আর কত পাপ বিদূর করিলে।"[৪৪১]

কি কি কাজের মাধ্যমে মুসলমানরা বিশ্বসভ্যতায় ভূমিকা রেখেছেন এবং সমসাময়িককালে বিভিন্ন ধর্মের লোকজন মুসলমানদের মানব সেবা ও মানবীয় গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্ড়রিত হয়েছেন, কবি চমৎকার ভাষায় তা উলেণ্ঢখ করেছেনঃ

"তোমরা স্থাপিলে একত্ব বন্ধন,

সত্যের মহিমা করিলে ঘোষণ,

বিদ্যার আলোক কৈলে বিতরণ.

ভ্রাতৃপ্রেম মত্ত করিলে ভুবন,

নারীর মর্যাদা করিলে স্থাপন;

সাজালে ধরায় স্বর্গীয় ভূষণে।

কোটি কোটি কোটি খ্রীষ্টান নাস্ড়িক

কোটি কোটি কোটি বৌদ্ধ পৌত্তলিক,

ছাড়িয়া স্বধর্ম (অসার অলীক)

গ্রহিল ইসলাম একাগ্র মনে।"[৪৪২]

এবার কবি মুসলমানদের সাহস ও উৎসাহ দিয়ে বলেনঃ

---

[৪৪১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

[৪৪২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

"কি ভয় ওরে মোসলেম নন্দন
চেষ্টায় অলভ্য আছে কোন ধন?
বিদ্যা উপার্জনে দেহ প্রাণ মন,
সৌভাগ্য তপন উদিত হবে।
জাতীয় উন্নতি সাধন করণ
উৎসর্গ করবে স্বকীয় জীবন
হবে ধন্য মান্য মানব জনম
চিরদিন বিশ্বে অমর রবে।
বল্ বল্ ওরে মোসলেম নন্দন,
কেন রে তোদের মলিন বদন?
কেনরে তোদের নিষ্প্রভ নয়ন?
কেনরে তোদের হতাশ জীবন?
কেনরে তোদের লাঞ্ছনা বিষম?
জাতীয় জীবন আঁধার কেন?"[৪৪৩]

মুসলমানদের মধ্যে যে ছোট খাটো ভুল-ভ্রান্ড়ি আছে তা ভুলে গিয়ে সবাইকে একতাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন কবি। ভারতবর্ষে মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে তর্কযুদ্ধ নিজেদের ঐক্য ও একতাকে পদধূলিত করেছে বার বার। মুসলমানদের মধ্যে একদল আরেকদলকে এই অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে তাঁদের সমাজের উন্নতিকে ব্যাহত করেছে। কবি দুর্বল এই মুসলিম জাতিকে এগুলো ছেড়ে দিয়ে জাতির উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। কবির ভাষায়ঃ

"মজ্হাব গঠন দাওরে ছাড়িয়া,
সব এক হও মিলিয়া মিশিয়া,
'হানিফী' 'ওহাবী' ফেলরে ভাঙিয়া
তুচ্ছ মতানৈক্য দাও জ্বালাইয়া

[৪৪৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

আপনি উন্নতি হইবে দাসী।"[৪৪৪]

মুসলিম দেশে দেশে প্রাচীন ঐতিহ্য ও কীর্তিকাহিনী স্মরণে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠত। তিনি তাঁর লেখায় ঐতিহাসিক ইসলামকে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। তাঁর লেখায় মূলত ইসলামের সর্বজনীন রূপ ও গৌরবকীর্তি ফুটে উঠেছে। তাঁর 'অনলপ্রবাহে' ইসলামের সৌন্দর্য বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কবি অত্যন্ড়আবেগের সাথে তাঁর ভাব তুলে ধরেছেনঃ

"কোথায় তোদের বিজয় বাহিনী?
কোথায় তোদের গৌরব কাহিনী?
এল কি ঘোর আঁধার যামিনী।
দেখি না গৌরব আলোক রেখা।
পাঠানের তেজ মোগল বিক্রম,
ইরানের চারচ বিলাস বিভ্রম,
আরবীর সেই প্রতাপ প্রচ
কোথা তাহার সভ্যতা মার্ত
কিছুই আর যায় না দেখা ।
কোথা সে বাগদাদ কায়রো গজনী
কোথায় কর্ডোভা য়ুরোপের মণি,
কোথায় গ্রানাডা দিলিণ্ঢ ইস্পাহান
কোথা সমরখন্দ আর কারোয়ান
সকলেরে আজি আঁধার হায়?"[৪৪৫]

সিরাজী তাঁর 'অনলপ্রবাহ' কবিতার শেষাংশে সকল ভুল-ভ্রান্ড়ি পেছনে রেখে মুসলমানদের জেগে উঠার আকুল আবেদন জানিয়ে এই কবিতার শেষ স্ড়বক লেখেনঃ

"জাগ তবে সবে জাগ এই বেলা

---

[৪৪৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

[৪৪৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

সাবধান ! আর করিস্ না হেলা,

দেখ চারিদিক হইয়াছে আলা

জাগ তবে তোরা নয়ন মেলি।"[৪৪৬]

'তূর্যধ্বনি'

ব্রিটিশদের লুটতরাজের বিরূদ্ধে ঘুমন্ড় মুসলমানদের মধ্যে চেতনা সৃষ্টি করা, প্রচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য স্মরণের মাধ্যমে তাঁদেরকে আবার স্বজাতির উন্নয়নে আন্দোলিত করা ইত্যাদি ভাবনা নিয়ে তিনি 'তূর্যধ্বনি' কবিতাটি লিখেন। কবি তাঁর কাব্যে সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যের দুরবস্থার কথাই তুলে ধরেছেন। কবির ভাষায়ঃ

"হে মোসলেম! কতকাল, মোহঘুমে রহিবে পড়িয়া,

বারেকের তরে কিহে উঠিবে না নয়ন মেলিয়া ?

তোমারে নিদ্রিত দেখি, মহানন্দে তস্করের দল,

লুটিয়া লইল তব উদ্যোনের চারচ ফল!

বিশাল সাম্রাজ্য তব পূর্ব হতে পশ্চিম অবধি

যাভা ও সুমাত্রা হতে, বহে যথা কুইভার নদী!

ইসলাম জননী আজি সাজি, হায় ! দীনা কাঙ্গালিনী,

চাহিয়া তোদের পানে, অশ্রচ্ধারে ভাষায় মেদিনী !"[৪৪৭]

ভারতবর্ষ নিয়ে কবি সবচেয়ে বেশি আফসোস করেছেন, কারণ এটি তাঁর মাতৃভূমি। এখানে ইসলামের আগমণ থেকে হাজার বছর পর্যন্ড় এর প্রভাব ছিল সমাজের প্রতিটি স্ড়রে। কিন্তু আজ আর সেই প্রভাব নেই। ভারতবর্ষে মুসলমানদের দুর্দশা ও পতন দেখে কবি খুবই মর্মাহত। কবির ভাষায়ঃ

"বিশাল ভারতবর্ষ, প্রকৃতির রম্য উপবন,

সুজলা সুফলা ভূমি, ঐশ্বির্যের মহা নিকেতন

[৪৪৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[৪৪৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

Dhaka University Institutional Repository

সহস্র বরষ যথা উড়েছিল তোমার কেতন

ইসলাম জননী মুখে, নাহি হাসি ঝরে অশ্রুধার,

হে মোসলেম! চেয়ে দেখ কি ভীষণ দুর্দশা তোমার।"[৪৪৮]

প্রায় শতবর্ষ আগের কবির ভাবনা আজো মুসলিম বিশ্বে বর্তমান। চারি দিকে ইহুদী ও নাসারা শক্তি মুসলিম বিশ্বে আজও যেভাবে আক্রমণ করছে তাতে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলেই প্রতীয়মান হয়। মুসলমানদের মধ্যে আজও জাগরণ সৃষ্টি হয় নি। তাদের ঘুম ভাঙ্গে নি। কবি দুঃখভারাক্রান্ড় হৃদয়ে বলেনঃ

"দাসত্ব-শৃঙ্খলে হায় ! মোসলেমের করিতে বন্ধন,

বিশ্ব হতে ইসলামের সমূলে করিতে উৎপাটন,

চলিতেছে ষড়যন্ত্র, দস্যু দলে কি ঘোর ভীষণ,

মোসলেম জগত তাহা, না দেখিলে মেলিয়া নয়ন!!"[৪৪৯]

মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী জাতি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের দুর্দশা দূরীকরণে সকলের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। অবহেলিত ও বঞ্চিত মুসলমানদের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন তিনি। এ জন্য অলসতা ও জড়তা দূর করে মুসলমানদের পরিশ্রমী হওয়ার প্রতি গুরচত্বারোপ করেন তিনি। তাঁর আকুল আবেদনঃ

"কি ঘুমে ঘুমালি তোরা আর নাহি উঠিলি জাগিয়া।

সকলি খোয়ালি তোরা, নিদ্রাবশে সময় কাটিয়া!"

"হে মোসলেম! একবার নিদ্রা হতে করি গাত্রোত্থান,

পূরব পশ্চিম জুড়ি সকলেরে করহ আহ্বান।

ইসলাম কংগ্রেস এক সবে মিলি করিয়া স্থাপন,

উদ্ধার করহ তব দস্যু-হৃত স্বর্ণ সিংহাসন।

উড়ূক অম্বরে পুন ইসলামের বিজয় কেতন,

[৪৪৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

[৪৪৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

দিকে দিকে উঠুক রে, 'আলণ্ঢাহু প্রমত্ত গর্জন'।"[৪৫০]

'মূর্ছনা'

নতুন প্রজন্মের মুসলমানদের উৎসাহ-উদ্দীপনা দিয়ে তাঁদের অতীত ইতিহাস জানানোর চেষ্টা করেছেন কবি তাঁর 'মূর্ছনা' কবিতায়। পৃথিবীতে মুসলমানরা ছিল বিজেতা জাতির প্রধান, যাঁদের ডাকে সমস্ড় পৃথিবী কেঁপে ওঠত এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে যাঁদের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি; বেদীন-নাসারা কর্তৃক তাঁরা আজ ঘৃণিত, লাঞ্চিত ও অপমানিত। সিরাজী তাঁদের উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

"তোমরা কি সেই মোসলেম-সন্ড়ান ?
ধরণী বিজেতা জাতির প্রধান,
যাহাদের দর্পে ভুবন কাঁপিল,
জ্ঞানালোকে যারা ধরা উজলিল।
যাদের অধীন ছিল সর্ব জাতি,
ফিরিত যাহার বীর দর্পে মাতি !"[৪৫১]

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিমের দাঙ্গার কারণে ১৯৪৭ সালে এ ভূ-খন্ড দুইভাগে ভাগ হয়ে যায়। এখনও এ উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা স্নায়ু যুদ্ধ চলছে। অথচ হাজার বছর মুসলমানরা ভারতবর্ষকে শাসন করেছে; ভারতীয়দের মধ্যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ তাঁরা দেয় নি। হিন্দু-মুসলিম, আর্য-অনার্য সকলেই সমান অধিকার এ ভারত ভূ-খন্ডে ভোগ করেছেন। মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে হিন্দুদের কোন অভিযোগ ছিল না। মুসলিম শাসকদের নিকট হিন্দু-অহিন্দু সকলেই ন্যায় বিচার পেয়েছে। সকলের উন্নয়নের জন্যই মুসলিম শাসকবৃন্দ কাজ করেছেন। কবি সেই কথাই আবেগের সাথে বলার চেষ্টা করেছেনঃ

"সহস্র বরষ সূচী পরাক্রমে
শাসিল যাহার এ ভারত-ভূমে।
ভারতে অনার্য আর্য্য হিন্দুগণে
দিয়া শিক্ষা দীক্ষা পরম যতনে

[৪৫০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১-৬২
[৪৫১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

সভ্য ভব্য করি অনুগত জেনে

শাসিল যাহারা হরষিত মনে।"[৪৫২]

সিরাজী অত্যন্ড় দুঃখের সাথে মুসলিম জাতির অধঃপতনে তাঁর মনের আকুতি বর্ণনা করেনঃ

"সিংহের ঔরষে লভিয়া জনম

হয়েছিস হায় ! শৃগাল অধম।"[৪৫৩]

'মিশরের অভ্যুত্থানে'

এই কবিতায় সিরাজী যে কতটা ইতিহাস জ্ঞানী ছিলেন, তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়। মিশরবাসীর উদ্দেশ্যে লিখিত এই কবিতার মাধ্যমে বাংলার মুসলমানকে উজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন কবি। ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে মুসলমানরা যেন আবার জেগে ওঠে এটাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্যঃ

"সহস্র বৎসর করি জগৎ শাসন,

ন্যায় ধর্ম বীর্যে করি আদর্শ স্থাপন,

বিজ্ঞানের আলোচনা

দর্শনের গবেষণা

সাহিত্য সঙ্গীত কাব্য কলার উন্নতি,

করিয়া লভিয়াছিল বিশ্রাম বিরতি।"[৪৫৪]

মুসলমানদের শত্রচ কাফের-বেদীনদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে তাদের সাথে জেহাদ করার আহ্বান জানিয়ে কবি বলেনঃ

"ইসলামের চিরশত্রচ কাফের শোণিতে

পিপাসু-কৃপাণ তৃষ্ণা মিটাও সুখেতে,

চির অরি দৈত্য বংশ

করহ তাহারে ধ্বংস

[৪৫২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

[৪৫৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

[৪৫৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

ডুবাও পাষন্ডগণে ভূমধ্যের জলে,

জীবন্ড় প্রোথিত কর কিম্বা ভূমিতলে।”[৪৫৫]

মুসলিম বীর সালাউদ্দীনের নাম স্মরণ করে কবি তাঁর স্বজাতি মুসলিম ভাইদের উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করেছেন এইভাবেঃ

“সালাউদ্দীনের সেই বিক্রম ভীষণ,

জ্বলুক হৃদয়ে যেন কাল হুতাশন!

তোমার বিজয় দৃশ্যে

আবার বিপুল বিশ্বে

জাগুক্‌রে মুসলমান আরব আজমে,

পড়ুক রে জয়ধ্বনি এ ভারত ভূমে।”[৪৫৬]

ভারতবর্ষের মুসলমানদের স্বাধীনতা নিয়ে কবির যে ভাবনা ছিল তা বাস্ড়বায়ন করতে হলে মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বলেনঃ

“বিনা জলে তরচলতা হয় না বর্ধিত,

বিনা রক্তে স্বাধীনতা নহে অঙ্কুরিত।”[৪৫৭]

ইসলামের জয়, মুসলমানদের জয় চেয়েছেন তিনি তাঁর এই কবিতার শেষাংশে। কবির ভাষায়ঃ

“ইসলামের জয় কেতু উড়ুক গগনে,

আলণ্ঢাহু ধ্বনিত হোক সমগ্র ভুবনে”[৪৫৮]

‘উন্মেষণা’

কবি ভারতবর্ষে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় শঙ্কিত ছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধের আগেই। যা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে বাস্ড়বে রূপ নিয়েছিল। কবি বলেছেন স্পেনে মুসলমানদের যে দুর্দশা হয়েছিল ভারত ভূমিতেও সেই দুর্দশা হতে পারে। সত্যিই, দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য ভারতবর্ষে দ্বিতীয়

[৪৫৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

[৪৫৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[৪৫৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

[৪৫৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

মহাযুদ্ধের পর থেকে মুসলমানদের দুর্গতির অন্ড় নেই। কবির সেই সময়ের উচ্চারণ আজও কত বাস্ড়বঃ

"ওরে মূর্খ মুসলমান !
আছিস রে কি ভাবে মগন,
বাঁচিতে চাহিস যদি
জাগ তবে জাগরে এখন।"
"তাহা না হইলে তোরা
কিছুতেই নারিবি টিকিতে,
ঘটিবে স্পেনের দশা
পুনরায় ভারত ভূমিতে।
দুর্বল অধম জাতি
বিশ্ব হইতে বিলুপ্ত হইবে,
প্রবল প্রচ= জাতি
সৌভাগ্যে আসনে বসিবে।
পুন বলি সাবধান
হও ত্বরা যত মুসলমান,
শক্তি ভিন্ন না পাইবি
কিছুতেই আর পরিত্রাণ।"[৪৫৯]

'স্পেনের প্রতি'

জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্পেনের দানের কথা কে না জানে। সেই স্পেন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শীর্ষে পৌঁছেছিল মুসলিম শাসনামলে। আজকের ইউরোপ স্পেনের মাধ্যমে মুসলমানদের নিকট ঋণী। সেই সময়ে ইউরোপ থেকে জ্ঞানপিপাসুরা স্পেনে এসে ভিড় জমাতো। আর আজ মুসলমানদের কি দুর্গতি! কবি সেই কথাই বলতে চেয়েছেন তাঁর 'স্পেনের প্রতি' কবিতায়ঃ

[৪৫৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২-৯৪

জ্ঞান-বিদ্যা-বিমন্িত তোমার সন্ড়ন,

যাদের চরণতলে আনন্দে বসিয়া

অসভ্য অজ্ঞান মূর্খ বর্বর খ্রীষ্টান,

ইসলামের সভ্যতা ও জ্ঞান আহরিয়া,

হয়েছে ধরায় এবে সুসভ্য প্রধান,

কোথায় তোমার আজি সেসব নন্দন!

কোথায় তোমার আজি বিজয় নিশান!”[৪৬০]

গ্রানাডা, কর্ডোভা ও টলেডো ইত্যাদি শহর মুসলমানদের হাতে সুসজ্জিত হয়েছিল। সমগ্র বিশ্ববাসী এ শহরগুলোর গুণকীর্তন করতো। যা মুসলমানদের সৃষ্টি। কিন্তু মুসলমানরা আজ তাঁদের নিজেদের ইতিহাসও ভুলে গেছে। এমন আত্মভুলা জাতি হচ্ছে মুসলমান। এই জন্যই কবি ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেনঃ

“নগরীকুলের রাণী গ্রাণাডা কোথায় ?

কোথায় কর্ডোভা আহা! বিশ্ব অভিরাম ?

টলিডো সেভিল কোথা শিল্পের আলয় ?

কোথায় সে ভালেন্সিয়া বাণিজ্যের স্থান ?

কোথায় সে গ্রাণাডার আলহামরা প্রাসাদ ?”

“লো হিস্পান! মোসলেমের সাধের উদ্যান

দহিছে তোমার স্মৃতি জ্বলন্ড়ে শিখায়,

করিবে বিধাতা কবে কল্যাণ বিধান

দুঃখ নিশি সুপ্রভাত কবে হবে হায়!

নিদ্রিত মোসলেম কবে উঠিবে জাগিয়া,

মেলিয়া যুগল আঁখি সিংহের মতন,

আলণ্ঢাহু আকবর আঁখি পৃথ্বী কাঁপাইয়া

---

[৪৬০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

পূর্ব অধিকার পুন করিবে গ্রহণ ?"[৪৬১]

'অভিভাষণ'

ইসমাইল হোসেন শিরাজী ছিলেন মূলত যুবকদের উৎসাহ দাতা ও অনুপ্রেরণাদাতা। তাঁর বিশ্বাস ছিল দেশের যুব শক্তি জাগলেই জাতি জাগবে। একমাত্র যুবশক্তিই পারে ভারতবর্ষকে ইংরেজদের হাত থেকে উদ্ধার করতে এবং পতিত মুসলিম বিশ্বকে মুক্তি দিতে। যুবশক্তির মাধ্যমেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা এসেছে। তাই যৌবন শক্তিকে জাগরণের ডাক দিয়ে তিনি বলেনঃ

"আশার তপন নব্য যুবগণ!
সমাজের ভাবী গৌরব-কেতন।
তোমাদের পরে জাতীয়-জীবন
তোমাদের পরে উত্থান পতন,
নির্ভর করেছে জানিও সবে।
তোমরা জাগিলে সমাজ জাগিবে,
তোমরা মরিলে সমাজ মরিবে,
তোমাদের পদচিহ্ন অনুসরি,
চলিবে আবার সমাজের তরী।
তোমাদের ধর্ম, তোমাদের কর্ম,
তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের মর্ম,
সবাই গ্রহণ করিবে!"[৪৬২]

'মরক্কো সঙ্কটে'

মুসলিম বিশ্বের যুবকদের জেহাদের প্রতি অনুপ্রেরণা দিয়ে কবি 'মরক্কো সঙ্কটে' কবিতাখানি লেখেন। শিরাজীর কাব্য, সাহিত্য ও উপন্যাস ইত্যাদির মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের কল্যাণ করা। শিরাজীর অনল প্রবাহকে তাঁর সমস্ড় রচনার চাবিকাঠি বলে কেউ কেউ উক্তি করেছেন।[৪৬৩] তিনি যেমন স্বজাতি

[৪৬১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০১
[৪৬২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩
[৪৬৩] . মুজীবর রহমান খাঁ, শিরাজী ও অনল প্রবাহ, হোসেন মাহমুদ সম্পা. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১

ও স্বদেশ নিয়ে চিন্ড়া করেছেন, তেমনি বিশ্ব মুসলমানদের দুরবস্থা দূরীকরণেও চেষ্টা করেছেন। কবি উলেণ্টখিত কবিতায় তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন এইভাবেঃ

গাজী ভিন্ন কোন জন এ যুগে পাবে না ত্রাণ,

প্রাণ দানে অশক্ত যে, -সেত নহে মুসলমান।

কোথা পিতামহগণ ! কর আজি দরশন,

লুপ্ত হয় বিশ্ব হতে ইসলামের সিংহাসন।”[৪৬৪]

‘দীপনা’

‘অনলপ্রবাহে’র একেকটি কবিতা যেন অন্যায় ও অত্যাচারের বিরচদ্ধে একেকটি বুলেট-বোমা বা এটম বোম। একেকটা কবিতার ছন্দ যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। দখলদার ব্রিটিশ বাহিনীর অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুমের বিরচদ্ধে সমসাময়িক কালে খুব কম কবি সাহিত্যিকই কথা বলেছেন। সারা দুনিয়ার মুসলমানদের উপর ঐ সময়ে ব্রিটিশরা রাজত্ব করত ও শোষণ করত। কবির সমস্ড় খুব ও দুঃখ দিয়ে ‘দীপনা’ কবিতাটি লিখেছেন। ঘুমন্ড় মুসলমানদের ডেকে ওঠানো ও ঘুম ভাঙ্গাবার চেষ্টা করেছেন। কবি বলছেনঃ

‘দিন মাস বর্ষে হায়!

আজি কত যুগ যায়!!

আর কি ইসলাম-রবি হবে না উদিত ?

আর কিরে মুসলমান,

ধরিয়া নূতন প্রাণ

শাসিবে না মহাদম্ভে ধরণী মন্ডল ?

এমন কি চিরদিন রহিবে দুর্বল!

আর কি জ্ঞানের আলো,

ধরা না করিবে আলো,

কোরান কি আর নাহি করিবে গ্রহণ ?[৪৬৫]

---

[৪৬৪] . সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, *অনল প্রবাহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০

[৪৬৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২

কবি আশাহত হন নি। মুসলমানদের প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস নিয়ে কবি তাঁদের আহ্বান জানাচ্ছেনঃ

হে নির্জীব মুসলমান!

রাখিতে জাতীয় মান,

এখনো উৎসর্গ করো স্বকীয় জীবন,

এখনও আছে বেলা,

আর করিও না হেলা,

ফিরালে ফিরাতে পার গৌরব-তপন,

এখনও অন্ধকারে ডুবেনি ভুবন![৪৬৬]

'অনলপ্রবাহ' গ্রন্থে লিখিত এ সমস্ড় কবিতার মাধ্যমে কবি ভারতবর্ষের পতিত মুসলিম জাতিকে আশার আলো দেখিয়েছেন। এ কবিতাগুলো সমসাময়িক কালের বাঙালি মুসলিম রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও চিন্ড়শীল ব্যক্তিদেরকে বাংলা ভাষায় ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কাজ করার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। পরবর্তীতে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর চিন্ড়-চেতনা নিয়ে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরচল ইসলাম ও ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররচখ আহমদ এ জাতীয় ব্যক্তিবর্গকে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে আমরা আবির্ভুত হতে দেখি।

---

[৪৬৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ক. 'ইসলামী কবিতা', কাজী নজরুল ইসলাম, আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৮২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

খ. নজরুল ইসলাম ঃ ইসলামী গান, আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পাদিত, মে **১৯৮০,** ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

ক. 'ইসলামী কবিতা', কাজী নজরুল ইসলাম

ইসলামের বিশ্বজনীন মানবতাবাদী চিন্তাধারাকে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর লেখনীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সৃষ্টির, তাঁর ভাবের, তাঁর ধ্যানের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে ইসলামী আদর্শ ও চিন্তাচেতনা ভিত্তিক লেখা। ইসলাম ধর্মকে নিয়ে এত সুন্দর উৎসাহ ও প্রেরণামূলক কাব্য সাহিত্য ইতোঃপূর্বে বা পরে আর কেউ রচনা করতে পারেন নি। তিনি তাঁর কবিতা, গান ও গজলে বিদ'আত মুক্ত ইসলামী ভাবধারাকে তোলে ধরেছেন। ইসলামের সঠিক আকীদা-বিশ্বাস ও ইসলামী মূল্যবোধকে সর্বোপরি ইসলামী জাগরণের পথ তাঁর কাব্যের মাধ্যমে তিনি আমাদের দেখিয়েছেন।

নজরুল **১৯১৯** সাল থেকে সাহিত্য জীবন শুরু করেন বলে নজরুল গবেষকগণ মনে করেন। জীবনের শুরু থেকেই তিনি ইসলামী ভাবের কবিতা রচনা করেন। "ঐ প্রথম বছরেই তাঁর লেখায় ইসলামী আবহ লক্ষ্য করা যায়।"[৪৬৭] নজরুল গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ বলেছেন, **১৯২০** সালে নজরুল হযরত মোহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে প্রথম কবিতা লেখেন, **১৯৩০** সালে পূর্ণাঙ্গ রসূল চরিত রচনায় মনোনিবেশ করেন; **১৯৩১** সালে না'ত রচনা শুরু করেন। যে ইসলামী আবহ নজরুল তাঁর শিল্পীজীবনের প্রথমে শুরু করেছিলেন নির্মাণ করতে, শেষ পর্যন্ত তাঁর তা অব্যাহত ছিলো। মরু-ভাস্কর রচনার মধ্য দিয়ে

[৪৬৭]. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৭৯

নজরুলের মুসলমানী ঢং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলো। হিন্দু-মুসলমান মিলনের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ কাজী নজরুল ইসলাম ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে তিনি বাঙালি মুসলমানেরও পরাণপ্রিয় কবি।[৪৬৮]

নজরুল মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবাদী ও ঐতিহ্যিক চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটাতে হযরত মোহাম্মদ (সা.) ও সাহাবীদের জীবনালেখ্য তোলে ধরেছেন। ইসলামী শৌর্যবীর্যের প্রতীক হযরত উমর (রা.), খালেদ (রা.) এবং কারবালা, মহররম, আযান ও ঈদের মত ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলোকে বাংলার মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। মুসলমানদের রাষ্ট্রশক্তির পুণরুত্থান প্রয়াসী বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। রচনার বিষয়বস্তু, শব্দচয়ন, উপমা ও চিত্রকল্প প্রয়োগেও ইসলামী ঐতিহ্যকে আশ্চর্যজনকভাবে তোলে ধরেছেন।[৪৬৯]

নজরুলের আবির্ভাবকালেই সমকালীন মুসলিম লেখক ও বুদ্ধিজীবী সমাজের কাছে তাঁর প্রতিভা ধরা পড়েছিল। ১৯২৫ সালে প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ এর সাথে নজরুলের চিঠি আদান-প্রদানের ঘটনা থেকে মুসলিম রেনেসাঁর ক্ষেত্রে নজরুলের প্রবেশ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়।

"ভাই নজরুল,

তোমায় কখনও দেখিনি। অনেকবার দেখা করার সুযোগ খুঁজেছি, সে সুযোগ ঘটে উঠে নাই-দূর হতে শুধু তোমার লেখা পড়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অন্তরের অন্তস্থল হতে ঐ প্রতিভার কাছে বার বার মস্তক নত করেছি, আলণ্ঢার কাছে প্রার্থনা করেছি, "প্রভো, এ কাঙাল বাঙালি মুসলিম সমাজকে যদি একটি রত্ন দিয়েছো, একে রক্ষা করো। সমাজকে দিয়ে ওর কদর নিও।" বাংলার মুসলমান সমাজ কাঙাল, শুধু ধনে নয়, মনেও। সমাজ মরতে বসেছে। তাকে বাঁচাতে হলে চাই সঞ্জীবনী সুধা। কে সেই সুধার পাত্র হাতে এনে এই মরণোম্মুখ সমাজের সামনে দাঁড়াবে- কে জানি না, কিন্তু মনে হয় তোমায় বুঝি খোদা সে সুধা ভান্ডের কিঞ্চিৎ দান করেছেন, অন্তরের অন্তরালে বুঝি সে সাধানার বীজ জমা আছে। বাঙালি মুসলিম চেয়ে আছে তোমার কণ্ঠ দিয়ে ইসলামের প্রাণ বাণী পুনঃপ্রতিধ্বনিত হবে, ইসরাফিলের সিঙ্গার মত প্রতিধ্বনি এই নিদ্রিত সমাজকে মহা আহ্বানে জাগ্রত করবে। ...বাংলার মৌলানা রুমীর আসন খালি পড়ে আছে। তুমি তাই দখল করে ধন্য হও, বাংলার মুসলিমকে, বাংলার সাহিত্যকে ধন্য করো।

---

[৪৬৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭

[৪৬৯]. ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

এই চিঠি পাওয়ার দুবছর পর নজরুল উত্তর দেন ইব্রাহিম খাঁকে-

বাংলার মুসলমান সমাজ ধনে কাঙ্গাল কিনা জানিনে কিন্তু মনে যে কাঙ্গাল এবং অতি মাত্রায় কাঙ্গাল তা আমি বেদনার সঙ্গে অনুভব করে আসছি বহুকাল হতে। মুসলমানেরা যে আমার কদর করেন নি, এটাও ঠিক নয়। যারা দেশের সত্যিকার প্রাণ, সে তরুণ মুসলিম বন্ধুরা আমায় যে প্রীতি দিয়ে অভিনন্দিত করেছেন, তাতে কাঁটা বহু নীচে ঢাকা পড়ে গেছে। ইসলামের সত্যিকার প্রাণ শক্তি গণ-শক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমানাধিকারবাদ। ইসলামের এই অভিনবত্ব ও এ শ্রেষ্ঠত্ব আমিতো স্বীকার করিই, যাঁরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী নন, তারাও স্বীকার করেন। ইসলামের এই মহান সত্যকে কেন্দ্র করে কাব্য মহাকাব্য সৃষ্টি করা যেতে পারে। আমি ক্ষুদ্র কবি, আমার বহু লেখার মধ্য দিয়ে আমি ইসলামের এই মহিমা গান করেছি। তবে কাব্যকে ছাপিয়ে ওঠেনি সে গানের সুর। উঠতে পারেও না। তাহলে তা কাব্য হবে না। আমি জানি যে বাংলার মুসলমানকে উন্নত করার মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় কল্যাণ নিহিত আছে। এদের আত্মজাগরণ হয়নি বলেই ভারতের স্বাধীনতার পথ আজ রুদ্ধ।"[৪৭০]

এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ।

'এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ' কবিতায় তিনি সাম্য, শক্তি আর দ্বন্দ্ব বিহীন এক আল্লাহর রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য নওজোয়ানদের-আল্লাহর সৈনিকদের প্রতি আহ্বান জানান।[৪৭১] স্রষ্টার প্রতি কি পরিমাণ প্রেম ও ভালোবাসা থাকলে একজন কবির স্রষ্টা ভক্তি বুঝা যায়, নজরুলের এ কবিতা তারই প্রমাণ বহন করছে। এমনিভাবে নজরুল বহু কবিতা ও গানে মহান আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন।[৪৭২] স্রষ্টার জয়গান করে তার হাতে রচিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা, গান ও প্রবন্ধ। কবি প্রাণ খোলে ও হৃদয় উজাড় করে বলেনঃ

"উহারা প্রচার করুক হিংসা বিদ্বেষ আর নিন্দাবাদ;
আমরা বলিব, "সাম্য, শান্তি, এক আল্লাহ্ জিন্দাবাদ।"[৪৭৩]

---

[৪৭০] . কবীর চৌধুরী, *নজরুল দর্শন* (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রথম প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২) পৃ. ২১-২২

[৪৭১] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[৪৭২] . রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরুল ইসলাম জীবন ও কবিতা* (ঢাকাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৮২) পৃ. ৫১৯

[৪৭৩] . কাজী নজরুল ইসলাম, *'ইসলামী কবিতা'*, আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পা. (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৮২) পৃ. ৩

ওরা বলে, হবে নাস্ড়িক সব মানুষ, করিবে হানাহানি।

মোরা বলি, হবে আস্ড়িক, হবে আলণ্ঢা-মানুষে জানাজানি।

ওরা কাদা ছুঁড়ে বাধা দেবে ভাবে-ওদের অস্ত্র নিন্দাবাদ,

মোরা ফুল ছুঁড়ে মারিব ওদের, বলিব-"আলণ্ঢাহ্ জিন্দাবাদ।"[৪৭৪]

আলণ্ঢা পরম প্রিয়তম মোর

'আলণ্ঢা পরম প্রিয়তম মোর' কবিতায় আলণ্ঢাহ তা'য়ালার প্রতি কবির হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছে। আলণ্ঢাহ যার সহায় হোন, কোনো অভিযানে তার বাধা বন্ধন নেই। তিনি বাংলার মুসলমানকে এই বলে উজ্জীবিত করতে চেয়েছেন যে, যত বাধা আসুক তার শত কোটি গুণ শক্তি আলণ্ঢাহর পক্ষ হতে স্রোতের মত অনর্গল ধারায় আসতে থাকে। আর সেই অজেয় শক্তি বলে রহমত প্রাপ্ত মানুষ সংহারী তলোয়ারের মতো উলণ্ঢাসে নেচে উঠে। সুতরাং তিনি নব-যুগের নব অভিযান-সেনাদলকে আলণ্ঢাহর দেয়া জীবন পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার সাথে আলণ্ঢাহর রাহে উৎসর্গ করার আহ্বান জানান। আলণ্ঢাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসে জাগ্রত হলে আলণ্ঢাহ তা'য়ালা সহায় হবেন বলে জনগণকে আশ্বস্ড় করেন।[৪৭৫] তিনি লিখেনঃ

"আলণ্ঢা পরম প্রিয়তম মোর, আলণ্ঢা ত দূরে নয়,

নিত্য আমাকে জড়াইয়া থাকে পরম সে প্রেমময়!

পূর্ণ পরম সুন্দর সেই আমার পরম পতি,

মোর ধ্যান জ্ঞান তনু-মন-প্রাণ, আমার পরম গতি।

ভিক্ষা করিয়া তাঁর কৃপা কেহ ফেরেনি শূন্য হাতে,

যারা চাহে নাই, তারাই তাঁহারে নিন্দে অবজ্ঞাতে।

কার করুণায় পৃথিবীতে এত ফসল ফুল হাসে,

বর্ষার মেঘে নদ-নদী-স্রোতে কার কৃপা নেমে আসে?

তাঁরি নাম লয়ে বলি, "বিশ্বের অবিশ্বাসীরা শোনো,

তাঁর সাথে ভাব হয় যার, তার অভাব থাকে না কোনো।

---

[৪৭৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

[৪৭৫] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

তাঁহারি কৃপায় তাঁরে ভালোবেসো ব'লে আমি চ'লে যাই,

তাঁরে যে পেয়েছে, দুনিয়ায় তার কোনো চাওয়া-পাওয়া নাই।"[৪৭৬]

চির-নির্ভয়

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীগণ (রা.) যেই বিশ্বাস ও আশা নিয়ে দ্বীনের কাজ করতেন, মহান আলণ্ঢাহর উপর তাঁদের যে নির্ভরতা ছিল; তাঁদের যে তাওয়াক্কুল ছিল সেরূপ মনোভাব যেন মুসলমানদের মধ্যে আবার ফিরে আসে কবি তাঁর এই কবিতায় সেই ভাবই ব্যক্ত করেছেনঃ

"আমি পেয়ে আলণ্ঢার সাহায্য হইয়াছি চির-নির্ভর,

আলণ্ঢা যাহার সহায় তাহার কোনো ভয় নাহি রয়!

কোনো বন্ধন বাধা নাই তার কোনো অভিযান-পথে,

যত বাধা আসে তার কোটি গুণ শক্তি উর্দ্ধ হ'তে

আলণ্ঢার সেই বান্দার বুকে স্রোত-সম নেমে আসে!

হাতে তার সংহারী-তলোয়ার নেচে ওঠে উলণ্ঢাসে!"[৪৭৭]

কোনো ভয়-ভীতি কবির সামনে চলা পথ রচদ্ধ করতে পারেনি। কারণ কবির একমাত্র অভিভাবক ছিল মহান আলণ্ঢাহ তায়ালা।

"কোন ভয় মোরে ফিরাতে পারেনি মোর 'আগে চলা' থেকে,

কে যেন স্বপ্নে জাগরণে মোর নাম ধ'রে গেছে ডেকে।"[৪৭৮]

পৃথিবীর সকল বিপণ্ঢবী, বিদ্রোহী ও মানবকল্যাণে নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিরা ছিলেন কবির প্রিয় ব্যক্তিত্ব। তাঁদের প্রতি কবি শ্রদ্ধা নিবেদন করেই বলেছেনঃ

"যত বিদ্রোহী বিপণ্ঢবী ছিল মোর প্রিয়তম সখা,

এদেরই বক্ষে আশ্রয় পেত এই চির-পলাতকা।

---

[৪৭৬]. কাজী নজর‍ল ইসলাম, *'ইসলামী কবিতা'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

[৪৭৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

[৪৭৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

নিতি হাহাকার উঠিত এ বুকে, কাহার মহা-বিরহ

অসহ নিবিড় বেদনা কেন যে জাগাইত অহরহ।

সে কি আলণ্ঢাহ ? পরম পূর্ণ আমার পরম স্বামী?

সে কি মোর চির-চাওয়া পূর্ণতা? সে কি আমি ?"[৪৭৯]

নজরুল এ কবিতায় নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন আলণ্ঢাহর সৈনিকরূপে। তুফান, বিপণ্ঢব, জেহাদ, বিদ্রোহ, যার সাথী; পুরাতন আর জীর্ণ সংস্কারের আবর্জনা যিনি দগ্ধ করে ফেলেন; কোনো আসমান, কোনো গ্রহ তারা, কোনো আবরণ, কোন শৃঙ্খল, কোনো কারাগার তাকে ধরে রাখতে পারেনা। পরম নিত্য ও পরম পূর্ণ টানে তিনি অপরাজেয় সর্বভয় ও মৃত্যুহীন।[৪৮০] কবি বলেনঃ

"তুফান আমার জন্মের সাথী, আমি বিপণ্ঢবী হাওয়া,

'জেহাদ' 'জেহাদ' 'বিপণ্ঢব' 'বিদ্রোহ' মোর গান গাওয়া!"[৪৮১]

মহা সমর

আলণ্ঢাহ ছাড়া আর কারও নিকট মাথা নত না করার জন্য কবি তাঁর অনুসারীদের আহ্বান জানিয়েছেন।

"বিশ্বাস কর অবিশ্বাসীরা, রহমত তাঁর আসিছে ঐ-

ভয় করিবে না মানুষ কারেও, অদ্বৈত সে আলণ্ঢা বৈ।

তাঁরই শক্তিতে শক্তি লভিয়া, হইয়া তাঁহারই ইচ্ছাধীন,

মানুষ লভিবে পরম মুক্তি, হইবে আজাদ চির-স্বাধীন!"[৪৮২]

জয় হোক! জয় হোক!

জয় হোক কবিতাতেও নজরুল আলণ্ঢাহর জয় ঘোষণা করেছেন। তবে এ কবিতায় স্রষ্টার জয়ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শান্তি, সাম্য, সত্য ও যৌবনের জয়ধ্বনিও ঘোষিত হয়েছে।[৪৮৩] কবি সহজভাবেই লিখেছেনঃ

"জয় হোক, জয় হোক, আলণ্ঢাহর জয় হোক!

---

৪৭৯ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

৪৮০ . রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২২

৪৮১ . কাজী নজরুল ইসলাম, '*ইসলামী কবিতা*', প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪৮২ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

৪৮৩ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২০

শান্ড়ির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক!

সত্যের জয় হোক, জয় হোক!

সর্ব্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্ড়ি

সর্ব্ব অপৌরচ্ষ মিথ্যা ও ভ্রান্ড়ি

হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক!

জয় হোক, জয় হোক!”[৪৮৪]

বৃটিশভারতের জনগণ ইংরেজ কর্তৃক লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত ছিল। বিশেষ করে বাংলার মুসলমানদের অবস্থা ছিল সবচেয়ে খারাপ। ইংরেজরা মুসলমানদের সম্পদ দখল করে তাদেরকে ইংরেজদের গোলাম বানিয়ে ফেলেছিল। মুসলমানরাও তাঁদের ইতিহাস-ঐতিহ্য ভুলে যাচ্ছিল। কুলি ও মুচি বা এই জাতীয় নিম্ন পদে মুসলমানদের চাকরি করতে হতো। ঠিক এই সময়ে এসে নজরচ্ল মুসলমানদের জাগালেন এই বলেঃ

“জাগো লাঞ্ছিত জনগণ সবে-সংঘবদ্ধ হও!

আপনার অধিকার জোর ক’রে কেড়ে লও!

নহিলে আলণ্ঢার আদেশ না মানিবে,

পরকালে দোজখের অগ্নিতে জ্বলিবে;

দুনিয়াতে আবার সার্ব্বভ্রাতৃত্ব সমন্বয় হোক!

জয় হোক, জয় হোক!”[৪৮৫]

আলণ্ঢাহর রাহে ভিক্ষা দাও (“ফি সাবিলিলণ্ঢাহ”)

ধনী ও লোভী মানুষদের লক্ষ করেই কবি উলেণ্ঢখিত কবিতাখানা লিখেছেন বলে মনে হয়। কবিতার ভাব ও ভাষা স্পষ্ট। এই কবিতার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তির অবস্থান কোথায় তা তিনি আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। ধনীর ধনে গরীবের কি অধিকার আর আলণ্ঢাহর পথে দান করলে কি উপকার, কবি সুন্দরভাবে তা উপস্থাপন করেছেনঃ

“এ টাকা তোমার রবে না বন্ধু জানি,

[৪৮৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[৪৮৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

এ লোভ তোমারে নরকে লইবে টানি।

“আর্শ” আসন টলিয়াছে আলণ্ঢার

শুনি ক্ষুধিতের কাঙ্গালের হাহাকার।

তাই সে পরম ভিক্ষু ভিক্ষা চায়

ভিখারীর মারফতে তব দরজায়।

ক্ষমা পাবে তুমি, আজিও সময় আছে,

ভিক্ষা না দিলে পুড়িবে অগ্নি-আঁচে

মৃত্যুর আর দেরি নাই তব-ফিরে চাও ফিরে চাও,

পরম ভিক্ষু মোর আলণ্ঢাহর নামে-

দরিদ্র উপবাসীদের ভিক্ষা দাও!”[৪৮৬]

একি আলণ্ঢার কৃপা নয়?

জুলুম, অন্যায় ও অত্যাচারের বিরচদ্ধে কবি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। জালেমদের পরিণতি কি তাও তিনি তুলে ধরেছেন। সকল মজলুমদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে কবি বলেনঃ

“হউক হিন্দু, হোক খ্রীশ্চান, হোক সে মুসলমান,

ক্ষমা নাই তার যে আনে, তাঁহার ধরায় অকল্যাণ।

জুলুম যে করে শক্তি পাইয়া দানব সে, সে অসুর,

আলণ্ঢার মার পড়ে তারে করে দুনিয়া হইতে দূর।

তাহাদেরই তরে দোজখে নরকে ভীষণ অগ্নি জ্বলে,

দলিছে যাহারা তাঁহার সৃষ্টির মানুষেরে পদতলে।

সকল জাতির সব মানুষের এক আলণ্ঢাহ সেই,

তাঁর সৃষ্টির বিচার করার কারো অধিকার নেই।

আমরা নিত্য চেষ্টা করিব চলিতে তাঁহারি পথে,

করিব না ভয়, আসুক আঘাত শত শত দিক হ’তে।”[৪৮৭]

[৪৮৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

কবি প্রকৃত মুসলমান কে ? কি তার পরিচয় ? নিম্নোক্ত পংক্তিতে তা তুলে ধরেছেনঃ

"তাঁর সৃষ্টিরে ভালোবাসে যারা, তারাই মুসলমান,

মুসলিম সেই, যে মানে এক সে আলণ্ডার ফরমান।"[৪৮৮]

সমকালীন রাজনৈতিক অবস্থা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষয়ে কবি তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করেছেন এইভাবেঃ

"আমি বুঝি না ক কোনো সে "ইজম" কোনোরূপ রাজনীতি,

আমি শুধু জানি আমি শুধু মানি, এক আলণ্ডার প্রীতি!"[৪৮৯]

আজাদ

ভারতবর্ষে মুসলমানদের দৈন্যদশা দেখে, ইংরেজ পূজা দেখে কবি আহত হয়েছেন। ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য কবি আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। মহান আলণ্ডাহর করুণায় কবির জীবদ্দশায় ভারতবর্ষ ও তাঁর মাতৃভূমি বাংলাও স্বাধীনতা লাভ করেছে। কবি মুসলমানদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেনঃ

"কোথা সে আজাদ ? কোথা সে পূর্ণ মুক্ত মুসলমান ?

আলণ্ডাহ ছাড়া করে না কারেও ভয়, কোথা সেই প্রাণ ?"[৪৯০]

পবিত্র কুরআনের আকর্ষণে ও প্রভাবে কত দেশ স্বাধীন হয়েছে! মুসলমানরা শত শত বছর অর্ধ পৃথিবীকে শাসন করেছে এই কুরআন দিয়ে। আর আজ ভারতবর্ষের মুসলমানদের কি দুরবস্থা! কবি আক্ষেপ করে বলেনঃ

"আছে সে কোরান-মজীদ আজিও পরম শক্তিভরা,

ওরে দুর্ভাগা, এক কণা তার পেয়েছিস্ কেউ তোরা ?

সেই সে নামাজ রোজা আছে আজও, আজও সে কলমা আছে,

আজও উথলায় আব-জম্‌জম্ কাবা-শরীফের কাছে।"[৪৯১]

---

৪৮৭ . প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৪৮৮ . প্রাগুক্ত, পৃ. ২২

৪৮৯ . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪৯০ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

৪৯১ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

মুসলমানরা খড়া, দুর্ভিক্ষ, অনাহারে ও অর্ধ্বাহারে ভারতবর্ষে জীবন কাটাতো। ইংরেজরা ছিল তাদের পরিচালক। সমাজ জীবনের সর্ব দিক থেকে তারা ছিল লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার। প্রকৃত মুসলমানের জীবন এমন হতে পারে না, কবির তা মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছিল। সেই কষ্ট থেকেই কবি বলেনঃ

"তিলে তিলে মরে, মানুষের মত মরিতে পারে না তবু ?

আলণ্ঢাহ্ যার প্রভু ছিল, আজ শয়তান তার প্রভু!

খুঁজিয়া দেখিনু , মুসলিম নাই, কেবল কাফের ভরা,-

কাফের তারেই বলি, যারে ঢেকে আছে শত ভীতি জরা।"[৪৯২]

মুসলমানকে তিনি বাদশাহের জাতি মনে করতেন। বাদশাহ জাতির এই ভাগ্য-বিড়ম্বনায় তিনি ব্যথিত, মর্মাহত। কবি বলেনঃ

"অন্যের দাস করিতে কিংবা নিজে দাস হ'তে, ওরে

আসেনিক দুনিয়ায় মুসলিম, ভুলিলি কেমন করে ?

ভাঙ্গিতে সকল কারাগার, সব বন্ধন ভয় লাজ

এল যে কোরান, এলেন যে নবী, ভুলিলি সে সব আজ ?"[৪৯৩]

নিত্য প্রবল হও

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে আলণ্ঢাহ জেহাদের কথা বলেছেন। মুসলমানরা কুরআন তিলাওয়াত করে ঠিকই কিন্তু এর মর্ম উপলব্ধি করতে পারে না। মুনাফিকদের সাথে ও ইসলামের শত্রচদের সাথে কোন আপোস-মীমাংসা নেই। তাদের সাথে জেহাদ চালিয়ে যেতে হবে আমৃত্যু, এটাই কবির প্রত্যাশাঃ

"সত্যের তরে দৈত্যের সাথে ক'রে যাও সংগ্রাম,

রণক্ষেত্রে মরিলে অমর হইয়া রহিবে নাম

এই আলণ্ঢার হুকুম ধরায় নিত্য প্রবল রবে,

প্রবলেই যুগে যুগে সম্ভব করেছে অসম্ভবে।

ভালোবাসেন না আলণ্ঢাহ অবিশ্বাসী ও দুর্বলেরে

---

[৪৯২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৪৯৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

"শেরে-খোদা" সেই হয়, যে পেয়েছে অটল বিশ্বাসেরে।

ধৈর্য্য ও বিশ্বাস হারায় সে মুসলিম নয় কভু,

বিশ্বে কারেও করে না ক ভয় আলণ্ঢাহ্ যার প্রভু;

নিন্দাবাদের মাঝে "আলণ্ঢাহ-জিন্দাবাদ"-এর ধ্বনি

বীর শুধু শোনে, কোনো নিন্দায় কোনো ভয় নাহি গণি'।"[৪৯৪]

মুসলমান একমাত্র তার স্রষ্টার নিকট আত্মসমর্পণ করে, একমাত্র আলণ্ঢাহর কুদরতের পায়েই সে সিজদা করে। আর কারও নিকট সে মাথা নত করে না। আলণ্ঢাহ্ ছাড়া আর কাউকে সে পৃথিবীতে ভয় করেনা। কবি ভারতবর্ষের ঘুমন্ড় মুসলমানদের সেই বাণী স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেনঃ

"যে মাথা নোয়ায়ে সিজদা করেছ এক প্রভু আলণ্ঢারে,

নত করিও না সে মাথা কখনও কোনো ভয় কোনো মারে।"[৪৯৫]

বিশ্বাস ও আশা

মানুষের জীবনে অভাব-অনটন ও সুখ-দুঃখ থাকবেই। বেঈমান, বেদীন ও অবিশ্বাসীদের থেকে মুসলমানদের সবসময় দূরে থাকতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। মুসলমানদের দুর্দিন দেখে হা-হুতাশ করে বেঁচে থেকে লাভ নেই। কবি সেই দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ

"বিশ্বাস আর আশা যার নাই, যেয়ো না তাহার কাছে

নড়াচড়া করে, তবুও সে মরা, জ্যান্ড়ে সে মরিয়াছে।

থাকুক অভাব দারিদ্র্য ঋণ রোগ শোক লাঞ্ছনা,

যুদ্ধ না করে তাহাদের সাথে নিরাশায় মরিও না।"[৪৯৬]

কবি মুসলমানদের বড় বড় স্বপ্ন দেখতে বলেছেন। জাতির কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে বলেছেন। পৃথিবী গড়ার ক্ষেত্রে যাঁরা মৌলিক ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরা সবাই মহৎ স্বপ্ন বাস্ড়বায়ন করার চেষ্টা করে গেছেন। তাই কবি বলেনঃ

[৪৯৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৪৯৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

[৪৯৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

"যারা বৃহতের কল্পনা করে, মহৎ স্বপ্ন দেখে,

তারাই মহৎ কল্যাণ এই ধরায় এনেছে ডেকে।"[৪৯৭]

যারা অত্যাচারীদের সাথে লড়াই করে না, তাদেরকে কবি পশুর সাথে তুলনা করে বলেনঃ

"আত্মা থাকিতে দেহে যারা সহে আত্ম-নির্য্যাতন,

নির্যাতকেরে বধিতে যাহারা করে না পরাণ-পণ,

তাহারা বদ্ধ জীব পশু সম, তাহারা মানুষ নয়,

তাদেরই নিরাশা মানুষের আশা ভরসা করিছে লয়।"[৪৯৮]

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। তারা তাদের স্রষ্টার নিকট যা চাবে, তাই তিনি তাদেরকে দিতে প্রস্তুত। কবি এখানে আধ্যাত্মিক ভাব প্রকাশ করে বলেনঃ

"ইহা আলণ্ঢাহর বাণী যে, মানুষ যাহা চায় তাহা পায়,

এই মানুষের হাত পা চক্ষু আলণ্ঢার হয়ে যায়।!

চাওয়া যদি হয় বৃহৎ, বৃহৎ সাধনাও তার হয়,

তাহারি দুয়ারে প্রতীক্ষা করে নিত্য সর্ব্বজয়।

অধৈর্য নাহি আসে কোনো মহাবিপদে সে সেনানীর'

অটল শান্ড়সমাহিত সেই অগ্রনায়ক বীর।"[৪৯৯]

ভয় করিও না, হে মানবাত্মা

সত্যপথের সৈনিকদের কবি ভরসা দিয়ে বলেন, তোমরা ভয় করিওনা। মাঝে মাঝে সন্ত্রাসী ও দুস্কৃতিকারীদের জয় দেখে বিশ্বাসীদের মন যেন দুর্বল না হয় কবি তাদের আশ্বস্ড়করেন এই বলেঃ

"সত্যপথের তীর্থ-পথিক ! ভয় নাহি, নাহি ভয়,

শান্ড়িযাদের লক্ষ্য, তাদের নাই নাই পরাজয়!

অশান্ড়ি-কামী ছলনার রূপে জয় পায় মাঝে মাঝে,

---

[৪৯৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[৪৯৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

[৪৯৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

অবশেষে চির-লাঞ্চিত হয় অপমানে আর লাজে!

পথের উর্দ্ধে ওঠে ঝোড়ো বায়ে পথের আবর্জ্জনা,

তাই বলে, তারা উর্দ্ধে উঠেছে-কেহ কভু ভাবিও না !

উর্দ্ধে যাদের গতি, তাহাদের পথে হয় ওরা বাধা,

পিচ্ছিল করে পথ, তাই বলে জয়ী হয় না ক' কাদা।"[৫০০]

সত্যের জয় একদিন হবেই, তা ইসলামের শিক্ষা। যাঁরা সত্য পথের পথিক, তাঁদের উপর নানারকম দোষ চাপিয়ে ভ˜রা সমাজের বাহ্‌বা নিতে চায়, যা সময়ের ব্যবধানে মানুষের নিকট ¯পষ্ট হয়ে ওঠে। কবি সেই দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ

"এক আলণ্ডারে ভয় করি মোরা কারেও করি না ভয়,

মোদের পথের দিশারী এক সে সর্ব্বশক্তিময়।

সাক্ষী থাকিবে আকাশ পৃথিবী, রবি শশী গ্রহ তারা,

কাহারা সত্য পথের পথিক পথভ্রষ্ট কারা ?

ভয় নাহি, নাহি ভয়!

মিথ্যা হইবে ক্ষয়!

সত্য লভিবে জয়!"[৫০১]

ডুবিবে না আশাতরী

মহান আলণ্ডাহর প্রতি কবির আস্থা ও বিশ্বাসের উদাহরণ এই কবিতায় আমরা পাই। হিজরতের সময় পাহাড়ের গুহায় ভীতসন্ত্র¯ড় হযরত আবু বকরকে (রা.) আমাদের নবীজী যেইভাবে সান্ড়্বনা দিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে কবি নজরচ্ল ভারতবর্ষের পতিত মুসলিম জাতিকে সান্ড়্বনা দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেনঃ

"ডুবে যদি তরী, বাঁচি কিবা মরি, আলণ্ডা মোদের সাথী,

যেখানেই উঠি তাঁর আশ্রয় পাব মোরা দিবারাতি!"[৫০২]

---

[৫০০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[৫০১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় আলণ্ঢাহ কাফেরদের সাথে মুসলমানদের জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। জিহাদের ময়দানে শাহাদাৎ বরণ করলে তার জন্যে রয়েছে পরকালে মহাপুরস্কার। নিচের পংক্তিগুলোতে দুনিয়ায় জিহাদ করে আখিরাতে পুরস্কার গ্রহণে কবি তাঁর স্বজাতীয় ভাইদের উৎসাহ প্রদান করেছেনঃ

"হে নবযুগের নৌসেনা, রণতরীর নৌজোয়ান !
আলণ্ঢারে নিবেদন করে দাও আলণ্ঢার দেওয়া প্রাণ।
পলাইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না মৃত্যুর হাত হ'তে,
মরিত হয় ত মরিব আমরা এক আলণ্ঢার পথে।
পৃথিবীর চেয়ে সুন্দরতর কত যে জগৎ আছে,
সে জগৎ দেখে যাব অনন্দধামে আলণ্ঢার কাছে।
আমাদের কিবা ভয়-
আমাদের চির চাওয়া পাওয়া এক আলণ্ঢাহ প্রেমময় !"[৫০৩]

আজান

'আজান' কবিতায় প্রাত্যহিক আজানের মাধ্যমে যুগে যুগে ইসলামের জাগরণকে অব্যাহত রাখার জন্য মুয়াজ্জিনের প্রতিও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।[৫০৪]

"বুঝি আর সে নাই-বা বুঝি, তবু প্রাণের মাঝে
চঞ্চল সে গুমরে মরে কী আকুলতা যে!"[৫০৫]

আজান মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দেয় বার বার ইসলাম এখনও ডুবে নাই। তাঁদের হৃদয়ে এক আকুল আবেদন সৃষ্টি করে স্রষ্টার প্রতি। কাফের-বেদ্বীনদের এত অত্যাচারের পরও এই আজানের প্রভাবে ইসলাম এখনও দাঁড়িয়ে আছে। কবি বলেনঃ

"তুমি আছ 'ইসলাম' তাই তেমনি আজো জেগে,
ডুবে নি ক' অবহেলার ঘোর ঝাপটা লেগে।

---

[৫০২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
[৫০৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
[৫০৪] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০
[৫০৫] . কাজী নজরু্ল ইসলাম, *'ইসলামী কবিতা'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

ওগো পূত ! ওগো গভীর ! ওগো উদাস ডাক !

ওগো আজান তোমার বিষাণ বিশ্বে বেজে যাক-

যতদিন না ইসরাফিলের প্রলয়-বিষাণ বাজে,

এমনি ক'রে ব্যাকুল স্বরে দীন-দুনিয়ার মাঝে।"[৫০৬]

কৃষকের ঈদ

'কৃষকের ঈদ' কবিতায় তিনি সমাজের প্রতি ঈদগাহের ইমামের যে কর্তব্য রয়েছে তাকে তোলে ধরেছেন। মুমূর্ষু, মৃত কৃষকের মুখে বুকে শক্তি সঞ্চারের জন্য ইমাম বা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইসলাম পৃথিবীতে এসেছে নির্যাতিতের পাশে দাঁড়াতে, মূক অম্ল্যান মুখে ভাষা জোগাতে। তোতা পাখির মতো ধর্ম গ্রন্থ তিলাওয়াত কিংবা নামায রোযায় ব্যক্তিগত ইবাদত হয়। কিন্তু ইসলামের সর্বজনীনতার আদর্শ ও এর মহিমা প্রচার করার জন্য কৃষক, শ্রমিক, কুলিসহ নিপীড়িত মানুষের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। এই মৃতবৎ জাতিকে বেঁচে থাকার জন্য কুরআন-হাদীস সম্মত রাস্ড়া দেখাতে হবে।[৫০৭] কবির ভাষায়ঃ

"নামাজ পড়েছ, পড়েছ কোরান, রোজাও রেখেছ জানি,

হায় তোতাপাখী ! শক্তি দিতে কি পেরেছ একটুখানি ?

ফল বহিয়াছ, পাওনিক রস, হায়রে ফলের ঝুড়ি,

লক্ষ বছর ঝর্ণায় ডুবে রস পায় না ক নুড়ি!

আলণ্ডা-তত্ত্ব জেনেছ কি, যিনি সর্ব্বশক্তিমান ?

শক্তি পেলো না জীবনে যে জন, সে নহে মুসলমান।

ইমান ! ইমান ! বল রাত দিন, ইমান কি এত সোজা ?

ইমানদার হইয়া কি কেহ বহে শয়তানী বোঝা ?

শোনো মিথ্যুক ! এই দুনিয়ায় পূর্ণ যার ইমান,

শক্তিধর সে টলাইতে পারে ইঙ্গিতে আসমান !

[৫০৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

[৫০৭]. ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

আলণ্ঢার নাম লইয়াছ শুধু, বোঝনিক আলণ্ঢারে।

নিজে যে অন্ধ সে কি অন্যেরে আলোকে লইতে পারে ?”[৫০৮]

ঈদের চাঁদ

জাকাত ইসলামের পঞ্চস্ভম্ভের একটি। মুসলমানরা যত গুরচত্ব দিয়ে নামাজ ও রোজা ইত্যাদি পালন করে, তত গুরচত্ব দিয়ে জাকাত প্রদান করে না।

অথচ জাকাত দানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আলণ্ঢাহ তা'য়ালা স্পষ্ট নির্দেশ প্রদান করেছেন। জাকাত প্রদানে অবহেলাকারীদের হুঁশিয়ার করে কবি বলেনঃ

“যক্ষের মত লক্ষ লক্ষ টাকা জমাইয়া যারা

খোদার সৃষ্ট কাঙ্গালে জাকাত দেয় না, মরিবে তারা।

ইহা আমাদের ক্রোধ নহে, ইহা আলণ্ঢার অভিশাপ,

অর্থের নামে জমেছে তোমার ব্যাংকে বিপুল পাপ!”[৫০৯]

বকরীদ

এই কবিতায় কবি তাঁর মানবতাবাদী, সাম্যবাদী, ভোগবিরোধী মানসিকতার পরিচয়কে উন্মুক্ত করেছেন। কবিতায় পশু কোরবানীর চেয়ে আত্মকোরবানীকে বড় করে দেখিয়েছেন। আলণ্ঢাহর রাহে পুত্রেরে কোরবানী দেয়ার কথা বলেছেন শাফায়াত পাওয়ার জন্য। কেননা সর্বোত্তম ত্যাগ ব্যতীত মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ কাম্য বস্তুকে লাভ করা যায় না।[৫১০]

“অন্দ্ররে ভোগী, বাইরে যে রোগী, মুসলমান সে নয়,

চোগা-চাপকানে ঢাকা পড়িবে না সত্য যে পরিচয় !

ইবরাহিমের মত পুত্রেরে আলণ্ঢার রাহে দাও,

নৈলে কখনো মুসলিম নও, মিছে শাফায়ৎ চাও!

নির্য্যাতিতের লাগি' পুত্রেরে দাওনা শহীদ হতে,

চাকরীতে দিয়া মিছা কথা কও-“যাও আলণ্ঢার পথে!”

বকরীদি চাঁদ করে ফরয়্যাদ, দাও দাও কোরবানী,

---

[৫০৮] . কাজী নজরুল ইসলাম, *'ইসলামী কবিতা'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০

[৫০৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

[৫১০] . শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নজরুল কাব্যে ঐতিহ্যের স্বরূপ* (ঢাকাঃ জ্ঞান বিতরণী, ২০০৪) পৃ. ২৪৩

আলণ্ঢারে পাওয়া যায় না, করিয়া তাহার না-ফরমানি!

উমরে, খালেদে, মুসা ও তারেকে বকরীদে মনে কর,

শুধু সালওয়ার পরিও না, ধর হাতে তলোয়ার ধর !

কোথায় আমার প্রিয় শহীদান মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণ ?

(এস) ঈদের নামাজ পড়িব, আলাদা আমাদের ময়দান !”[৫১১]

মোবরকবাদ

কবি মুসলমান সমাজের গভীরে প্রবেশ করে অনুভব করেন যে, মুসলমানরা মৌখিকভাবে আলণ্ঢাহকে স্বীকার করে ঠিকই কিন্তু অন্ড্র দিয়ে তাঁর হুকুম পালন করে না। যে সমস্ড় কাজ করতে তিনি নিষেধ করেছেন তা থেকে তারা বিরত থাকে না। কবি আক্ষেপ করে বলেনঃ

“মুসলিম হয়ে আলণ্ঢারে মোরা করিনিক বিশ্বাস,

ঈমান মোদের নষ্ট করেছে শয়তানী নিঃশ্বাস।

ভায়ে ভায়ে হানাহানি করিয়াছি, করিনি কিছুই ত্যাগ,

জীবনে মোদের জাগেনি কখনো বৃহতের অনুরাগ।”[৫১২]

মোবারকবাদ কবিতায় তিনি ব্রিটিশের গোলামীর চেয়ে, শহীদি দরগাকে শ্রেয়তর জ্ঞান করেছেন। এবং আলণ্ঢাহ ছাড়া কারও কাছে শির নিচু না করার আহ্বান জানিয়েছেন।[৫১৩]

“আলণ্ঢার কাছে কখনো চেয়ো না ক্ষুদ্র জিনিস কিছু,

আলণ্ঢাহ ছাড়া কারও কাছে কভু শির করিও না নীচু!

এক আলণ্ঢাহ ছাড়া কাহারও বান্দা হবে না বল,

দেখিবে তোমার প্রতাপে পৃথিবী করিতেছে টলমল।

আলণ্ঢারে বলো, দুনিয়ায় যারা বড় তার মত কর

কাহাকেও হাত ধরিতে দিও না, তুমি শুধু হাত ধর।”[৫১৪]

---

[৫১১] . কাজী নজরুল ইসলাম, *‘ইসলামী কবিতা’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

[৫১২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

[৫১৩] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

[৫১৪] .কাজী নজরুল ইসলাম, *‘ইসলামী কবিতা’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

আলণ্ঢাহ তার মোজাহিদ বান্দাদের ভালোবাসেন। বান্দা যখন তার খোদাকে ভালোবেসে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করেন, আলণ্ঢাহকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কারও নিকট মাথা নত না করেন, তখনই সে খোদার প্রেমের সাক্ষাৎ পায়। কবি বলেনঃ

"এক আলণ্ঢারে ছাড়া পৃথিবীতে করো না কারেও ভয়
দেখিবে অমনি প্রেমময় খোদা, ভয়ঙ্কর সে নয়।"[৫১৫]

খেয়া-পারের তরণী

বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্য বিষয়ক অন্যতম উলেণ্ঢখযোগ্য কবিতা 'খেয়াপারের তরণী'। 'মোসলেম ভারতে' প্রকাশিত ঢাকার নওয়াবজাদী মেহের বানু অংকিত একটি চিত্র অবলম্বনে রচিত। কবিতার চতুর্থ স্ড়বক থেকে ইসলামী ঐতিহ্যবাহী শব্দ ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। এ স্ড়বকে পুণ্যের তরীর কা ারী রূপে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উলেণ্ঢখ মুসলমানদের বিশ্বাসের অনুসৃতি, তাদের বিশ্বাস হযরত মুহম্মদ (সা.) তাঁর প্রিয় উম্মতদের পরিত্রাণ করবেন। তরণীর দাঁড়ীরূপে হযরতের উত্তরাধিকার আবু বকর, উসমান, উমর ও আলী (রা.) ইসলামের এই চার খলীফার নাম উলেণ্ঢখিত হয়েছে।[৫১৬]

"আবু বকর উস্‌মান উমর আলী হায়দর
দাঁড়ী যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর!
কা ারী এ তরীর পাকা মাঝি মালণ্ঢা,
দাঁড়ী মুখে সারি গান-লা-শরীক আলণ্ঢাহ!"[৫১৭]

গোঁড়ামি ধর্ম্ম নয়

তৌহীদবাদ ইসলামী আকীদার মূল বিষয়বস্তু। বর্তমান পৃথিবীতে এ নিয়ে তর্কের শেষ নেই। আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরচ্ল ইসলাম এর সমাধান কত চমৎকারভাবে তাঁর কাব্যে তুলে ধরেছেনঃ

"এক সে স্রষ্টা সব সৃষ্টির এক সে পরম প্রভু,
একের অধিক স্রষ্টা কোনো সে ধর্ম্ম কহে না কভু।"[৫১৮]

---

[৫১৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

[৫১৬] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

[৫১৭] . কাজী নজর ল ইসলাম, *'ইসলামী কবিতা'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০

সারা পৃথিবীতে ধর্ম্মে ধর্ম্মে হানাহানি, পাল্টা আঘাত ও পাল্টা অভিযোগ চলছেই। অথচ ধর্মের প্রবর্তকগণের মধ্যে এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। কবি বলেনঃ

"কোনো "ওলি" কোনো দরবেশ যোগী কোনো পয়গম্বর,

অন্য ধর্ম্মে-দেয়নি ক গালি,-কে রাখে তার খবর ?"[৫১৯]

জীবনে যাহারা বাঁচিল না

কবির জীবদ্দশায় ভারতবর্ষের মুসলমানদের দুর্বল মানসিকতার পরিচয় এই কবিতায় আমরা দেখতে পাই।

ইংরেজদের লাথি ও গুতা খেয়েও মুসলমানদের চেতনা কেন ফিরে আসছেনা এই ছিল কবির প্রাণে বড় অভিযোগ। কবি দুঃখ করে বলেনঃ

"মোরা মুসলিম, ভারতীয় মোরা,

এই সান্ত্বনা নিয়ে আছি,

মরে' বেহেশতে যাইব বেশক,

জুতো খেয়ে হেথা থাকি বাঁচি।

অতীতের কোন্ বাপ দাদা কবে,

করেছিল কোন্ যুদ্ধ জয়

মার খাই আর তাহারি ফখর

করি হর্দ্দম জগৎম।"[৫২০]

সমাজের সমস্ত কুসংস্কার দূর করে একটি আধুনিক সমাজ গড়তে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে কবি বলেনঃ

"যত পুরাতন সনাতন জরা-

জীর্ণের ভাঙ্, ভাঙ্রে আজ!

আমরা সৃজিব আমাদের মতো

---

[৫১৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

[৫১৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

[৫২০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

ক’রে আমাদের নব সমাজ!”[৫২১]

মৌলবী সাহেব

নজরুল কুসংস্কারের ধারক মৌলবী সাহেবানদের প্রতি কখনও কখনও খেদোক্তি করলেও নায়েবে নবী মৌলবী সাহেবানদের পাক কদমে তিনি ‘মৌলবী সাহেব’ কবিতায় সালাম জানিয়েছেন। কারণ তাঁরাই ইসলামী শিক্ষা ও আচরণকে আজও জনমানসে জাগ্রত রেখেছেন।[৫২২]

“দুনিয়াদারীর কাজ নিয়ে সব
দুনিয়ার লোক থাকে মাতি
মৌলবী সাহেব দুনিয়া ভুলে
জ্বালিয়ে রাখেন দ্বীনের বাতি।
উনিই জ্বালান জ্ঞানের আলো
আমাদের এই আঁধার মনে
ওঁরই গুণে মানুষ ব’লে
পরিচিত হই ভুবনে।
গাফলিয়াতের ঘুমে যখন
গ্রামের সবাই রয় ঘুমিয়ে,
উনিই জানান ‘ফজর হল’
ভোরে উঠে আজান দিয়ে।”[৫২৩]

উমর ফারুক

‘উমর ফারুক’ কবিতায় হযরত উমরের (রা.) অসামান্য কীর্তিসমূহ তোলে ধরা হয়েছে। তাঁর ইসলাম গ্রহণ জেরুজালেম অধিকার, খালেদের পদচ্যুতি, রাত্রে নগর ভ্রমণ, পুত্র হত্যা প্রভৃতি প্রসঙ্গ তোলে ধরে কবি ইসলামের গৌরবময় অতীত স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান সময়ে বিশেষতঃ ভারতবর্ষে ইসলাম

---

৫২১ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৫২২ . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

৫২৩ . কাজী নজরুল ইসলাম, *‘ইসলামী কবিতা’*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

জ্যোতি ক্রমাগত যে প্রভা হারাচ্ছে তা উপলব্ধি করেন। তিনি এও উপলব্ধি করেন যে, আজ হযরত উমরের মতো তেজোদ্দীপ্ত, পরাক্রমশালী শাসকের অভাব আর বাংলার মুসলমানের 'আসহাবে কাহাফে'র মতো ঘুম এ দু'য়ের সমন্বয় হওয়ার ফলে জমানার অভিশাপে আজ শয়তান রাজ তখতে সমাসীন।[৫২৪] কবি বলেনঃ

"নাই তুমি নাই, তাই সয়ে যাই জামানার অভিশাপ,
তোমার তখ্তে বসিয়া করিছে শয়তান ইনসাফ!
মোরা "আসহাবে কাহাফে"র মতো দিবানিশা দিই ঘুম
"এশা"র আজান কেঁদে যায় শুধু-নিঃঝুম নিঃঝুম!"[৫২৫]

উমর (রা.) আলণ্ঢাহর ওহী পান নি। নবী হন নি। তাই কবি প্রাণ ভরে বন্ধু বলে তাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরতে পারেন। খোদাকে আমরা সেজদা করি, রসুলকে সালাম করি। কিন্তু উমরের স্থান হতমান মানবজাতির বুকে। উমর ঊর্ধ্বলোকের নন, তিনি মাটির মানুষ। শাসক হয়েও তিনি মাটির কাছাকাছি ছিলেন। সে পরিচয় নজরুল এ কবিতায় দিয়েছেন সুন্দরভাবে।[৫২৬]

"অর্ধ পৃথিবী করেছ শাসন ধূলার তখ্তে বসি'
খেজুর পাতার প্রাসাদ তোমার বারে বারে গেছে খসি'"[৫২৭]

খালেদ

"তোমার ঘোড়ার ক্ষুরের দাপটে মরেছে যে পিপীলিকা,
মোরা আজ দেখি জগৎ জুড়িয়া তাহাদেরি বিভীষিকা !
হটিতে হটিতে আসিয়া পড়েছি আখেরি গোরস্তানে,
মগরেব বাদে এশার নামাজ পাব কি না কে সে জানে !
খালেদ ! খালেদ ! বিবস্ত্র মোরা পরেছি কাফন শেষে,
হাতিয়ার-হারা দাঁড়ায়েছি তাই তহ্রিমা বেঁধে এসে।

---

[৫২৪] . ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম নূরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪
[৫২৫] . কাজী নজরুল ইসলাম, '*ইসলামী কবিতা*', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৬
[৫২৬] . রফিকুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৫
[৫২৭] . কাজী নজরুল ইসলাম, '*ইসলামী কবিতা*', প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯

খালেদ ! খালেদ ! কীর্তি তোমার ভুলি নাই মোরা কিছু
তুমি নাই তাই ইসলাম আজি হটিতেছে শুধু পিছু !
পুরানো দামামা পিটিয়া পিটিয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছে আজ,
আমামা অস্ত্র ছিল না ক' তবু দামামা ঢাকিত লাজ !
খালেদ ! খালেদ ! লুকাব না কিছু , সত্য বলিব আজি,
ত্যাগী ও শহীদ হওয়া ছাড়া মোরা আর সব হতে রাজি !"[৫২৮]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকের মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে নজরচ্ল তাঁর মূল বক্তব্য উপরের উদ্ধৃতিতে প্রকাশ করেছেন। আদর্শ নেতার অভাবের জন্যে মুসলমান সমাজের অধোগতি। নজরচলের ধারণা সঙ্কটকালের জন্য 'খালেদ' এর ন্যায় বীর সেনাপতি প্রকৃত যোগ্য নেতা প্রয়োজন। এই ধরনের শক্তিমান সাহসী এবং সর্বোপরি আত্মত্যাগী মানুষের অভাবের জন্যই মুসলমান সমাজের দুর্দশা। ইসলামের উজ্জ্বল শিখা যে ক্ষীয়মান তার কারণ মুসলমানের আত্মত্যাগের অভাব। মুসলমানের লোভ ও বিলাসিতা। মুসলমানের ভীরচতা ও কাপুরচ্ষতা।[৫২৯]

"বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে আমরা তখনো বসে
বিবি-তালাকের ফতোয়া খুঁজেছি ফেকা ও হাদিস চ'ষে!"[৫৩০]

উলেণ্টখিত স্ড়বকে বিদ্রোহী কবি বাঙালি মুসলিম সমাজের অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কন করেছেন। পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর শনৈ শনৈ উন্নতি নতুন নতুন বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং সেই উন্নতির দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ ও এশিয়া আফ্রিকার দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলোর উপর প্রভুত্ব ও প্রভাব বিস্ড়র অত্যন্ড় মনোযোগের সঙ্গে নজরচ্ল লক্ষ্য করেছিলেন এবং তার সঙ্গে নিজের অধঃপতিত সমাজকে তুলনা করে বেদনাহত হয়েছিলেন। এজন্য মুসলমানদের সামনে তাদের উজ্জ্বল ইতিহাসকে তোলে ধরলেন। তোলে ধরলেন তাদের ঐতিহ্যের, শৌর্য্যের, বীর্য্যের ও মহত্ত্বের কাহিনীকে। পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর

---

[৫২৮]. কাজী নজরচ্ল ইসলাম, '*ইসলামী কবিতা*', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬-৩০৮

[৫২৯]. শাহাবুদ্দীন আহমদ, *ইসলাম ও নজরচ্ল ইসলাম* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০) পৃ. ৮৪

[৫৩০]. কাজী নজরচ্ল ইসলাম, '*ইসলামী কবিতা*', প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৮

উন্নতির দিকে হতবাক হয়ে তাকিয়ে নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবার যে কোন কারণ নাই, জাতিকে সেই দীক্ষা দিলেন তিনি।[৫৩১]

মহাত্মা মোহসিন

দানবীর হাজী মোহম্মদ মোহসীন তাঁর সমস্ড় সম্পদ মানুষের কল্যাণে দান করতে দেখে কবি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তাঁকে উদ্দেশ্য করে এই কবিতাখানি লেখেনঃ

কোন আনন্দ প্রেয়সীরে পেয়ে, হে চির-ব্রহ্মচারী,
মিটিল তোমার তৃষ্ণা, করিয়া পান কোন্ রস-বারি ?
মোহাম্মদের তত্ত্ব তুমিই শিখালে ভারতে আসি'
ষড়ৈশ্বর্য্য পেয়ে মুসলিম বৈরাগী সন্ন্যাসী।"[৫৩২]

ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে ধনী লোকের সংখ্যা ছিল না বললেই চলে। এর মধ্যে এই দানবীরের আবির্ভাব কবিকে আশা জাগিয়েছে। 'ভোগে নয়, ত্যাগেই আনন্দ' কবি এ কথাটিই তাঁর কবিতায় তোলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ভারতবর্ষে এই দানবীর চির অমর হয়ে থাকবে। কবির ভাষায়ঃ

"যারা দান ক'রে, আপনারে তা'রা নিঃশেষে দিয়ে যায়,
মেঘ ঝরে যায়, ভাবে না তাহার বিনিময়ে সে কি পায়।
প্রদীপ নিজেরে তিলে তিলে দাহ করে দেয় নিজ প্রাণ,
প্রদীপই জানে, কি আনন্দ দেয় তারে এই মহাদান।
যুগে যুগে এই পৃথিবী গেয়েছে সেই মানবের জয়,
বিলায়ে দিয়েছে মানুষেরে যারা স্বীয় সব সঞ্চয়।
তুমি আলণ্ডার সৃষ্টিরে দিয়ে আলণ্ডার নিয়ামত,
তাহার দানের সম্মান রাখিয়াছ, ওগো হজরত!"[৫৩৩]

---

[৫৩১] . শাহাবুদ্দীন আহমদ, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৮৪

[৫৩২] . কাজী নজরুল ইসলাম, *'ইসলামী কবিতা'*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫

'কাব্য আমপারা'

'কাব্য-আমপারা' পবিত্র কুরআনের ত্রিশতম পারার বাংলা কাব্যানুবাদ। বিদ্রোহী কবির পবিত্র কুরআনের উপর গভীর অধ্যবসায় ও ভালোবাসার উপহার হচ্ছে এই কাব্যানুবাদ। সমকালীন প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদগণ এর উপস্থিতিতে প্রতিটি শব্দ ও ছত্র পরীক্ষা নীরিক্ষা করে পবিত্র কুরআনের এ অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেন। অনুবাদকের ভাষায়ঃ "মৌলানা মোহাম্মদ মোমতাজ উদ্দিন ফখরোল মোহাদ্দেসীন সাহেব, মৌলানা সৈয়দ আবদুর রশীদ (পাবনবী) সাহেব, মিঃ ইসকান্দার গজনভী বি. এ. সাহেব, মৌলবী কে. এম. হেলাল সাহেব ও আরও অনেক সাহেবান তাঁদের অমূল্য সময়ের ক্ষতি করে অত্যন্ড় ধৈর্য্য সহকারে আমার এই অনুবাদে শুধু সাহায্য নয়, সহযোগিতাও করেছেন, তাদের সাহায্য ব্যতিরেকে এ অনুবাদ হয়ত এতটা নির্ভুল হত না। এঁদের সকলকে আমার অন্ড়রের অন্ড়স্থল থেকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সম্মান নিবেদন করছি।"[৫৩৪] কাব্য আমপারা গ্রন্থের শুরুতে 'আরজ' শিরোনামে কবি পবিত্র কুরআন সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেন। যা এখানে উলেণ্ডখ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

"আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র "কোরআন" শরীফের বাঙলা পদ্যানুবাদ করা। সময় ও জ্ঞানের অভাবে এতদিন তা করে উঠতে পারিনি। বহু বৎসরের সাধনার পর খোদার অনুগ্রহে অন্ড়তঃ প'ড়ে বুঝবার মতো আরবী-ফার্সী ভাষা আয়ত্ত করতে পেরেছি ব'লে নিজেকে ধন্য মনে করছি। কোরআন শরীফের মত মহাগ্রন্থের অনুবাদ করতে আমি কখনো সাহস করতাম না বা তা করবারও দরকার হ'ত না- যদি আরবী ও বাঙলা ভাষায় সমান অভিজ্ঞ কোন যোগ্য ব্যক্তি এদিকে অবহিত হ'তেন।

ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্র-পুঁজি ধনরত্ন মণি-মাণিক্য সবকিছু কোরআন মজীদের মণি-মঞ্জুষায় ভরা, তাও আরবী ভাষার চাবি দেওয়া। আমরা-বাঙালি মুসলমানেরা-তা নিয়ে অন্ধ ভক্তি ভরে কেবল নাড়াচাড়া করি। ঐ মঞ্জুষা যে কোন্ মণিরত্নে ভরা, তার শুধু আভাসটুকু জানি! আজ যদি আমার চেয়ে কোন যোগ্যতর ব্যক্তিগণ এই কোরআন মজীদ, হাদীস, ফেকা প্রভৃতির বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করেন, তা হলে বাঙালি মুসলমানের তথা বিশ্ব-মুসলিম সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করবেন। অজ্ঞান অন্ধকারের বিবরে পতিত বাঙালি মুসলমানদের তাঁরা বিশ্বের আলোক-অভিযানের সহযাত্রী করার সহায়তা করবেন। সে শুভ দিন এলে আমার মত অযোগ্য লোক এ বিপুল দায়িত্ব থেকে সানন্দে অবসর গ্রহণ করবে।

---

৫৩৩ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬

৫৩৪ . আবদুল মুকিত চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪

আমার বিশ্বাস পবিত্র কোরআন শরীফ যদি সরল বাঙলা পদ্যে অনূদিত হয়, তাহলে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন-অনেক বালক-বালিকাও সমস্ড় কোরআন হয়ত মুখস্থ করে ফেলবে। এই উদ্দেশ্যেই আমি যতদূর সম্ভব সরল পদ্যে অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। খুব বেশি কৃতকার্য্য হয়েছি তা বলতে পারিনে-কেননা কোরআন পাকের একটি শব্দও এধার ওধার না করে তার ভাব অক্ষুন্ন রেখে কবিতায় সঠিক অনুবাদ করার মত দুরূহ কাজ দ্বিতীয় আর আছে কি না জানিনে। কেননা আমার কলম, আমার ভাষা, আমার ছন্দ এখানে আমার আয়ত্বাধীন নয়।"[৫৩৫]......ইতি-খাদেমূল ইসলাম-নজরচ্ল ইসলাম। কবি তার কাব্য আমপারাখানি উৎসর্গ করেন "বাঙলার নায়েবে-নবী মৌলবী সাহেবানদের দস্ড়-মোবারকে"।

তাঁর কাব্য আমপারা থেকে সুরা ইখলাসের অনুবাদ উলেণ্টখ করেই এ বিষয়ের আলোচনা শেষ করছিঃ

"বল, আলণ্টাহ এক! প্রভু ইচ্ছাময়,
নিষ্কাম নিরপেক্ষ, অন্য কেহ নয়।
করেন না কাহারেও তিনি যে জনন,
কাহারেও ঔরস-জাত তিনি নন।
সমতুল তাঁর
নাই কেহ আর।"[৫৩৬]

'মরচ-ভাস্কর'

হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের উপর লিখিত 'মরচ-ভাস্কর' একটি কাব্য গ্রন্থ (অসমাপ্ত), যার পূর্ণাঙ্গ রূপ কবি দিয়ে যেতে পারেন নি। কবির দীর্ঘকাল লালিত বাসনা আংশিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনের মাত্র পঁচিশ বছর তিনি রূপায়িত করতে পেরেছিলেন। ১৯৫০ সালে ঢাকা থেকেই 'মরচ-ভাস্কর' প্রথম প্রকাশিত হয়। কবিপত্নী প্রমীলা নজরচ্ল এই সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেনঃ

[৫৩৫] . আবদুল মুকিত চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

[৫৩৬] . আবদুল মুকিত চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

“অনেকদিন আগে দার্জিলিঙে বসে কবি এই কাব্যগ্রন্থখানি রচনা আরম্ভ করেন। তিনি তখন আধ্যাত্মিকভাবে নিমগ্ন। বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদের (সা.) এর জীবনী নিয়ে একখানি বৃহৎ কাব্যগ্রন্থ রচনার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ড় তাড়াহুড়া করে তিনি বইখানি শেষ করেন।....

-প্রমীলা নজরচ্ল ইসলাম। ২৩.৫.১৯৫৭[৫৩৭]

আবেগাপণ্ডুত কবি হলেও নজরচলের মধ্যে অন্ধতা, সত্য বা তথ্যের অপলাপ, যুক্তিহীনতা কখনো দেখা যায়নি। মরচ-ভাস্কর কাব্য গ্রন্থে অলংকারের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি’ হয়েছে সত্যি, কিন্তু রাসুলুলণ্ঢাহর (সা.) জীবনী বর্ণনায় কোনো অসত্য প্রকাশ করেনি। বোঝাই যাই যে, কবি এ বিষয়ে বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন। যেমন কবির ভাষায়ঃ

“প্রভাত-রবির স্বপ্ন হেরে গো যেমন নিশীথ একা
গর্ভে ধরিয়া নতুন দিনের নতুন অরচ্ণ-লেখা;
তেমনি হেরিছে স্বপ্ন আমিনা-যেদিন নিশীথ শেষে
স্বর্গের রবি উদিবে জননী আমিনার কোলে এসে।”[৫৩৮]

বিশ্ব ইসলামী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ আমাদের জাতীয় কবির ইসলামী কাব্য সমগ্র। ইসলামের মূল আদর্শ, সারমর্ম ও বিষয়বস্তু তাঁর ইসলামী কবিতাগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে। নজরচলের ইসলামী চিন্ড়ার উপর আমাদের আরও গবেষণা প্রয়োজন। বাংলার আলেম সমাজ সম্ভবত এখনও নজরচ্লকে চিনে নি। নজরচলের কোনো গ্রন্থ এখনও পর্যন্ড় কোনো মাদরাসায় পাঠ্যভুক্ত হয় নি। অথচ আরব বিশ্বের ও ভারতীয় ইসলামী সাহিত্যিকদের বই বাংলাদেশের বিভিন্ন মাদরাসায় সিলেবাসভুক্ত হয়ে পাঠদান চলছে। নজরচলের ইসলামী ভাবধারাকে বাংলার আলেম সমাজ যে দিন উপলব্ধি ও মূল্যায়ন করতে পারবে, সেদিনই বাংলায় ইসলামের প্রকৃত জাগরণ হবে, তার আগে নয়।

খ. নজরচ্ল ইসলাম ঃ ইসলামী গান

---

[৫৩৭]. আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

[৫৩৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ইসলামী সাহিত্যিক এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষায় ইসলামী সংস্কৃতির ভিত্তি স্থাপনে তাঁর দান অবিস্মরণীয়। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসীর বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম জাতির আশা-আকাঙ্খা প্রতিষ্ঠায় তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন।

সঙ্গীতে তাঁর দান অপরিসীম। তিনি নিজেই লিখেছেন, 'কাব্যে ও সাহিত্যে আমি কি দিয়েছি জানিনা;... কিন্তু সঙ্গীতে যা দিয়েছি, সে সম্বন্ধে আজ কোনও আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে'। "কাব্যে যেমন তিনি বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, তেমনি সঙ্গীতেও রেখেছেন অতলস্পর্শী অবদান।

নজরুল ইসলামের ইসলামী গান প্রতিটি মুসলিমের হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। তাদেরকে আল্লাহ ও নবীপ্রেমে পরিসিক্ত করে, ঈমানী দীপ্তিতে প্লাবিত হয় তাদের অন্তর্লোক।"[৫৩৯] এর আগে নজরুলের কবিতায় আমরা দেখেছি কিভাবে তিনি ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন।

সাহিত্যের যেখানেই তিনি হাত দিয়েছেন সেখানেই তিনি মণি-মুক্তা বের করে এনেছেন। "নজরুল যেমন কবিতায় অনন্য তেমনি সঙ্গীতেও বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। বিশেষ করে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিষয়-বৈচিত্র্যের সাথে সাথে সুর-বৈচিত্র্যেও তাঁর গানকে অতুলনীয় করে তুলেছে। সঙ্গীতে নজরুলের আবির্ভাব যেন এক নবযুগের সূচনা করলো। মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সুর ও বাণীর ঐতিহ্য নজরুল বাংলার ঘরে এনে স্থান দিলেন। আল্লাহ ও রাসূল প্রেমের অমিয়ধারা সিক্ত করলো বাঙালি মুসলমানের হৃদয়-মন।"[৫৪০]

নজরুলের জাগরণমূলক ইসলামী গানের সৃষ্টির পেছনে তাঁর কোন পূর্বসূরি ছিলনা। তাঁর কবিতায় ও প্রবন্ধে তিনি যেমন ইসলামী বিপ্লবের কথা বলেছেন, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষের অধিকারের কথা বলেছেন; তেমনি তাঁর সঙ্গীতেও এ জাতীয় জাগরণমূলক বক্তব্য আমরা দেখতে পাই।

কুরআন ও হাদীসের ভিত্তিতে তাঁর ইসলামী সঙ্গীত রচিত, কোন আজগুবী কিচ্ছা-কাহিনী নয়। নজরুলের ইসলামী গানে আল্লাহ ও রসুলের পরিচয়ও তিনি প্রাণ উজাড় করে গেয়েছেন। ইসলামী সঙ্গীত সংকলক

[৫৩৯] . নজরুল ইসলাম: ইসলামী গান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৫৪০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

আবদুল মুকীত চৌধুরীর মতে-ইসলাম যে শুধু শান্ড়ি ও প্রেমের নয়, সাহস, শক্তি ও বীর্যের, শুধু আধ্যাত্মিকতার নয়, মানবিকতার-মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার এবং সমাজ জীবনে ন্যায়ের নিয়ামক ভূমিকার কথা-সমাজ বিপণ্ডবের- সেই বাস্ড়বতার প্রতিফলন ও তারই মহিমময় প্রতিচ্ছবি তাঁর ইসলামী গান। তাঁর ইসলামী গানের বক্তব্য কুরআনুল কারীম ও হাদীস ভিত্তিক। তিনি আরও বলেন, "নজরচলের লেখা ইসলামী গানের পরতে পরতে ছড়ানো রয়েছে কালাম-ই-ইলাহীর বক্তব্যের নির্যাস। কোথাও শাব্দিক অনুবাদের মত, কোথাও ভাবার্থে বা বিশেণ্ঢষণমূলকভাবে-লিপিবদ্ধ রয়েছে হাদীসের শব্দগত বা ভাবানুবাদ।"[৫৪১]

ভারতীয় ইতিহাসে মুসলিম শাসনের পতনের পর মুসলমানদের মনে যে হতাশা সৃষ্টি হয়েছিল এবং হিন্দু সংস্কৃতিতে মুসলমানদের সংস্কৃতি যেভাবে ডুবে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে নজরচ্ল পতিত মুসলিম জাতিকে তাঁর ইসলামী সঙ্গীতের মাধ্যমে আশার বাণী শোনালেন। "তিনি যখন ইসলামী গান লিখলেন, তার মধ্যে এ মুমূর্ষু জাতির বঞ্চিত হৃদয়ের বেদনাকে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তোললেন-তাদের বুকে জাগালেন নব জাগরণের প্রত্যয়দীপ্ত দুর্নিবার আকাঙ্খা।"[৫৪২]

নজরচলের পূর্বে যাঁরা ইসলামী গান রচনা করেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁদের লেখা ভক্তিমূলক গান বা গীতি ছাড়া কিছুই ছিলনা। কিন্তু নজরচ্ল এখানেই ব্যতিক্রম। "তিনি ইসলামী গান বলতে কেবল কতকগুলো 'ভক্তিমূলক' গান রচনা করেন নি। জাতীয় ভাবাবেগকে উদ্দীপ্ত করতে পারে, এমন সমাজ সচেতনতা তাঁর ইসলামী গানের একটি মূখ্য উপাদান।"[৫৪৩]

নজরচলের ইসলামী গান হাফিজ, রচমী, শেখ সাদী ইত্যাদি দার্শনিকদের চিন্ড়ার সাথে বা তার ঊর্ধ্বে তুলনীয় হতে পারে। তাঁর ইসলামী গানের অনুবাদ শোনার পর সমকালীন একজন আরবী কবি শ্রদ্ধাপূর্ণ বক্তব্যে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিলেন, "ইসলামী জাগরণ ও গণ-বিপণ্ডবের সঙ্গীত-স্রষ্টা এমন কোন কবি আরব জগতে জন্ম গ্রহণ করেছেন-বলে তিনি জানেন না, যার কবিতা-গান এই সব গানের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর।"[৫৪৪]

---

[৫৪১] . প্রাগুক্ত, পৃ. আট-নয়

[৫৪২] . প্রাগুক্ত, পৃ. চৌদ্দ

[৫৪৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. চৌদ্দ

[৫৪৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. পনের

ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে এমন কোন দিক নাই যে, নজরুল ছবি আঁকার চেষ্টা করেন নি। “ইসলামের সংগ্রাম, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী ও শান্তির আবেদন নজরুলের গানে উজ্জ্বলভাবে দীপ্তিমান।”[৫৪৫]

ইসলামী গানকে গবেষকগণ বিভিন্ন ভাবে ভাগ করেছেন। যেমনঃ হামদ, না'ত ও ভক্তিমূলক ইত্যাদি। হাম্‌দ অর্থ প্রশংসা। যে সব গানে আল্লাহর প্রশংসা আছে, সেগুলোকেই হাম্‌দ বলা হয়। না'ত হযরত মুহাম্মদ (সা) এর মহিমা-গীতি ও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। উল্লেখিত গ্রন্থে সম্পাদক নজরুল রচিত ইসলামী গানগুলোকে জাগরণ, হাম্‌দ, মরমী ও না'ত ইত্যাদি শিরোনামে গ্রন্থিত করেছেন। উল্লেখ্য কবি তাঁর ‘জুলফিকার’ কাব্য গ্রন্থে যে সমস্ত ইসলামী গান সংকলন করেছেন, তার অধিকাংশই ছিল জাগরণমূলক।

সম্পাদকের বিন্যাসুনাযায়ী এখানে উপরোল্লেখিত গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি তোলে ধরতে চাই, যা নজরুলের ইসলামী সাহিত্যে বিচরণ সম্পর্কে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হবে।

মোনাজাত

তওফিক দাও খোদা [ইমন মিশ্র পোস্তা]

‘তওফিক দাও খোদা’ গানটিতে মুসলিম জাহানের পুনর্জাগরণ চেয়ে কবি তার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা উদ্ধারের আশা ব্যক্ত করে কবি বলেনঃ

“তওফিক দাও খোদা ইসলামে
মুসলিম-জাহাঁ পুনঃ হোক আবাদ।
দাও সেই হারানো সালতানাত,
দাও সেই বাহু, সেই দিল আজাদ।।”[৫৪৬]

ইসলামের যাত্রা কালে যে সমস্ত বীর মোজাহিদগণ শৌর্য-বীর্য দেখিয়েছেন, যাঁদের অবদানে ইসলাম দ্রুত প্রসার লাভ করে, দুনিয়া থেকে পাপ কালিমা দূর হয় ও মজলুমরা মুক্তি পায়, কবি তাঁদের মত মুসলিম বীরের আগমন চেয়েছেন এই পতিত মুসলিম জাতির মধ্যে।

---

[৫৪৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. আঠার

[৫৪৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

"দাও সেই হামজা সেই বীর ওলিদ

দাও সেই ওমর হারুন-অল-রশীদ,

দাও সেই সালাহউদ্দীন আবার

পাপ দুনিয়াতে চলুক জেহাদ।।"[৫৪৭]

আলণ্টাহ্ তুমি রক্ষা কর [কোরাস]

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের পতন তথাকথিত মুসলমানদের ভোগ-বিলাসিতা দেখে কবি হযরত ওমরের উদাহরণ দিয়ে মহান আলণ্টাহর কাছে নিবেদন করেছেন এই দুনিয়াকে রক্ষা করার জন্য। মুষ্টিমেয় আরববাসী যে ঈমানের জোরে হাজার বছর পৃথিবী শাসন করার সুযোগ পেয়েছিল, নজরুল মহান আলণ্টাহর নিকট তাই প্রার্থনা করেন। তিনি বলেনঃ

"হায়! যে-জাতির খলিফা ওমর শাহান্‌শাহ হ'য়ে

ছেঁড়া কাপড় প'রে গেলেন উপবাসী র'য়ে,

আবার মোদের সেই ত্যাগ দাও, খোদা

ভোগ-বিলাসে মোদের জীবন করো না মলিন।

আমিন, আলণ্টাহুম্মা আমিন।।"[৫৪৮]

শোনো শোনো য়্যা ইলাহি

মহান আলণ্টাহর প্রতি কবি যে কত সুন্দর ভাষায় শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ও তাঁর নিকট প্রার্থনা করেছেন তাঁর অসংখ্য গানের কলিই এর প্রমাণ। নিম্নের এই গানটিও তেমনি এক হৃদয়স্পর্শকারী আবেদন। প্রচলিত ধারণায় বলা হয়ে থাকে আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় যে মানের ইসলামী সাহিত্য আছে সেই মানের সাহিত্য বাংলা ভাষায় নেই। কিন্তু নজরুলের ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নে আমাদের সেই ভুল ধারণা ভেঙ্গে যায়। আমাদের বিশ্বাস নজরুলের সাহিত্য পৃথিবীর যেই কোন ভাষার ইসলামী সাহিত্যের সাথে তুলনা হতে পারে। যেমনঃ কবি কত সুন্দর করেই না বলেছেনঃ

"শোনো শোনো য়্যা ইলাহি

আমার মোনাজাত।

---

[৫৪৭] .প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

[৫৪৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

তোমারি নাম জপে যেন

হৃদয় দিবস-রাত।।"[৫৪৯]

গানটির শেষের দিকে কবি বলেনঃ

"আমায় দিয়ে কারও ক্ষতি হয় না যেন দুনিয়ায়।

আমি কারচ্চ ভয় না করি; মোরেও কেহ ভয় না পায়।"[৫৫০]

তুমি যে রহমান

কবি এই গানে আলণ্ঢাহর নিকট রহমত কামনা করেছেন। দুনিয়ার মায়া-মহব্বতে মানুষ খোদা তা'য়ালাকে ভুলে যায়, বাজে কাজে সময় নষ্ট হয়ে যায়, আলণ্ঢাহকে আর ডাকা হয়ে ওঠেনা। কবি সেই দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ

"আলণ্ঢাজী, আলণ্ঢাজী রহম কর

তুমি যে রহমান।

দুনিয়াদারীর ফাঁদে প'ড়ে

কাঁদে আমার প্রাণ।।"[৫৫১]

সংসার ঝামেলা ছেড়ে একাগ্র চিত্তে কবি আলণ্ঢাহকে ডাকতে চান। সংসার ও দুনিয়ার ঝামেলার কারণে কবি আলণ্ঢাহকে আন্ড়রিকভাবে ডাকতে পারেন না। তাই কবি বলেনঃ

"দাও অবসর তোমায় ডাকার

এই বেদনা সহেনা আর

সংসারের এই দোজখ হ'তে

কর মোরে ত্রাণ।।"[৫৫২]

দরিয়ায় ঘোর তুফান [জংলা-দাদরা]

---

৫৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৫৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৫৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

দুনিয়ায় আমরা অনেক সময় ব্যথা পেয়ে আলণ্ঢাহকে গালি দিয়ে থাকি। আবার আলণ্ঢাহর কাছেই কাকুতি-মিনতি করি। কবি এটাকে মায়ের সাথে শিশু সন্ড়ানের যে আচরণ হয় তার সাথে তুলনা করে বলেনঃ

"মা'র কাছে মার খেয়ে শিশু যেমন মাকে ডাকে,

যত দাও দুখ শোক, ততই ডাকি তোমাকে।

জানি শুধু তুমি আছ, আসিবে আমার ডাকে,

তোমারি এ তরী প্রভু, তুমি চল বাইয়া।।"[৫৫৩]

তোমার নাম নিয়ে খোদা

বিপদে-আপদে, সুখে-শান্ড়িতে সর্বদাই আমরা যেন আলণ্ঢাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকি। মান-সম্মান, ইজ্জত বা বেইজ্জত সবই আলণ্ঢাহর পক্ষ থেকে আসে। যেই কোন অবস্থায় আলণ্ঢাহকে যেন ভুলে না যাই। তাই কবি বলেনঃ

"সুখ-দুঃখ যশ নিন্দা

মান ও অপমান,

আমার বলে নাই তো কিছু

সবই তোমার দান,

(যত) বাইরে আঘাত আসে তত

তোমায় যেন ধরি।।"[৫৫৪]

ক্ষমা সুন্দর আলণ্ঢা [দ্বৈত-সঙ্গীত]

কবি এখানে আলণ্ঢাহকে তার বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বন্ধুর প্রতি অভিনয় করে তিনি তাঁর আখিরাতের দাবি আদায় করার চেষ্টা করেছেন। দুনিয়ায় আসার কারণেই আজ মানুষকে বেহেশত ও দোযখ নিয়ে চিন্ড়া করতে হচ্ছে। দোযখের ভয় যেন আলণ্ঢাহ তাঁর বান্দাকে না দেখান। বান্দার প্রতি তাঁর সৃষ্টিকর্তার অসীম করুণা রয়েছে, এটা কবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেই বলেনঃ

"কেন দুনিয়ায় পাঠাইলে, কেন গুনাহের বোঝা দিলে

তুমি ত জানিতে দুনিয়ায় পুড়িব মরিব যে তিলে তিলে।

---

[৫৫৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[৫৫৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

হেথা পদে পদে করি অপরাধ,

তোমারে পাওয়ার তবু জাগে সাধ

অপরাধ শুধু দেখ কি গো তুমি, রোদন দেখ না তার।।”[৫৫৫]

দুনিয়ার জীবন সহজ নয়। অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুম ইত্যাদি বেড়াজালের মধ্যেই জীবন কাটাতে হয়। কোনো ভালো কাজ করতে গেলেই পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বাধা-বিপত্তি আসে। এইজন্য আলণ্ডাহ যেন আজাব না দেন তিনি সেই আবেদনও আলণ্ডাহর কাছে করেন। কবি বলেনঃ

“তুমি জান স্বামী, তব পথে কত কণ্টক, কত বাধা,

যে পথে যাই সেই পথে লাগে দুনিয়ার ধুলো-কাদা।”[৫৫৬]

তুমি রহিমুর রহমান

সারা জীবন এই ভবের খেলায় কেটে গেলো কবির। জীবনের শেষ প্রান্তে তিনি আলণ্ডাহকে উপলব্ধি করতে পারলেন। দুনিয়ার মায়ায় পড়ে তিনি আলণ্ডাহকে ভুলে গিয়েছিলেন। কবির এখন হুঁশ ফিরে এসেছে। তিনি আলণ্ডাহর নিকট তওবা করে সঠিক পথে ফিরে আসার আকুতি জানিয়েছেন এই গানে। কবি বলেনঃ

“তুমি রহিমুর রহমান, আমি গুণাহ্‌গার বান্দা।

হাত ধরে মোর পথ দেখাও, য়্যা আলণ্ডাহ আমি আন্ধা।।”[৫৫৭]

আমার যখন পথ ফুরাবে

খোদার দিদার কামনায় কবি দীর্ঘ সময় যাবৎ অপেক্ষা করছেন। সারা জীবনই কবি তার স্রষ্টার সান্নিধ্য পাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পাননি। বিদায়ের এই বেলায় আর যেন এই সুযোগ তার হাত ছাড়া না হয়। তাই কবি আবেগের সাথে তাঁর এই গান ধরেনঃ

“আমার যখন পথ ফুরাবে,

আসবে গহীন রাতি

তখন তুমি হাত ধ’রো মোর

---

[৫৫৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

[৫৫৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

[৫৫৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫

হয়ো পথের সাথী।।"[৫৫৮]

মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই

ইসলাম ধর্মের ইবাদতের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে মসজিদ। কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর জীবনের একটা বিরাট সময় এই মসজিদে কাটিয়েছেন। তিনি ছিলেন একাধারে মসজিদের মোয়াজ্জিন, ইমাম, খতীব ও মকতবের শিক্ষক। স্বাভাবিক কারণেই মসজিদের প্রতি তাঁর আবেগ ছিল সাধারণ মুসলমানের চেয়ে অনেক বেশি। আর সেই আবেগকে সকলের করে তিনি এমনভাবে প্রকাশ করলেন যা ইসলামী সাহিত্যের হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বললেও অত্যুক্তি হবে না। মসজিদের প্রতি অতুলনীয় দরদ থাকার কারণেই এই ধরনের সাহিত্য তাঁর মাধ্যমে প্রকাশ সম্ভব হয়েছে বলে মনে হয়। কবির এই কবিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেই বাংলাদেশ সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে কবিকে কবরস্থ করেন। সম্ভবত কবির স্বপ্নও পূরণ হয়েছে। কবি গেয়েছিলেনঃ

"মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই।
যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আজান শুনতে পাই।।
কত পরহেজ্‌গার খোদার ভক্ত নবিজির উম্মত্‌
ঐ মস্‌জিদে করে রে ভাই কোরান তেলাওত্‌।
সেই কোরান শুনে' যেন আমি পরাণ জুড়াই।।"[৫৫৯]

আলণ্ঢাহ্‌ আমার করো না বিচার

আমি ভিখারী, আমি নিঃস্ব, আমি অপরাধী ও আমি গুণাহগার। তুমি রহমান, তুমি গাফ্‌ফার। তুমি ক্ষমা করাকে পছন্দ কর। কিয়ামতের দিন তুমি আমাকে বিচারের কাঠগড়ায় নিওনা। বিচার যদিই করবে তাহলে তুমি কেন রহমান নাম ধারন করেছ? তুমি কেন গাফ্‌ফার নাম আমাদের নিকট প্রচার করেছ? আমি তোমার নিকট তোমার দয়া ভিক্ষা করছি। তুমি আমায় দয়া কর। কবির ভাষায়ঃ

রোজ হাশরে আলণ্ঢাহ আমার করো না বিচার।
বিচার চাহে না, তোমার দয়া চাহে এ গুণাহ্‌গার।।
আমি জেনে' শুনে' জীবন ভ'রে

---

[৫৫৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫
[৫৫৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

দোষ করেছি ঘরে পরে,

আশা নাই যে যাব ত'রে বিচারে তোমার।।"[৫৬০]

যেদিন তুমি হবে কাজী

এ গানটিতেও পূর্ববতী গানের ভাবই দেখা যায়। বিচারের সময় আলণ্ঢাহ যেন কবিকে রহম করেন বা খাতির করেন, সে আশাই ব্যক্ত হয়েছে কবির প্রাণ থেকেঃ

"যেদিন রোজ হাশরে করতে বিচার

তুমি হ'বে কাজী,

সেদিন তোমার দীদার আমি

পাব কি আলণ্ঢাজী।।"

জাগরণী

এই পর্বে আমরা দেখতে পাই কবি নজরচ্ল ইসলামের এমন কিছু জাগরণী গান, যেগুলোর মাধ্যমে তিনি ইসলামের জাগরণ চেয়েছেন। আলণ্ঢাহ ও রাসুলকে (সা.) ও ইসলামের বিভিন্ন ঘটনাকে উপজীব্য করে এমন কিছু গান রচনা করেছেন, যেগুলোকে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ইসলামী গান বললে অত্যুক্তি হবে না। যা ইসলামী সাহিত্যের এক বিরাট সংযোজন।

আলণ্ঢাহ আমার প্রভু [ভৈরবী-কার্ফা]

একজন প্রকৃত মু'মিনের পরিচয় কবি এই গানের মাধ্যমে তোলে ধরেছেন। বর্তমান বিশ্বে মুসলমানরা তাদের আত্মপরিচয় পর্যন্ড় ভুলে যাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে নিজের পরিচয় গোপনও রাখছে। ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু প্রভাবে অনেক মুসলমান কবরপূজা, পীরপূজা ও বিভিন্ন কুসংস্কারে নিজের অজান্ড়েই জড়িয়ে পড়ে প্রকৃত ইসলামী ভাবধারা থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে। একজন মুসলমান হিসেবে তার কি কি নীতি অনুসরণ করে চলা উচিৎ কবি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা ব্যক্ত করেছেনঃ

"আলণ্ঢাহ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।

আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়।।

আমার কিসের শঙ্কা,

[৫৬০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

কোর্‌আন আমার ডঙ্কা,

ইস্‌লাম আমার ধর্ম্ম, মুসলিম আমার পরিচয়।।

কলেমা আমার তাবিজ, তৌহীদ আমার মুর্শিদ,

ইমান আমার বর্ম্ম, হেলাল আমার খুর্শিদ্‌ ।

'আলণ্টাহু আক্‌বর' ধ্বনি

আমার জেহাদ-বাণী

আখের মোকাম ফেরদৌস্‌ খোদার আরশ যথায় রয়।।"[৫৬১]

জাগ্‌ মুসাফির

আর বেশি দিন নাই। অনেক সময় ঘুমে কেটে গেছে। কবি মূলত এই গানের মাধ্যমে ঘুমন্ড় মুসলিম জাতিকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন। ধর্মের কাজে অবহেলা করে সারা জীবন কেটে গেল, তাতেও মুসলমানদের হুঁশ হলো না। এই দুনিয়া একটি মুসাফিরখানা ছাড়া কিছু নয়। হাদীসে এসেছে, 'তুমি দুনিয়ায় এমনভাবে চলো যেন তুমি একজন মুসাফির'। মুসাফির যদি ঘুমিয়ে থাকে, তাহলে তো সে নির্দ্দিষ্ট সময়ে তার গন্ড়ব্যে স্থানে পৌঁছাতে পারবে না। কবি হৃদয় দিয়ে, প্রাণ দিয়ে তাঁর মুসলিম ভাইদের আহ্বান করে বলেনঃ

"ভোর হ'ল ওঠ্‌, জাগ্‌ মুসাফির, আলণ্টা-রসুল বোল্‌।

গাফলিয়াতি ভোল্‌ রে অলস, আয়েশ আরাম ভোল্‌।।

এই দুনিয়ার সরাইখানায়

(তোর) জনম গেল ঘুমিয়ে হায়!

ওঠ্‌ রে সুখ-শয্যা ছেড়ে, মায়ার বাঁধন খোল্‌।।

যে দিন আজো আছে বাকী

খোদারে তুই দিসনে ফাঁকি

আখেরে পার হবি যদি পুল্‌সিরাতের পোল।।

আলণ্টা-রসুল বোল্‌।।"[৫৬২]

---

৫৬১ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

বক্ষে আমার কাবার ছবি [সিন্ধু-বাগেশ্রী-কাহারবা/কার্ফা]

পবিত্র মক্কা ও মদীনাকে মুসলিম মাত্রই ভালোবাসেন। কারণ সেখানে রয়েছে ইসলামের দুটো গুরচত্বপূর্ণ মসজিদ। আরও রয়েছে মুসলমানদের প্রাণের প্রিয় মানুষ হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর জন্মস্থান ও তাঁর স্মৃতি বিজড়িত বিভিন্ন গুরচত্বপূর্ণ ইতিহাস। ইব্রাহীম (আ.) এর স্মৃতি ও পবিত্র হজ্জের কার্যক্রমও এই স্থানকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ জাতীয় আরও বিভিন্ন গুরচত্বপূর্ণ কারণে এ স্থান মুসলমানদের নিকট প্রাণের চেয়েও পবিত্র। কবি এ স্থানের প্রতি তাঁর ভালোবাসা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেনঃ

"বক্ষে আমার কা'বার ছবি

চক্ষে মোহাম্মদ রসুল।

শিরোপরি মোর খোদার আরশ

গাই তারি গান পথ-বেভুল।।"[৫৬৩]

ঘোষণা

ইসলামে কোন বংশ গৌরব নেই। আশরাফ-আতরাফ বা ছোট বড় নেই। সকল মুসলমানকে হাতে হাত ধরে কবি এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন এই গানে। হজরত আলীর শৌর্য, ওমরের কর্ম, খালেদের বীরত্ব ও হোসেনের ত্যাগ ইত্যাদি উলেণ্ঢখ করে কবি মুসলিম সমাজকে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেন এবং এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। ইসলাম যে পরের গোলামী করতে নিষেধ করেছেন, সে কথা গানের শেষাংশে তিনি উলেণ্ঢখ করেন। কবির ভাষায়ঃ

হাতে হাত দিয়ে আগে চল্, হাতে

নাই থাক হাতিয়ার।

জমায়েত হও, আপনি আসিবে

শক্তি-জুলফিকার।।

আনো আলীর শৌর্য্য, হোসেনের ত্যাগ,

ওমরের মত কর্ম্মানুরাগ;

---

[৫৬২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

[৫৬৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

খালেদের মত সব আলস্য

ভেঙ্গে কর একাকার।।

চাকর সাজিতে, চাকুরী করিতে

ইসলাম আসে নাই পৃথিবীতে।

মরিবে ক্ষুধায় কেহ নিরন্ন,

কারো ঘরে রবে অঢেল অন্ন-

এ জুলুম সহে নিক ইসলাম,

সহিবে না আজও আর।।"[৫৬৪]

কোথায় তখ্‌ত তাউস [খাম্বাজ-কার্ফা]

আজ মুসলমানদের রাজ সিংহাসন কোথায়, বাদশাহী কোথায়, বীর খালেদ, তারেক ও মুসা এঁরা কোথায় বা এদের তরবারী কোথায়? কবি সমস্ড় মুসলিম বিশ্বের কোথাও তাঁদের মত কোন মুসলিমকে খোঁজে না পেয়ে বড়ই আফসোস করেছেন। উমর (রা.) যে জোশ নিয়ে দুনিয়া জয় করেছিলেন সে জোশও আজ মুসলমানদের মধ্যে নেই। তাই কবি বলেনঃ

"কোথায় তখ্‌ত তাউস, কোথায় সে বাদশাহী,

কাঁদিয়া জানায় মুসলিম ফরিয়াদ য়্যা এলাহী।।

কোথায় সে বীর খালেদ, কোথায় তারেক, মুসা,

নাহি সে হজরত আলী, জুলফিকার নাহি।।

নাহি সে ওমর খাত্তাব, নাহি সে জোশ্‌,

করিল জয় যে দুনিয়া, আজ নাহি সে সিপাহী।।"[৫৬৫]

জাগে না সে জোশ ল'য়ে [ভৈরবী-কার্ফা]

ইসলাম আজ শুধু কিতাবেই সীমাবদ্ধ। যে সমস্ড় মুসলমানরা দুনিয়ার মালিক ছিল আজ তারা ফকির ও পথের ভিখারী। কবি এই অবস্থাকে মুসলিম গোরস্ড়ান বলে উলেণ্ঢখ করেছেন। আবু বকর সিদ্দিকের

[৫৬৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

[৫৬৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

সত্যতা আর বেলালের ঈমান আজ আর নাই। কবি খুব দুঃখের সাথে মুসলিম জাতির এই পতিত অবস্থার কথা উচ্চারণ করেনঃ

জাগে না সে জোশ ল'য়ে আর মুসলমান।

করিল জয় যে তেজ ল'য়ে দুনিয়া জাহান।।

যাহার তক্‌বীর ধ্বনি

তক্‌দীর বদলালো দুনিয়ার,

নাফরমানি জমানায়

আনিল ফরমান খোদার,

পড়িয়া বিরান আজি সে বুলবুলিস্তান।।"[৫৬৬]

ভুবন জয়ী তোরা কি সেই

কবি মুসলমানদের পূর্ব ইতিহাসকে সিংহের সাথে তুলনা করে মুসলমান জাতির গৌরব বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকাতে মুসলমানরা একসময় বিজয়ের নিশান উড়িয়ে ছিল। তাদের শক্তির কাছে পারস্য আর রোম রাজত্ব মাথা নত করেছিল। তার কারণ ছিল মুসলমানরা তখন ভোগ-বিলাসী ছিল না। তাদের খলীফা শুকনো রুটি খেজুর খেয়ে অর্দ্ধেক জাহান শাসন করেছিল। যখন মুসলমানদের মধ্যে অলসতা ও জড়তা প্রবেশ করে তখন থেকেই মুসলমান রাজত্বের পতন হতে থাকে এবং বর্তমানে শৃগাল পর্যায়ে এসে পৌঁছায়। এই গানে কবি তার স্বজাতি ভাইদের প্রতি আক্ষেপ করে বলেনঃ

"ভুবন-জয়ী তোরা কি হায়, সেই মুসলমান।

খোদার রাহে আন্‌ল যারা দুনিয়া না-ফরমান।।

শুকনো রুটি খোর্মা খেয়ে যাদের খলিফা

হেলায় শাসন করিল রে অর্দ্ধেক জাহান।।

সিংহ-শাবক ভুলে আছিস্‌ শৃগালের দলে,

দুনিয়া আবার পায়ে কি তোর হবে কম্পমান।।"[৫৬৭]

---

[৫৬৬]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫

আমরা সেই সে জাতি

সাম্য ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা করার জন্য পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলমানরাই সবচেয়ে বেশি সংগ্রাম করেছেন। আরব মরচভূমিতে যেই অনাচার ও জুলুম চলছিল তা সমসাময়িককালে নবীজী (সা.) ও তাঁর সাহাবীরা (রা.) দূরীভূত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানরা পৃথিবীতে গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অবহেলিত নারী জাতিকে ইসলামই মুক্তি দেয় বলে ইতিহাসে তার প্রমাণ। কবির ভাষায়ঃ

"ধর্ম্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি।
সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি-
আমরা সেই সে জাতি।।"[৫৬৮]

কোথা সে মুসলমান

কুরআনের শিক্ষা পেয়ে সমকালীন সাহাবী ও তাবেয়ীদের মধ্যে যে শক্তি ও হিম্মত ছিল আজ মুসলমানদের মধ্যে তা নেই। তারা আলণ্ঢাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পেতেন না। তারা ইসলামের জন্য হিজরত করেছেন। ইসলামের প্রচার-প্রসারের জন্য পরিবার-পরিজনকে আলণ্ঢাহর উপর ছেড়ে পৃথিবীর অজানা গন্ড়ব্যে চলে গিয়েছিলেন। শুধু তৌহীদ ও একত্ববাদের নেশায় পড়েই তারা তা করেছিলেন। আজ আর সেই মুসলমান আমাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। কবি সেই দিকেই ইঙ্গিত করে বলেনঃ

"আলণ্ঢাহ্‌তে যাঁ'র পূর্ণ ঈমান, কোথা সে মুসলমান
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাহার জীবন মৃত্যু-জ্ঞান।
যাঁর মুখে শুনি' তৌহীদের কালাম
ভয়ে মৃত্যুও করিত সালাম;
যাঁর দীন্ দীন্ রবে কাঁপিত দুনিয়া জিন্-পরী ইন্‌সান।।
স্ত্রী-পুত্রে আলণ্ঢারে সঁপি জেহাদে যে নির্ভীক
হেসে' কোরবাণী দিতে প্রাণ হায়, আজ তা'রা মাগে ভিখ্!
কোথা সে শিক্ষা আলণ্ঢাহ ছাড়া

[৫৬৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬
[৫৬৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

ত্রিভুবনে ভয় করিত না যা'রা

আজাদ করিতে এসেছিল যা'রা সাথে ল'য়ে কোর্‌আন।।"[৫৬৯]

বিশ্ববিজয়ী

কবি বর্তমান বিশ্বে অধঃপতিত মুসলিম জাতিকে দেখে তার এই অবনতির কারণ বর্ণনা করেছেন এই গানে। কবি বলেনঃ

"খোদায় পাইয়া বিশ্ববিজয়ী হ'ল একদিন যা'রা।

খোদায় ভুলিয়া ভীত পরাজিত আজ দুনিয়ায় তা'রা।।

খোদার নামের আশ্রয় ছেড়ে

ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ফেরে,

এসে শয়তান ভোগ-বিলাসের

কাড়িয়া লয়েছে ইমান তাদের

খোদারে হারায়ে মুসলিম আজ হয়েছে সর্ব্বহারা।।"[৫৭০]

তুইও ওঠ্ জেগে [মার্চের সুর]

ভারতবর্ষের মুসলমানদের অচেতনতা দেখে কবি তাদেরকে আসহাবে কাহাফের সাথে তুলনা করেছেন। যারা একটি গুহায় হাজার বছর ঘুমিয়ে ছিলেন। বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশে ইসলামী জোশ নিয়ে মুসলমানরা জেগে ওঠছে দেখে কবি খুব আশান্বিত হয়েছিলেন যে এই ঢেউ ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যেও এসে লাগবে। তাই কবি তাদেরকে উদ্দীপনামূলক গান লিখেনঃ

''দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দ্বীন-ই-ইসলামী লাল মশাল।

ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ্ জেগে তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল।।"[৫৭১]

বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা [ইমন মিশ্র-একতালা]

কুরআন সাথে থাকলে মুসলমানদের কোনো চিন্ড়া নেই। ধন-সম্পদের লোভ করলে মুসলমানদের পতন হবেই। যতদিন তাদের সাথে কুরআন-সুন্নাহ ছিল, যতদিন তারা লোভ থেকে দূরে ছিল, ততদিন তাদের

---

৫৬৯ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭

৫৭০ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

৫৭১ . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

হাতে পৃথিবীর ক্ষমতা ছিল। কবি এই গানের মাধ্যমে এখনও আশা পোষণ করছেন; মুসলমানদের হৃত গৌরব আবার ফিরে আসবে।

"মুখেতে কলেমা হাতে তলোয়ার,
বুকে ইসলামী জোশ্ দুর্ব্বার,
হৃদয়ে লইয়া এশ্‌ক্ আলণ্ডার
চল্ আগে চল্ আগে বিষাণ।
ভয় নাই তোর গলায় তাবিজ্
বাঁধা যে তোর পাক কোরান।।
নহি মোর জীব ভোগ-বিলাসের,
শাহাদাৎ ছিল কাম্য মোদের,
ভিখারীর সাজে খলিফা যাদের
শাসন করিল আধা জাহান।
তা'রা আজ প'ড়ে ঘুমায় বেহোঁশ্
বাহিরে বহিছে ঝড় তুফান।।
ঘুমাইয়া কাজা করেছি ফজর,
তখনো জাগিনি যখন জোহর,
হেলা ও খেলায় কেটেছে আসর,
মাগরেবের আজ্ শুনি আজান।
জামাত্-সামিল হও রে এশাতে
এখনো জামাতে আছে স্থান"[৫৭২]

আসমানে কোরআন্

কবি এখানে কুরআনের প্রতি আবেগ প্রকাশ করে বলেন, আসমান থেকে আলণ্ডাহ যে কুরআন নাযিল করেছেন তা সোনালী হরফে লেখা, তা রূপালী হরফে লেখা। মুসলমানরা যেন এই কুরআন বেশি বেশি

---

[৫৭২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১

পড়ে। কেউ যদি আলণ্ডাহ তা'য়ালার ভালোবাসা চান, তাহলে তিনি যেন পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেন। আর এই কুরআনের মাধ্যমেই খোদা তায়ালার আরশকে পর্যন্ড় খোঁজে পাওয়া সম্ভব। কবির ভাষায়ঃ

"খোদার আরশ লুকিয়ে আছে ঐ কোরানের মাঝে,

খোঁজে ফকির দরবেশ সেই আরশ সকাল সাঁজে।

খোদার দীদার চাস্‌রে যদি,

পড় এ কোরান নিরবধি;

খোদান নূরের রওশনীতে রাঙ্‌রে দেহ প্রাণ।।"[৫৭৩]

সকাল হ'ল শোন্ রে আজান

প্রতিদিন সকাল সকাল কাজ শুরচ করতে পারলে মানুষের জীবনটা অনেক সুন্দর হয়। ফজরের নামাযের আজানের সাথে সাথে সাথে কবি তার অনুসারীদের কাজ শুরচ করতে বলেন। আজান শোনার পরেও শয়তান যেন আমাদেরকে আর বেশিক্ষণ আটকিয়ে রাখতে না পারে, সেই জন্য শয্যা ছেড়ে দ্রচত মসজিদে চলে যাওয়ার জন্য কবি আকাঙ্খা পোষণ করেন। ওজু করলে মানুষের শরীরের দুর্বলতা কমে যায়। শরীরে সতেজতা আসে। কবি বলতে চান খোদার নামে কাজে নামলে সেই কাজ আলণ্ডাহর বান্দার জন্য সহজ হয়ে যাবে। কবির ভাষায়ঃ

"সকাল হ'ল শোন্ রে আজান, ওঠ্ রে শয্যা ছাড়ি'

মসজিদে চল্ দীনের কাজে, ভোল্ দুনিয়াদারী।।

ওজু ক'রে ফেল্‌রে ধুয়ে নিশীথ রাতের গণ্ডানি,

সিজ্‌দা করে জায়নামাজে ফেল্‌রে চোখের পানি,

খোদার নামে সারা দিনের কাজ হবে না ভারি।।"[৫৭৪]

চল্ নামাজে চল্

কবির এই গানে নামায সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীসের অনুবাদের আভাস পাওয়া যায়। মানুষের দেহ ও মন পরিষ্কার করে। প্রতিদিন আলণ্ডাহকে পাঁচবার ডাকার নির্দেশ আছে। কিন্তু এটাও তাঁর বান্দারা ঠিকভাবে পালন করতে চায় না। অথচ তিনি আমাদের প্রতি কতইনা রহম করছেন। বেনামাজীর কবরে যে অন্ধকার

[৫৭৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

[৫৭৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

হবে, সেই অন্ধকার কবরকে একমাত্র নামাজই আলোকিত করতে পারে বলে কবি মত প্রকাশ করেন। কবি বলেনঃ

তুই হাজার কাজের অছিলাতে নামাজ করিস্ কাজা,
খাজনা তারি দিলি না, যে দীন্ -দুনিয়ার রাজা;
তারে পাঁচবার তুই করবি মনে তাতেও এত ছল!
ওরে চল্ নামাজে চল্ ।।"
কার তরে তুই মরিস্ খেটে, কে হবে তোর সাথী;
বে-নামাজীর আঁধার গোরে কে জ্বালাবে বাতি;
খোদার নামে শির লুটায়ে জীবন কর্ সফল।
ওরে চল্ নামাজে চল।।"[৫৭৫]

খুশীর ঈদ্ [পিলু-কার্ফা]

এই গানটি বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে প্রতি বছর রমজানের ঈদের আগে ও পরে ঘরে ঘরে শুনতে পাওয়া যায়। ছেলে-মেয়েদের মোবাইলে ও টিভি চ্যানেলে কিছুক্ষণ পর পরই বাজতে থাকে। রোজাদারের মনে এই গান এক আধ্যাত্মিক আবেদন সৃষ্টি করে। কিন্তু কবি এই গানের সাথে ইসলামের পঞ্চস্ড়ম্ভ জাকাতকে আমাদের সামনে নিয়ে এসেছেন। রমজানের বড় শিক্ষা হচ্ছে অভাবী ও ক্ষুধার্ত মানুষের মানবিক অবস্থা উপলব্ধি করা। কবি ধনীদের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, আজ তোমরা সবকিছু আলণ্ঢাহর রাস্ড়ায় দিয়ে দাও। গরীব, অসহায় ও এতীম যারা নিত্যদিন রোজা রাখে ও যারা নিত্যদিন উপবাসী তাদের পাশে তোমরা দাঁড়াও এবং তাদের জন্য তোমরা উপকারী হও। সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রচতা ভুলে গিয়ে বিশ্বের সকল ইসলামী মুরীদদের এক হওয়ার আহ্বান জানান কবি তাঁর এই কবিতায়ঃ

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ্।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্ আসমানী তাকিদ্।।
তোর সোনাদানা বালাখানা সব রাহে লিলণ্ঢাহ্
দে জাকাত্, মুর্দ্দা মুসলিমের আজ ভাঙাইতে নিদ।।

---

[৫৭৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬

তুই পড়বি ঈদের নামাজরে মন সেই সে ঈদগাহে

যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ।।”[৫৭৬]

নতুন চাঁদের তক্‌বীর শোন্‌

কবি এই গানে হজরত ইব্রাহীম (আ.) এর কোরবানীর কথা, ত্যাগের কথা মুসলমানদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান। শুধু পশু কোরবানী নয়, মানুষের পশুত্বকে কোরবানী করতে হবে। মানুষের মনের মধ্যে যত রকমের কাম, ক্রোধ ও লোভ-লালসা আছে এইগুলো পশুর গুণাবলী, আজ বকরীদে পশু কোরবানীর সাথে এইগুলোও কোরবানী দেওয়ার বা ত্যাগ করার আহ্বান জানান কবিঃ

“এল স্মরণ করিয়ে দিতে ঈদজ্জোহার এই সে চাঁদ,

(তোরা) ভোগের পাত্র ফেল্‌ রে ছুঁড়ে, ত্যাগের তরে হৃদয় বাঁধ।।

কোরাস ঃ কোরবাণী দে তোরা, কোরবাণী দে।।

প্রাণের যে তোর প্রিয়তম আজকে সে সব আন্‌,

খোদার রাহে আজ তাহাদের করবে কোরবাণ,

কি হবে ঐ বনের পশু খোদারে দিয়ে

(তোর) কাম ক্রোধাদি মনের পশু জবেহ্‌ কর্‌ নিয়ে।।

কোরাস্‌ ঃ কোরবাণী দে, তোরা কোরবাণী দে।।”[৫৭৭]

ঈদজ্জোহার চাঁদ [ভৈরবী - কার্ফা]

কবি ভারতবর্ষের মুসলমানদের ইংরেজদের অত্যাচর-জুলুম থেকে বাঁচার জন্য মুসলমানদের শাহাদাতের পথ গ্রহণের জন্য বিভিন্ন লেখায় আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আজকের এই কোরবানীর দিনে হজরত ইব্রাহীম (আ.) যেমন আলণ্ঢাহর নির্দেশে তাঁর প্রিয় পুত্রকে কোরবানী দেন, ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের মুসলমানদের মুক্তির জন্য ও ইসলামের মুক্তির জন্য যুবকদের শহীদী তামান্না নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। বাংলার গ্রামে গ্রামে যে ঘরোয়া বিবাদ চলে তা বন্ধ করে মুসলমানদের মধ্যে একতা সৃষ্টি করার প্রতি কবি এই গানের শেষাংশে উলেণ্ঢখ করেন। তাকে আরাফাতের ময়দানের একতা ও হজের সওয়াবের সাথে কবি তুলনা করেন।

[৫৭৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

[৫৭৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫

"এমনি দিনে কোরবাণী দেন

পুত্রে হজরত ইব্‌রাহীম,

তেমনি তোরা খোদার রাহে

আয় রে হবে কে শহীদ।।"[৫৭৮]

দে জাকাত

কবির এই গানটি পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও কিছু হাদীসের ভাবানুবাদ। ধনীদের সম্পদে যে গরীবদের হিস্‌সা আছে এটা অনেক ধনী বিশ্বাসই করেন না। অথচ এই ধন-দৌলত দিয়ে তারা যেমন দুনিয়ায় আরাম আয়েশ করছেন; আখিরাতেও আরাম করতে পারতেন। গরীবদের যে হক আছে তা সঠিকভাবে বন্টনের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। হাজার হাজার ভুখা ও অভুক্ত মুসলমানকে চোখে দেখে যে সমস্ড় ধনী মুসলমানদের হৃদয় কাঁদেনা, তারা কখনও পরকালে নাজাত পাওয়ার আশা করতে পারে না। তাদের কবরে কখনও নুরের চেরাগ জ্বলবে না। তাই কবি বলেনঃ

"দে জাকাত, দে জাকাত, তোরা দে রে জাকাত।

তোর দিল্ খুল্‌বে পরে- ওরে আগে খুলক হাত।।

দেখ্ পাক্ কোরান্, শোন্ নবিজির ফরমান

ভোগের তরে আসেনি দুনিয়ায় মুসলমান।

(তোর) একার তরে দেন্‌নি খোদা দৌলতের খেলাত।।

এই দৌলত বিভব-রতন যাবে না তোর সাথে

হয়তো চেরাগ জ্বলবে না তোর গোরে শবেরাতে।

এই জাকাতের বদলাতে পাবি বেহেশ্‌তী সওগাত।।" [৫৭৯]

জপিলে আর হুঁশ থাকে না

এক আধ্যাত্মিক চেতনা এই গানের মাধ্যমে আমরা পাই। 'আলণ্টাহ' নামের মধ্যে যে কি যে মধু একমাত্র আলণ্টাহর প্রেমিকরাই তা বুঝতে পারেন। আলণ্টাহকে দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু এই নামের মাধ্যমে তাঁকে উপলব্ধি করা যায়। কবি সহজ-সরলভাবে এই ভাব ব্যক্ত করেছেনঃ

---

[৫৭৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

[৫৭৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৭৯

"মা গো আমায় শিখাইলি কেন আলণ্ঢা নাম।
জপিলে আর হুঁশ থাকে না, ভুলি সকল কাম।।
লোকে বলে আলণ্ঢাতায়ালায় যায় না না-কি পাওয়া,
ও-নাম জপিলে প্রাণে কেন বহে দখিন হাওয়া।
ও-নাম জপিলে হিয়ার মাঝে
কেন এত ব্যথা বাজে,
কে তবে মা আমার বুকে কাঁদে অবিরাম।।"[৫৮০]

মোহসিন স্মরণে

লোভ-লালসাহীন ও পরের তরে নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার মত একজন মুসলমানকে নিয়ে কবি এই গানটি রচনা করেন। তিনি হচ্ছেন হাজী মুহাম্মদ মোহসিন। তাঁর দানে ভারতবর্ষের মুসলমানরা শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়। তিনি উদার মনে তাঁর সমস্ড় সম্পদ মুসলমানদের কল্যাণের জন্য ব্যয় করে যান। অবহেলিত মুসলিম সমাজ তাঁর দানকে গ্রহণ করে আজ নিজ পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে। কবি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলেনঃ

"সকল জাতির সব মানুষের বন্ধু- হে মোহসীন।
এ যুগে তুমিই শোধ করিয়াছ এক আলণ্ঢার ঋণ।।
ভোগ করনিক' বিপুল বিত্ত পেয়ে'
ভিখারী হইলে শুধু আলণ্ঢারে চেয়ে;
মহাধনী হ'লে আলণ্ঢার কৃপা পেয়ে,
দুনিয়ায় রহিলে কাঙাল দীন।।"[৫৮১]

কবির বাল্য রচনা

বন্দনা

কবি তাঁর বাল্যকালে এক ইসলামী সাংস্কৃতিক পরিবেশ পেয়েছিলেন বলে তাঁর জীবনী লেখকগণ উলেণ্ঢখ করেছেন। কবির বাল্য রচনায়ও তা ধরা পড়ে। তাঁর বাল্য রচনার মধ্যেই ভবিষ্যতের মসলমানদের

[৫৮০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪
[৫৮১]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০

কা—ারী হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তিনি যে মুসলমানদের ঘুম ভাঙাবেন, তাদেরকে জাগিয়ে তুলবেন এই জন্য আলণ্ঢাহর কাছে শক্তি প্রার্থনা করেই কাজ শুরচ করেছেন।

মানুষ বিদেশ যাওয়ার আগে, পরীক্ষা দেওয়ার আগে বা কোন ব্যবসা বাণিজ্য শুরচ করার আগে যেমন মিলাদ মাহফিল, দোয়া-দরূদ দিয়ে শুরচ করেন, তার কাজে বরকত বা সফলতা পাওয়ার জন্যে। অথবা মুরচব্বী বা মা-বাবা থেকে দোয়া নিয়ে কাজ শুরচ করেন, ঠিক তেমনি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরচল ইসলাম সেই বাল্য কালেই মহান আলণ্ঢাহর নিকট বন্দনা ও প্রার্থনা করে কাব্য জগতে বা জ্ঞানের জগতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেছিলেন, তাঁর এই গানটি সেই দিকেই ইঙ্গিত করছে। মহাপুরচষদের ছোটবেলাতেই যে কিছু আলামত পাওয়া যায় আমরা কবির এই গানটির মাধ্যমে তা বুঝতে পারিঃ

“সর্ব্বপ্রথমে বন্দনা গাই
তোমারই ওগো “বারিতালা”।
তারপরে দরূদ পড়ি
মোহাম্মদ সালেণ্ঢ আলা।।
সকল পীর আর দেবতা-কুলে
সকল গুরচর চরণমূলে
জানাই সালাম হস্ড়তুলে;
দোওয়া কর তোমরা সবে,
হয় যেন গো মুখ উজালা।
সর্ব্বপ্রথমে বন্দনা গাই
তোমারই ওগো খোদাতায়া’লা।।”[৫৮২]
[লেটো দলের গান]

হাম্‌দ

তোমার নূরের রওশনী মাখা

---

[৫৮২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

নাস্তিকরা আলণ্ঢাহকে দেখে না বলে বিশ্বাস করতে চায় না। অথচ আলণ্ঢাহর সৃষ্টির দিকে তাকালেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। আলণ্ঢাহর জ্যোতির ইশারা পৃথিবীর প্রতিটা সৃষ্টির মধ্যেই বিদ্যমান। বিশেষ করে প্রাকৃতিক যে সৃষ্টি রয়েছে তার দিকে তাকিয়ে একটু ভাবলেই স্রষ্টাকে উপলব্ধি সহজ হয়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারা এগুলো প্রত্যেকটা সৃষ্টির পেছনে আলণ্ঢাহর নুরকে উপলব্ধি করা যায়। ফুল, ফল ও নদী-তরঙ্গ এবং আকাশের বিজলী ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দিয়ে আলণ্ঢাহকে চিনতে কবি অবিশ্বাসীদের প্রতি আহ্বান জানান।

"তোমার রূপের ইঙ্গিতে খোদা

ফুটিছে বনের কুসুম সদা,

তোমার নূরের ঝলক হেরি

মেঘে বিজ্‌লী চম্‌কে যখন।"[৫৮৩]

তোমার মেহেরবাণী

বাংলার মুসলমানদের মন কুড়ানো একটি গান। কবি এই গানে মানুষের প্রতি আলণ্ঢাহর মেহেরবাণীর কথা বলেছেন। তার হুকুম পালন না করা সত্ত্বেও, কতভাবে তাঁর বান্দাদের প্রতি রহম করছেন তা তিনি তোলে ধরেছেন। মানুষের হেদায়াতের জন্য তিনি নবী-রসুল পাঠিয়েছেন ও মহাগ্রন্থ আল-কুরআন দিয়েছেন। কবির ভাষায়ঃ

"এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল আর মিঠা নদীর পানি

(খোদা) তোমার মেহেরবাণী।

শস্যশ্যামল ফসল-ভরা মাঠের ডালিখানি

(খোদা) তোমার মেহেরবাণী।।

তুমি কতই দিলে রতন

ভাই বেরাদর পুত্র স্বজন,

ক্ষুধা পেলেই অন্ন জোগাও

মানি চাই না মানি।।

[৫৮৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮

খোদা ! তোমার হুকুম তরক করি আমি প্রতি পায়,

তবু আলো দিয়ে বাতাস দিয়ে বাঁচাও এ বান্দায়।"[৫৮৪]

তোমারি প্রকাশ মহান [দেশী টোড়ি মিশ্র-কার্ফা]

পাক-ভারত উপমহাদেশে সুফীবাদের বিকাশ ঘটেছে বিভিন্ন উপায়ে। এর মধ্যে কিছু কুসংস্কার ও শিরক এর কার্যক্রমও লক্ষ করা যায়। এই গানটিতে সহীহ আকীদা-বিশ্বাসের সাথে কবি মহান আলণ্ডাহর পরিচয় তোলে ধরেছেন। নজরচলের ইসলামী সাহিত্যের এখানেই স্বাতন্ত্র্য যে তিনি শিরক ও বিদআত মুক্ত ইসলামী সাহিত্য বাঙালি মুসলিম সমাজকে উপহার দিয়েছেন।

"তোমারি প্রকাশ মহান্ এ নিখিল দুনিয়া জাহান।

তোমারি জ্যোতিতে রওশন নিশিদিন জমীন্ ও আসমান্।।

তোমারে কত নামে হায় ডাকিছে বিশ্ব শিশুর প্রায়,

কত ভাবে পূজে তোমায় ফেরেশ্‌তা হুর পরী ইন্‌সান্।।"[৫৮৫]

কলেমা শাহাদাতে আছে

ঝিনুকের বুকে যেমন মোতি লুকিয়ে থাকে; তেমনি কলেমা শাহাদাতের মধ্যেও লুকিয়ে আছে খোদা তা'য়ালার জ্যোতি ও পরিচয়। এই কলেমা সকাল-সন্ধায় যারা জপে তাদের কোনো মুসিবত আসে না। এই কলেমাকে আঁকড়িয়ে ধরলে মানুষের সুখ-দুঃখ দূর হয়ে যায়। তাই কবি বলেনঃ

"কলেমা শাহাদাতে আছে খোদার জ্যোতি।

ঝিনুকের বুকে লুকিয়ে থাকে যেমন মোতি।।

এস্‌মে আজম হ'তে কদর ইহার,

পায় ঘরে ব'সে খোদা আর রসুলের দীদার,

তাহার হৃদয়াকাশে সাত বেহেশ্‌ত ভাসে,

তার খোদার আরশে হয় আখেরে গতি।।"[৫৮৬]

---

[৫৮৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

[৫৮৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০১

আলণ্ঢাহু আলণ্ঢাহু

“ওরে কোকিল, কে তোরে দিল এ সুর,

কোথা পেলি পাপিয়া এ কণ্ঠ মধুর ?”

কহে কোকিল ও পাপিয়া, “আলণ্ঢাহ গফুর,-

তাঁরি নাম গাহি ‘পিউ পিউ’, কুহু কুহু’-

আলণ্ঢাহু আলণ্ঢাহু।।

ওরে ও রবি-শশী, ওরে ও গ্রহ-তারা,

কোথা পেলি এ রওশনী জ্যোতিঃধারা ?

কহে, আমরা তাহারি রূপের ইশারা,

মুসা বেহুঁশ হলো হেরি’ যে খুব্‌রো-

আলণ্ঢাহু আলণ্ঢাহু।।”

আলণ্ঢার নাম লইয়া বান্দা

আলণ্ঢাহর নাম নিয়ে যেই কোন কাজ শুরচ করলে তাতে বরকত হয় এবং কাজের ভার কমে যায়। যেই কোন কিছু খাবার বা পান করার পূর্বে আলণ্ঢাহর নাম স্মরণ করে নিতে বা ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্রকে আলণ্ঢাহর রাস্ড়ায় সঁপে দিয়ে বের হতে কবি এই গানে তাঁর আকাঙ্খা পোষণ করেছেন। আলণ্ঢাহর নাম নিয়ে ঘুমাতে ও মৃত্যুর সময় আলণ্ঢাহর নাম উচ্চারণ করে পরকালে যাত্রা করার জন্য কবি তাঁর স্বজাতীয় ভাইদের প্রতি অনুরোধ রেখেছেন। কবির ভাষায়ঃ

“কাজে তোমরা যাইও বান্দা আলণ্ঢার নাম লইয়া

(ঐ) নামের গুণে কাজের ভার যাইবে হাল্‌কা হইয়া

শুনলে আজান, কাজ ফেইল্যা মসজিদে শির লুটিও।।

আলণ্ঢার নাম লইয়া রে ভাই কইরো খানা-পিনা

হাটে মাঠে যাইও না ভাই আলণ্ঢার নাম বিনা,

স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তোমার খোদায় সঁপে দিও

---

[৫৮৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২

আলণ্ঢার নাম জিকির কইর‌্যা নিশীথে ঘুমিও।

(ঐ) নাম শুইন্যা জন্মেছো ভাই, ঐ নাম লইয়া মরিও।।"[৫৮৭]

তুমি অনেক দিলে খোদা

কবি এখানে খোদার শোকরিয়া আদায় করার চেষ্টা করেছেন। পৃথিবীতে আলণ্ঢাহর এত নেয়ামত পেয়েও আমরা তাঁর শোকরিয়া আদায় করি না। কেবলই পাপ করি। তাই কবি তাঁর অকৃতজ্ঞতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেনঃ

"তুমি অনেক দিলে খোদা,

দিলে অশেষ নিয়ামত-

আমি লোভী, তাইতে আমার

মেটেনা হস্‌রত।।

মায়ের বুকে স্ড়ন্য দিলে, পিতার বুকে স্নেহ;

মাঠে শস্য-ফসল দিলে; আরাম লাগি' গেহ।"[৫৮৮]

তুমি আশা পুরাও খোদা

দ্বারে দ্বারে হাত পেতে কোনো বান্দা যখন নিরাশ হয়ে আলণ্ঢাহর কাছে বলেন তখন আলণ্ঢাহ তাকে নিরাশ করেন না। মাঝ-দরিয়ায় নৌকা ডুবেও যদি সে আলণ্ঢাহর সাহায্য কামনা করে, আলণ্ঢাহ তাকে উদ্ধার করেন। পৃথিবীর সমস্ড় মানুষ যখন তাকে ঘৃণা করে তখনও সে আলণ্ঢাহর নিকট সান্ড়্বনা বা ভরসা পায়। কবির ভাষায়ঃ

তুমি আশা পুরাও খোদা,

সবাই যখন নিরাশ করে।

সবাই যখন পায়ে ঠেলে,

সান্ড়্বনা পাই তোমায় ধ'রে।।"[৫৮৯]

---

[৫৮৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

[৫৮৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

মরমী

আলণ্ঢা নামের বীজ বুনেছি

কবি তাঁর এই মরমী গানটির মধ্যে আলণ্ঢাহকে ও তাঁর ইবাদতকে কত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন! মুসলমানরা সবাই আখিরাতে বিশ্বাসী। সেখানে সবাইকে তার দুনিয়ায় কৃতকর্মের জবাব দিতে হবে। কবি আলণ্ঢাহর ইবাদতকে ফসলের সাথে তুলনা করেছেন। মানুষ যেমন হাটে-বাজারে ফল-ফসল বিক্রি করে লাভবান হয়, তেমনি কবি আলণ্ঢাহর ইবাদতকে কেয়ামতের দিন বিক্রি করে লাভবান হতে চান। কবির ভাষায়ঃ

"(আমি) আলণ্ঢা নামের বীজ বুনেছি এবার মনের মাঠে।

ফল্‌বে ফসল, বেচব তারে কেয়ামতের হাটে।।"[৫৯০]

এক আলণ্ঢার ভরসা কর

বাংলাদেশের অনেক গরীব মানুষকে দেখা যায়, ধনীদের পিছনে পিছনে ঘুরে সময় নষ্ট করছে কিছু লাভের আশায়। কবি তাদেরকে ভৎর্সনা করছেন এই কবিতায়। কবি বলতে চাচ্ছেন, মানুষকে শুধু একমাত্র আলণ্ঢাহর উপরই ভরসা করা উচিৎ। রোগে শোকে যে কোনো অবস্থায় আত্মীয় স্বজন ছেড়ে যেতে পারে কিন্তু আলণ্ঢাহ তাঁর বান্দাকে কখনও ছেড়ে দেন না। কখনও নিরাশ করেন না। যদি বান্দা আলণ্ঢাহর প্রতি তাওয়াক্কুল করেন, তাহলে আলণ্ঢাহর রহমত তার প্রতি বৃষ্টি বর্ষণের মত পরতে থাকে। সেই দিকে ইশারা করেই কবি বলেনঃ

"ও মন কারো ভরসা করিসনে তুই

এক আলণ্ঢার ভরসা কর।

আলণ্ঢা যদি সহায় থাকেন

ভাবনা কিসের, কিসের ডর।।

রাজার রাজা বাদশা যিনি

গোলাম হ' তুই সেই খোদার,

বড় লোকের দুয়ারে তুই

বৃথাই হাত পাতিসনে আর।"[৫৯১]

---

[৫৮৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

[৫৯০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

সোজা পথে চল রে ভাই

সুরা ফাতিহাতে আলণ্ঢাহ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর নিকট সরল সহজ পথ চাওয়ার জন্য। সেই বাণীই এখানে কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে একটু ভিন্নভাবেঃ

"সোজা পথে চল রে ভাই, ইমান থেকো ধ'রে।
খোদার রহম মেঘের মত ছায়া দেবে তোরে।।"[৫৯২]

আলণ্ঢাজী গো আমি বুঝি না

আমরা অনেক সময় ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুঃখে-কষ্টে আলণ্ঢাহকে ভুল বুঝি। কিন্তু এই দুঃখ-কষ্টের মাঝেও বান্দার জন্য আলণ্ঢাহ তা'য়ালা রহমত ও বরকত সঞ্চিত রেখেছেন। বান্দা ধৈর্য্য ধরলেই তা উপলব্ধি করতে পারে। কবি বলছেন, আমরা নিজেরাই দোষ করে আলণ্ঢাহকে দোষারোপ করি। তবুও তাঁর বান্দাকে আলণ্ঢাহ ভালোবাসেন। আলণ্ঢাহর খেলা বান্দা সামান্য জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে কখনও সক্ষম হবেনা। কবির ভাষায়ঃ

"আলণ্ঢাজী গো আমি বুঝি না রে তোমার খেলা।
তাই দুঃখ পেলে ভাবি বুঝি হানিলে হেলা।।
কুমার যখন হাঁড়ি গড়ে কাঁদে মাটি,
ভাবে, কেন পোড়ায় আমায়, চড়িয়ে ভাটি।
ফুলদানি হয় পোড় খেয়ে সেই মাটির ঢেলা।।"[৫৯৩]

দিন গেল মোর মায়ায় ভুলে

দুনিয়ার মায়া-মোহে পড়ে আমাদের দিন কেটে যায়। আলণ্ঢাহর নাম স্মরণ করার কোনো সুযোগ আমাদের হয় না। কত বাদশা, আমীর ও ফকীর পৃথিবীতে আসল আর গেল; তাদের দুরবস্থা দেখেও আমাদের হুঁশ হলো না। কবি আক্ষেপ করে বলছেন, আমিও যে কখন চলে যাব তা আমি নিজেও জানি না। কবির ভাষায়ঃ

"দিন গেল মোর মায়ায় ভুলে মাটির পৃথিবীতে।

---

[৫৯১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৫
[৫৯২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭
[৫৯৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭

Dhaka University Institutional Repository

কে জানে কখন নিয়ে যাবে গোরে মাটী দিতে (রে)।।”

“রাত্রে শুয়ে আবার যে ভাই উঠ্‌বো সকাল বেলা-

বলতে কি কেউ পারি, তবু খেলি মোহের খেলা।”[৫৯৪]

না'ত

বাংলা সাহিত্যে না'ত বা রাসুলের (সা.) প্রশংসা গীতি নজরুলের একটি অনন্য সংযোজন। নজরুলের আগে ও পরে আর কেউ এ কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। আবদুল মুকীত চৌধুরীর মতে “রসে ও রূপে, সুরে ও ছন্দে হিলেণ্ডালিত ও লীলায়িত করে সমগ্র বাঙালি মুসলিম চিত্তকে এমনভাবে স্পন্দিত করেনি আর কারো না'ত”। নজরুল রচিত ইসলামী গান ও না'তে রাসুলের (সা.) একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি অতিরঞ্জিত করে কুরআন ও হাদীসের বাহিরে গিয়ে কিছু বলেন নি বা বলার চেষ্টাও করেননি। আলণ্ডাহর একত্ববাদ, মানুষ হিসাবে হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর মর্যাদা ইত্যাদি বিষয় ঠিক রেখেই তিনি ইসলামী সাহিত্যে চষে বেড়িয়েছেন। অনেক ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মের প্রবর্তক বা গুরুকে এত মর্যাদা দিয়ে থাকেন, যা আলণ্ডাহর গুণের সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে যায়, নজরুল সেই অবস্থার ব্যাপারে শতভাগ সতর্ক ছিলেন। নিম্নে নজরুল কর্তৃক রাসুল (সা.) প্রেমে রচিত কিছু না'ত নিয়ে আলোকপাত করছি।

ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি

আমাদের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও ইসলাম ধর্মের শিশু অবস্থাকে নিয়ে কবি এই সুন্দর গানখানি রচনা করেন। সেদিন আমিনা মায়ের কোলে যেই শিশুটি দোল খাচ্ছিল আজ সেই শিশুটি পৃথিবীর ব্যথিত মানুষের, অধিকার হারা মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করছে। তাঁর প্রচারিত একটাই বাণী ছিল যে, “এক আলণ্ডাহ ছাড়া আর কোন প্রভু নাই”। মানুষের মুক্তি ও উন্নয়নের জন্য যে দীন ও হীন বেশে জীবন কাটিয়ে গেছেন। বাদশাহ ও ফকীরকে তিনিই এক শামিল করে কাজ করার শিক্ষা দিয়া গেছেন। প্রিয় নবীর (সা.) প্রতি হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা থেকে কবির কণ্ঠে বেজে ওঠেছেঃ

“তোরা দেখে যা আমিনা মায়ের কোলে।

মধু-পূর্ণিমারি সেথা চাঁদ দোলে।

যেন ঊষার কোলে রাঙা রবি দোলে।।

[৫৯৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

মানুষে মানুষের অধিকার দিল যে-জন,

“এক আলণ্ডাহ্ ছাড়া প্রভূ নাই”,-কহিল যে-জন,

মানুষের লাগি’ চির দীন-হীন বেশ ধরিল যে-জন,

বাদশাহ্-ফকিরে এক শামিল করিল যে-জন-’

এল ধরায় ধরা দিতে সেই সে নবী,

ব্যথিত মানবের ধ্যানের ছবি,

(আজি) মাতিল বিশ্ব-নিখিল মুক্তি কলরোল।।”[৫৯৫]

ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম [আবির্ভাব]

গানের এই চরণ দুটিতে সাগর, আকাশ ও বাতাসকে কবি আহ্বান করছেন কবির প্রিয় ব্যক্তিত্ব তথা ত্রিভুবনের প্রিয় মানুষটিকে এসে দেখার জন্য। কবির কণ্ঠে উচ্চারিত হচ্ছেঃ

“ত্রিভুবনের প্রিয় মোহাম্মদ এল রে দুনিয়ায়।

আয় রে সাগর আকাশ বাতাস, দেখবি যদি আয়।।”[৫৯৬]

মুহ্‌রে নবুয়ত-ধারী

আমাদের প্রিয় নবীজীর (সা.) মাধ্যমে অসংখ্য নেয়ামত পেয়ে আমাদের জীবন ধন্য হয়েছে। তৌহীদ বা একত্ববাদ, বিপদে ধৈর্য্যধারণ, ঈমান, বিপদে আলণ্ডাহর উপর ভরসা করা ও কুরআন ইত্যাদি পেয়ে আমাদের জীবন ধন্য। তাই কবি রাসুল (সা.) এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এইভাবেঃ

“দিলে মুখে তক্‌বীর, দিলে বুকে তৌহীদ,

দিলে দুঃখের সান্ত্বনা খুশীর ঈদ;

দিলে প্রাণে ইমান, দিলে হাতে কোরান,

দিলে শিরে শিরতাজ নাম মুসলিম আমায়।।”[৫৯৭]

ধাত্রী হালিমার উক্তি

[৫৯৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

[৫৯৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩

[৫৯৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

জন্মের পর থেকেই অনেক ধরনের অলৌকিক আলামত ও মোজেজা আমাদের নবীজীর (সা.) জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর দুধ মাতা হালিমা (রা.) এর ঘরে যাওয়ার পর থেকে তিনিও কিছু অলৌকিক ঘটনা বালক মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে দেখতে পেয়েছেন। সেই ঘটনাগুলো শিল্পীর তুলিতে কত সুন্দরভাবে ধরা পড়েছেঃ

"(ওগো) আমিনা! তোমার দুলালে আনিয়া
আমি ভয়ে ভয়ে মরি।
এ নহে মানুষ, বুঝি ফেরেশতা
আসিয়াছে রূপ ধরি।।
সে নিশীথে যখন বক্ষে ঘুমায়
চাঁদ এসে তারে চুমু খেয়ে যায়,
দিনে যবে মেষ-চাড়নে সে যায়
মেঘ চলে ছায়া করি'।
সাথে সাথে তার মেঘ চলে ছায়া করি।।"[৫৯৮]

দীনের নবিজি শোনায় [মিশ্র সুর-দাদরা]

"দীনের নবিজি শোনায় একাকী কোরানের মধু-বাণী।
আয়েশা খাতুন শোনেন বসিয়া, নয়নে ঝরিছে পানি।।
চন্দ্র-তারকা-গ্রহ আদি ঐ তরুলতা মরু-বায়,
কোরানের সেই আয়াত শুনিয়া লুটায় নবীর পায়।
কোরানে জাগাও ওরে
জ্ঞান-গরিমার মোরে
মরিতে আমায় দিয়ো গো ল'য়ে বক্ষে কোরানখানি।।"

যেয়ো না যেয়ো না মদিনা দুলাল

---

[৫৯৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

আমাদের রাসুল (সা.) তাঁর তেষট্টি বৎসর জিন্দেগী শেষ করে আলণ্ঢাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। কবি তাঁর চলে যাওয়াটাকে বিশ্বের অগণিত মানুষের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে বলে মনে করেন। পৃথিবীর দুর্দশাগ্রস্ড় জাতির প্রতি নবীজীকে (সা.) ফিরিয়ে তাকানোর আহ্বান জানিয়ে বলেনঃ

"যেয়ো না যেয়ো না মদিনা-দুলাল,
হয়নি যাবার বেলা।
সংসার পাথারে আজো দুলে পাপের ভেলা।
আজো হয়নি যাবার বেলা।
মেটেনি তোমারে দেখার পিয়াসা
মেটেনি কদম জিয়ারত আশা,
হজরত, এই জমেছে প্রথম
দীন-ই- ইস্‌লাম মেলা।।"[৫৯৯]

ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম [তিরোভাব]

হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর তিরোভাবকে নিয়ে সমস্ড় বিশ্বে মাতম হচ্ছে। উট, মেষ ও দুম্বা ইত্যাদি প্রাণীও আজ তৃণলতা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু আলণ্ঢাহ তাঁর বন্ধুকে তাঁর নিকট নিয়েই গেলেন। কারও কথা শোনলেন না। কবি এইভাবেই তা চিত্রাঙ্কন করেনঃ

"হায়! হায়! উঠিছে মাতম
আকাশ পবন ভুবন ভরি'।
আখেরী নবী দীনের রবি নিল বিদায়
বিশ্ব-নিখিল আঁধার করি'।।
অসীম তিমিরে পুণ্যের আলো
আনিল যে চাঁদ, সে কোথায় লুকালো,
আকাশ ললাট হানি' কাঁদিছে মরুভূমি,
শোকে গ্রহ-তারকা পড়িছে ঝরি'।"[৬০০]

---

[৫৯৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮

দীন-দরিদ্র কাঙালের তরে

ধনী মুসলিমরা ভোগ ও বিলাসে মত্ত। তোমারে (নবী) শুধু গরীব চাষারাই আজ স্মরণ করছে। তোমার শিক্ষা ও নির্দেশ আজ আর মুসলিমরা মানছেনা। তুমি যে দুনিয়ার বাদশাহ হয়েও উপবাস থেকে জীবন কাটিয়ে গিয়েছ, পরের কল্যাণে, মানুষের তরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছ, আজ মুসলিমরা তা ভুলে গেছে। তাই কবি দুঃখ করে বলেনঃ

"দীন-দরিদ্র কাঙালের তরে এই দুনিয়ায় আসি'

হে হজরত বাদশাহ্ হ'য়ে ছিলে তুমি উপবাসী।।

(তুমি) চাহ নাই কেহ হইবে আমীর, পথের ফকির কেহ

(কেহ) মাথা গুঁজিবার পাইবে না ঠাঁই, কাহারো সোনার গেহ,

ক্ষুধার অন্ন পাইবে না কেহ, কারো শত দাস দাসী।।"[৬০১]

সালাম

কবি নিজেকে পঙ্গু বলে আখ্যায়িত করে মক্কা-মদীনা যাওয়ার অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন। যার জন্য তিনি নবীজীর (সা.) রওজা মোবারকে স্বশরীরে হাজির হয়ে সালাম ও দরূদ পড়তে পারছেন না। কবির মনে এই জন্য এক আকুতি। যারা কা'বার জিয়ারতে যাচ্ছেন, তারা যেন কবির সালাম তার পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় নবীকে (সা.) পৌঁছিয়ে দেন। এই জন্য কবি হাজীদের যাত্রা পথে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ তার সালাম নেই নি। সেই দুঃখে কবি দরিয়ার ঢেউকে গিয়ে বলছেন, ঢেউ যেন তার পক্ষ থেকে সালাম মদীনা মুনাওরায় পৌঁছিয়ে দেয়ঃ

"কা'বার জিয়ারতে তুমি কে যাও মদিনায়?

আমার সালাম পৌঁছে দিও নবিজির রওজায়।।

হাজীদের ঐ যাত্রা-পথে

দাঁড়িয়ে আছি সকাল হ'তে

কেঁদে' বলি, কেউ যদি মোর সালাম নিয়ে যায়।।"[৬০২]

---

[৬০০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

[৬০১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

[৬০২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

তোমার নামে একি নেশা

হাজার বছর আগে নবীজী (সা.) চলে গেলেও তিনি এখনও কবির অন্দরেই আছেন। যদিও আরব ও হিন্দের মধ্যে এক বিশাল দূরত্ব, সে দূরত্ব দু'জনের মধ্যে কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। যদিও দু'জনের সময়ের মধ্যে হাজার বছরের বেশি সময় দূরত্ব, সেটাও দুজনের প্রেম ও ভালোবাসার মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। কবি বলেনঃ

কোথায় আরব কোথায় হিন্দ,
নয়নে মোর নাই তবু নিন্দ্'
মোর, প্রাণে শুধু জাগে তোমার
মদিনারই পথ।।
কে, বলে তুমি গে'ছ চ'লে হাজার বছর আগে,
আছ, লুকিয়ে তুমি প্রিয়তম আমার অনুরাগে।"[৬০৩]

তৌহীদের মুর্শিদ আমার

ইসলামের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এটা কোনো ব্যক্তির নামে প্রসার লাভ করে নি। কুরআনের ভাষ্যমতে নবী ও রাসুলরা (সা.) হচ্ছেন প্রচারক মাত্র। আমাদের নবীও আলণ্ঢাহর নির্দেশানুযায়ী আলণ্ঢাহর একত্ববাদ প্রচার করে গেছেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আমরা আলণ্ঢাহর পুর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভ করি। কবির ভাষায়ঃ

"তৌহীদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম,
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।
ঐ নাম জপিলেই বুঝতে পারি খোদাই কালাম,
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।।"[৬০৪]

চাঁদ-মোস্তফা

---

[৬০৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮
[৬০৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

পবিত্র কুরআনের আয়াতে আয়াতে ও হাদীসের বাণীতে বাণীতে কবি তাঁর প্রিয় নবীকে (সা.) দেখতে পান। কিন্তু এটা হচ্ছে আধ্যাত্মিক দেখা। এতে কবির মন খুশী হয় না। কবি সরাসরি তাঁর রাসুলকে (সা.) দেখতে চান। তাই কবি বলেনঃ

"কোরান পড়ি, হাদিস শুনি, সাধ মেটে না তাহে,

আতর পেয়ে মন যে আমার ফুল দেখতে চাহে।

সবাই খুশী ঈদের চাঁদে,

আমার কেন পরাণ কাঁদে?

দেখব কখন আমার ঈদের চাঁদ-মোস্ত্বফাকে।।"[৬০৫]

নবীকুলের রবি

হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের আগে পৃথিবীর অন্ধকার অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই গানে পাওয়া যায়। সেই অন্ধকার যুগকে সোনার পরশে যিনি আলোকিত করলেন কবি তাঁকে শান্তিদাতা হিসাবে আখ্যায়িত করলেন। কবির ভাষায়ঃ

"তুমি আসার আগে ধরার মজলুম

করিত ফরিয়াদ, চোখে ছিল না ঘুম,

ধরার জিন্দানে, বন্দী ইন্সানে

আজাদী দিতে এলে হে প্রিয় আল-আরাবী।।

মানুষ ছিল আগে হীন পশুর প্রায়

পীড়িত পাপে-তাপে অভাবে বেদনায়;

শান্তি-দাতা এসে সহসা এলে তুমি

পড়িল দুনিয়াতে নব বেহেশতের ছবি।।"[৬০৬]

নবীদের রাজা [বেহাগ-কার্ফা]

---

[৬০৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭

[৬০৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯

পৃথিবীতে অন্যায়ের বিরূদ্ধে ও জাহেলী যুগের কুসংস্কারের বিরূদ্ধে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) সর্বপ্রথম একা দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে যে নিশান ছিল তাতে লেখা ছিল, "লা শরীক আলণ্ঢাহ"। তাঁর এই ভূমিকার কারণেই আরব ভূমি থেকে পাপের রেখা মুছে যায়। পৃথিবীতে নতুন করে পুণ্যের রবি উদিত হয়।

"মারহাবা সৈয়দে মক্কী-মদনী আল্-আরাবী।

বাদ্‌শারও বাদশাহ্ নবীদের রাজা নবী।।

পাপের জেহাদের রণে দাঁড়াইলে তুমি একা,

নিশান ছিল হাতে "লা-শরীক আলণ্ঢাহ্" লেখা,

গেল দুনিয়া হ'তে মুছে পাপের রেখা,

বহিল খুশীর তুফান, উদিল পুণ্যের রবি।।"[৬০৭]

অনুরোধ

পবিত্র কা'বা গৃহ দেখার বা জিয়ারতের সম্বল নাই কবির। এই জন্য দুনিয়াতে তার সাধ মিটে নাই। কবি পূর্ব দিকের বাতাসকে অনুরোধ করছেন, পশ্চিমে যাওয়ার সময় যেন তার সালামখানি মক্কা-মদীনায় নিয়ে যায়। তাহলেই কবির জীবন সার্থক। তাই কবি বলেনঃ

"পুবাল হাওয়া পশ্চিমে যাও কা'বার পথে বইয়া।

যাও রে বইয়া এই গরীবের সালামখানি লইয়া।।"[৬০৮]

ত্রাণ কর মওলা

দুনিয়াতে জালিম শাসকরা ক্ষমতায় বসে আছে। মুসলিম বিশ্ব আজ তাদের দ্বারা লুণ্ঠিত। মুসলমান ও ঈমানদারদের খবর নেই। কাফের ও বেদীনেরা সবকিছু লুট করে নিয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমাদের নবীর নিকট কবি অভিযোগ পেশ করেছেন এই বলেঃ

"ত্রাণ কর মওলা মদিনার

উম্মত তোমার গুণাহ্‌গার কাঁদে।

তব প্রিয় মুসলিম দুনিয়ার

---

[৬০৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০

[৬০৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২

পড়েছে আবার গুণাহের ফাঁদে।।

নাহি কেউ ইমানদার, নাহি নিশান-বর্দ্দার,

মুসলিম জাহানে নাহি আর পরহেজগার,

জামাত সামিল হ'তে যায় না মসজিদে,

পড়ে না কো কোরান, মানে না মুর্শীদে।

ভুলিয়াছে কল্‌মা শাহাদাত,

পড়ে না নামাজ ঈদের চাঁদে।।

নাহি দান খয়রাত, ভুলে মোহ-ফাঁসে

মেতে আছে সবে বিভব-বিলাসে,

বসিয়াছে জালেম শাহী তখ্‌তে তব

মজলুমের এই ফরিয়াদ আর কা'রে ক'ব।

তলওয়ার নাহি আর

পায়ে গোলামীর জিঞ্জীর বাঁধে।।"[৬০৯]

হৃদয়ে-শামাদানের বাতি [গজল-না'তিয়া]

কবি গভীর রাতে কুরআনের আয়াত অধ্যয়নের মাধ্যমে আমাদের প্রিয় নবীজীকে (সা.) সন্ধান করে বেড়ান। কবি বলেনঃ

"দিনের কাজে পাই না সময়

তাই নিরালা রাতে

তোমায় পাওয়ার পথ খুঁজি গো

কোরানের আয়াতে।"[৬১০]

কবি হামদ ও না'ত এর মাধ্যমে ইসলামের মহান আদর্শ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ জাতীয় গান শ্রবণ মাত্রই শ্রোতার আবেগ ইসলাম ও হজরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর বেড়ে যায়। ভক্তি ও

[৬০৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৭

[৬১০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

ধ্যানের সাথে মানুষ এগুলো শ্রবণ করে ও হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে। দুনিয়ার শত ব্যস্ড়তার মধ্যেও পরকালের প্রতি মানুষের ভাবনাকে এ গানগুলো টেনে নিয়ে যায়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

ক. 'ধর্ম জীবন', ডাঃ লুৎফর রহমান, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮১

খ.'মানব জীবন', ডাঃ লুৎফর রহমান, প্রকাশকাল: ১৯২৭

ক. 'ধর্ম জীবন'

শুরচ করছি লুৎফর রহমান গবেষক ইসরাইল খানের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। "তিনি এমনই গুরচত্বপূর্ণ লেখক যে, তাঁর উলেণ্টখ ব্যতীত বাঙলা সাহিত্যের কোনো ইতিহাস বা আলোচনা পূর্ণাঙ্গ হয় না।"[৬১১] প্রকৃতপক্ষে তাঁর সম্পর্কে আমাদের সমাজ যতোটা জেনেছে, তাঁরও বেশি আছে অজানার গহ্বরে।[৬১২] ইসলাম ধর্মকে তিনি সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় বাঙালি মুসলমানদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। আলণ্টাহকে পাওয়ার সঠিক পথ কোনটি তা অনেক মুসলমানই জানেনা।

ইসলামের সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আমাদের সামনে উপস্থাপিত না হওয়ায় প্রকৃত ইসলাম থেকে আমরা অনেক দূরে আছি বলে তিনি মনে করেন। "তাঁর ধর্ম চিন্ড়ায়, বিশেষভাবে লক্ষনীয়-পবিত্র আলণ্টাহকে পাবার অনন্ড় ইচ্ছাই সর্বত্র ব্যক্ত হয়েছে। সকল সুখ-শান্ড়ি আলণ্টাহর মাধ্যমেই তিনি পেতে চান।

[৬১১] . ইসরাইল খান, *মুহাম্মদ লুৎফর রহমান জীবন ও চিন্তাধারা (১৮৮৯-১৯৩৬)* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, এপ্রিল, ১৯৯৮), পৃ.১৩

[৬১২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

কোনো মানুষের নিকট থেকে নয়, অন্য কোথাও থেকে নয়।"[৬১৩] বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে- তাঁর রচনায় ইসলাম ধর্মকে মানবতাবাদী দার্শনিকের দৃষ্টিতে মানুষের কল্যাণের উপায় রূপেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেহেশতে যাবার প্রকৃষ্ট উপায় বুঝে-জেনে তিনি ধর্মীয় আচার আচরণের প্রতিপালক পরিপোষক ছিলেন না। পরলোকে এবং কর্মফলে বিশ্বাসী, মৌলিক ইসলামী আদর্শে আস্থাবান, দায়িত্বশীল ঈমানদার মুমীন মুসলমান হিসেবে কুরআন, হাদীস এবং হজরত মোহাম্মদের (সা.) জীবনকে অনুধাবন করে তিনি এমতে স্থিত হয়েছিলেন যে, ঐশ্বরিক গুণ অর্জনের সুযোগ তাঁর অপরিসীম। কারণ আলণ্ঢাহর শক্তি মানুষের ভিতর দিয়েই প্রকাশিত হয়।[৬১৪]

লুৎফর রহমান ছিলেন একজন প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুসারী। তিনি ইসলাম ধর্মকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে সাহিত্যের মাধ্যমে সুধী ও শিক্ষিত মহলে তোলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তাঁর প্রতিটি বাক্যই যেন ইসলামের বিভিন্ন নির্দেশনা ও প্রিয় নবীজীর (সা.) বাণীর ব্যাখ্যা। লুৎফর রহমানের ধর্মচিন্ড়া ও জীবন-দর্শন তাঁর প্রতিটি লেখায় মূর্ত ও অভিব্যক্ত। তবে ধর্ম, আলণ্ঢাহ, এবাদত, নামাজ, রোজা, উপাসনা, প্রার্থনা, পাপ-পুণ্য, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক বক্তব্য স্পষ্ট করেই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। 'ধর্মজীবন' নামে বই-ই লিখেছেন পৃথক করে। তাছাড়া মানব জীবন, মহাজীবন, যুবক জীবন, উচ্চ জীবন, উন্নত জীবন, মহৎ জীবন, সত্যজীবন প্রভৃতি গ্রন্থেত বটেই নানা উপন্যাসেও তিনি বিভিন্ন প্রসঙ্গে ধর্মহীনতার জন্য বেদনা অনুভব করে মানুষের মনে প্রকৃত ধর্ম সম্পর্কে কৌতূহল, জিজ্ঞাসা ও পিপাসা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।[৬১৫] নিম্নে 'ধর্মজীবন' গ্রন্থ থেকে কিছু আলোকপাত করছি।

এই গ্রন্থে বিভিন্ন শিরোনামে একুশটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। যেমনঃ 'ধর্মজীবন', 'ঈশ্বরের অপমান', 'ধর্মের ব্যাখ্যা', 'ধর্মের জীবিত উৎস', 'পাপ, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরচদ্ধে সংগ্রাম' এবং 'ক্রোধ ও অহংকার' ইত্যাদি।

ধর্মজীবন বলতে কি বুঝায়, জীবনে ধর্ম পালনের উদ্দেশ্য কি, একজন ধার্মিক ব্যক্তির আচার-ব্যবহার সমাজে ও মানুষের সাথে কি ধরনের হওয়া বাঞ্ছনীয়, ধর্মীয় আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সমাজকে

---

[৬১৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১

[৬১৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

[৬১৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

কিভাবে সুন্দর করে গড়ে তোলা যায়, 'ধর্মজীবন' গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে লেখক তা চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন।

লেখকের মতে ধর্ম অর্থ পাপ বর্জনের সাধনা, মিথ্যার সঙ্গে আত্মার সংগ্রাম। নামাজ এই কাজে সহায়তা করে। যেই মানুষ বা জাতির জীবনে ন্যায় ও সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা নেই, মিথ্যা কথা বলতে কিংবা অন্যায় কাজ করতে যারা ভীত হয় না, জীবনকে সকল প্রকার অমঙ্গল ও অন্যায় হতে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয় না, বাইরের নিয়ম পালন, ক্রিয়াকলাপ, নামায-রোযাকেই ধর্ম মনে করে, তাঁদের জীবনে কোন উন্নতি নেই।[৬১৬]

'ধর্ম কি চোখে দেখলাম' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন: ''মনুষ্য শিশুকে মানুষ করে তোলাই ধর্ম। মনুষ্য শিশুর সেবা কর। নামাজ পড়লেই কি স্বর্গে যাওয়া যায় ? ধর্ম আসলে পড়ে আছে বাস্ড়ব জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে। শুধু মুখে ঈশ্বর বাক্যের আবৃত্তি করলে লাভ হবেনা।"[৬১৭] তিনি আরও বলেছেনঃ "যারা পাপী ও পাপিনী, যারা পতিত ও পতিতা তাদের রক্ষা কর-ইহাই ধর্ম। মনুষ্য সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলোনা, তাতে তোমার ধর্ম থাকবে না। এই জগৎকে স্বর্গে পরিণত করাই হচ্ছে প্রকৃত ধার্মিকের কাজ।"[৬১৮]

কর্মই ইবাদত। পাপ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন: 'মানুষকে কোনো রকম দুঃখ দেওয়া পাপ, জগতে দুঃখ সৃষ্টি করা পাপ, আলণ্ডাহ মানে সত্য, হক, ন্যায়বিচার। লেখক বলেছেনঃ সত্যকে অপমান করা, মিথ্যাকে সত্য বলে চালানো মানেই হচ্ছে আলণ্ডাহে অপমান করা।'[৬১৯]

আমাদের সমাজে এখনও অনেকে মনে করে; পাপ করে, অন্যায় করে নামাজ পড়লে আলণ্ডাহ ক্ষমা করে দেন। লেখকের মতে এ ধারণা নিতান্ড়ই ভুল। সত্যের জন্য, ন্যায়ের জন্য দুঃখ সহ্য করার নামই ইবাদত। মানব সমাজ থেকে অন্যায় ও অসত্য দূরীভূত করা, মানুষকে মনুষ্যত্ব সম্পন্ন করাই ধর্মজীবনের মূল তাৎপর্য।[৬২০]

---

[৬১৬] . মোহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, *ডাঃ লুৎফর রহমানের সাহিত্য সাধনা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৪) পৃ.৮২

[৬১৭] . *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, বেলায়েত হোসেন সম্পা (ঢাকাঃ দি স্কাই পাবলিশার্স, জুলাই, ২০১০) পৃ. ১৮৫

[৬১৮] . ইসরাইল খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[৬১৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

[৬২০] . মোহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

'ঈশ্বরের অপমান' প্রবন্ধে লেখক অত্যন্ড় সহানুভূতিশীল হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন। "ঈশ্বর মানে তার কাছে একটা মানুষের মতো বাদশাহ। আকাশের সিংহাসনে বসে আছেন। আমি কি করি না করি কিছু ঠিক পান না। ভালো করে শেষকালে তোষামোদ করলে তিনি স্বর্গে যেতে দেবেন।"[৬২১] এ প্রসঙ্গে লেখক তৎকালীন সময়ে সরকারী অফিস-আদালতে ঘুষ লেনদেন ও অসদুপায়ে আয়-উপার্জনকারী ব্যক্তির উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি আরও স্পষ্ট করেন। লেখকের মতে ধর্মীয় বিধি বিধানকে যথাযথভাবে পালন না করাই আলণ্ডাহকে অপমান ও অস্বীকারের শামিল।[৬২২]

"ধর্মের ব্যাখ্যা" একটি গুরচত্বপূর্ণ ও মূল্যবান প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে প্রকৃত ধর্ম কি, ইসলাম কেন শ্রেষ্ঠ ধর্ম সে বিষয়ে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। শুধু নিয়ম পালনই ধর্ম নয়, আত্মায় সত্যের আসন প্রতিষ্ঠা করাই ধর্ম; বিদ্রোহ ব্যতীত এই সত্যের প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব নয়। মিথ্যাকে দলিত করে সত্যের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে নিজের কল্যাণে, পৃথিবীর কল্যাণে।[৬২৩] লেখকের মতে 'মুসলমান সমাজে আজ আর সুস্থ মানসিকতা নেই-বাইরের চাকচিক্যই আছে শুধু। আত্মার দিকে এরা তাকায় না। হযরত (সা.) এর নামে এরা দুরূদ পড়েই কর্তব্য শেষ করে, তাঁর বাণীকে তারা জীবনে কার্যকরী করার চেষ্টা করে না। শুধু তাই নয়, অন্ধের মত এরা কুরআন পড়ে, কিন্তু তার যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।'[৬২৪]

"আজগুবী গল্প" প্রবন্ধে লেখক ইসলামের অপব্যাখ্যা ও মুসলমানদের দুর্দশার কথা তুলে ধরে দুঃখ প্রকাশ করেন। "মুসলমান সমাজে আজগুবী গল্পের প্রভাব অতিরিক্ত বেশি। বুজরচকী, মিথ্যা কেরামতিতে বিশ্বাস-মূর্খ মুসলমান সমাজকে পতনের গভীরে গুহায় নিয়েছে।"[৬২৫] মৃতকে জীবিত করা, লোহাকে সোনা, পাথরে চড়ে নদী পার হওয়া, স্রোতের উপর বসে নামায পড়া প্রভৃতি ঘটনায় অতিরিক্ত বিশ্বাস মুসলমান সমাজকে দিন দিন ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আর এর প্রভাবে তাদের আত্মা বিকশিত হওয়ার পথ পায় না।[৬২৬]

---

[৬২১] . *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

[৬২২] . মোহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩

[৬২৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

[৬২৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

[৬২৫] . *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

[৬২৬] . মোহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

“পাপ, মিথ্যা ও অন্যায়ের বিরচদ্ধে সংগ্রাম”এই প্রবন্ধে লেখক ইসলামকে জেহাদী মনোভাব নিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন। সমাজের অন্যায়, অত্যাচার ও জুলুম এমনিতেই দূর হবেনা। এগুলোকে দূর করার জন্য ধার্মিকদের কাজ করতে হবে। অন্যায়ের বিরচদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। সমাজ শুধু দুয়েকটা দুষ্টু লোকের জন্যই নষ্ট হয় না, ভালো লোকদের নীরবতার কারণেই সমাজ নষ্ট হয়। এ কথাটি লেখক তাঁর প্রবন্ধে তোলে ধরেছেন। লেখকের মতে, ‘মানুষকে আলণ্ঢাহ জেহাদ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। যারা এসব কাজ থেকে দূরে থাকে, তাদের ধ্বংস অনিবার্য। মানুষকে সৎ, সুন্দর ও নিষ্পাপ থাকার চেষ্টা করতে হবে, মানুষকে দুঃখ দিলে আলণ্ঢাহ অসন্তুষ্ট হন। নিজেদের ভাল কাজ দিয়ে পৃথিবী থেকে দুঃখ কষ্ট দূরীভূত করতে হবে, সুখশান্িড় বাড়াতে হবে।’[৬২৭]

“পবিত্র আত্মা” শিরোনামে প্রবন্ধে লেখক আত্মার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পাশাপাশি এর জাগতিক অবস্থানও তোলে ধরেছেন। যার আত্মা পবিত্র সে কোনো বিপদকে ভয় করে না। লেখকের ভাষায়ঃ “পবিত্র আত্মা মানুষকে উন্নতির পথে পরিচালিত করে। ন্যায়-অন্যায় কী তা বুঝিয়ে দেন। গুরচর মতো অন্যায় কার্যে মানুষকে অন্ড়র হতে ভর্ৎসনা করেন। যে পবিত্র আত্মাতে বিশ্বাসী নয়, সে মনুষ্য নামের যোগ্য নয়। পবিত্র আত্মার অবিশ্বাসী নর-নারীকে ধর্মহীন বলা যায়। পবিত্র আত্মাকে কোরানে ‘রচহে কুদ্দুস’ বলা হয়েছে।”[৬২৮]

‘‘ঈশ্বরের রাজ্যবিস্ড়ার” প্রবন্ধে লেখক সত্যধর্ম প্রচারের কথা ব্যক্ত করেছেন। মুসলমান মাত্রই আলণ্ঢাহর সৈনিক। তাই আলণ্ঢাহকে সমগ্র বিশ্বে প্রচারের জন্য সে সবকিছু কোরবানী করতে প্রস্তুত। পৃথিবী থেকে অন্যায়, অসত্য ও দুঃখ দূর করাই ধার্মিকের কাজ। এখানে পাপ থাকবেনা, বেদনা, অত্যাচার, নির্যাতন থাকবেনা, থাকবেনা সর্বহারা মানুষের দীর্ঘশ্বাস। জগৎ যতই পাপমুক্ত হবে, ততই আলণ্ঢাহর রাজ্যবিস্ড়ার লাভ করবে। এই কাজ করার জন্য প্রকৃত আলণ্ঢাহ ভক্তকে মনপ্রাণ ঢেলে দেয়ার জন্য লেখক আহ্বান জানিয়েছেন। পৃথিবীতে অন্য মানুষের দুঃখ দেখে যার অন্ড়রে বেদনা জাগে না, তাকে আলণ্ঢাহ ভালবাসেন না। পাপ ও অন্যায়ের বিরচদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। আর সংগ্রাম বলতে লেখক বুঝিয়েছেন

[৬২৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯

[৬২৮] . *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

শরীরের বল, জ্ঞান, বক্তৃতা, কাব্য সাহিত্য উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মানুষকে পাপের বিরচদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলা।[৬২৯]

"প্রভুর সংবাদ বাহন" প্রবন্ধে লেখক কত চমৎকারভাবে ইসলাম প্রচারের ভাব তোলে ধরেছেনঃ "চল যারা পথহারা, পতিত, অশিক্ষিত, ঈশ্বরবর্জিত, পাপের অন্ধকারে ডুবে আছে, যেখানে আলণ্ঢাহর নাম কেউ লয় না- যেখানে আলণ্ঢাহর কথা কেউ ভাবে না-সেখানে যাই এবং আলণ্ঢাহর মহাবাণী শুনাই। আমি আলণ্ঢাহর কসম করে বলছি, এই-ই ধর্ম। এ ছাড়া কোনো উচ্চতর ধর্ম নাই।"[৬৩০]

"আলণ্ঢাহর আদেশ, নরহত্যা করো না" এ প্রবন্ধের শুরচতে লেখক বলতে চেয়েছেন, অধিকাংশ মুসলমান না বুঝে নামাজ পড়ে। আর এই নামাজ তাদেরকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে পারে না। ফলে নামাজ পড়েও তারা কুকর্ম করে বেড়ায়। লেখক প্রশ্ন রাখেন, "খুন কারা করে? প্রতিশোধ কারা নেয়? ব্যভিচার কে করে? মিথ্যা কথা কারা বলে? অল্প ওজনে জিনিস কারা দেয়? নারীর সম্পত্তি কারা হরণ করে? এতিমের সম্পত্তি কারা ভোগ করে? যেখানে ধর্ম জীবনের পরীক্ষা সেখানেই মুসলমান অপারগ, অসমর্থ ও গুনাহগার।"[৬৩১] এখানে এসে লেখক পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারা থেকে একটি আয়াত উদ্ধৃতি করে বলেন, "পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ করলে পুণ্য হয় না।"

"প্রতিবেশিকে প্রেম করিও" প্রবন্ধে লেখক বলেনঃ "আলণ্ঢাহর আদেশ প্রতিবেশিকে প্রেম করিও। কৈ আপন প্রতিবেশীর সঙ্গেইতো মুসলমানের বেশি বিরোধ। তিনি আরও বলেন, আপন ভ্রাতার সঙ্গে প্রথমে সন্ধি কর, অতঃপর মসজিদ ঘরে এস। মানুষ নিজ প্রতিবেশিকে ঘৃণা করে, ছোট মনে করে- এইতো মুসলমান সমাজের আজ দৈনন্দিন কাজ। যে ধার্মিক হতে চাও, আলণ্ঢাহর অনুগ্রহ লাভ করতে চাও, সে প্রতিবেশির সঙ্গে আত্মীয়তা কর। প্রতিবেশি আত্মীয়ের চাইতেও আপন। যে প্রতিবেশির সঙ্গে সদ্ভাব রাখেনা-তার ঘরের পার্শ্বে চলাচল বন্ধ করার জন্য বেড়া তোলে, তার পক্ষে উচিত নয়, নামায ও কুরআন পাঠ করা। প্রতিবেশীর জন্য অন্ড়রে যার সত্যের আলো জ্বলে না- কলবে (হৃদয়ে) যে ঈশ্বরের বাণীর

---

[৬২৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯০-৯১

[৬৩০]. *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০

[৬৩১]. *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

ধ্বনি শুনতে পায় না-তার আবার রোজা-নামাজ কী? তার আবার ধর্ম কী?[৬৩২] এইভাবে প্রবন্ধকার বলতেই থাকেন। লেখকের উপরোক্ত বাক্যগুলো কুরআন ও হাদীসের ভাবানুবাদ এতে কোন সন্দেহ নেই।

"অন্নদান ও দুঃখের উপশম চেষ্টা" অন্নহীনকে অন্নদান, দুঃখীর দুঃখমোচন সকল ধর্মেই এ নির্দেশ রয়েছে। "মানুষকে অন্ন দেবার মতো মহাধর্ম আর নাই। ভরা পেটে খাবার দান করা এমন কিছু নয়, কিন্তু জগতে তাই হয়। বাইরে রাস্ড়ায় মানুষ এক মুঠো অন্নের জন্য কাতর চিৎকার জানাচ্ছে। ভিতরে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি জোড়হস্ড় হয়ে ক্ষমা চাইলেও তাকে আরও খেতে অনুরোধ করা হচ্ছে।"[৬৩৩] উপবাসীর বেদনা উপলব্ধি করার জন্য আলণ্ঢাহ রোযার ব্যবস্থা করেছেন। যে প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজে আরাম-আয়েশে কাটায় সে মহাপাপী।[৬৩৪]

"সম্মানিত ব্যক্তি ও পন্ডিতদের সঙ্গে নিঃস্বার্থ সাক্ষাৎ" প্রবন্ধে লেখক একটি গুরচত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। 'পন্ডিত, আলেম, জ্ঞানী, সম্মানিত, পূজনীয় ব্যক্তির সাথে নিঃস্বার্থভাবে মাঝে মাঝে দেখা করা ধর্মজীবনের অঙ্গ। আজকাল নিঃস্বার্থ দেখা-সাক্ষাৎ উঠে গিয়েছে-যেখানে লাভের আশা থাকে, স্বার্থসিদ্ধির আশা থাকে, সেইখানে মানুষ মধু মক্ষিকার মতো ঘোরে।' লেখক চান আলণ্ঢাহকে খুশী করার উদ্দেশ্যে, আলণ্ঢাহর কাজের উদ্দেশ্যে মানুষ যেন মানুষের সাথে মিলিত হন। আলণ্ঢাহর কাজ কী? এই প্রসঙ্গে লেখক বলেনঃ"তা মানব কল্যাণ, মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের সংবাদ বহন, বিদ্যালয় স্থাপন, হাসপাতাল নির্মাণ, মানুষকে সুখী ও মানুষ করবার প্রচেষ্টা, নিজে সুখী ও সম্পদশালী হওয়া, পরিবারবর্গ প্রতিপালন, প্রতিবেশীর মঙ্গলকামনা, নিজের মধ্যকার পশুভাব দমন, মানুষকে সত্যময় ও সুন্দর করা। ঈশ্বরের কাছে ঐশ্বরিক শক্তি ও সাহায্য ভিক্ষা এবং এই জন্য আন্ড়রিকভাবে প্রার্থনা, সামাজিক ধর্মজীবনের মর্যাদা রক্ষা অর্থাৎ রোজা ও আজানসহ সমবেতভাবে নামাজ পড়া।"[৬৩৫]

"ক্রোধ এবং অহঙ্কার" প্রবন্ধে লেখক বলতে চেয়েছেন, তা মানব জাতির ধ্বংসের মূল কারণ। অহঙ্কারী ব্যক্তি কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। "যতক্ষণ মনে ক্রোধ এবং অহঙ্কার আছে ততক্ষণ স্বর্গের আশা করো না। ক্রোধ মাটি করে ফেল। নিজে মাটি হও তবেই স্বর্গের যোগ্য হবে। তার একটু আগে নয়।"[৬৩৬]

---

[৬৩২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

[৬৩৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬

[৬৩৪] . মোহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

[৬৩৫] . *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০

[৬৩৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

এখানে লেখক ক্রোধ সম্পর্কে একটি ঘটনা উলেণ্ঢখ করেছেনঃ "যুদ্ধকালে জনৈক কাফের হযরত আলীর মুখ ভরে থুথু নিক্ষেপ করলো। তৎক্ষণাৎ আলী তাকে ত্যাগ করলেন। কাফের কারণ জিজ্ঞেস করলে আলী বললেন-বন্ধু! যদি হত্যা করতে হয়, কর্তব্যের খাতিরে তা করতে হবে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে নয়। তোমার ব্যবহারে আমি ক্রুদ্ধ হয়েছি, তাই তোমায় ত্যাগ করলুম। কাফের তৎক্ষণাৎ আলীর কাছে ইসলাম গ্রহণ করলো। সে বললো, যে ধর্মে এমন কথা বলে, সে ধর্ম নিশ্চয় সত্য।"[৬৩৭]

এইভাবে লেখক বিভিন্ন উদাহরণ ও ঘটনা উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য বাঙালি মুসলমান সমাজের সামনে তোলে ধরেছেন। যা কুরআন ও হাদীসের মর্মার্থ ও ভাবানুবাদ। এই গ্রন্থ অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য পাঠকের হৃদয়ে ভেসে ওঠে। লেখক তাঁর এই লেখনির মাধ্যমে ইসলামের অনেক বড় খেদমত করে গেছেন এবং আমরা তাঁর নিকট চিরঋণী হয়ে থাকবো।

খ. 'মানব জীবন' ঃ

'মানব জীবন' ডাঃ লুৎফর রহমানের অপর একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আগেই উলেণ্ঢখ করা হয়েছে যে, লেখক তাঁর প্রতিটি লেখায় ইসলামী ভাবধারা প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি সরাসরি কুরআন-হাদীসের উলেণ্ঢখ করেন নি। তাঁর অনেক বক্তব্যে আমরা কুরআন ও হাদীসের উৎস খোঁজে পাই। 'মানব জীবন'ও এমনি একটি গ্রন্থ, যা লেখক কুরআন-হাদীসের বাণী পরোক্ষভাবে সাহিত্য রসের মাধ্যমে আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। এ গ্রন্থে 'মানব-চিত্তের তৃপ্তি', 'আলণ্ঢাহ', 'শয়তান', 'স্বভাব গঠন' ও 'দৈনন্দিন জীবন' ইত্যাদি শিরোনামে প্রায় চৌদ্দটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে।

'মানব-চিত্তের তৃপ্তি' এ গ্রন্থের প্রথম আলোচ্য প্রবন্ধ। মানব হৃদয় কিভাবে তৃপ্তি পেতে পারে তা যুক্তিপূর্ণ ভাষায় এ গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে। লেখকের মতে অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি, রাজ্যলাভ মানবচিত্তে তৃপ্তি

---
[৬৩৭]. *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১

দিতে পারে না। আলেকজান্ডার সমস্ড় পৃথিবী জয় করেও এতটুকু শান্ড়ি পান নি।[৬৩৮] লেখক বলেন, সত্য সাধনাই মানব জীবনে পরম সাধনা। আর এ সত্যকে প্রতিদিনের কাজের ভেতর দিয়ে অনুভব করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কাজ। "কত বিচিত্রভাবে তাকে অনুভব করতে হবে তার ইয়ত্তা নেই। যিনি যতটুকু এই পরম সত্যকে অনুভব করতে পেরেছেন তিনি বড় সাধক, সন্ন্যাসী ও ফকির। সত্যময় আলণ্ঢাহ তা'য়ালাকে হৃদয়ে ধারণ করা, তাতে মিশে যাওয়া, আলণ্ঢাহময় হয়ে যাওয়া-সর্ব্বপ্রকারের সত্য, সুন্দর, মধুর ও পূর্ণ হয়ে ওঠা এই-ই চরম এবাদত।"[৬৩৯]

"আলণ্ঢাহ" প্রবন্ধে আলণ্ঢাহর পরিচয় কি ? তাঁর সাথে মানুষের সম্পর্ক কত গভীর, কিভাবে আলণ্ঢাহকে পাওয়া যায়, কি করলে তিনি খুশী হন ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। লেখকের ভাষায়ঃ 'আলণ্ঢাহ কী ? তাঁর কোনো সিংহাসন নাই, কোনো আসন নাই, রূপ নাই-অন্ড়রের সঙ্গে তিনি মিশে আছেন। সুন্দর, কল্যাণ এবং সত্যে তিনি আছেন। তোষামোদে তাঁকে পাওয়া যাবে না। তিনি আছেন ত্যাগে, সহিষ্ণুতায় এবং প্রেমে। তিনি রূপমুক্ত প্রেম, কল্যাণ এবং জীবন্ড় সত্য।' এইভাবেই আলণ্ঢাহর পরিচয় আমরা এই প্রবন্ধের মাধ্যমে উপলব্ধি করতে পারি।

"শয়তান" এর পরিচয় নিয়ে তিনি একটি চমৎকার প্রবন্ধ আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। শয়তানকে চেনার উপায় কি ? ধরার উপায় কি ? লেখক তাও তাঁর সুখপাঠ্য এই প্রবন্ধটিতে উলেণ্ঢখ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে শয়তান বলতে আমরা মহান আলণ্ঢাহর আদেশ অমান্যকারীকে বুঝি। লেখক একটু ব্যঙ্গ করে শয়তানের পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে "পৃথিবীর যত পাপ-পৃথিবীর যত প্রতারণা, নীচাশয়তা, হীনতা, কাপুরুষতা তাই তো শয়তানের মুখ।"[৬৪০] মিথ্যাবাদী, তোষামোদকারী, শঠ, হৃদয়হীনের মুখে লেখক শয়তানের মুখ দেখেছেন। অসাক্ষাতে কারও নিন্দা করা, বা অন্যের স্ত্রীর সাথে প্রেমালাপ করাকেও লেখক শয়তানী কারবার বলে উলেণ্ঢখ করেছেন। শয়তান মানুষকে কত রকমেই না প্রতারণা করে। সুতরাং মানব সংসারে যাবতীয় অন্যায় এবং অসত্যের মূলে লেখক শয়তানের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন।[৬৪১]

---

[৬৩৮]. মোহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৬৩৯]. *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

[৬৪০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪২

[৬৪১]. মোহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

"দৈনন্দিন জীবন" প্রবন্ধে মানুষের আচার ব্যবহার কিরূপ হওয়া উচিত লেখক তা বর্ণনা করেছেন কুরআন-হাদীসের আলোকে। জীবন চলার ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিষয়গুলোও মানব জীবনে শান্ড়ি আনতে সহায়ক হতে পারে বলে লেখক অভিমত প্রকাশ করেন। "প্রতিদিনের ছোট ছোট কথা, ছোট ব্যবহার, হাসি-রহস্য একটুখানি সহৃদয়তা, একটা স্নেহের বাক্যে মানুষের মনুষ্যত্ব সূচিত হয়। প্রতিদিনকার জীবন যার নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা ও প্রতারণায় ভরা-তার সমস্ড় জীবনটাই একটা ভাঙ্গা ঘরের মতো অন্ড়ঃসারশূণ্য"[৬৪২] লেখক বলেন, আলণ্ডাহর কালাম আমরা যে তিলাওয়াত করি না তা নয়, কিন্তু নিষ্ঠার সাথে আলণ্ডাহর আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন করি না বলে তা আমাদের মধ্যে সততা, ন্যায় নিষ্ঠার জন্ম দেয় না, প্রতারণা, মিথ্যা ও অন্যায় থেকে আমাদেরকে রক্ষা করে না। আর এ জন্য লেখক অন্ড়রে গভীর বেদনাবোধ উপলব্ধি করেছেন।[৬৪৩] লেখক আক্ষেপ করে বলেন, "ধর্মগ্রন্থ তোমায় কী দীক্ষা দিয়েছে ? ইঞ্জিল, জবুর, তওরাত, কোরান এবং পবিত্র হাদীস সমষ্টি কী শিক্ষা তোমায় দিয়েছে? তোমাকে স্নেহশীল, প্রেমিক হতে বলেনি? কতবার কতভাবে তোমাকে বলেছে-, হে মানুষ, প্রেমিক হও, পাষাণ হয়ো না।" যে যত বিনয়ী এবং ভদ্র সে তত বড়। এই প্রসঙ্গে আমাদের প্রিয় নবীর (সা.) সাহচর্য পাওয়ার উপায় সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন, হে ভক্তেরা! মোহাম্মদ (সঃ) তোমার কাছে দরুদ চান নাই। তিনি দেখতে চেয়েছেন, যারা তাঁকে প্রেম করে তারা মানব-প্রেমিক কিনা, তারা সর্বপ্রকার অহঙ্কার বর্জন করেছে কিনা, দিকে দিকে আলণ্ডাহর বাক্য তারা বহন করেছে কিনা।[৬৪৪]

"সংস্কার মানুষের অন্ড়রে" প্রবন্ধে লেখক বলতে চেয়েছেন যে, অন্যের দোষত্রূটি ধরার আগে নিজের দোষত্রূটি সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। অধিকাংশ মানুষই নিজে ভুলের মধ্যে দাঁড়িয়ে অন্যের ভুল সংশোধন করতে চায়। লেখকের মতে অন্ড়রের পাপ ভাব ও গণ্ডানি ধুয়ে না ফেলে যে যতই ধার্মিকের ভাব দেখাক না কেন, সে আসল ধার্মিক নয়।

মানুষের অন্যায় কর্মকাণ্ডের জন্য মানুষকে অনেক সময় পশুর সাথে তুলনা করে মানুষ তৃপ্তি অনুভব করে। লেখক মানুষকে কেন পশুর সাথে তুলনা করা হয় এই বিষয়ে যুক্তি উত্থাপন করে বলেনঃ 'মানুষকে পশুর সাথে তুলনা করে কেন? মানুষের প্রবৃত্তি কী, পশুর প্রবৃত্তিই বা কী? পশুরা আপন পত্নীকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু খাবার বেলায় দেখতে পাই, সে পত্নীকে ফাঁকি দিয়ে নিজেই খায়, পশু পিতা সন্ড়ান পালন করে না,

[৬৪২] . *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

[৬৪৩] . মাহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[৬৪৪] . *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

বরং বাচ্চাগুলো নিকটে এলে পশুপিতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়, নিকটে এলে তাড়িয়ে দেয়। সে নিজের ভালো, নিজের লাভই বেশি বোঝে, সে কখনও পরের চিন্ড়া করে না। সে দুর্বলকে আঘাত করে এবং অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীর কাছে সভয়ে মাথানত করে। তার আপন-পর জ্ঞান নাই, সুযোগ পেলেই পরের জিনিস চুরি করে। নিজের কোনো অন্যায় দেখলে আপত্তি করে না। কেউ বিপদে পড়লে তার উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হয় না। কোনো কোনো সময় দেখা যায় আপন জাতির কাউকে বিষণ্ন দেখলে তাকে আরও আঘাত করে, তার লজ্জা নাই, তার কোনো সম্মান জ্ঞান নাই। আপন আপন স্বামী এবং পত্নীর কাছে সে বিশ্বস্ড় থাকে না। যেখানে স্বার্থ দেখে সেখানেই উপস্থিত হয়।’[৬৪৫]

কিন্তু মানুষের স্বভাব এর সম্পূর্ণ বিপরীত। যেখানে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা মানুষের মধ্যে দেখি সেখানেই আমরা সেই মানুষটাকে পশুর সাথে তুলনা করি।

“জীবনের মহত্ত্ব” প্রবন্ধে লেখক মানুষের জীবনের সার্থকতা কোথায় তা বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। মানুষকে একটু সহযোগিতা করা, সুন্দর একটি হাসি দিয়ে একজন বিপদ গ্রস্ড় মানুষের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া, এগুলো ছোট জিনিস হলেও মানুষের জীবনে এর গুরচত্ব কোনো অংশে কম নয়। তিনি বলেন, “কৃপণ জীবন ভরে এক একটা মুদ্রা প্রাণের রক্তের মতো সঞ্চয় করে। আমরা কি সুন্দর সুন্দর মহৎ কাজ করে, কৃপণের মতো জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের সুবর্ণ মুদ্রাগুলো সঞ্চয় করতে পারি না। তাতে যে আমাদের জীবনের মূল্য কত বেড়ে যাবে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহৎ কাজগুলো যেমন আমাদের চিত্তকে প্রসন্ন করে, তেমনি অক্ষয় সুবর্ণরেখার মতো চিরদিন মনুষ্য আত্মাকে সম্পদশালী করে।”[৬৪৬]

“স্বভাব গঠন” প্রবন্ধে লেখক তাকীদ দিয়ে বলেন, মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরচত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে তার স্বভাব গঠন। যার স্বভাব ভালো না, তাকে তার পরিবারের আপন সদস্যরাও ভালোবাসে না, তাকে এড়িয়ে চলে। সমাজের মানুষ তাকে দেখলে ঘৃণা পায়। স্বভাবের পরিবর্তন না করে ইসলামে ইবাদতের তেমন স্বার্থকতা নেই। যে আলণ্ঢাহকে ভালোবাসে, তাঁর প্রেরিত রসুলকে ভালোবাসে তাকে অবশ্যই সবকিছুর আগে তার স্বভাব পরিবর্তন করতে হবে। লোকে যেন তাকে তার স্বভাবের কারণে ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে। লেখক বলেনঃ “আলণ্ঢাহ চান না তোমরা শুধু ইসলামের মহিমা কীর্তন কর, তিনি চান তোমরা মুসলমান হও, নিজ নিজ স্বভাব খোদায়ি ভাবে গঠন কর। হযরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে বলা

[৬৪৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

[৬৪৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

হয়েছে-'নিশ্চয়ই তোমার স্বভাব উত্তম।' যে নিজ স্বভাবকে উত্তমরূপে গঠন করেছে, সে প্রকৃত নবীভক্ত; যে শুধু মুখে চিৎকার করে দরূদ পাঠ করে, সে নবী ভক্ত নয়"।[৬৪৭] তিনি আরও বলেন, দুঃস্বভাবে মানুষ মানুষের হৃদয়ে জ্বালা এবং বেদনা দেয়, তার সুন্দর মুখে মনুষ্য তৃপ্তি পায় না। স্বভাবের ক্ষেত্রেই মানুষের সমস্ড় শক্তি, সমস্ড় জ্ঞানের পরীক্ষা হয়-কে কতখানি নিজকে গঠন করতে পেরেছে। মিথ্যা, লোভ, দ্বেষ, হিংসা, দুর্বলতা কে কতখানি জয় করতে শিখেছে?[৬৪৮] স্বভাব যার উত্তম সে সর্বদাই নীতিবান, মিথ্যাকে সে আন্ড়রিক ঘৃণা করে, প্রাণ গেলেও সে মানুষকে তুষ্ট করবার জন্যে অন্যায় ও মিথ্যাকে সমর্থন করে না। সে মিথ্যাকে সাক্ষ্য দেয় না। অন্ড়রে পাপ, মুখে তার মধু নয়। সে বিনয়ী, ভদ্র এবং সহিষ্ণু। সে মানুষের দাবিকে নষ্ট করে না, সে কখনও অভদ্রের মতো কথা বলে না।[৬৪৯]

"জীবনের সাধনা" প্রবন্ধে লেখক মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ সম্পর্কে কথা বলেছেন। মানুষ শুধু অন্ন-বস্ত্রের জন্যই লালায়িত। আর এই অন্ন-বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ কতভাবে পাপ ও অন্যায় কাজ করে যাচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। অথচ আলণ্ঢাহ কোনো প্রাণীকে অভুক্ত রাখেন না। প্রত্যেক প্রাণীর রিযিকের ব্যবস্থা তিনি করেন। তারপরও আলণ্ঢাহর উপর মানুষের আস্থা নেই। তিনি মানুষকে মানুষের দাসত্ব না করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। শুধু চাকুরির জন্য জ্ঞান ও বিদ্যা সাধনা করতে লেখক নিষেধ করেছেন, বরং জীবনকে জাগিয়ে তোলার জন্য এবং বিকশিত করার জন্যই জ্ঞানের সাধনা। "জ্ঞান ও বিদ্যালোচনা চাকরির জন্য নয়। জ্ঞান মানুষের জীবনে অসংখ্য প্রকারে সফল করার সুযোগ সুবিধা করে দেয়। জ্ঞানকে দাসত্বের কাজে নিয়োগ করে জ্ঞানের মর্যাদা নষ্ট করো না। জীবনে ঘুমন্ড় শক্তি, মস্ড়িষ্কের সহস্র লুকান ক্ষমতাকে জাগিয়ে তুলবার অমোঘ উপায় হচ্ছে জ্ঞান।" তিনি আমাদের আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে, অভাব, দারিদ্র সমস্যা কখনও মানুষের সাধনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা গেছে, বড় বড় মহামনীষীরা এমনকি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরচ্ল ইসলামও খুবই অভাবের মধ্যেই জীবনের সাধনা করে সফলতা লাভ করেছেন।

"বিবেকের বাণী" একটি অসাধারণ ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধ। যা পাঠে পাঠক হৃদয়ে আলাদা একটি আন্দোলন সৃষ্টি করে। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই বিবেক রয়েছে, তবে মানুষের বিবেক অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় অধিক শক্তিশালী। মানুষ বিবেক দ্বারা নিজের ভালোমন্দ নিজে বুঝতে পারে। ন্যায়-অন্যায় উপলব্ধি করতে

[৬৪৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

[৬৪৮]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[৬৪৯]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৭

পারে, যা প্রাণী জগতের আর কেউ পারে না। এই বিবেকের কারণে প্রাণী জগৎ আজ মানুষের অধীন। মহান আলণ্ঢাহর নিকট এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমরা শেষ করতে পারবো না। লেখক বলেন: "অন্ধকারে যেমন আলো মানুষের কাছে বিবেকও তদ্রূপ বর্তিকার মতো সর্বদা পথ দেখায়। বিবেকই মনুষ্যকে ধার্মিকতা শিক্ষা দেয়। বিবেক মানব জীবনের পরম বন্ধু। ইহা বন্ধুর ন্যায়, জননীর ন্যায়, পিতার ন্যায় মনুষ্যকে পথ দেখায়; সান্ড়্বা দেয়।"[৬৫০] বিবেকবান মানুষ সর্বদাই ভীত থাকে এই কারণে যে, তার দ্বারা কোন অন্যায় যেন সংঘটিত না হয়। বিবেক মানুষকে পশুর স্ড়র থেকে উচ্চস্ড়রে উন্নীত করে। মহৎ থেকে মহত্তর হতে অনুপ্রাণিত করে।[৬৫১]

"মিথ্যাচার" আরেকটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধ। এ বিষয়ে লেখকের অভিব্যক্তি হচ্ছে যে জাতির মধ্যে সত্য সাধনা নাই, সে জাতি কখনই উন্নতি লাভ করতে পারে না। সুতরাং মানব জীবনের একমাত্র লক্ষ হওয়া উচিৎ সত্য সাধনা। মিথ্যা এবং প্রতারণার দ্বারা পৃথিবীতে কোন বড় কাজ হয়নি। যদি জীবনকে সার্থক এবং কল্যাণময় করে তুলতে হয়, তবে মানুষের প্রশংসা অপেক্ষা না করে সত্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখতে হবে।

ত্যাগ, দুঃখবরণ এবং সত্যনিষ্ঠা জাতির মুক্তির পথ প্রশস্ড় করে।[৬৫২]

"পরিবার" প্রবন্ধে লেখক বাংলার ঘরে ঘরে শান্ড়ি ও বেহেশতি পরিবেশ বিরাজ করচক এই কামনা করেছেন। প্রিয় নবীজীর বাণীতে রয়েছে, 'যিনি নিজের পরিবারে উত্তম, তিনি আলণ্ঢাহর কাছেও উত্তম।' পরিবারের কর্তা যদি উত্তম আদর্শের না হয়, তাহলে সেই পরিবারে কখনও শান্ড়ি আসতে পারে না। "তার প্রতাপে গৃহের সমস্ড় মানুষ দগ্ধ হতে থাকে, ফলে তার বিপদে, দুঃখে পরিবারের কারো কোনো আন্ড়রিক সহানুভূতি থাকে না।"[৬৫৩] পরিবারের কর্তা যদি ছোটদের সাথে মন্দ ব্যবহার করে, তাহলে সে পরিবারের প্রত্যেকের স্বভাব দিন দিন খারাপ হতে থাকে। পরিবারের প্রতি সহানুভূতিই পরিবারের প্রাণ। যে পরিবারের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি ও মমত্ববোধ নাই, সেই পরিবারের কোন উন্নতি হয় না।[৬৫৪] লেখক সন্ড়ানের প্রতি আগ্রহ সম্পর্কে বলেছেনঃ "সন্ড়ান আলণ্ঢাহর কাজ করে এই উদ্দেশ্যে

[৬৫০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩
[৬৫১] . মাহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
[৬৫২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২
[৬৫৩] . *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
[৬৫৪] . মোহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

পুত্র কামনা কর, তাহলে পুত্রের মুখ দেখে যে আনন্দ হবে সে আনন্দ স্বর্গীয় হবে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র বল, 'আলণ্ঢাহু আকবার' 'আলণ্ঢাহ শ্রেষ্ঠ' 'সত্যের জয়' 'প্রেম ও সত্যের জয়'। মানব শিশুর জন্য ইহাই প্রথম মন্ত্র।" লেখক এই প্রবন্ধে মানব জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে ইসলামের আলোকে সাজানো দেখতে চেয়েছেন। "ইসলাম মানে শুধু উপাসনা নয়। বাইরে, রাস্ড়ায়, ঘরে, বিপণীতে দিনের সমস্ড় কাজে সে সর্বাঙ্গ সুন্দর হবে।"[৬৫৫]

''সেবা" শিরোনামে প্রবন্ধটি আলোচনা করেই এই বিষয়ে শেষ করতে চাই। এটা সত্য যে ইসলাম ধর্ম হিজরী প্রথম সন থেকে দুইশত বছরের মধ্যে সারা দুনিয়ায় প্রসার লাভ করেছিল শুধু 'সেবা'র কারণেই। হযরত উমর ফারচক (রা.) অর্ধেক জাহান শাসন করতে পেরেছিলেন তাঁর সেবা ও আত্মত্যাগের জন্যই। আজ ইসলামের সেই সেবার কথা ভুলে গিয়ে মানুষ আত্মভুলা হয়ে গিয়েছে। লেখক সেই দিকে ইঙ্গিত করেই এই প্রবন্ধে বলেনঃ মানুষের মনুষ্যত্বের প্রমাণ হয় সেবার মধ্য দিয়ে। সেবার কাজে আত্মদান করাই মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব বলে লেখক মনে করেন। যথার্থ বুজর্গ ব্যক্তি যারা তাদের প্রধান ধর্ম মানব সেবা।

ত্যাগ, প্রেম ও দুঃখের প্রতি অপরিসীম সহানুভূতি প্রকাশ ইত্যাদি নিঃসন্দেহে আলণ্ঢাহর ইবাদত।[৬৫৬]

সমগ্র মুসলিম বিশ্ব আজ সেবামূলক কাজ থেকে পিছিয়ে আছে। অথচ খ্রিস্টান মিশনারীগুলো সেবামূলক কাজের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় কাজকর্ম সমগ্র বিশ্বে চালিয়ে যাচ্ছেন এবং হাজার হাজার মানুষকে ধোঁকা দিয়ে ধর্মান্ড়রিত করছেন। হাসপাতাল, বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে তারা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছার সুযোগ পাচ্ছেন। অথচ ইতিহাসে প্রমাণিত মুসলমানরাই পৃথিবীতে সর্বপ্রথম হাসপাতাল, গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয় মানবজাতির সেবার জন্য স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু আজ আমরা সেই মানবসেবা ভুলে অনেক ক্ষেত্রে তাদের সেবা গ্রহণ করছি।

ইসলামী ভাবধারা নিয়ে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তা থেকে পাঁচটি গ্রন্থ নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করলাম। আরও শত শত গ্রন্থ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের উপর রচিত হয়েছে। সাহিত্যের কোন বিষয় নিয়ে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করার মতো কঠিন কাজ আর আছে বলে মনে হয় না। তারপরেও ইসলামী সাহিত্যের বিষয়গুলো শরীয়তের নির্দেশনার কারণে বিশেণ্ঢষকের কিছু সীমাবদ্ধতা থাকে।

[৬৫৫]. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬
[৬৫৬]. মোহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে বাংলা ভাষায় আজ আমরা যে ইসলামী সাহিত্য পেয়েছি তা আমাদের প্রতি মহান আলণ্ঢাহ তায়ালার এক অশেষ করচ্ণা। এর মাধ্যমে ইসলামকে জানার, বুঝার ও বাস্ড়্ব জীবনে সেই আলোকে আমল করার এক সুবর্ণ সুযোগ বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার কারণে বাংলাদেশে এক বিশাল জনগোষ্ঠী ইসলামী শিক্ষার প্রাথমিক ধারণা থেকেও বঞ্চিত। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আরবী পড়ার সুযোগ তাদের নেই। এই পরিস্থিতিতে অধিকাংশ মুসলমান তাদের ধর্ম সম্পর্কে অজানা বা মূর্খই থেকে যাচ্ছেন।

আর এই অজ্ঞতার সুযোগে ইসলাম ও ইসলামী পণ্ডিতদের সম্পর্কে মিডিয়ার অপপ্রচার ও ইসলাম বিরোধীদের ঘৃণ্য শত্রচতার কারণে ইসলাম ধর্ম ও তাঁর প্রকৃত অনুসারীদেরকে আজ সারা পৃথিবীতে বিতর্কিত স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুঃখজনকভাবে সত্য যে ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ এই মুসলমানেরা অপপ্রচারের এই অবাস্ড়্ব কাহিনীগুলো বিশ্বাস করছে। এই অবস্থা থেকে উদ্ধার হওয়ার পথ হিসাবে মাতৃভাষায় ঘরে বসে ইসলামকে জানার এক বিরাট সুযোগ করে দিয়েছেন আমাদের বাঙালি ইসলামী সাহিত্যিকগণ। মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের বিশেষ উপকারিতা হচ্ছে, এতে সাহিত্য রসের মাধ্যমে ইসলামকে সহজে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অনুবাদ থেকে ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করা খুবই কঠিন।

পাঠকের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে, পাঠক হৃদয়ে যদি কোনো পঠিত বিষয় আকর্ষণ বা আগ্রহ সৃষ্টি করতে না পারে, পঠিতব্য বিষয় যত গুরচত্বপূর্ণই হোক না কেন পাঠক তা পাঠ করতে চায় না। সাহিত্যরসের মাধ্যমে কোন বিষয় পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা গেলে পাঠক তা প্রাণভরে মনযোগের সাথে অধ্যয়ন করার এবং বাস্ড়্বে অনুসরণ করার চেষ্টা করেন। এখানেই ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা ঃ

এই অধ্যায়ে বাংলাভাষা বলতে মাতৃভাষা বাংলায় ইসলাম চর্চার প্রয়োজনীয়তা নিয়েই মূলত আলোচনা করবো। বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা বলতে, বাংলা ভাষায় ইসলামী ভাবধারা নিয়ে লিখিত, অনূদিত ও প্রকাশিত সমস্ড় লেখাকে বুঝায়। তবে লেখাতে ইসলামের আলোকে বিশুদ্ধতা, স্বচ্ছতা ও সাহিত্যের মান থাকা বাঞ্চনীয়। বাংলাদেশে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বিশেষ করে কওমী মাদরাসায় মাতৃভাষা বাংলাকে ত্যাগ করে উর্দু বা আরবী ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ও ইসলামের মূল্যবান ধর্মীয় কিতাবগুলো পাঠদান করা হয়। বিদেশি ভাষায় শিক্ষাদানের ফলে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী তাদের সিলেবাসভুক্ত পাঠ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং অন্যান্য বিষয় নিয়ে আরবী মাধ্যমে লিখিত ধর্মীয় গ্রন্থে যে উচ্চাঙ্গ সাহিত্য ভাব রয়েছে; তার স্বাভাবিক অর্থ বের করতেই ছাত্রদের হিমশিম খেতে হয়। ভাবার্থ বা সাহিত্য ভাব বের করা তো ঐ ছাত্রের পক্ষে সম্ভবই হয়ে ওঠেনা। আর ভাষার জটিলতার কারণে মাতৃভাষা বহির্ভুত কোন

সাহিত্য ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যয়ন করতে চায় না। শুধু পরীক্ষা পাশের জন্য হয়তো কিছু পাতা ফটোকপি করে পড়াশুনা করে থাকে।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিরাট অংশে সাহিত্য রয়েছে। এমনিভাবে অন্যান্য আরবী কিতাবেও। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতার জন্য কুরআন-হাদীস ব্যাপকভাবে যেমন অধ্যয়ন করা দরকার, তেমনি তার সাহিত্য ও শিল্পভাবও উপলব্ধি করা দরকার। মাতৃভাষায় অধ্যয়ন করার সুযোগ না পাওয়ার কারণে তার কোনটাই হয়ে ওঠে না।

জুম‘আর সালাতের খুৎবাও বাংলা ভাষায় হওয়া উচিৎ। ইমাম সাহেব নিজেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর ভাষণ বুঝেন না। সাধারণ মুসুলিণ্ঢরা গোনাহ হওয়ার ভয়ে ইমাম সাহেবের দিকে তাকিয়ে থাকে অথবা ঘুমায়। আর শিশুরা গোনাহ সম্পর্কে কোন জ্ঞান না হওয়ায় নাচানাচি করতে থাকে বা শিশু বন্ধুদের সাথে গল্প করতে থাকে।

মাতৃভাষা বাংলা নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরচ হয় মূলত ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর থেকেই। কোন্ ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করলে বাংলার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জ্ঞানের পালণ্ঢা ভারী হবে এবং শিক্ষার্থী সৃষ্টিশীল কিছু করতে পারবে, এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ড় নেই। যেই সময়ে মাতৃভাষা নিয়ে বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে এই বিতর্ক শুরচ হয়েছিল সেই সময়ে বাংলা ভাষায় পর্যাপ্ত বই-পুস্ড়ক ছিল না। কিন্তু বর্তমানে সেই দুরবস্থা বাঙালি মুসলমানরা কাটিয়ে উঠেছে।

ধর্ম যেহেতু মানুষের আত্মা ও মনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; এই আত্মা ও মনকে জ্ঞান দিয়ে তৃপ্তি দিতে চাইলে, মাতৃভাষাই সবচেয়ে বেশি অনুকূল। বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় / কলেজ / মাদরাসা পর্যায়ে ইসলাম শিক্ষার যে বিভাগগুলো রয়েছে, তাতে শিক্ষার মাধ্যম পুরোপুরি বাংলা হলে, ইসলামের ইতিহাস, সাহিত্য, কুরআন, হাদীস ও ফিকহ এ সমস্ড় বই-পুস্ড়ক বাংলা মাধ্যমে শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করার সুযোগ পেলে বর্তমান অবস্থা থেকে শিক্ষার মান অনেক বেড়ে যাবে এবং ইসলামের প্রচার-প্রসার, ইসলামী পন্ডিতের সৃষ্টি, ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি মানুষের আগ্রহ, ইসলামকে বাস্ড়ব জীবনে অনুসরণ ও ধর্মীয় কুসংস্কার দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো মাতৃভাষার কারণে সমাজ জীবনে এক বড় ধরনের কল্যাণমূলক প্রভাব ফেলবে।

জ্ঞান আহরণের জন্য বিদেশি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই কিন্তু জ্ঞান বিতরণে যাকে বিতরণ করা হবে তার জন্য সহজবোধ্য ভাষা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বর্তমান বাজারে মাতৃভাষায় যথেষ্ঠ পরিমাণে ধর্মীয় গ্রন্থাদি রয়েছে, যা প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যায় পর্যন্ড় সিলেবাসে অন্ড়র্ভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব।

প্রতি জুম'আ ও ঈদের জামাতে এবং বাৎসরিক ওয়াজ মাহফিলে আলেমগণ শিক্ষিত মানুষের সামনে যে জগাখিচুড়ী ভাষায় বয়ান করেন, তাতেই বোঝা যায় তাঁদের জ্ঞানের দৌড় কতটুকু। তারা মাদরাসায় অধ্যয়নের সময় পৃথিবীর উন্নত ইসলামী সাহিত্য পড়েছে ঠিকই, কিন্তু তা তাদের মাতৃভাষায় না হয়ে আরবী ভাষায় হওয়ায় তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বুঝেন নি। আর না বুঝার কারণে তাদের ভিতরে ইসলাম ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান প্রবেশ করার সুযোগ পায় নি।

বাংলাদেশের অনেক আলীয়া ও কওমী মাদরাসায় প্রত্যেক বৎসর বুখারী শরীফের আরবী তিলাওয়াত খতম হয় কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র তা বুঝতে সক্ষম হয় না। অথচ বাংলায় খতম হলে ইসলামী দর্শনের অনেক মৌলিক তত্ত্ব ছাত্ররা হৃদয়ঙ্গম করতে পারতো।

অন্যদিকে বাংলাদেশে অধিকাংশ আলেম-ওলামাদের বিশ্বাস মাতৃভাষায় অধ্যয়নের মাধ্যমে ইসলামী জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আলেমরা যখন মাতৃভাষা বর্জন করে আরবী ভাষায় ধর্মীয় বিষয়গুলো শিখতে যায়; তখন তারা আরবী ভাষাও ভালো করে জানতে পারে না, মাতৃভাষাও না। সভা-সমিতিতে ও জুম'আর খুৎবায় আলেমদের অশুদ্ধ ভাষায় বক্তৃতা ও ভাষণ শোনে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁদের অপরিপক্বতা দেখে সাধারণ মানুষের ইসলামের প্রতি একটা অনীহা ভাব সৃষ্টি হয়। যার ফলে ইসলামের প্রতি অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করতে চায় না। তাঁদের ছেলে-মেয়েদেরকেও মাদরাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করিয়ে শিক্ষা দিতে চায় না।

বাংলা ভাষায় গিরিশচন্দ্র সেনের কুরআনের অনুবাদ (১৮৮৫) থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের 'ইসলামী বিশ্বকোষ' (১৯৮৫) ও 'সীরাত বিশ্বকোষ' (২০০৫) পর্যন্ড় হাজার হাজার ইসলামী বই-পুস্ড়্ক রচিত ও অনূদিত হয়েছে, যার বিশুদ্ধতা ও সাহিত্যের মানের দিক থেকে আরবী বা উর্দু ভাষার তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী, মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য ও বই-পুস্ড়্ক অধ্যয়নের

মাধ্যমেই ইসলামের স্বর্ণযুগ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান আজও বিশ্ব ইতিহাসের অংশ হয়ে আছে।

ক. মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন, জ্ঞানার্জন, প্রচার ও প্রসারে ইসলামী শরীয়ার নির্দেশ পালনের প্রয়োজনীয়তা ঃ

নিজ ভাষায় কথা বলা, লিখা ও মনের ভাব ব্যক্ত করা অতীব সহজ। মাতৃভাষা মানবতার প্রতি মহান আলণ্ঢাহর অশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। এর মাধ্যমে মানুষ তার মনের ভাব অন্যের কাছে সহজেই প্রকাশ করতে পারে। এজন্যই পবিত্র কুরআনে মাতৃভাষাকে 'আলণ্ঢাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম'[৬৫৭] বলে উলেণ্ঢখ করা হয়েছে। ভিন্ন ভাষায় অন্যের সঙ্গে ভাব বিনিময় করাও কঠিন। পুরোপুরিভাবে কিছু বুঝানোও জটিল ব্যাপার।

ইসলামী জ্ঞানের প্রধান উৎস ওহী। যুগে যুগে মহান আলণ্ঢাহ এই ওহী নাযিল করেছেন সে যুগের নবী, রসুল ও তাঁদের উম্মতের মাতৃভাষায়। আরব জাতির মাতৃভাষা ছিল আরবী। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে: "আমি এ কিতাব (তোমাদের মাতৃভাষা) আরবীতেই অবতীর্ণ করেছি যাতে করে তোমরা তা বুঝতে পার।"[৬৫৮]

তাছাড়া শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার অতীব প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যুগে যুগে মনীষীগণ এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরচত্ব অনুধাবন করেছেন। এমনকি নবী-রাসুলগণও তাদের উম্মতের শিক্ষা দিতে মাতৃভাষায় বিশুদ্ধতা ও প্রাঞ্জলতা অর্জনকে খুবই গুরচত্ব প্রদান করেছেন। মুসা (আ.) মহান আলণ্ঢাহর কাছে এ বলে প্রার্থনা করেছেন-

واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى

"হে প্রভূ! তুমি আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও, যাতে করে তারা আমার কথা ও বক্তব্য বুঝতে সমর্থ হয়।"[৬৫৯] তিনি আরও বলেছেন:

ولا ينطق لسانى فارسل إلى هارون

---

৬৫৭. (.৩০:২২ (القران) ومن اياتة خلق السماوات و الارض واختلاف السنتكم والوانكم,

৬৫৮ . আল-কুর'আন, ১২:২

৬৫৯ . আল-কুরআন, ২০ ঃ ২৭-২৮

“আমার জিহ্বায় জড়তা আছে আমার কথা প্রাঞ্জল নয়, সুতরাং হারুনের প্রতিও প্রত্যাদেশ করুন।”[৬৬০] অন্যত্র এসেছে:

وأخى هارون هو أفصح منى لسانا فارسله معى ردا يصدقنى

“আমার ভাই হারুন, সে আমার অপেক্ষা বাগ্মী, অতএব তাকে আমার সাহায্যকারীরূপে প্রেরণ করুন, সে আমাকে সমর্থন করবে।”[৬৬১] মহান আল্লাহ্ আরও বলেন:

وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

“আমি প্রত্যেক রাসুলকে তাঁর জাতির ভাষাতেই প্রেরণ করেছি। যাতে করে তিনি মহান আল্লাহর বাণী (সহজেই) তাদের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারেন।”[৬৬২] উল্লিখিত বর্ণনা থেকে এটি প্রমাণিত হয় যে, শিক্ষা ও উপদেশ দানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় দক্ষতা, প্রাঞ্জলতা ও বিশুদ্ধতা অর্জন অত্যাবশ্যক।[৬৬৩]

মাতৃভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম আযম আবু হানীফার মতামতও প্রণিধানযোগ্য। “তিনি কুরআন বুঝার স্বার্থে নামাযের মধ্যে কেউ চাইলে কুরআনকে নিজ মাতৃভাষায় পড়তে পারবে বলে মতামত দিয়েছিলেন। যেমন এ প্রসঙ্গে ‘নুরুল আনোয়ার’ গ্রন্থে এসেছে-

إن أبا حنيفة يجوز القراءة الفرسية فى الصلاة مع القدرة على النظم العربى

‘ইমাম আবু হানীফা আরবী ভাষা পড়তে সক্ষম ব্যক্তির জন্যও নামাযে ফার্সী ভাষায় ক্বির’আত পড়া বৈধ মনে করতেন’।[৬৬৪] উল্লেখ্য ফার্সী ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তবে পরবর্তীতে তিনি তাঁর মতামত থেকে ফিরে আসেন এবং আরবীতেই ক্বিরআত পড়ার মতামত প্রদান করেন।[৬৬৫]

ইসলাম প্রচার প্রসারেও মাতৃভাষার ভূমিকা অপরিসীম। মহান আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন:

---

৬৬০. আল-কুরআন, ১৬ ঃ ১৩

৬৬১. আল-কুরআন, ২৮ ঃ ৩৪

৬৬২. আল-কুরআন, ১৪ ঃ ৪

৬৬৩. ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন ও ড. মোঃ ইউসুফ, *আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা চর্চা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৩) পৃ. ২১-২২

৬৬৪. শায়খ আহমদ মোল্লাজিওন, *নুরুল আনোয়ার* (দেওবন্দঃ মাকতাবা থানবি, ১৯৮৩), পৃ. ১১

৬৬৫. ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন ও ড. মোঃ ইউসুফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هى أحسن

"তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের প্রতি আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা। আর তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে।"[৬৬৬] এ আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতীত ধর্মের প্রচার ও প্রসার ফলপ্রসূ হয় না। আহুত ব্যক্তিকে তার মাতৃভাষায় ডাকা হলো শ্রেষ্ঠ কৌশলের একটি। উপরোক্ত আয়াতে কোন কোন ব্যাখ্যাকার মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণের ইঙ্গিত করেছেন।

মানুষকে আলণ্ঢাহর দিকে আহ্বান করার সময় এমন ভাষা, বাচনভঙ্গি, পরিশীলিত শব্দ চয়ন ও কুশলী বাক্যবিন্যাস প্রয়োগ করা উচিত, যাতে মানুষ সহজে বুঝতে পারে এবং অনুপ্রাণিত হতে পারে। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এভাবেই মানুষকে আকৃষ্ট করতেন। মাতৃভাষা শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা মহানবীর সুন্নত। হযরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর সারা জীবনে একবারও মাতৃভাষা অশুদ্ধ করে উচ্চারণ করেন নি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমি আরবদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধ ভাষার অধিকারী'।[৬৬৭] যে সকল আরববাসী অতি অল্প সময়ে মহানবী (সা.) এর ভক্ত হয়েছিল; তার বিশেষ কারণ ছিল, তিনি তাঁর কওমের ভাষা মানুষের সামনে বিশুদ্ধ ও শ্রুতি মধুরভাবে উপস্থাপন করেছিলেন।[৬৬৮]

খ. সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা বাংলায় জ্ঞান চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও বাঙালি মনীষীদের চিন্ড়া ঃ

বাংলাদেশের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে জাগতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাধারণ মানুষ দেশের উন্নয়ন ও জ্ঞানের উন্নয়ন অনেকটা সমভাবেই আশা করে। জ্ঞান বিতরণে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আরবী ও উর্দু মাধ্যম আর জাগতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ইংরেজি মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা দানের চেষ্টা করছে। যার ফলে, কোনো পক্ষেরই সফলতা আশাপ্রদ হচ্ছেনা। এই বিষয়ে একটা তুলনামূলক আলোচনা করে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করছিঃ

[৬৬৬]. আল-কুরআন, ১৬: ১২৫

[৬৬৭]. আল-জাহিয, *আল-বায়ান ওয়া আল-বায়ান ওয়া আল-তিবয়ীন, খণ্ড, ২, এডিশন, ৪* (মিশর: মাকতাবাতুল খানজি, ১৯৭৫) পৃ. ১৭, *আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা চর্চা*, প্রাগুক্ত, পৃ, ২১

[৬৬৮]. মো: শামছুল আলম ও তারেক জিয়াউর রহমান সিরাজী, *ইসলামের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা চর্চার গুর—ত্ব* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা , ৪৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৪) পৃ ১৬৫-১৬৬

মুসলমানরাই অবিভক্ত বাংলায় বাংলা ভাষা ও সভ্যতার সৃষ্টি করেন।[৬৬৯] তবে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি মুসলমানদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব কবে, কখন ও কিভাবে প্রবেশ করে তা জানতে হলে গবেষণার প্রয়োজন। কবি আবদুল হাকিম তাঁর কবিতায় মুসলমানদের এই মনোভাবের কারণে তাঁদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছেন ঃ

"যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে ন জুয়ায়।
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশে ন যায়॥
মাতা পিতামহ ক্রমে বঙ্গেত বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥" ।[৬৭০]

এ প্রসঙ্গে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা' কবিতাটিও উলেণ্ঢখযোগ্য ঃ

'হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন।
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে,
মাতৃভাষা-রূপ খনি, পূর্ণ মণিজালে।"[৬৭১]

মাতৃভাষায় যত সহজে জ্ঞান আত্মস্থ করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায়, চিন্তা করা যায়, ধ্যান করা যায়; পর ভাষায় বা বিজাতীয় ভাষায় তা পারা যায় না। পর ভাষায় কোন কিছু ভাবা বা প্রকাশ করতে যাওয়া, এ যেন প্রকৃতি বিরুদ্ধ এক ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) মতামত উলেণ্ঢখ করা যায়: ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ' নামে এক প্রবন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন,

---

[৬৬৯] . ড. এস.এম. লুৎফর রহমান, মুসলমানরাই বাঙলা ভাষার আদি ওয়ালেদ, *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯

[৬৭০]. মোহাম্মদ সা'দাত আলী, *সাহিত্য প্রতিভা* (ঢাকাঃ অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০০৯) পৃ. ১৫, '*নূরনামা*' কবি আবদুল হাকিম

[৬৭১] .বাংলা সাহিত্য (সংকলন) গদ্য ও পদ্য, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য (ঢাকাঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৬) পৃ. ১৭১

"শিক্ষায় মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ"। তাঁর এই প্রবন্ধে তিনি 'বাংলা ভাষার মাধ্যমে সকল জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারিত হোক' এমন প্রত্যাশাও করেছিলেন। এর প্রায় বছর তিনেক আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শিক্ষার বিকিরণ' নামে এক বক্তৃতায় তিনি উলেণ্টখ করেন: "এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলা ভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে কমে। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, প্রায় সত্তর বছর আগে উচ্চারিত এই বক্তব্য আজও কত প্রাসঙ্গিক,-প্রবচনতুল্য এই উক্তির সত্যমূল্য কালান্ড়রেও কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি।"[৬৭২]

তাছাড়া আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পর দেখা যাচ্ছে যে, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা বা চাকরির ক্ষেত্রে বিসিএস ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় আরবী ও ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের তুলনায় বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা বেশি সুযোগ করে নিচ্ছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, মাতৃভাষায় শিক্ষার্জন প্রাকৃতিক জ্ঞানের মতোই এর শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাংলাদেশে যারা ইসলাম নিয়ে চিন্ড়া করেন ও ভাবেন, ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামী রাজনীতি করেন এবং ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চান অর্থাৎ ইসলামী আদর্শ সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান; তাদেরকে ইসলামী জ্ঞানে প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ হওয়ার কোন বিকল্প নেই।

ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন ছাড়া ইসলামকে সমাজ ও বাস্ড়ব জীবনে প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখেও কোন লাভ নেই। যাদেরকে ইসলামী জ্ঞান প্রদান করা হয় এবং যারা ইসলামী জ্ঞান আহরণে আগ্রহী তাদেরকে সহজ পথ ও পদ্ধতি দিয়ে ইসলামী জ্ঞানার্জনে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে মাতৃভাষাই হতে পারে প্রধান অবলম্বন। গবেষক আবুল আহসান চৌধুরীর মতেঃ জাতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান করলে তা শিক্ষার্থীদের সহজ বোধ্য হয় এবং এতে তাদের সহজাত বুদ্ধি, মৌলিক চিন্ড়াশক্তি ও কল্পনা শক্তির বিকাশ সাধন সহজতর হয়। অধিকন্তু জাতীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থাদি শ্রেণী কক্ষের বাইরেও জনগণের মধ্যে জ্ঞান প্রসারে সহায়তা করে। শিক্ষার পদ্ধতিতে ভাষার গুরচত্ব খুব বেশি এবং শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞান বিস্ড়ার, সংস্কৃতির প্রসার এবং জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি। অতএব, আমাদের শিক্ষা পরিকল্পনাকে সার্থক করে তুলতে হলে অবিলম্বে সর্বস্ড়রে শিক্ষার মাধ্যম রূপে বাংলাভাষার ব্যবহার করতে হবে।[৬৭৩]

---

[৬৭২]. আবুল আহসান চৌধুরী, 'বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ উচ্চপর্যায়ের বাংলা ভাষা শিক্ষা', *সুশিক্ষাবর্ষ স্মারক গ্রন্থ* ২০০৩ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৩) পৃ. ২১৪

[৬৭৩]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

মুসলিম শাসনের স্বর্ণযুগে বাগদাদ কেন্দ্রিক বায়তুল হিকমার[৬৭৪] প্রতিষ্ঠাতাগণ তাঁদের মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্ব জ্ঞানভান্ডারকে আরব জাতির নিকট উন্মুক্ত করেছিলেন। যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে আরবজাতি জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করেছিল এবং বিশ্বকে প্রায় হাজার বছর নেতৃত্ব দিয়েছিল।

সাহিত্যিক সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর ভাষায়ঃ "মাতৃভাষা ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই। যখন আরব জাতি জ্ঞান গৌরবের এবং জয় মহিমার বিজয় পতাকা পৃথিবীর নানা দেশে উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন, যখন বর্তমান জগতের ভাগ্যচক্রের বিধাতা ইউরোপ খন্ড তাহাদের পাদমূলে বসিয়া শিক্ষা ও সভ্যতা লাভ করিয়াছিল তখন আরবগণ তাহাদের মাতৃভাষা আরবীর কীদৃশ কঠোর সাধনা ও গভীর অধ্যবসায় বলে বিবিধ রত্নরাজিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর যাবতীয় ভাষা গ্রীক, লাটিন, হিব্রূ, সংস্কৃত এমনকি চীনা ভাষা হইতেও যাবতীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আরব্য ভাষায় আনুবাদিত হইয়াছিল। তাই আরব জাতি, ভূতলে অতুল কীর্ত্তির পতাকা উড়াইয়া গিয়াছেন"।[৬৭৫]

ইংলিশ মিডিয়াম আর আরবী মিডিয়াম। রাস্তার মোড়ে, বিলবোর্ডে এমনকি গ্রাম-গঞ্জে পর্যন্ত শিক্ষার এজাতীয় মিডিয়ামের বিজ্ঞপ্তির অভাব নেই। এতে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত ও প্রতারিত হচ্ছেন। অথচ কোন মিডিয়ামই বাংলাদেশে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের গভীরে প্রবেশ করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারছেনা।

স্কুল পর্যায়ে যেমন ভয় দেখানো হয়; ইংরেজি না জানলে বিশ্ব জ্ঞান ভান্ডারে প্রবেশ করা যাবেনা; ঠিক তেমনি মাদরাসা পর্যায়েও ভয় দেখানো হয়; আরবী বা উর্দু না জানলে ইসলামী জ্ঞানে প্রবেশ করা যাবেনা। অথচ এ দুটো বক্তব্যের কোনটাই এ পর্যায়ে পুরোপুরি সত্য নয়। আমরা বিদেশি বা ধর্মীয় ভাষার সহযোগিতা নিতে পারি; কিন্তু সেই ভাষার উপর অন্ধ নির্ভরতা আমাদের গভীর জ্ঞানার্জনে, সৃষ্টিশীলতায় ও ধ্যানমগ্নতায় বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রবীণ শিক্ষাবিদ ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের বিশিষ্ট

---

[674]. The first institution for the higher studies among the Arab was Bayt al-Hikmah, a combination of library, academy and translation bureau, founded on the bank of the Tigris at Bagdad by Harun al-Rashid in 830 A.C. [S.M. Imamuddin, Some Leading Muslim Libraries of the World (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983), P. 25]

[৬৭৫]. সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, 'মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি', *বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্যচিন্তা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১) পৃ. ২-৪

অধ্যাপক জিলণ্ডুর রহমান সিদ্দিকীর মতে-কোথায় আমাদের উচ্চশিক্ষার দুর্বলতা তাঁর কারণ খুঁজতে বেশিদূর যেতে হয়নি। মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি থাকার যে অসুবিধার দিক তা প্রথম থেকেই স্বীকৃত। একটি বিদেশী ভাষার সহায়তা এক কথা, তার উপর একান্ড় নির্ভরতা অন্য জিনিস। সব দেশেই ছাত্র সমাজ মাতৃভাষার বাইরে অন্যান্য দুটি একটি ভাষার সাহায্য দরকার মতো নিয়ে থাকে, তবে তাদের অবলম্বন মাতৃভাষাই।

এই বক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে মাতৃভাষাকে গ্রহণের দৃষ্টান্ড় পৃথিবীর নানা দেশে আছে, এদের মধ্যে অনেকেই উন্নতির শিখরে উঠেছে। কেউ কেউ বিশ্বের পরাশক্তি হিসাবেও স্বীকৃত। উদাহরণ হিসাবে চিন ও জাপানের নাম আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের প্রাক্তন সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কথা উলেণ্ডখ করা যায়।[৬৭৬]

সুতরাং বাংলাদেশে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি করতে হলে, ঘরে ঘরে ইসলামের মর্মবাণী পৌঁছে দিতে হলে, ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কিত পর্যাপ্ত পরিমাণে বই-পুস্ড়ক বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বাংলায় পঠন-পাঠনের সুযোগ করে দিতে হবে।

বর্তমানে ধর্মীয় পুস্ড়কাদি ক্লাসিকেল আরবী ভাষায় ও উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের মানে লিখিত হওয়ায় সর্বসাধারণের নিকট খুবই দুর্বোধ্য। ছাত্র-ছাত্রীরাও পরীক্ষা পাশের জন্য মুখস্থ করে বিধায় পরীক্ষার হল থেকে বের হওয়ার পর কঠিন কোন যুদ্ধ থেকে জীবন বাঁচিয়েছে বলে আনন্দ বোধ করে। এই ছাত্ররা যখন শিক্ষক হয়, তারাও তাঁদের ছাত্রদের ভালো করে এই বিষয়গুলো বুঝাতে সক্ষম না হয়ে অনেক ক্ষেত্রেই ক্লাসে গল্প-গুজব করে বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে, অন্ড়রে একটি অশান্ড়ির ভাব নিয়ে ক্লাস থেকে বের হয়ে চলে আসেন।

শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষা না হওয়ার ফলে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাহিত্যচর্চার সুযোগ না থাকার কারণে আমাদের স্কুল / কলেজ / মাদরাসা/ প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার যে কী দুর্গতি চলছে তা প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের (১৮৯৮-১৯৭৯) লেখায় সবচেয়ে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে-"আসলে শিক্ষাদানটা হইল শিক্ষক যা বুঝেন ছাত্রকে তা বুঝাইয়া দেওয়া, যত বড় বিজ্ঞানীই আপনি হোন, আর ইংরাজী, ফরাসী, জার্মানী, রুশীয়, আরবী ও ফারসী যে ভাষাতেই আপনি সে বিজ্ঞান

---

[৬৭৬] . প্রাগুক্ত,পৃ.২২০

পড়িয়া থাকুন, আপনি তা বুঝিয়াছেন আপনার মাতৃভাষাতেই। চিন্তাও করেন আপনি সেই ভাষাতেই। কাজেই অপরকে বুঝাইতেও পারিবেন সেই ভাষাতেই। যিনি তা পারিবেন না, তিনি নিজেই সেটা বুঝেন নাই, মুখস্থ করিয়াছেন মাত্র।" ।[৬৭৭]

আমাদের সমাজের ধারণা হচ্ছে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংলিশ মিডিয়াম না হলে, মাদরাসা অথবা আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে আরবী মিডিয়াম না হলে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান বা স্ট্যান্ডার্ড বজায় থাকে না। বাংলাদেশের যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজাতীয় ভাষায় পাঠদান করা হয়, সমাজে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রহণযোগ্যতা বেশি। এতে ছাত্র-ছাত্রীর লাভ-লোকসান যাই হোক। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমেদ আরও বলেন-

"শিক্ষার স্ট্যান্ডার্ড মানে জ্ঞানের স্ট্যান্ডার্ড, মিডিয়ামের স্ট্যান্ডার্ড নয়। ইংরাজীতে শিক্ষা দিলেই শিক্ষার মান উন্নত হয়না। যাঁরা কিন্ডার গার্টেন স্কুল ইংরাজী মিডিয়ামে ছেলে মেয়েদের বাল্য শিক্ষা শুরু করিয়া ভাবিতেছেন, সন্তানদের শিক্ষার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতেছেন, তাঁরা আসলে ওদের জীবনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করিতেছেন। এঁরা ভুলিয়া যান চল্লিশ বছরের যে শিক্ষা ও লব্ধ জ্ঞানের বলে রুশ জাতি চাঁদের বুকে রুশ নিশান গাড়িয়াছে, সে শিক্ষা তারা পাইয়াছে রুশ ভাষার মাধ্যমে, ইংরাজীর মাধ্যমে নয়। আর মিলিটারী শক্তির কথা? হিটলার জার্মান জাতির যে অজেয় ও দুর্বার মিলিটারী শক্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেটা তিনি করিয়াছিলেন জার্মানদের মাতৃভাষাতেই। সেই অজেয় শক্তিকে চুরমার করিয়া স্ট্যালিনগার্ড রক্ষা করেছিলেন যে রুশ বীরেরা তাঁরাও মিলিটারী স্মার্টনেস অর্জন করিয়াছিলেন নিজেদের মাতৃভাষাতেই। আসলে জ্ঞানের মধ্যে ভাষা নিহিত, ভাষার মধ্যে জ্ঞান নিহিত নাই।"[৬৭৮]

আরবী, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা প্রয়োজন মতো অবশ্যই শেখার দরকার আছে। কিন্তু তা শেখার জন্যে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করে দিতে হবে কেন? প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রায় সাত হাজার নাম্বার ইংরেজি ভাষা শিক্ষা বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হয়। কওমী মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় শতকরা ৯৯% ভাগই আরবী ও উর্দু পড়তে হয়।

অন্যদিকে এই ইংরেজি বা আরবী শেখার জন্য প্রাইভেট শিক্ষকের সহযোগিতা গ্রহণ করেন নি, কোচিংয়ে যান নি বা অপরিকল্পিত টাকা খরচ করেন নি; এমন শিক্ষিত নাগরিক পাওয়া যাবে না। শিক্ষার্থী ও তাদের

---

[৬৭৭]. আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার* (ঢাকাঃ আহমেদ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯) পৃ. ১০৭-১০৮

[৬৭৮]. প্রাগুক্ত,পৃ.১১৫-১১৬

অভিভাবকদের মধ্যে সবসময় একটি ভীতি কাজ করে এই বিদেশি ভাষা শিক্ষা গ্রহণ ও পাশ করা নিয়ে। অনেকের প্রেসার বেড়ে যায় এবং এ কারণে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালেও ভর্তি হতে দেখেছি।

তাছাড়া, আমাদের দেশে প্রাথমিক স্ড়র থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ড় শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি বা আরবী হওয়ার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশ শ্রম ও সাধনা ভাষা শেখার পিছনেই চলে যায়। জ্ঞানার্জন আর হয় না। অথচ ভাষাবিজ্ঞানীরা বলছেন, যেই কোন ভাষা দুই তিন বৎসর চেষ্টা করলেই আয়ত্ত্ব করা সম্ভব। আবুল মনসুরের ভাষায়ঃ "বিদেশী ভাষা শিক্ষার আমি বিরোধিতা করিতেছিনা। আমরাও শিখিব। কিন্তু সেটা হইবে অন্যান্য সভ্য জাতির মতোই। বিদেশী ভাষা শিখিব আমরা মাতৃ ভাষায় শিক্ষিত হইবার পর, আগে নয়। একজন শিক্ষিত লোক মাত্র তিন বৎসরে যে কোন বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারে। আর সবচেয়ে বড় কথা কোন অবস্থাতেই গোটা জাতিকে বিদেশী ভাষা শিখিতে হইবেনা। অতএব, কোন যুক্তিতেই বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম করার মতো জাতীয় জীবনের জরচ্রী কাজে একদিনের জন্যও বিলম্ব করা যায়না।"[৬৭৯]

মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি এ শব্দগুলো প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের অন্ড়রে রেখাপাত করে আসছে। সাহিত্যিক মোতাহের হোসেন চৌধুরী (১৯০৩-১৯৫৬) তাঁর 'সংস্কৃতির কথা' গ্রন্থে মাতৃভাষায় শিক্ষার্জনের চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যা উলেণ্ঢখ করলে বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে ঃ মাতৃস্ড়ন্য বঞ্চিত শিশু যতই ধাত্রীস্ড়ন্য পান করচক না কেন, শারীরিক পরিপুষ্টি লাভ করা তার পক্ষে তেমন সম্ভব হয় না। মাতৃভাষার রস বঞ্চিত শিক্ষার্থীর অন্ড়রও অপরিপুষ্ট থেকে যায়। শিক্ষা জিনিসটা আসলে মানসিক আহার ছাড়া আর কিছুই নয়। শরীর বাঁচিয়ে রাখবার উপায় যেমন ডাল, চাল প্রভৃতি আহার্য দ্রব্য, অন্ড়র বাঁচিয়ে রাখবার উপায়ও তেমনি শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি মানসিক খাদ্য। আহার্য দ্রব্য পরিপাক লাভ করে রক্তে পরিণত না হলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে, আর বাইরের প্রাপ্ত শিক্ষাও অন্ড়রের সঙ্গে এক হয়ে না গেলে কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই সৃষ্টি করে বেশী।

মাতৃভাষার সঙ্গে অন্ড়রের যে সহজ যোগ আছে, বিদেশী ভাষার সঙ্গে সে সহজ সম্বন্ধ নেই। তাই তার মধ্যস্থতায় শিক্ষা দেবার চেষ্টা অন্ড়র জগতে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন না হওয়ার দরচন ছেলেদের পক্ষে চিন্ড়া ও কল্পনাচর্চা সম্ভব হচ্ছেনা; অথচ এই কল্পনা ও চিন্ড়া চর্চা ব্যতীত

[৬৭৯]. প্রাগুক্ত, পৃ.১১৬

শিক্ষা কখনও সার্থক হতে পারেনা। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মনের ঘুম ভাঙানো-অন্য কথায় চিন্ড়া ও কল্পনার উন্মেষ সাধন।

বিদেশী ভাষায় শিক্ষা লাভ করতে বহু সময় ও শক্তির অপচয় হয় বলে ছেলেদের কল্পনা ও মননশক্তি তেমন কার্যকরী হয়না। ভাষা শিখতেই তাদের সময় যায়, ভাবচর্চা আর হয়ে ওঠেনা। স্মরণশক্তি নিয়ে বেশিরভাগ কাজ করতে হয় বলে মননশক্তি সম্বন্ধে জাগ্রত থাকা তাদের পক্ষে মুশকিল হয়ে ওঠে। বাংলা ভাষার সঙ্গে ভাল করে পরিচিত নয় বলে ছেলেরা আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা লাভ করতে পারেনা। এবং সে-হেতু তাদের অনুর্বর চিত্তভূমি কোন সুফলও প্রদান করতে সক্ষম হয়না। মাতৃভাষা শিক্ষার বাহন হলে দেশের কচি তরুণ চিত্তগুলি এমন বিনা আবাদে পড়ে থাকতনা- সেখানে সোনা ফলাবার বন্দোবস্ড় হত।[৬৮০]

অবিভক্ত বাংলার মুসলিম জাগরণে যে সমস্ড় ইসলামী চিন্ড়াবিদ গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তারা প্রায় সকলেই[৬৮১] মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জন ও ইসলামী সাহিত্যচর্চার পক্ষে জোরালো বক্তব্য প্রদান করেছেন।

---

[৬৮০]. মোতাহের হোসেন চৌধুরী ‘শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ’ *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খ-* (ঢাকা ঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫) পৃ. ১৬১-১৬৪

[৬৮১]. মুন্সী মহম্মদ মেহেরউলণ্ঢা (১৮৬১-১৯০৭), গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০), আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), মৌলানা মুহম্মদ নইমুদ্দিন (১৮৩২-১৯১৬), দীন মুহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯১৬), শেখ আবদুল জব্বার (১৮৮১-১৯১৮), রেয়াজ আলদীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) টাঙ্গাইল , সফিউদ্দীন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২), মুহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩), নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪), খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), খান বাহাদুর তসলীমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭), সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দিন (১৮৭০-১৯৩০), সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯৩০), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) বরিশাল, শেখ ফজলল করিম (১৮৮৩-১৯৩৬), দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬), ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৪০), আবদুল করিম (১৮৬৩-১৮৪৩), আবদুল বারী কবিরত্ন (১৮৭৩-১৯৪৪), মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), রেভারেন উইলিয়ম গোল্ডসেক (১৮৬১-১৯৫০), কাজেম আল কোরায়শী কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯ / ১৮৭১-১৯৫৩), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬), মুহাম্মদ আবদুল হাকিম (১৮৭৬-১৯৫৭), শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২), মুহাম্মদ সেরাজুল হক (১৯০৩-১৯৬৩), কাজী আকরম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩), খান বাহাদুর আবদুর রহমান (১৮৮৯-১৯৬৪), গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪) বেগম শামসুননাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪), খান বাহাদুর আহছানউলণ্ঢা (১৮৭৩-১৯৬৫), গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৫), মুহাম্মদ হাবীবুলণ্ঢাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬), মৌলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মুহাম্মদ এমদাদ আলী (১৮৯১-১৯৬৯), ড. মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) (১৮৯৮-

বাংলার মুসলিম জাগরণের অগ্নি পুরুষ সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১) ইসলাম, মুসলমান ও বঙ্গের আলেম-ওলামাদের ভবিষ্যৎ চিন্ড়া করে; তিনি যে 'মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি লিখেছেন এর কিয়দংশ এখানে উলেণ্ঢখ করছিঃ "আজ হিন্দুস্থানের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ কি আমাদিগের অপেক্ষা ইংরেজী শিক্ষায় অধিকতর অগ্রসর হইয়াছেন? আমি দৃঢ়তা এবং সততার সহিত বলিতেছি নিশ্চয়ই না। কিন্তু তাহাদের মাতৃভাষা উর্দ্দুর আলোচনা থাকায় উর্দ্দু ভাষায় প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ নিরন্ড়র অনুবাদিত হওয়ায়, উর্দ্দুর প্রতি তাহাদের মাতৃবৎ শ্রদ্ধা এবং অনুরাগ থাকায় আজ তাহাদের মধ্যে নবজীবনের লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে।

ভ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমান! তুমিও তোমার মাতৃভাষা পরম পবিত্র বাঙ্গালার সেবায় বদ্ধপরিকর হও; শীঘ্রই দেখিবে বঙ্গীয় মুসলমান গগনে শুভ ঊষারাগমন হইয়াছে। সমাজহিত চিকির্ষ, মহোদয়গণ! নিশ্চয় জানিয়া রাখিবেন-আমরা যতই আরবী, পার্সী, উর্দ্দু এবং ইংরেজীতে পন্ডিত হইনা কেন, যতই আমরা অন্যান্য ভাষার আলোচনা করিনা কেন, যতদিন আমরা বাঙ্গালার আলোচনায় বদ্ধপরিকর না হইব, ততদিন আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা করা নিতান্ড়ই মূর্খতা।

তাই বলি, ভ্রাতঃ বঙ্গীয় মুসলমান! আর আলস্যে কাল কাটাইও না। যে ভাষায় তুমি মনে সুখ দুঃখের কথা প্রকাশ কর, যে ভাষায় তুমি স্বপ্ন দেখ, যে ভাষায় তুমি মনোভাব ব্যক্ত করিয়া প্রাণে শান্ড়ি এবং আরাম লাভ কর তাহা নিজের মাতৃভাষা। জগতের সমস্ড় ভাষা অপেক্ষা তাহার গৌরবের পরিমাণ নিতান্ড় অল্প নহে। মাতাকে ঘৃণা করিলে, তাহার সেবা শুশ্রূষা না করিলে যে পাপ; মাতৃভাষার সেবা না করিলে, যত্ন না করিলেও সেই পাপ।[৬৮২]

আসলে বিদেশি ভাষা সকলের পক্ষে আয়ত্ত্ব করা কঠিন কাজ। তা আরবী / ইংরেজি যাই হোক। আমাদের বাল্যকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই পর্যায়ে কত মেধাবী ছাত্র দেখেছি! কিন্তু কয়জন বিদেশি ভাষায়

১৯৬৯), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবদুল মওদুদ (১৯০৮-১৯৭০), নূর মুহাম্মদ আযমী (১৯০০-১৯৭২), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), মোহাম্মদ বরকতুলণ্ঢাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা (১৯০০-১৯৭৭), শামসুর রহমান চৌধুরী (১৯০২-১৯৭৭), প্রিন্সিপাল ইবরাাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), ডক্টর এম আবদুল কাদের (১৯০৬-১৯৮৪), শইখ শরফুদ্দীন (১৯০০-১৯৮৪), মুজিবর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪) ।

[৬৮২] . সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৪

ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন ? আমাদের জানা মতে অনেকেই আছেন, যারা শুধু বিদেশি ভাষার জটিলতার কারণে জ্ঞানার্জনের রাস্ড়া ছেড়ে দিয়ে অন্য রাস্ড়া ধরেছেন।

মাদরাসায় আলণ্চাহ ও রাসুলের (সা.) শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভর্তি হলেও আরবী ভাষা শিক্ষাভীতির কারণে সে ধর্মীয় শিক্ষার পথ ছেড়ে দিয়ে বিধর্মী শিক্ষায় প্রবেশ করে অথবা মূর্খ থেকে যায়।

আমরা যারা এখন আধো আধো ইংরেজি ভাষা জানি; ঐ স্কুল কলেজ ফেল করা বন্ধুরা আমাদের চেয়ে কম মেধাবী ছিলেন না। এতে স্পষ্ট যে, বিদেশি ভাষায় জ্ঞানার্জনের নামে আমরা অনেককেই শিক্ষার দরজায় প্রবেশ করতে দিচ্ছিনা। শিক্ষার্থীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে দূরে রাখার চেষ্টা করছি।

অনেক শিক্ষার্থী জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার জন্য জটিল বিজাতীয় ভাষা আয়ত্ত্ব করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত হাবুডুবু খাচ্ছেন। আর ভাবছেন, লেখা পড়া এত কঠিন! জ্ঞানীরা কিভাবে জ্ঞানার্জন করেছিলেন! মাদরাসায় যেই ছাত্রটি ইসলামী জ্ঞানার্জনের জন্য ভর্তি হয়, তাকে আরবী ভাষাভীতি দেখিয়ে ইসলামী জ্ঞানার্জন থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছি অথবা সামান্য ভাসা ভাসা জ্ঞান দিয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি।

স্কুল ও মাদরাসার এই জঙ্গি ও কঠোর ইংরেজি-আরবী ভাষাভীতির কারণেই সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ও নজরূলের মত হাজার হাজার-মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী স্কুল পালিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেনঃ বিদ্যালয়ের কাজে আমার যে টুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষা শিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদি-বা তারা কোনমতে এন্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়– উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এখন কথাটা এই, এইযে সব বাঙ্গালি ছেলে স্বাভাবিক বা আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিলনা তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যে জন্য তারা বিদ্যামন্দির হইতে যাবজ্জীবন আন্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিলনা এমন ঢের ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্খা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছেনা? আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্যন্ড় একরকম পড়াইয়া তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটি বড় রাস্ড়া খুলিয়া দেওয়া যায়

তা হইলে কি নানা প্রকারে সুবিধা হয় না? একতো ভিড়ের চাপ কিছু কমেই দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্ড়ার অনেক বাড়ে।[৬৮৩]

সিরাজী বা রবীন্দ্র যুগে বাংলাভাষায় বই পুস্ড়কের যে অপ্রতুলতা ছিল; এখন আর তা নেই। থাকলেও সেই অভাব আমাদেরকেই পূরণ করতে হবে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী সাহিত্য ও নতুন নতুন বই-পুস্ড়ক রচনা করতে হবে। সরকারী, বেসরকারী বা প্রকাশকদের উদ্যোগে অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রাষ্ট্রে অনুবাদ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞানার্জনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্র থেকে বিশ্বখ্যাত লেখকদের রচিত ইসলামী বই-পুস্ড়ক অনুবাদ করতে হবে।

প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বিভাগের মত অনুবাদ বিভাগও থাকতে পারে। এতে শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটানো সম্ভব মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিটি এ প্রসঙ্গে উলেণ্ঢখযোগ্যঃ "আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি যে বাংলা ভাষার যোগে উচ্চ শিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলা ভাষায় উচুঁদরের শিক্ষা গ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষা গ্রন্থ হয় কী উপায়ে?

বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছেনা এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। এই অংশে বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। এখন যারা ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধূলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাইয়া সেদিন ধারা বর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।"[৬৮৪]

আরবী ও উর্দু ভাষায় কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানার্জনের ফল বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য কোন মতেই সুবিধা হচ্ছেনা। আমরা অনেক চেষ্টা তদবীর করে ফল ধরাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু ফুল ও ফলের যে সুবাস, পাকা ফলের সুমিষ্ট গন্ধ মানুষকে যেভাবে আকৃষ্ট করে, আমাদের শিক্ষার ফল তা করতে ব্যর্থ হচ্ছে। তার কারণ শুধু শিক্ষার বাহন বিদেশি বা বিজাতীয় ভাষা। কবি গুরুর মতে: "প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহারা উচ্চ শিক্ষিত তাহারা কর্মশক্তি হারাইয়া ফেলে। একে দারিদ্র্য ও অস্বাস্থ্য-

[৬৮৩] . রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,'শিক্ষার বাহন', *রবীন্দ্র রচনাবলী ৯ম খ*ন্ড (ঢাকাঃ ঐতিহ্য, ২০০৬) পৃ. ৬৮৮-৬৮৯

[৬৮৪] . প্রাগুক্ত,পৃ.৬৯০-৬৯২

তাহার উপর এই বিদেশী ভাষার কোটর হইতে অতি পরিশ্রমে যে বিদ্যা অর্জন হয়, তাহাতে বাঙালি ছাত্রগণের মস্তিষ্ক দারুণ পীড়া অনুভব করে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ৬০ হাজার ছাত্র পড়িতেছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার পর ইহারা মেট্রিক পাস পর্যন্ত বিজাতীয় ভাষা শিক্ষার চেষ্টা ছাড়া আর কি করে ? সময় ও শক্তির এই অপচয় জগতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।"[৬৮৫]

বাংলাদেশের অধিকাংশ কওমী মাদরাসাই আবাসিক। আবাসিক ব্যবস্থায় শিক্ষকদের তদারকির কারণে ছাত্ররা প্রত্যেকদিন ১০/১২ ঘন্টা উর্দু ও আরবী ভাষায় ইসালামী বই-পুস্তক অধ্যয়নের পিছনে সময় দিয়ে থাকে। তারপরেও তাদের জ্ঞানার্জনের পরিমাণটা হয় খুবই কম। কারণ ইসলামী সাহিত্যের গ্রন্থগুলো তারা মাতৃভাষায় চর্চা না করে বিদেশি ভাষায় চর্চা করার ফলে, সময় অনুপাতে ফলাফল খুব কম আসে। বিদেশি ভাষায় জ্ঞানচর্চার ফলে একশত ঘন্টায় যে জ্ঞানার্জন হয়, মাতৃভাষায় তা এক ঘন্টাতেই সম্ভব।

আমরা ধর্মীয় কারণে আরবীর মাধ্যমে আর জাগতিক কারণে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করি ঠিকই; কিন্তু বাস্তবিক অর্থে আমরা জ্ঞান আহরণের কোন স্বাদ অনুভব করিনা। এ যেন লবন ছাড়া ঘি ভাত খাওয়া বা পান্তা ভাত খাওয়ার মত অবস্থা। ডাক্তারি বিদ্যা মতে যে খাদ্য মুখে স্বাদ লাগেনা; তা বার বার আহার করলে পেটে হজম হয় না। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করার জন্য নীচের উদ্ধৃতিটি খুবই প্রাসঙ্গিকঃ

"ইংরাজের প্রদত্ত শিক্ষা হইতে আমরা যে কিছুই লাভ করি নাই, এ একটা প্রকান্ড মিথ্যা কথা। যে ব্যক্তি ইংরাজি শিক্ষা একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে বলিতে চাহেন, আমরা তাহার সহিত বাহু যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কুণ্ঠিত নহি। আমরা শিখিয়াছি অনেক ও পাইয়াছি অনেক; কিন্তু তাহাতে আমাদের বাহ্য ব্যতীত আভ্যন্তরিক উন্নতি বিশেষ কিছু হয় নাই; আমাদের শরীরে মজ্জা বা শোনিত শোধিত হয় নাই; আমাদের আত্মার পুষ্টি হয় নাই। এ যেন অস্থি চর্মসার চির রোগীকে বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অথবা গলিত নখদন্ত বৃদ্ধকে পরচুলা রঙ ও কৃত্রিম দন্তের সাহায্যে যুবা সাজাইয়া রঙ্গমঞ্চে নামান হইয়াছে। জীর্ণ, কুণ্ঠাগত প্রাণ রোগীকে ফোঁটা কতক ব্রান্ডি খাওয়াইয়া কিয়তকাল তার শরীরে অস্বাভাবিক বল সঞ্চয়

[৬৮৫] . প্রফুল্লচন্দ্র রায়, 'ডিগ্রির অভিশাপ', *বাংলদেশের উচ্চশিক্ষার দুশো বছর*, তপন বাগচী সম্পা. (ঢাকাঃ সূচীপত্র, ২০০৬) পৃ. ১৭৪-১৭৬

করিয়া দেওয়া যাইতে পারে বা তাহার হৃৎস্পন্দন পুনরায়ণ করিয়া কয়েক মুহূর্তের জন্য হিম অঙ্গে উষ্ণতার সঞ্চার করা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে স্থায়ী লাভ কিছুই হয়না।"[৬৮৬]

গ. মাতৃভাষাকে বর্জন, আরবী ও উর্দু মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য চর্চার ফল ঃ

এতক্ষণ ইংরেজি বাহনে পড়ার কুফল আমরা দেখতে পেলাম। যা আরবী ও উর্দু বাহনে ধর্মীয় শিক্ষা বা মাদরাসা শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঘটছে। এবার বাংলাদেশে আরবী বাহনে ধর্মীয় শিক্ষার যে মন্থর গতি ও পিছিয়ে চলা ভাব, এ বিষয়ে আলোচনা করা যাক। বর্তমান কালের আলোচিত ইসলামী চিন্তবিদ-হাসান আল বান্না, ইউসুফ আলকারযাবী, সায়্যেদ কুতুব, মুফতী মুহাম্মদ শফী, আশরাফ আলী থানভী, ইদ্রিস কান্ধলভী, আবুল হাসান আলী নদভী প্রমুখ ইসলামী চিন্তবিদ স্ব স্ব মাতৃভাষায় অধ্যয়ন ও গবেষণা করে বিশ্বখ্যাত হয়েছেন। এখানে আরও উলেণ্টখ করা প্রয়োজন, দেওবন্দ দারচ্ল উলুম মাদরাসা (১৮৬৬) ও নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ (১৮৯৮) প্রতিষ্ঠা হওয়ার ৫০ বছরের মধ্যে সেখান থেকে বিশ্ববরেণ্য অনেক ইসলামী চিন্তবিদের আবির্ভাব হয়েছে।[৬৮৭] এর অন্যতম কারণ ছিল মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মাতৃভাষা উর্দুকে পাঠদানের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে আরবী ছিল সেখানে দ্বিতীয় ভাষা।

অন্যদিকে বাংলাদেশে কওমী ও আলীয়া মাদরাসা, দেওবন্দ মাদরাসার সময়কাল থেকে চলে আসলেও আমরা একজনও মুফতী শফী, আশরাফ আলী থানভী, নদভী, ইউসুফ আল কারযাবী জন্ম দিতে পারিনি। তারও অন্যতম কারণ, আমরা মাতৃভাষা বাংলাকে গ্রহণ না করে উর্দু বা আরবীকে গ্রহণ করেছি। শিরাজী আরও বলেনঃ "বঙ্গের প্রতি মাদ্রাসায় বাঙ্গালা ভাষার প্রতিষ্ঠা করা একান্তই কর্তব্য। আমাদের বঙ্গীয় মৌলভী সাহেবগণ, মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া সমাজের বা ধর্মের কোনই উপকার সাধন করিতে সমর্থ হইতেছেন না। তাঁহারা এক্ষণে কোন সভা সমিতিতে বক্তৃতা বা ওয়াজ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইলে, তাঁহাদের কদর্য খিচুড়ী ভাষা শ্রবণে শিক্ষিত সভ্য শ্রোতাগণের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

মাদ্রাসাসমূহে রীতিমত বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপনা না হওয়ায়, তাহারা আরবী ফারসী প্রভৃতি ভাষার যে দুই চারিখানি ভাল গ্রন্থ পড়েন তাহাও তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হয়না। হে মৌলভী সাহেবগণ! ইহা কি নিতান্তই

---

[৬৮৬] . রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী 'ইংরেজি শিক্ষার পরিণাম', *বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

[৬৮৭] . দারুল উলুমের প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্র: শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান, ফখরুল হাসান গাংগুহী, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী, উবায়দুলণ্টাহ সিন্ধি, আশরাফ আলী থানভী ও মুফতী মুহাম্মদ শফী জ্ঞান আহরণ ও বিতরণে তাঁরা সকলেই ছিলেন উপমহাদেশের তথা বিশ্ব মুসলিমের রত্ন স্বরূপ।

লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় নহে যে, বঙ্গে সহস্র সহস্র মাদ্রাসা পাস মুসলমান থাকিতে আজ ব্রাহ্ম পণ্ডিত আমাদিগের কোরান ও হাদিস অনুবাদ করিতেছেন?" ।[৬৮৮]

আবুল হোসেন সনাতনী ধর্মীয় শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে বলেন, 'মধ্যযুগের প্রবর্তিত ইলমুল কালাম, মানতক, বালাগাত শিক্ষার জন্য শক্তি ও অর্থ ক্ষয় যে বর্তমান যুগের পক্ষে অনেকখানি নিরর্থক, সে কথা গলা ছেড়ে বলবার মতো শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব আজও মুসলমান সমাজে হয় নাই।'[৬৮৯]

ভারতবর্ষের উর্দু ভাষাভাষী আলেমগণ তাঁদের মাতৃভাষায় ধর্মীয় বই-পুস্তক চর্চা করে আজ জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) বাংলা ভাষাভাষী আলেম-ওলামাদের মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা দেখে বড় দুঃখ করে বলেছেনঃ "হিন্দুস্থানী আলিমগণ উর্দ্দু ভাষায় কুরআন শরীফের অনুবাদ এবং তফসীর, ফিক্‌হ, হাদীস, তসউফ, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয়ে বহু মৌলিক গ্রন্থ রচনা করিয়া কিংবা এতদ্‌বিষয়ক আরবী, পারসী ও ইংরাজী প্রভৃতি ভাষার গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া উর্দ্দু ভাষায় সর্বাঙ্গ সুন্দর ইসলামী সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দুই চারিজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত আমাদের মৌলভী মৌলানাগণ বঙ্গভাষায় গ্রন্থ রচনা করা দূরে থাকুক, বঙ্গভাষা কাফেরী ভাষা, তাহাতে ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ করিলে ধর্মগ্রন্থের অমর্য্যাদা করা হয় ইত্যাদি প্রলাপ উক্তি করিতে ছাড়েন না।"[৬৯০]

বর্তমানে বাংলাদেশে আধুনিক কিছু মাদরাসা, ক্যাডেট মাদরাসা, যেমনঃ তানযিমুল উম্মাহ ক্যাডেট মাদরাসা, নিবরাস মাদরাসা ইত্যাদি গড়ে উঠছে। অন্য দিকে সরকার পরিচালিত ও অনুমোদিত সরকারী-বেসরকারী আলীয়া ও কওমী মাদরাসা রয়েছে। এগুলোতে আরবী ও ইংরেজি দু ভাষাতেই শিক্ষা প্রদান করা হয়। যা ইসলাম প্রিয় মানুষকে আকৃষ্ট করে। ফলে তারা তাদের সন্তানদের অনায়াসে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেয় দুনিয়া ও আখিরাত লাভের জন্য। কিন্তু ফল হয় এর বিপরীত। শিক্ষাবিদ আবুল হোসেনের মতেঃ নব-মাদ্রাসা শিক্ষা যে আদরণীয় হচ্ছে, তার কারণ ইহাতে আরবী ও ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু ভাল করে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে, এই শিক্ষায় মুসলমান সমাজের জীবন

---

[৬৮৮] . সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৪

[৬৮৯] . আবুল হোসেন, 'বাঙালি মুসলমানরে শিক্ষা সমস্যা ', প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪

[৬৯০] . মোরশেদ সফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্তাচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া* (ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী, ২০০৭) পৃ. ১২৩, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 'প্যারীর পত্র', আনিসুজ্জামান সম্পা. *শহীদুল্লাহ রচনাবলী* প্রথম খণ্ড, (ঢাকাঃ ১৯৯৯) পৃ. ৬৩৮

শ্রী সম্পন্ন হবেনা, তার মন জাগবেনা, রুচি ফিরবেনা, বুদ্ধি বিকশিত হবেনা-জগতের জ্ঞান গ্রহণ করতে তার শক্তিও বাড়বেনা।

শুধু ভাষা শিখলেই যে জ্ঞান বর্ধিত হয়, বুদ্ধি বিকশিত হয়, মন সম্প্রসারিত হয়, কর্মশক্তি বাড়ে, এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েই বোধ হয় প্রবর্তকগণ নব মাদরাসা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু শিক্ষাতত্ত্ব বিদ্যান এক বাক্যে বলবেন, এরূপ ধারণা নিতান্ড় ভুল। যে শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক নাই-সে শিক্ষা পঙ্গু। যেমন যে জীবনের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক নাই সে জীবন অন্ধ। যে শিক্ষা হৃদয় প্রশস্ড় করেনা, বুদ্ধিকে জাগ্রত করেনা, চিত্তকে মার্জিত করেনা, সংস্কার হতে মুক্তি দেয়না, সে শিক্ষা জাতির প্রাণ বিনাশ করে।[৬৯১]

উলেণ্টখ্য, সরকারী সিলেবাসে ইবতেদায়ী থেকে কামিল ও কওমী মাদরাসার সিলেবাসে প্রথম শ্রেণি থেকে দাওরা পর্যন্ড় ধর্মীয় সিলেবাসে বড় ধরনের কোন পার্থক্য নেই। যদিও সরকারী সিলেবাসে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ইংরেজি ও বাংলার উপর স্কুলের সমপর্যায়ে বই-পুস্ড়ক রয়েছে। আবুল হোসেন আরও বলেনঃ তারপর মাদরাসায় যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা প্রদান করা হয় তাহাও শিক্ষার্থীর মনোবিকাশের অনুকূল নয়। শৈশবেই মাতৃভাষার সহিত পরিচয় ঘটবার আগেই আরবী প্রাথমিক ও তার উর্দু তর্জমা কণ্ঠস্থ করতে করতে শিশুর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়।

৮/১০ বৎসর বয়সেই একটি বালককে তিনটি ভাষা পড়তে হয়। আরবী, উর্দু ও বাংলা। তারপর দুই বৎসর পরই ইংরেজি তার উপর চাপে। ১২ বৎসর বয়সে তাকে চারটি ভাষার সহিত যুঝতে যুঝতে জুনিয়র মাদরাসার সীমা অতিক্রম করতে হয়। তার পূর্বেই এইরূপ নিষ্ঠুর পাঠ্য-পদ্ধতির চাপে, অনেককে শিক্ষা ক্ষেত্র হতে চির বিদায় গ্রহণ করতে হয়।”[৬৯২] তা ছাড়া বাংলাদেশে আলেম-ওলেমাসহ সাধারণ মুসলিম লেখক, গবেষক ও ইসলামী চিন্ড়াবিদগণ ইসলামী সাহিত্য চর্চা ও সৃষ্টির ব্যাপারে খুবই উদাসীন।

ইসলামী ইতিহাস-ঐতিহ্যকে মনগড়া ব্যাখ্যা করে ইসলামী চিন্ড়া-চেতনা ও আদর্শ বিরোধী সাহিত্যও অনেক বাঙালি মুসলিম লেখক নিয়মিত লেখে যাচ্ছেন। যা মুসলমানদের অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করছে। ইসলামের সুন্দর ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। “আধুনিক মুসলমান লেখকদের

---

[৬৯১] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭

[৬৯২] . আবুল হুসেন, ‘বাঙালি মুসলমানের শিক্ষা সমস্যা’ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৮

মধ্যে পনের-আনি লেখকের লেখা ইসলামী বৈশিষ্ট্য-বর্জিত। বাঙ্গালা সাহিত্যে ইসলামী সাহিত্যের এইরূপ দীনতা বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে শুভ বলিয়া মনে হইতেছে না।"[৬৯৩]

অন্যদিকে আমাদের দেশের অনেক মুসলিম সাহিত্যিকই হিন্দু সাহিত্য ও সাহিত্যিক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহিত্য রচনা করছেন। সত্যনিষ্ঠ মুসলমানগণ সেই সাহিত্যকে অনেক ক্ষেত্রে বর্জন করে চলার চেষ্টা করেন; কিন্তু এটাইতো সমাধান নয়।

সঠিক সমাধানের জন্য ইসলামী চিন্ড্র-চেতনা ও ভাব নিয়ে ইসলামী সাহিত্যিকগণকে নিয়মিত নতুন নতুন ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করার পরিবেশ করে দিতে হবে। ইসলাম নিয়ে নিয়মিত সাহিত্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যেতে হবে। "বাঙ্গালায় মুসলমান যতদিন পর্য্যন্ড় বাঙ্গালার অবয়বে ইসলামী মস্ড়িষ্কপূর্ণ হইয়া সাহিত্য সৃষ্টি না করিবেন, এবং যে পর্য্যন্ড় তাঁহার সেই সৃষ্টি সৃজন-মহিমায় মন্ডিত হইয়া না উঠিবে, ততদিন সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দুর বিরুদ্ধে অনৈসলামিকতার অভিযোগ আনিয়া কোন প্রতিকারের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।"[৬৯৪]

ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও আদর্শের ব্যাপারে বর্তমান মুসলমানদেরকে গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। প্রাচীন বাংলার মুসলিম সাহিত্য যা কুরআন-হাদীসকে কেন্দ্র করে ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, তা যদি যুগ যুগ যাবৎ মানুষকে ইসলামের সুধা পান করাতে পারে, বর্তমানেও তা সম্ভব। "মুসলমানদের রচিত বাঙ্গালা সাহিত্য আজকাল ইসলামী বৈশিষ্ট্য হইতে এরূপ অধিকমাত্রায় বর্জিত হইয়া পড়িয়াছে কেন, তাহাও কি ভাবিবার বিষয় নয় ? উত্তর-ভারতের উর্দু সাহিত্য এবং প্রাচীন বাঙ্গালার মুসলিম সাহিত্য সাধারণতঃ ইসলামী আদর্শ অনুসারী। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, এই সাহিত্যের স্রষ্টাগণ ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি, আদর্শ ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের অধিকারী। ইসলাম ধর্ম সম্পর্কেও ইহাদের অধিকার বিশেষ শ্রদ্ধা পাইবার যোগ্য।"[৬৯৫]

ইসলামী সাহিত্যকে ঘৃণা করেন এমন নামধারী মুসলমানের সংখ্যাও কম হবে না। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ইসলামের নাম গ্রহণ করাও অনেকে সাহিত্যের নামে সাম্প্রদায়িকতার চর্চা মনে করেন। "ইসলামী বিষয় লইয়া ইসলামী আওতায় থাকিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারা যায় কিনা, "নূরনবী" ও "শান্ড়িধারা"র মধ্য

[৬৯৩] . আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, "বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ", প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

[৬৯৪] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

[৬৯৫] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২-১৮৩

দিয়া এয়াকুব আলী চৌধুরী তাহার নজীর দেখাইয়াছেন। ফারসী পোষাকে ফারসী ভাব বুকে লইয়া বাঙ্গালার মুসলিম সাহিত্য কেমন সম্ভ্রান্ড় ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে, অসংখ্য বাঙ্গালা গজল ও বহু কবিতায় নজরচ্ল ইসলাম তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। বাঙ্গালার বুক ইসলামের প্রাচীন সম্পদে কতখানি সম্পদশালী, বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অজ্ঞাত তথ্যের দ্বার গভীর পান্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় উদঘাটন করিয়া ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক আমাদিগকে "বঙ্গে সুফী প্রভাব", "বঙ্গে ইসলাম বিস্ড়ার" ও "আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য" উপহার দিয়াছেন।"[৬৯৬]

বাংলাদেশের বৃহত্তম কওমী মাদরাসা[৬৯৭], আলিয়া মাদরাসা[৬৯৮], 'হাটহাজারী', 'পটিয়া', 'জিরি', 'লালবাগ', 'দারচ্ল মা'আরিফ', সরকার পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া'

---

৬৯৬ . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

৬৯৭ . বিংশ শতকে বেসরকারীভাবে দরসে নিযামিয়া ও দেওবন্দ মাদরাসার সম্মিলিত ধারায় এদেশে প্রচুর মাদরাসা স্থাপিত হয়। যেগুলোর অধিকাংশের নাম করণ করা হয় 'জামিয়া' বা বিশ্ববিদ্যালয়। এসব মাদরাসার মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ

১. আল-জামিয়া আল আহলিয়া দারচ্ল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্রগ্রাম, স্থাপিত : ১৯০১ খ্রী.।
২. জামিয়া এমদাদিয়া, বায়দর, হবিগঞ্জ, স্থাপিত : ১৯০৫ খ্রী.।
৩. আল-জামিয়াতুল ইসলামিয়া হেমায়াতুল ইসলাম, পটিয়া, চট্রগ্রাম, স্থাপিত : ১৯০৭ খ্রী.।
৪. আল-জামিয়া আল ইসলামিয়া দারচ্ল উলুম, বরচ্ড়া, কুমিলণ্ডা, স্থাপিত : ১৯০৯ খ্রী.।
৫. জামিয়া ইসলামিয়া ইউনুসিয়া ব্রাক্ষণবাড়িয়া, স্থাপিত : ১৯১৭ খ্রী.।
৬. আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া, জিরি, পটিয়া, চট্রগ্রাম, স্থাপিত : ১৯২০ খ্রী.।
৭. জামিয়া মুহাম্মদিয়া হাড়িয়া কান্দি, জকিগঞ্জ, সিলেট, স্থাপিত : ১৯২৩ খ্রী.।
৮. জামিয়া আরাবিয়া কাসিমুল উলুম, কুমিলণ্ডা, স্থাপিত : ১৯৩০ খ্রী.।
৯. জামিয়া হোসাইনিয়া আশরাফুল উলুম, বড় কাটরা, ঢাকা, স্থাপিত : ১৯৩১ খ্রী.।
১০. মেখল হামিউস সুন্নাহ মাদরাসা, হাটহাজারী, চট্রগ্রাম, স্থাপিত : ১৯৩১ খ্রী.।
১১. দারচ্ল হাদীস মাদরাসা, হাসলাবাদ, ছাতক, সুনামগঞ্জ, স্থাপিত : ১৯৩৫ খ্রী.।
১২. জামিয়া কাসেমুল উলুম পটিয়া, চট্রগ্রাম, স্থাপিত : ১৯৩৮ খ্রী.।
১৩. জামিয়া ইসলামিয়া ইমাম বাড়ী, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ, স্থাপিত : ১৯৪৪ খ্রী.।
১৪. মাদরাসা ফয়জুল উলুম, বড়ইতুলী, চকরিয়া, কক্সবাজার, স্থাপিত : ১৯৪৫ খ্রী.।
১৫. দারচ্ল উলুম খাদেমুল ইসলাম, গোপালগঞ্জ, স্থাপিত : ১৯৩৭ খ্রী.।
১৬. জামেয় মিফতাহুল উলুম, নেত্রকোনা, স্থাপিত : ১৯৪২ খ্রী.।
১৭. জামিয়া ইমদাদিয়া কিশোরগঞ্জ, স্থাপিত : ১৯৪৫ খ্রী.।
১৮. গজালিয়া মাদরাসা বাগেরহাট, খুলনা, স্থাপিত : ১৯৩৫ খ্রী.।
১৯. আল-জামিয়া আরাবিয়া মহিউল ইসলাম, নওয়া পাড়া, যশোর, স্থাপিত : ১৯৪৮ খ্রী.।
২০. জামেয়া ইসলামিয়া মোমেনশাহী, স্থাপিত : ১৯৪২ খ্রী.।
২১. আল জামিয়া আল ইসলামিয়া আল মাহমুদিয়া, বরিশাল, স্থাপিত : ১৯৪৭ খ্রী.।
২২. জামিয়া কুরআনিয়া আরাবিয়া, লালবাগ, ঢাকা, স্থাপিত : ১৯৫০ খ্রী.।

২৩. জামিয়া আরাবিয়া এমদাদুল উলুম ফরিদাবাদ, ঢাকা, স্থাপিত : ১৯৫৬ খ্রী.।
২৪. জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া শামসুল উলুম, চুনারঘাট. হবিগঞ্জ, স্থাপিত : ১৯৫৬ খ্রী.।
২৫. আল জামিয়া আল ইসলামিয়া কাসেমূল উলুম, বগুড়া, স্থাপিত : ১৯৬০ খ্রী.।
২৬. আজিজিয়া আনোয়ারুল উলুম মাদরাসা, দিনাজপুর, স্থাপিত : ১৯৬০ খ্রী.।
২৭. জামিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া দারুল উলুম, খুলনা, স্থাপিত : ১৯৬৭ খ্রী.।
২৮. আল জামিয়া আল আশরাফিয়া, পাবনা, স্থাপিত : ১৯৬৮ খ্রী.।
২৯. জামিয়া রহমানিয়া আরাবিয়্যা, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
৩০. জামিয়া আশরাফিয়া, পাবনা সদর, পাবনা।

এসব মাদরাসায় শিশু শ্রেণী থেকে নিয়ে উচ্চস্তর দাওরায়ে হাদীস (তাকমীল) পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়। সাধারণত আরবী, ফার্সী ও উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেয়া হয়। [সূত্রঃ মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্ওয়ারী, *ইসলামী দা'ওয়াহ: স্বরূপ ও প্রয়োগ* (ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৩), পৃ. ৩০৭-৮

[৬৯৮] . ১৭৮০ সালে ইংরেজ শাসক কর্তৃক কলিকাতায় সর্বপ্রথম আলিয়া মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তীতে দেশ ভাগের পর ১৯৪৭ সালে মাদরাসা-ই-আলিয়া নামে এ প্রতিষ্ঠানটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়। প্রসিদ্ধ কয়েকটি আলিয়া মাদরাসা নিম্নরূপ:

১. রায়পুর আলিয়া মাদরাসা, লক্ষীপুর, স্থাপিত : ১৮৭২ খ্রী.।
২. রাজশাহী মাদরাসা (প্রকাশ মুহসিনিয়া মাদরাসা), ১৮৭৪ খ্রী.।
৩. ঢাকা মাদরাসা (প্রকাশ মুহসিনিয়া মাদরাসা), ১৮৭৪ খ্রী.।
৪. সীতাকুন্ড কামিল মাদরাসা, ১৮৬৬ খ্রী.।
৫. কাতলা সেন কাদেরিয়া আলিয়া মাদরাসা, আলিমনগর, ময়মনসিংহ ১৮৯০ খ্রী.।
৬. ফেনী আলিয়া মাদরাসা, ১৮৯৮ খ্রী.।
৭. শাহতলী কামিল মাদরাসা, চাঁদপুর, ১৯০২ খ্রী.।
৮. দারুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, চট্টগ্রাম, ১৯১৩ খ্রী.।
৯. নোয়াখালী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা, ১৯১৩ খ্রী.।
১০. সরকারি আলিয়া মাদরাসা সিলেট, ১৯১৩ খ্রী.।
১১. ছারছীনা দারুস্সুন্নাহ আলিয়া মাদরাসা, পিরোজপুর, ১৯১৫ খ্রী.।
১২. পাবনা আলিয়া মাদরাসা, ১৯১৯ খ্রী.।
১৩. ধামতী ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা, পিরোজপুর, ১৯১৫ খ্রী.।
১৪. বোরহানুদ্দীন কামিল মাদরাসা, ভোলা, ১৯২১ খ্রী.।
১৫. আরামনগর কামিল মাদরাসা, জামালপুর, ১৯২২ খ্রী.।
১৬. চাটখিল কামিল মাদরাসা, নোয়াখালী, ১৯২৪ খ্রী.।
১৭. কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা, নোয়াখালী, ১৯২৫ খ্রী.।
১৮. সরকারি মুস্তাফাবিয়া আলিয়া মাদরাসা, বগুড়া, ১৯২৫ খ্রী.।
১৯. মহিমাগঞ্জ আলিয়া মাদরাসা, গাইবান্ধা, ১৯৩০ খ্রী.।
২০. মুক্তাগাছা আব্বাছিয়া আলিয়া মাদরাসা, ময়মনসিংহ, ১৯৩৩ খ্রী.।
২১. আহছানাবাদ রশিদিয়া আলিয়া মাদরাসা চরমোনাই, বরিশাল, ১৯৩৫ খ্রী.।
২২. চুনতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদরাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম, ১৯৩৭ খ্রী.।

ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ‘আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম’ এর ধর্মতত্ত্ব অনুষদ ও শরীয়া ফ্যাকাল্টি এর অধীন যে কোর্সগুলো আরবী ও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো ও শিক্ষা দেয়া হয়, তাদের সিলেবাসের আলোকে সেই কোর্সগুলো বাংলা মিডিয়ামে পড়ানোও সম্ভব।

বর্তমানে আরবী মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু ফটোকপি সিট ও নোটের উপরই নির্ভর করছে। ফলে মোটা মোটা আরবী রেফারেন্স বই থেকে ৫/১০ পৃষ্ঠার অনুবাদ / মুখস্থ বুলি ছাড়া আর কিছুই ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া হচ্ছে না বা হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। অথচ সংশিণ্টষ্ট কোর্সের সাথে বাংলা বই এর রেফারেন্স দিয়ে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া হলে কোর্সের চাহিদামত বা তারও বেশি জ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীরা অর্জন করে নিতে পারতো, তাদের নিজেদের চেষ্টায়।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন শুরচ হলে জ্ঞানের রাজ্যে তাদের পক্ষে বিপণ্টব ঘটানো সম্ভব ছিল। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মাদরাসাগুলো থেকে বিশ্বখ্যাত ব্যক্তির জন্ম হতো। এই দিকে ইঙ্গিত করে বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ বলেনঃ “বড়ই

---

২৩. রাঙ্গুনিয়া আলম শাহ পাড়া আলীয়া মাদরাসা চট্রগ্রাম, ১৯৩৮ খ্রী.।
২৪. হাম্মাদিয়া মাদরাসা, ঢাকা, ১৯৩৯ খ্রী.।
২৫. মাদরাসা-ই-আলিয়া কর্‍না মোকামিয়া, বরগুনা, ১৯৪২ খ্রী.।
২৬. চরফ্যাশন কারামতিয়া আলিয়া মাদরাসা, ভোলা, ১৯৪৫ খ্রী.।
২৭. ঝিনাইদহ সিদ্দীকিয়া আলিয়া মাদরাসা, ১৯৪৭ খ্রী.।
২৮. দুর্বাটি মদীনাতুল উলুম আলিয়া মাদরাসা, গাজীপুর, ১৯৪৮ খ্রী.।
২৯. ফরাযীকান্দী উয়েসিয়া আলিয়া মাদরাসা, চাঁদপুর, ১৯৪৯ খ্রী.।
৩০. হাসেমিয়া আলিয়া মাদরাসা, কক্সবাজার, ১৯৫২ খ্রী.।
৩১. যশোর আমীনিয়া আলিয়া মাদরাসা, ১৯৫২ খ্রী.।
৩২. কুওয়াতুল ইসলাম আলিয়া মাদরাসা, কুষ্টিয়া, ১৯৫৫ খ্রী.।
৩৩. জামিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া আলিয়া মাদরাসা চট্রগ্রাম, ১৯৫৪ খ্রী.।
৩৪. রাজশাহী দার্‍স সালাম আলিয়া মাদরাসা, ১৯৫৭ খ্রী.।
৩৫. ইসলামিয়া আলিয়া মাদরাসা, কুমিলণ্ঢা, ১৯৬২ খ্রী.।
৩৬. তামির্‍ল মিলণ্ঢাত কামিল মাদরাসা ১৯৬৩ খ্রী.।
৩৭. দিনাজপুর নুরজাহান আলিয়া মাদরাসা, ১৯৬৫ খ্রী.।
৩৮. কুড়িগ্রাম আলিয়া মাদরাসা, ১৯৬৫ খ্রী.।
৩৯. সাতক্ষীরা আলিয়া মাদরাসা, ১৯৬৮ খ্রী.।
৪০. বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদরাসা, চট্রগ্রাম, ১৯৮২ খ্রী.। [সূত্রঃ মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্‌ওয়ারী, *ইসলামী দা‘ওয়াহ: স্বরূপ ও প্রয়োগ* (ঢাকা ঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৩), পৃ. ৩০৬

আফসোসের বিষয়, আজ পর্যন্ড় আমাদের মধ্যে এমন লোক আছেন যাঁহারা মনে করেন যে, ইসলামী আওতায়া থাকিয়া ইসলামী আদর্শ লইয়া সাহিত্য সৃষ্টি করা চলে না বা সাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। ইহাদের মতে ইসলামে উদারতা ও সহিষ্ণুতার গণ্ডি ক্ষুদ্র, বিশেষতঃ ইসলামী আবহাওয়া সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নহে। এইরূপ ধারণা ইসলাম সম্বন্ধে ধারণাপোষণকারীর অজ্ঞাত পরিচায়ক। ইহার মূলে কোন সত্য দেখিতে পাই না। ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষায় মণ্ডিত হইয়া ইসলামী আওতায় বাস করিয়া মুতনব্বী, হারীরী, আবু আলাআল মায়ারী, ইবনে খলদূন, তবরী, সয়ুতী, আবুল ফারেজ, অলইদ্রিসী, আবু-রোশদ, ইমাম গাজ্জালী, আল-খারিজমী, অলকিন্দী, অলবিরূনী, ফিরদৌসী, রূমী, নেজামী, জামী, ও সাদী প্রভৃতির ন্যায় কবি, লেখক, দার্শনিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক প্রভৃতি ব্যক্তি যদি ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া বিশ্বকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করিয়া দিতে পারেন, তবে আমাদের বাঙ্গালী মুসলমান লেখকগণ কেন ইসলামী আওতায় ভীত, তাহার কারণ খুঁজিয়া বাহির করা অতি সহজ।

এখনও খ্রীষ্টানী বা হিন্দু আওতায় থাকিয়া খ্রীষ্টান বা হিন্দু আদর্শ লইয়া যদি বিশ্বের সেরা সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে, তবে ইসলামী আওতা ও আদর্শ কি দোষ করিয়াছে বুঝা যায় না। এখনও কি ইকবাল ইসলামী আদর্শ-উদ্বুদ্ধ হইয়া ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া যান নাই ? ফল কথা, ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত ও ইসলামী মস্ড়িষ্কযুক্ত প্রতিভাবান পুরচষের আবশ্যক। তাহা না হইলে এরূপ সাহিত্য সৃষ্টি হইতে পারে না।”[৬৯৯]

লেখক খুব দুঃখ করেই অন্যত্র বলেন, অনেক মুসলমান লেখক ইসলাম সম্পর্কে সচেতন নন। ইসলামী সভ্যতার সাথে তাদের কোন যোগও নেই। বাংলার মুসলমানদের জন্য এটা বড়ই দুঃখের বিষয়। লেখকের ভাষায়ঃ “আধুনিক বাঙ্গালার অধিকাংশ মুসলমান লেখকের সহিত ইসলাম ও ইসলামী সাহিত্য-সংস্কৃতি ও আচার ব্যবহারের নিবিড় যোগ আছে কি না তাহা বলা কঠিন। বোধ হয়, আধুনিক বাঙ্গালার মুসলিম লেখকগণ শিক্ষা-দীক্ষা ও মনে-প্রাণে ইসলামী ভাবাপন্ন নহেন বলিয়াই আজ বাঙ্গালা সাহিত্য তাহাদের এই জাতীয় অবদান হইতে বঞ্চিত হইতে চলিয়াছে।”[৭০০]

এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের কিছু প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিশেষ করে ‘আন্ড়র্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্রগ্রাম’ এ পৃথিবীর ৮/১০ টি দেশ থেকে আগত বিদেশি ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়ন

---

[৬৯৯] . আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪

[৭০০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

করে। চিন থেকে আগত প্রায় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এখানে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যয়ন করে। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যম বাংলা হলে বিদেশি ছাত্ররা আসবে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের মান কমে যাবে।

বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষিত মানুষ বাংলা মাধ্যমের কথা শুনে হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করবে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমরা যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানে নিয়ে যেতে চাই; তা কি বাংলাদেশী ছাত্রদের উন্নয়ন দিয়ে, নাকি বিদেশি ছাত্রদের উন্নয়ন দিয়ে? তা কি জ্ঞানার্জনের পাল্লা ভারী করে, নাকি শুধু ভাষার্জনের পাল্লা ভারী করে।

আমার মনে হয়, আমরা এই সামান্য অজুহাতে আমাদের দেশীয় ছেলে-মেয়েদের পঙ্গু করে দিচ্ছি। জ্ঞানের নামে ওরা বিদেশি কিছু আরবী ও ইংরেজি বই এর নাম, লেখকের নাম মুখস্থ করে। কিছু ফটোকপি পৃষ্ঠা নজর দিয়ে, পরীক্ষার দিন সকাল বেলা কিছু পয়েন্ট মাথার ভিতরে লুকিয়ে এনে পরীক্ষার খাতায় এঁকে রেখে বছর বছর ওরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিদায় নিচ্ছে।

সুতরাং যে ভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী জ্ঞান আহরণ করবে, সাহিত্য অধ্যয়ন করবে; তার উপর শিক্ষার্থীর থাকতে হবে অগাধ দখল। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর কোন ভাষার ভিত যদি মজবুত না থাকে, তবে সে ভাষায় প্রাণ ভরে শিক্ষা লাভ করতে পারে না, তা স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় যেখানেই হোক না কেন।

সুতরাং আমার প্রস্তাব হচ্ছে শিক্ষার মাধ্যম হবে শিক্ষার্থীর মাতৃভাষা। কারণ মাতৃভাষার উপর যে কোন ব্যক্তিরই দখল থাকে অন্য যে কোন ভাষার চেয়ে বেশি। অতএব, আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। বাংলা ভাষায় সব ধরনের ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করার সুযোগ থাকতে হবে। কুরআন, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ইত্যাদি সম্পর্কিত সব ধরনের জ্ঞান বাংলায় চর্চা করার সুযোগ থাকতে হবে।

আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-দর্শনকে শিক্ষার সুব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই জন্য রাষ্ট্রকে একটি আলাদা অনুবাদ মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করতে কবে। কওমী ও আলীয়া মাদরাসা এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ইসলাম শিক্ষা বিভাগ তথা সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিৎ বাংলা।

প্রত্যেকের সিলেবাসে ইসলামী সাহিত্যের উপর নির্বাচিত বাংলা গ্রন্থ থাকবে, যা ছাত্র-ছাত্রীরা স্বেচ্ছায় অধ্যয়ন করবে। যার ফলে স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে। কুরআন ও হাদীস তথা সমস্ত ইসলামী

সাহিত্য অধয়ন করবে বাংলায়। তবে আলাদা ভাষা কোর্সের মাধ্যমে আরবী, ইংরেজি ও অন্যান্য ভাষা শেখার ও শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আরবী বা ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা না দেয়ার অর্থ এই নয় যে, আরবী বা ইংরেজি শেখা যাবেনা। এ ক্ষেত্রে বহু ভাষাবিদ ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুলণ্ণাহ আমাদের আদর্শ হতে পারেন, যিনি ভিন্ন কৌশলে প্রায় ১৮টি ভাষা আয়ত্ত্ব করে ছিলেন। তবে মাতৃভাষায় তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি।

এমন কয়েকটি কোর্সের বর্ণনা দিয়ে শেষ করতে চাই; যেগুলো বর্তমানে আরবী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার কারণে ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু ফটোকপি সিট ও নোটের উপরই নির্ভর করছে। নিম্নে মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদান করা হয় শুধু এমন ১০ টি কোর্সের সাথে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইসলামী গ্রন্থের রেফারেন্স দিয়ে এর তুলনা দেখাচ্ছি, যা প্রমাণ করবে মাদরাসা ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রত্যেকটা কোর্সই মাতৃভাষা বাংলায় প্রকাশিত ইসলামী গ্রন্থ দিয়েই পঠন-পাঠন, শিক্ষাদান ও অধ্যয়ন সম্ভব।

ঘ. সিলেবাস উপযোগী তুলনামূলক আরবী ও বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক রেফারেন্স গ্রন্থঃ

(এক)

رقم الكورس: ১০১

الدعوة في القران الكريم

المراجع:

১.الاستاذ أبو الاعلي مودودي : تفهيم القران

২.المفتي محمد شفيع : معارف القرآن

৩.الشوكاني : فتح القد ير

৪.فخر الدين الرازي : مفاتيح الغيب

৫.سيد قطب : في ظلال القران

৬. االقرطبي : الجامع لأحكام القران

৭.الزمخشري : روح المعاني

<u>বাংলা ভাষায় সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ</u>

১. তাফসীরে মা'আরেফুল কোরআন (১ম-৮ম খন্ড), মূলঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ), অনুবাদ ও সম্পাদনয়: মাওঃ মুহিউদ্দীন খান (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮০-৮৩)

২. তাফসীরে ইবনে কাছীর (১ম-১১শ খন্ড), মূলঃ আলণ্ঢামা ইবনে কাছীর (রহ), অনু.অধ্যাপক আখতার ফারূক (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৮-২০০৩)

৩. তাফসীরে তাবারী শরীফ, আলণ্ঢামা ইবনে জারীর তাবারী, (১ম -১১শ খন্ড), ই.ফা.বা. অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৩-২০০৩)

৪. তাফসীরে মাযহারী, (১ম-১২তম খন্ড), আলণ্ঢামা কাজী মুহম্মদ ছানাউলণ্ঢাহ পানিপথী, ই.ফা.বা. অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৩-২০০০)

৫. তাফসীরে উসমানী, (১ম-৪র্থ খন্ড), মাওলানা সাব্বির আহমদ উসমানী, ই.ফা.বা. অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৬-২০০৩)

৬. আহকামুল কোরআন, মূলঃ আবু বকর আল জাসসাস, মাও. মোহাম্মদ আব্দুর রহীম অনূদিত (ই.ফা.বা. অনূদিত ও প্রকাশকালঃ ১৯৮৮)

৭. কুরআন গবেষণার মূলনীতি, মূলঃ আমিন আহসান ইসলাহী, সৈয়দ জহিরূল হক অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮০)

৮. কুরআনের আলোকে দীনী দাওয়াতের মূলনীতি, ক্বারী মোঃ তৈয়ব (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৫)

৯. ওহীর মর্ম ও তাৎপর্য, ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৯)

১০. তাফসীর শাস্ত্র পরিচিতি, শামসুল হক দৌলতপুরী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৯)

১১. বিভিন্ন ভাষায় আল-কুরআনের তরজমা ও তাফসীর, অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮০)

১২. কুরআর ব্যাখ্যার মূলনীতি, মূলঃ শাহ ওয়ালীউলণ্ঢাহ দেহলভী, আখতার ফারূক অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮১)।

(দুই)

رقم الكورس: ২০১علوم القران وتفسيره

المراجع:

১.السيوطي : الاتقان في علوم القرآن

২.محمد حسين الذهبي : التفسير والمفسرون

৩.محمد علي الصابوني : التبيان في علوم القرآن

৪.شاه ولي الله المحدث الدهلوي : الفوز الكبير

٥.السيوطي : طبقات المفسرين

বাংলা ভাষায় সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ

১. তাহরীফমুক্ত কুরআন, মাওলানা মুহাম্মদ ছামির উদ্দিন গাজীপুরী (ঢাকাঃ দ্বীনে হক প্রকাশনী, গাজীপুর, ১৯৯৫)

২. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৮ম খন্ড, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯০)

৩. কুরআন অধ্যয়নের মূলনীতি, মূলঃ সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী, আবু তাহের সিদ্দিকী অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৫)

৪. কুরআনের নীতিতত্ত্ব, ড. আহমদ হোসেন অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৫)

৫. কুরআন পরিচিতি, সম্পাদনা পরিষদ, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৫)

৬. তাফসীরুল কুরআন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ড. আব্দুর রহমান আনওয়ারী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০২)

৭. কুরআনের প্রকাশভঙ্গি ও ভাষা অলঙ্কার, দিদারুল ইসলাম (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৪)

৮. আল-আমসাল ফিল কুরআন আল-করীম, ড. আবদুল্লাহ আল মা'রূফ (ই.ফা.বা. প্রকাশকালঃ ২০০২)

৯. তাফসীর ও তাফসীরকার পরিচিতি, মুহাম্মদ মূসা (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৫)

১০. আল-কুরআনুল করীম এর আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, ড. মোহাম্মদ গোলাম মাওলা (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৫)

* আরও অন্যান্য প্রকাশনার অসংখ্য বাংলা গ্রন্থ রয়েছে, যা সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হলে বাংলায় শিক্ষা দেয়া সম্ভব।

(তিন)

رقم الدورة:২০২التوحيد والعقائد الاسلامية

المراجع:

১.الإمام أبوحنيفة رحمه الله تعالى : الفقه الاكبر

২.الإمام الغزالى : الاقتصاد في الاعتقاد

৩.محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد

৪.التفتزاني : شرح العقائد النسفية

৫.السيد السابق : العقائد الاسلامية

٦.ابن تيمية : التوسل والوسيلة

বাংলা ভাষায় সহায়ক গ্রন্থসমূহ:

১. ঈমান, আব্দুল খালেক (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৭)

২. কিতাবুল কাবায়ের (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.১৯৯৫)

৩. ইসলামী আকীদা, মূল আব্দুল হক হক্কানী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮১)

৪. ইসলামী আকীদা, মুহাম্মদ মূসা অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৬)

৫. আকায়েদুল ইসলাম, মূলঃ মাওলানা ইদ্রীস কান্ধুলভী, সিরাজুদ্দীন আহমদ অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০১)

৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, ঈমান অধ্যায়, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

৬. স্রষ্টা ও ইসলাম, গবেষণা বিভাগ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

৭. তাওহীদের মর্মবাণী, মাওলানা আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৬)

৮. শিরক ও বিদআত, আবুল হাসান আলী নদভী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

৯. ইসলাম ও ফিতরাত, মোহাম্মদ সাদেক (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৬)

১০. আত্ তাওহীদ, ইসমাঈল রাজী আল ফারচ্কী (ঢাকাঃ বি. আই. আই.টি)

১১. ইমাম আবু হানিফা (রহ.), সিরাজুল ইসলাম (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

১২. ঈমান সংক্রান্ড় মাসআলা-মাসায়েল, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৭)

১৩. বিশ্বনবীর রেসালতী আদর্শ, মোঃ আবদুল হাকীম (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮০)

১৪. ইসলামী ভাবধারা, সাইয়েদ আবদুল হাই অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৭)

১৫. তাওহীদ, অধ্যাপক শাহেদ আলী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৭)

১৬. তাকমীলুল ঈমান, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী, মাওলানা মুহাম্মদ সালমান অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৪)

১৭. আকীদা ও আমল, ইমাম গাযালী, এম. এ. সামাদ অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৭৯)

১৮. নাস্ড়িকতাবাদ ও নৈতিকতা, নূরচ্ল হোসেন খন্দকার (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯২)

১৯. হাকীকতে তাওহীদ, মোঃ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৫)

২০. ঈমান ও ঈমান ও ইসলাম, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৮)

২১. ঈমান: তত্ত্ব ও দর্শন (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৯)

* আরও অন্যান্য প্রকাশনারও অনেক বই রয়েছে।

(চার)

رقم الكورس২০৩=التاريخ الاسلامي (السيرة النبوية والخلافة الراشدة)

أهم المراجع:

১.ابو عيسى الترمذى: شمائل النبى صلى الله عليه و سلم

২.ابن هشام : السيرة النبوية

৩.ابن كثير : البداية والنهاية

৪.السيد ابو الحسن على الندوى : السيرة النبوية

৫. شبلي نعمانى: سيرة النبى صلى الله عليه و سلم

الدكتور روؤف شبلي : الدعوة في عهد المكي

<u>বাংলা ভাষায় সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ</u>

১. শাশ্বত নবী (সা), সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৪)

২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম-১০ম খ, ইমাম ইবনে কাছীর (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৭-২০০৮)

৩. বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি, নাসির হেলাল সম্পা. (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৫)

৪. সীরাত বিশ্বকোষ, ১ম -১১তম খ, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৫-২০০৮)

৫. নবী গৃহ সংবাদ, মোহাম্মদ বরকতুলণ্ঢাহ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০১০)

৬. নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ, মোহাম্মদ বরকতুলণ্ঢাহ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৫)

৭. হযরত মোহাম্মদ (সা.) তাঁর শিক্ষা ও অবদান ১ম ও ২য় খ, সৈয়দ বদরচদ্দোজা (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৩)

৮. ছায়্যেদুল মোরছালীন ১ম-২য় খ, মাও. আব্দুল খালেক এম.এ. (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯১)

৯. মরচভাস্কর, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৪)

১০. হযরত মোহাম্মদের জীবন চরিত ও ধর্ম্মনীতি, শেখ আব্দুর রহীম

১১. হযরত মোহাম্মদের (স) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন, তফাজ্জল হোসাইন

১২. সীরাতে রাসুলুলণ্ঢাহ (সা) ১ম-তয় খ , ইবনে ইসহাক (র) (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৭-১৯৯২)

১৩. সীরাতুন্নবী, ১ম-৪র্থ খ , ইবনে হিশাম (র), (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৪-১৯৯৬)

১৪. পয়গামে মুহাম্মদী, সাইয়েদ সুলায়মান নদভী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৮)

১৫. বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন, মূলঃ ড. মুহাম্মদ হামিদুলণ্ঢাহ, আবদুল মতিন জালালাবাদী অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৫)

১৬. সীরাতে খাতিমুল আম্বিয়া, মূলঃ মুফতী মুহাম্মদ শফী (র), সিরাজুল হক অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৫)

১৭. মুহাম্মদ (সা) জীবনী বিশ্বকোষ ১ম খ , সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৯)

১৮. অগ্রপথিক সংকলন, অনুপম আদর্শ, হাসান আবদুল কাইউম (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯২)

১৯. রাসুল মুহাম্মদ (সা) এর সরকার কাঠামো, মূলঃ ড. মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী, মুহাম্মদ ইবরাহীম ভূইয়া অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৪)

২০. মহানবী (সা) এর জীবন চরিত, মূলঃ মুহাম্মদ হোসাইন হাইকল, মাওলানা আবদুল আওয়াল অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০১০)

২১. বিশ্বনবীর কর্মসূচী, আবদুল খালেক (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৫)

২২. রাসুল করীম (সা) জীবন ও শিক্ষা, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮০)

২৩. হযরত মোহাম্মদ (সা) জীবন ও বৈশিষ্ট্য, সংকলিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৪)

২৪. কল্যাণ সমাজ গঠনে মহানবী (সা), মোঃ গোলাম মোস্ড়ফা সম্পা. (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৫)

২৫. বিশ্ব শান্ড়ি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী (সা), মোঃ গোলাম মোস্ড়ফা সম্পা. (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৫)

২৬. পরিবেশ সংরক্ষণে মহানবী, সম্পাদনা পরিষদ, নূরুল ইসলাম মানিক (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৫)

* আরও অন্যান্য প্রকাশনারও মূল্যবান অনেক গ্রন্থ রয়েছে।

(পাঁচ)

رقم الكورس:২০৭ التاريخ الاسلامي (عهد الأموى والعباسى والفاطمى والعثمانى والاندلوسى)

أهم المراجع:

১.ابن كثير : البداية و النهاية

২.البلاذرى : فتوح البلدان

৩.السيوطى : تاريخ الخلفاء

৪.الطبرى : تاريخ الرسل والملك

৫.ابو الحسن الماوردى الحكام السلطانية

.العلامة شبلى نعمانى : الفاروق[৭০১]

বাংলা ভাষায় সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ

১. ইসলাম প্রচারের ইতিহাস, মহিউদ্দীন শামী অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৪)

২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম-১০ম খন্ড, ইমাম ইবনে কাছীর (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৭-২০০৮)

৩. ইসলামী বিশ্বকোষ, নির্বাচিত কিছু অধ্যায় (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

৪. রাসুল মুহাম্মদ (সা) এর সরকার কাঠামো, মূলঃ ড. মুহাম্মদ ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী, মুহাম্মদ ইবরাহীম ভূইয়া অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৪)

৫. স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস, এস. এম. ইমামুদ্দীন

৬. আরব জাতির ইতিহাস, মুহাম্মদ রেজা-ই- করিম (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী)

৭. আরব জাতির ইতিহাস, শেখ লুৎফুর রহমান

৮. আরব জাতির ইতিহাস, মফিজুলণ্ডাহ কবির

৯. মধ্যযুগের মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি, মুসা আনসারী (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী)

১০. ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস, আ.ক.ম. আব্দুল আলীম

১১. মধ্যযুগের মুসলিম ইতিহাস, আশরাফ উদ্দিন আহমেদ

১২. তুরস্কের ইতিহাস, এম. আবব্দুল কাদির

১৩. ক্রুসেডের ইতিহাস, ড.এম. আবদুল কাদের, রাসুল মুহাম্মদ (সা) এর সরকার কাঠামো (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮০)

১৪. মুসলিম স্পেন, সরকার শরীফুল ইসলাম (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৭)

১৫. খিলাফতের ইতিহাস, আবদুল জাব্বার সিদ্দিকী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮০)

১৬. মুসলিম স্থাপত্য, একেএম ইয়াকুব আলী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮১)

১৭. তুরস্কের ইতিহাস, ড. এম. আবদুল কাদের (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৬)

[৭০১] . ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয, কুষ্টিয়া এর দাওয়া বিভাগের সিলেবাসের আলোকে লিখিত।

১৮. মুসলিম কীর্তি, ড. এম. আবদুল কাদের (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০১০)

১৯. ইসলামের ইতিহাস ১ম-৩য় খণ্ড, মাওলানা আকবর শাহ খান নজীবাবাদী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৮)

২০. ইসলামের ইতিহাস দর্শন, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৮)

২১. মুসলিম জাহান, সোহরাব উদ্দিন আহমদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৯)

২২. স্পেনে ইসলাম ও মুসলমানদের অবদান, মোঃ আবু তাহের (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৮)

২৩. বিশ্বসভ্যতায় মুসলিম অবদান, নুরুল হোসেন খোন্দকার (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৯)

(ছয়)

اثم المادة :علوم الحديث رمز المادة:১১২০

المراجع والمصادر:

ابن الصلاح علوم الحديث(مقدة ابن الصلاح)

২.جلال الدين السيوطيى : تدريب الراوي

৩.صبحي الصالح : علوم الحديث و مصطلحه

৪.مناع القطان: مباحث فى علوم الحديث

<u>বাংলা ভাষায় সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ</u>

১. রিজাল শাস্ত্র ও জাল হাদীসের ইতিবৃত্ত, ড. মুহাম্মদ জামাল উদ্দীন (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৫)

২. ইলমে হাদীসে ভারতীয় উপমহাদেশের অবদান, ড. মোহাম্মদ এছহাক (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯০)

৩. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস, নূর মোহাম্মদ আজমী (ঢাকাঃ এমদাদীয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২)

৪. আসহাবে রাসূল, মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার)

৫. হাদীস সংকলনের ইতিহাস, মাও.মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (ঢাকাঃ খায়রুল প্রকাশনী)

৬. হাদীস শাস্ত্র পরিচিতি, মোহাম্মদ শামসুল হক দৌলতপুরী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৬)

৭. উলূমূল হাদীস, মাওলানা মুশতাক আহমদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৯)

৮. হাদীস বিজ্ঞান, শামীম আরা চৌধুরী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০১)

৯. হাদীসের পরিভাষা, মূল: ড. মুহাম্মদ আত্ তাহহান (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০১০)

* আরও অন্যান্য প্রকাশনারও উলেণ্টখযোগ্য গ্রন্থ রয়েছে।

(সাত)

اسم المادة :الفقه الاسلامی رمز المادة- ২১২০

المراجع والمصادر :

১.فقه السنه للسيد السابق

২.منهاج المسلم لابی بكر الجزائري

৩.فقه العبادات لليوسف القرضاوی

8..نيل الأوطارللشوكانی

৫.الهداية

৬.الاركان الاربعة لأبی الحسن الندوي

৭.حجة الله بالغة للشيخ ولی الله الدهلوی

<u>বাংলা ভাষায় সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ</u>

১. ইসলামে যাকাতের বিধান, ইউসুফ আলকারযাভী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৮)

২. নামায, আব্দুল খালেক (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

৩. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ১ম-৩য় খ, মুহাম্মদ মূসা (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৫-১৯৯৬)

৪. ফতোয়ায়ে আলমগীরী, ১ম- ৬ষ্ঠ খ, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৯-২০০৫)

৫. আল হিদায়া, ১ম- ৪র্থ খ, আবু তাহের মেসবাহ অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০১-২০০৩)

৬. ফতোয়া ও মাসায়েল, ১ম- ৬ষ্ঠ খ, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৫-২০১০)

৭. মৌলিক সমস্যা সমাধানে ইসলামী আইন, ড. মোঃ মোস্ড়ফা কামাল (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

৮. পরিবার ও পারিবারিক জীবন বিধান, মাওঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী)

৯. ইসলামী ঐতিহ্যে পরিবার পরিকল্পনা, আব্দেল রহীম উমরান (ঢাকাঃ পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়)

১০. ইসলামী শরীয়াহ ও সুন্নাহ, ড. মুস্ড়ফা হুসনী আস সুবায়ী, এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

১১. ফিকহী হানাফীর ইতিহাস ও দর্শন, লেখক মন্ডলী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৪)

১২. ইসলামী ফিকহ, ১ম-৩য় খ, মুজীবুল্লাহ নদভী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৭)

১৩. ফিকাহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, আবু সাইদ মোঃ আবদুলণ্ডাহ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৭)

১৪. ইসলামী ফিকহের পটভূমি ও বিন্যাস, আবদুল মান্নান তালিব অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৪)

১৫. শরীয়াহ বিষয়ে সিদ্ধান্ড় দানের নীতিমালা, মুফতী মুহাম্মদ আব্দুলণ্ডাহ অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৯)

১৬. ফিকহুস সুন্নাহ ওয়াল আসার, ১ম খন্ড, মুফতী আমীমুল ইহসান (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৯)

* আরও অন্যান্য প্রকাশনারও এই বিষয়ে অনেক মূল্যবান বই রয়েছে।

(আট)

اسم المادة :علم المواريث- رمز المادة:৩২০৪

المراجع والمصادر :

১.محمد على الصابونى, المواريث فى الشرعية الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة للصابونى

২.علم الفرائض, الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة

৩.فوزان آل فوزان, التحقيقات المرضية في المسائل الفرضية

৪.جمال الدين السراجي, السراجي في الفرائض

বাংলা ভাষায় সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ

১. ইসলামে নারী অধিকার ও অবস্থান, শাহনাজ পারভীন (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০১০)

২. আল কুরআনে অর্থনীতি, ১ম ও ২য় খন্ড, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৩)

৩. উত্তরাধিকার আইন, হাবিবুর রহমান

৪. ফারায়েয, গাজী শামছুর রহমান (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৬)

৫. মুসলিম আইন, অধ্যক্ষ এ, কে, এম মনিরুজ্জামান

৬. মুসলিম আইন পরিচিতি, মজিবুর রহমান

৭. উত্তরাধিকার আইন, বাসুদেব গাঙ্গুলী

৮. ইসলামী আইন, মূলঃ স্যার এ. এ. ফৈজী, গাজী শামছুর রহমান অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৫)

৯. মুসলিম পারিবারিক আইন কানুন, মোঃ আবুল বাশার (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৯৭)

১০. মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে মহিলাদের অংশ, মোঃ মুফাজ্জল হোসাইন খান (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৪)

১১. ফারাইয বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ড় মাসআলা-মাসায়েল, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৭)।

(নয়)

اسم المادة :دراسات حول الأنبياء ودعواتهم في القرآن- رمز المادة:৪২০১

المراجع والمصادر :

১القرآن الكريم

২.ابن كثير , قصص الأنبياء

৩.مجمد احمد جاد المولى,قصص القرآن

৪. ابن كثير, البداية و النهاية

৫.الشيخ الصابونى , النبوة الأنبياء

৬.الدكتور محمد خليل هراس, دعوة التوحيد[৭০২]

<u>বাংলা ভাষায় সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ</u>

১. ইসলামী বিশ্বকোষ, ১ম- ২৬তম খন্ড, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৫-২০০৭)

২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম-১০ম খন্ড, ইমাম ইবনে কাছীর (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৭-২০০৮)

৩. কুরআনের ইতিহাস দর্শন, ড. মাযহার উদ্দীন (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৮)

৪. সীরাত বিশ্বকোষ, ১ম-১১তম খন্ড, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০৫-২০০৮)

৫. বাংলা তরজমা কুরআন শরীফ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

৬. কাছাছুল কোরআন, হিফযুর রহমান (ঢাকাঃ এমদাদিয়া প্রকাশনী)

৭. আল-কুরআনে বিজ্ঞান (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

৮. কুরআনের জ্ঞান বিজ্ঞান, জাস্টিস আলণ্ঢামা তাকী উসমানী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

৯. গভীরতর অনুভবে আল-কুরআন, মোঃ ফেরদাউস খান, (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

১০. আনওয়ারে আম্বিয়া, এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম অনূদিত (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

১১. তাফসীরে সূরা ইউসুফ, মুফতী দীন মুহাম্মদ খান (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০১০)

---

[৭০২] . 'আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম' এর শরীয়া ফ্যাকাল্টির সিলেবাসের আলোকে লিখিত।

১২. আল-কুরআনের শাশ্বত পয়গাম, সম্পাদনা পরিষদ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ২০০২)

১৩. কুরআনের আলোকে দীনী দাওয়াতের মূলনীতি, ক্বারী মুহম্মদ তৈয়ব (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৫)

১৪. কুরআনের রাষ্ট্রনীতি, অধ্যক্ষ আবদুর রাজ্জাক (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮৬)

১৫. কুরআন কাহিনী, ড. এম এ সাত্তার (ঢাকাঃ ই.ফা.বা. ১৯৮১)

* আরও অন্যান্য প্রকাশনারও প্রাচীন ও আধুনিক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে।

(দশ)

المراجع والمصادر: اسم المادة: الدراسات البنغلاديشية (বাংলা থেকে আরবীতে বা ইংরেজিতে অনুবাদ করে পাঠদান করা হয়)

বাংলা ভাষায় সহায়ক গ্রন্থসমূহঃ

১. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান

২. হাজার বছরের ইতিহাস, ড. মোহাম্মদ হান্নান

৩. বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, এম, আর আখতার মুকুল

৪. শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, আবুল মনসুর আহমেদ

৫. বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খন্ড মোঃ সিরাজুল ইসলাম

৬. বাঙ্গালীর ইতিহাস : আদি পর্ব : নীহার রঞ্জন রায়

৭.বাংলাপিডিয়া, এশিয়াটিক সোসাইটি

৮. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ই.ফা.বা.)

৯. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

১০. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, এম . এ .রহিম

১১. বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল, আব্দুল করিম

১২. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, আনিসুজ্জামান

১৩. ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, বশীর আল হেলাল

১৪. উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা, ড. ওয়াকিল আহমদ

১৫. এ শর্ট হিস্টরি অব সারাসিনস, পি কে হিট্রি

* আরও অন্যান্য প্রকাশনারও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রয়েছে।

এইভাবে প্রাথমিক পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ড় প্রত্যেকটা স্ড়রে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ইসলামী গ্রন্থের মাধ্যমে ইসলাম শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলোর সিলেবাসকে আমরা সাজাতে পারি। যা ইসলামী জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এক বিপণ্ঢব ঘটাতে পারে। আর এই মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জন ও জ্ঞান সাধনার ফলে বাংলার আলেম সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের নেতৃত্বে আসন পেতে পারেন। আর তাঁদের আহরিত জ্ঞান থেকে উপকৃত হবে সাধারণ মানুষ। গড়ে উঠবে শান্ড়িপূর্ণ সমাজ। মানব জীবনে দুনিয়ায় নেমে আসবে বেহশতি সুধা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ভবিষ্যত ঃ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব

লোকে বলে, অতীত ভালো হলে ভবিষ্যতও ভালো হয়। গত এক হাজার বছরের ইতিহাসে মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকগণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অসামান্য অবদান রেখেছেন। তাঁদের অবদানকে পুঁজি করে আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারি। বিশ্ব ইসলামী সাহিত্যের ভান্ডার থেকে অনুবাদের মাধ্যমেও আমাদের সাহিত্যকে শক্তিশালী করা যায়। তবে এ ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের সতর্কভাবে আগাতে হবে। এস. ওয়াজেদ আলীর একটি উপদেশ এ ক্ষেত্রে ইসলামী সাহিত্যিকদের অনুসরণীয় হতে পারে। ‘ভাল ফুল পেতে হলে অনেক কিছু করতে হয়। ভাল মাটি চাই, ভাল সার চাই, জল সরবরাহের যথোচিত ব্যবস্থা চাই, ভাল মালি চাই, আলো-ছায়ার আসা-যাওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখা চাই, আরও কত কিছুর সংস্থান করা চাই। তারপর আবার ভাল জাতের বীজ, কিম্বা ভাল জাতের চারা পাওয়া চাই। সাহিত্যের জন্যও এইভাবে আয়োজন দরকার।’[৭০৩]

প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮) বলেনঃ “অতীতে ইসলামের নামে যে বিশ্বসভ্যতা সমৃদ্ধ হইয়াছে, তাহা হইতেই এখন আমাদিগকে রসদ সংগ্রহ করিয়া যুগের সহিত পা রাখিয়া চলিতে হইবে। তাহা হইলেই আমাদের চলা সার্থক হইবে-আমরা আবার গৌরবের উচ্চ শিখরে

[৭০৩] . এস. ওয়াজেদ আলি, “সাহিত্য”, *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী* **১**, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

উঠিতে সমর্থ হইব। যিনি সাহিত্যে এই যুগোপযোগী চলার মন্ত্র দিতে পারিবেন, তিনিই জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ উপকার করিবেন- তাঁহারই সাহিত্য-সাধনার সঞ্জীবনী মন্ত্রে এ জাতি আবার জাগিয়া উঠিবে।"[৭০৪]

ইসলাম ধর্মের মূল কথা হচ্ছে একত্ববাদ। অন্যান্য ধর্মের মধ্যে বহুত্ববাদ বা বহু ঈশ্বরবাদ রয়েছে। ইসলাম ধর্মে ব্যক্তি পুজার বা পীর পুজার কোন স্থান নেই, কিন্তু অন্যান্য ধর্মে তা রয়েছে। বিশেষ করে হিন্দু ধর্মের ধর্মীয় কাজ কর্মের সাথে ইসলামের কোনো মিল পাওয়া যায় না। তা সত্ত্বেও ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু সংস্কৃতি দ্বারা ইসলাম মারাত্মকভাবে আক্রান্ড় হয়েছে। বর্তমান মুসলমানদের সাহিত্যে হিন্দু সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই প্রভাব থেকে সহীহ আকীদা-বিশ্বাস কেন্দ্রিক সাহিত্য রচনার মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে উদ্ধার করতে হবে।

কুরআন-হাদীস ভিত্তিক রচিত ইসলামী সাহিত্যের যে একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য বা স্বাতন্ত্র্য আছে ইসালামী সাহিত্যিককে তা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিতে হবে। "মুসলমানকে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলিতে হইবে। পৌত্তলিক এবং যে কোন কারণে হউক, মোসলেম বিদ্বেষী হিন্দুর নিজস্ব ভাব ও ধারাকে গরল জ্ঞানে ত্যাগ করিতে হইবে। দুঃখের বিষয়, আমাদের অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিকও সর্বত্র খাস হিন্দু সাহিত্যের বিষক্রিয়া হইতে আপনাকে একেবারে বাঁচাইয়া চলিতে পারেন নাই।

ভাষা ভেদ ও দেশ ভেদকে তুচ্ছ করিয়া যে বিরাট মুসলমান বিশ্বসাহিত্য বিদ্যমান রহিয়াছে, বাঙলা সাহিত্যকে তাহারই একটা সমর্থ অঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে-মুসলমানের নিজস্ব ভাব ও চিন্ড়া দ্বারা বাঙলাকে সুশোভিত করিতে হইবে। মুসলমান সাহিত্যিকের সমগ্র সাধনা সমগ্র চেষ্টা ও চিন্ড়া এইদিকেই পর্য্যবসিত হওয়া উচিত।"[৭০৫]

কিন্তু হিন্দু সাহিত্যিকবৃন্দ যে সাহিত্য শুরচ থেকে রচনা করে আসছেন, তা যে হিন্দু প্রভাবিত হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর প্রভাব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মুসলমান সাহিত্যিক ও পাঠকদের উপরও পড়েছে; যা তাদের ভিত্তিমূলে আঘাত করছে। সৌভাগ্যের বিষয় দেরিতে হলেও মুসলমানরা তা বুঝতে সক্ষম হয়েছে।

---

[৭০৪] . আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, "সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩৫

[৭০৫] . মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "বাঙলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য", *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী প্রথম খন্ড*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৯০) পৃ. ২৮৮-২৮৯

বর্তমান মুসলিম সাহিত্যিকদের এই স্বাতন্ত্র্যের কথা মনে রেখেই সাহিত্য রচনা করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই হিন্দু ও মুসলিম আদর্শকে মিশ্রণ ঘটিয়ে উপস্থাপন করা যাবে না। অথবা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে কোনো ক্রমেই নিজস্ব কৃষ্টি কালচারকে হেয় করে দেখলে চলবে না। যেহেতু দুটো সভ্যতাই দুই ধারায় প্রবাহিত। ইসলামী সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর বক্তব্যে এ বিষয়ে আরও সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। "বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসুদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রভৃতি প্রভাবশালী সাহিত্যিক ও কবিগণ আবির্ভূত হইয়া যে সাহিত্য সৃষ্টি করিলেন, তাহাও স্বাভাবিকভাবে হিন্দু সভ্যতার দ্বারা অন্তরে বাহিরে অনুরঞ্জিত হইল। মুসলমানেরা ইহা হইতে কিছুদিন দূরে রহিলেন, পুরাতন মুসলমানী বাঙ্গালা লিখিত কেতাব পুঁথি আর তাহাদিগকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যাসাগরীয় বাঙ্গলাই শিক্ষানবীশ বাঙ্গলা বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

যাহা হউক, একদল দূরদর্শী মুসলমান এই অবস্থায় সমাজের বৈশিষ্ট্য রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তখন তাঁহারা পুরাতন বাঙ্গলা ছাড়িয়া তথাকথিত সাধু বাঙ্গলায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সকল ভদ্র লোকের মধ্যে মরহুম মুনশী মেহেরুল্লাহ, মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মুনশী শেখ আবদুর রহীম প্রভৃতি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও দুই একজনের উপর হিন্দু সাহিত্যের প্রভাব কি রূপ বিস্তার লাভ করিয়াছিল, শুধু 'বিষাদ-সিন্ধু' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানির ভাষা ও ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিলেই তাহা সহজে উপলব্ধি হইতে পারিবে।"[৭০৬]

ইসলামী দল, ইসলাম প্রচারক ও ইসলামী আচার-অনুষ্ঠান পালনে বিশ্বাসী সকলকে সমবেতভাবে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। তা না হলে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানরা চিন্তা ও দর্শনে অদূর ভবিষ্যতে নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হবে না।

পৃথিবীর সব জাতিই তার নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে তাদের সাহিত্য রচনা করে থাকে। তাহলে বাঙালি মুসলমানরা কেন এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকবে। "বাঙ্গলা সাহিত্যে যদি মুসলমানরা নিজস্ব ভাবধারা আমদানি করিতে না পারিল, তাহা হইলে হিন্দুরা তাহাদিগকে চিনিবেন, জানিবেন, বুঝিবেন, কি রূপে ? বর্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে হিন্দুকে চিনিয়া লওয়া যাইতে পারে, কেননা উহা মূলত ও প্রধানতঃ

---

[৭০৬] . মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, " সাত্যি স্বাতন্ত্র্য কেন", *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

হিন্দুরই সাহিত্য। মুসলমানকেও অতঃপর বাঙ্গলার মারফত স্বকীয় স্বরূপ লোকচক্ষুর গোচরীভূত করিতে হইবে। এজন্য বাঙ্গলায় একটা বিরাট ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন।"[৭০৭]

মুসলমানকে চিন্‌ড়্‌-চেতনায় কখনই হিন্দু, খ্রিস্টান বা অন্য কোন সাহিত্যের উপর নির্ভর করা যাবে না। অনেক ব্যক্তি আছেন, যারা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় দিয়ে ইসলাম বিরোধী চিন্‌ড়্‌-চেতনা তাদের সাহিত্যে প্রকাশ করে থাকেন।

ভিন্ন ধর্ম বা সংস্কৃতির সাথে মিলে-মিশে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। এতে ইসলামের অস্‌ড়িত্বই বিলীন হয়ে যেতে পারে। কারণ, ইসলামের একত্ববাদের ধারণা বর্তমান পৃথিবীর কোন ধর্মের সাথেই মিলে না। "আমাদের শুভাকাঙ্খী কোন কোন হিন্দু ভ্রাতা হয়তো একথা প্রশ্ন করিবেন, বাঙ্গলায় ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হইবে, ইহা তো বেশ ভালো কথা কিন্তু সেজন্য আলাদা থাকিবার দরকার কি? ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে যাহা যাহা আবশ্যক তাহা সহ্য করিবার মত উদারতা কোন হিন্দুরই নাই, একথা বলিব না, কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু সাহিত্যিক ধুরন্ধেরেরই নাই, ইহা বাধ্য হইয়াই বলিতে হইতেছে। হিন্দুর সহিত মিলিয়া মিশিয়া সাহিত্য সেবা করিতে হইলে মুসলমানকে ভাবে চিন্‌ড়্‌য় হিন্দু হইয়া থাকিতে হইবে।"[৭০৮]

ইহুদী, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ ও হিন্দু সকল জাতিই নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ধর্ম নিয়ে নিজস্ব ভাষার বাহিরে গিয়েও আন্‌ড়্‌র্জাতিক ভাষায় বড় বড় বিশ্বকোষ বের করে সারা বিশ্বের মানুষের নিকট পৌঁছিয়ে দিচ্ছে।

ভারতবর্ষের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে বড় বড় হিন্দু লেখক বা সাহিত্যিক মানেই তাদের ধর্মের প্রচারক হিসাবে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। তাহলে ইসলাম ধর্ম নিয়ে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হলে অসুবিধা কোথায়? এ প্রশ্ন তোলেন সাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীঃ "হিন্দুরা যেমন বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে তাঁহাদের সভ্যতার সহিত আমাদের পরিচয় ঘটাইতেছেন, আমরা মুসলমান সাহিত্যিকেরাও তেমনি আরবী-ফারসীর মধ্য হইতে ইসলামী সভ্যতার উপকরণগুলি বাঙ্গলা সাহিত্যের মারফতে হিন্দুদের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। তাহা না করিলে আমাদিগকে কর্তব্যভ্রষ্ট হইতে

[৭০৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

[৭০৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪

হইবে। সুতরাং যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য রচনায় উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা কোন মতেই নিন্দার পাত্র নহেন, বরং সর্বদা প্রশংসা পাইবার অধিকারী।"[৭০৯]

মুসলমান সাহিত্যিকরা উন্নত ইসলামী সাহিত্য রচনা করতে পারে নাই বলেই মুসলমান সন্তানেরা হিন্দু বা অন্যান্য সাহিত্য পড়ছে। ফলে, ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতির তুলনায় অন্যান্য সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা বেশি জানতে পারছেন। অন্যদিকে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকজন ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছুই জানার সুযোগ না পাওয়ার কারণে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে তাদের মধ্যে এক ভুল ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে। এমনকি মুসলমান সন্তানেরাও আজ ইসলাম ধর্মের প্রকৃত রহস্য না জানার কারণে তারা আত্মবিশ্বাসহীন হয়ে বিজাতীয় সংস্কৃতিকে স্বাগত জানাচ্ছে।

এই অবস্থায় মানব জীবনের বিভিন্ন দিকে নিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারলেই মুসলমানের সন্তানরা যেমন এদিকে আকৃষ্ট হবে, তেমনি আগ্রহী অমুসলিম জ্ঞানপিপাসুরাও ইসলাম ও ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে। "এ যাবৎ মুসলমানেরা যেমন হিন্দুদের ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন, মুসলমানের ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত গতিতে চলিলে অল্পকাল পরেই হিন্দুরাও তেমনি মুসলমানদের নিজস্ব ভাব ও চিন্তার সহিত পরিচয় লাভ করিবেন, এই সময় হইতে উভয় সম্প্রদায় এক যোগে একইভাবে সমবেত শক্তি প্রয়োগে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের পরিচর্যা করিতে পারিবেন।"[৭১০]

ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি বলতে শুধু কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করার নাম নয়। সাহিত্যের যে কোন ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখালেখি করাটাই হচ্ছে ইসলামের আওতাধীন সাহিত্য। কোন অবস্থাতেই যেন মুসলমানের সাহিত্য ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। সাংঘর্ষিক হলে তা আর ইসলামী সাহিত্য থাকে না। "ইসলামের প্রেরণায় সাহিত্যের সংস্কারে হাত দিতে হলে মোটের ওপর ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি বলতে যে ব্যাপারটি বোঝায় তাকে আয়ত্ত করাই সবচাইতে বড় প্রয়োজন। সেই দৃষ্টি দিয়ে মানুষ ও প্রকৃতির দিকে তাকাতে শেখাই আসল কাজ। এ কাজের ক্ষেত্র দেশ, সমাজ এমনকি সারা বিশ্ব।"[৭১১]

---

[৭০৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬

[৭১০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-১৭

[৭১১] . মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, " ভাষা ও সাত্যিের সংস্কার",প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮

ইসলামী সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করে বর্তমান মুসলিম সাহিত্যিকদের ত্যাগ ও আদর্শের উপর, দূরদর্শিতা ও নিরলস পরিশ্রমের উপর। অপসংস্কৃতি, ফেইসবুক সংস্কৃতি ও আকাশ সংস্কৃতি মুসলমানদের মূল্যবোধ, হায়া, লজ্জা ও সম্ভ্রম ইত্যাদি যেভাবে নষ্ট করে দিচ্ছে, তা থেকে একমাত্র ইসলামী সাহিত্যিকরাই পতিত এই মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে পারে। 'বাঙালী সাহিত্যিকদের কর্তব্য তাঁদের মনকে, তাঁদের চিন্তাকে, তাঁদের কল্পনাকে ভবিষ্যন্মুখী করা। একশত বৎসর পরে বাংলাদেশ কেমন হবে, ভারতবর্ষ কেমন হবে, এশিয়া কেমন হবে, পৃথিবী কেমন হবে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শেখার দরকার।

শতাব্দী পরে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ কিরূপ হবে, শতাব্দী পরে পারিবারিক জীবন কিরূপ হয়ে দাঁড়াবে, ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে পিতা-মাতার কিরূপ সম্বন্ধ হবে বা কিরূপ হওয়া উচিত, তা নিয়ে কবি, সাহিত্যিক, ভাবুকেরা ভাবুন। শতাব্দী পরে হিন্দু-মুসলমান থাকবে কি না; যদি থাকে তাহলে তাদের পরস্পর সম্বন্ধ কিরূপ হবে, তাও ভাবতে শিখুন। শতাব্দী পরে জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ হবে, তা ভবিষ্যদ্দৃষ্টি দিয়ে স্থির করা সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ধর্ম।'[৭১২]

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে মুসলমানদের মধ্যে যে ইসলামী সাহিত্য চর্চার জাগরণ শুরু হয়েছিল, তাতে অনেক সঙ্কীর্ণ মনের সাহিত্যিকবৃন্দ ইসলামী সাহিত্যিক ও তাঁদের সাহিত্যকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এর ঘোর বিরোধিতা করে বলেনঃ "যাঁহারা মুসলমানদের সাহিত্যিক জাগরণকে বিভীষিকার দৃষ্টিতে দেখিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, মেহেরবাণী করিয়া একটি বার বিচারের দৃষ্টিকোণ ফিরাইয়া লউন এবং উদার দৃষ্টিতে অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যকে দেখিতে থাকুন, দেখিতে পাইবেন, মুসলমানদের সাহিত্য সাধনায় বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, উজ্জ্বল বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাবি ফল অমঙ্গলজনক নয়, মঙ্গলপ্রসূ।"[৭১৩]

এই সময়কালে বাংলার মুসলমানদের এক বিরাট সংঘবদ্ধ দল ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রতিশ্রুতবদ্ধ হয়ে কাজ শুরু করেন। মুসলিম জাতির মনে আশার সঞ্চার হয়। এই অবস্থার উন্নতি কামনা করে ও উৎসাহ প্রদান করে সাহিত্য বিশারদ আরও বলেনঃ "সম্প্রতি অমানিশার পর প্রভাত আলোর বর্ণচ্ছটার ন্যায়

---

[৭১২] . এস. ওয়াজেদ আলী, "ভবিষ্যৎ বাংলা সাহিত্য", *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী ১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩০

[৭১৩] . আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, "বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

বঙ্গীয় মুসলিম গগনে একটি শুভলক্ষণ দেখা দিয়েছে, ইহাই আশ্বাসের বিষয়। বাঙ্গালার মুসলমানদের মধ্যে এখন বহুপূর্বের সংস্কার আন্দোলন নূতনভাবে দেখা দিয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালার মুসলমানদের সহিত ইসলামের যোগ-নিবিড় হইবে বলিয়া মনে হয়। এই যোগ যতই ঘনিষ্ট হইবে, ততই বাঙ্গালা সাহিত্য ইসলামী ভাবাপন্ন হইবে বলিয়া আশা করা যায়।"[৭১৪]

১২০০ শতাব্দী থেকে বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার যে ধারা শুরচ হয় তা বিংশ শতাব্দীর শুরচতে এসে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। শুরচতে কাব্যে ও পুঁথি সাহিত্যে ইসলামী সাহিত্য চর্চা অনেকটা সীমাবদ্ধ থাকলেও এই সময়ে প্রবন্ধাকারে ও সহজ ভাষায় ইসলামের বিভিন্ন বিষয় রচিত ও প্রকাশিত হতে থাকে।

এই ক্ষেত্রে যে সমস্ড় সাহিত্যিক ইসলামী সাহিত্য রচনায় গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন তাঁদের মধ্যে উলেণ্টখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেনঃ মুন্সী মহম্মদ মেহেরউলণ্ঢা (১৮৬১-১৯০৭), গিরিশ চন্দ্র সেন (১৮৩৪-১৯১০), আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০), মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), মৌলানা মুহম্মদ নইমুদ্দিন (১৮৩২-১৯১৬), দীন মুহাম্মদ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৬৩-১৯১৬), শেখ আবদুল জব্বার (১৮৮১-১৯১৮), রেয়াজ আলদীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯), সফিউদ্দীন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২), মুহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৭৮-১৯২৩), নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪), খান বাহাদুর কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬), খান বাহাদুর তসলীমুদ্দীন আহমদ (১৮৫২-১৯২৭), সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), শেখ মোহাম্মদ জমিরচদ্দিন (১৮৭০-১৯৩০), সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৬২-১৯৩০), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩), মুন্সী মোঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩) বরিশাল, শেখ ফজলল করিম (১৮৮৩-১৯৩৬), দাদ আলী (১৮৫২-১৯৩৬), ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৪০), আবদুল করিম (১৮৬৩-১৮৪৩), আবদুল বারী কবিরত্ন (১৮৭৩-১৯৪৪), মোহাম্মদ মনিরচজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), রেভারেন উইলিয়ম গোল্ডসেক (১৮৬১-১৯৫০), কাজেম আল কোরায়শী কায়কোবাদ (১৮৫৭-১৯৫১), এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), আবদুল করিম

[৭১৪] . আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৩

সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯ / ১৮৭১-১৯৫৩), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬), মুহাম্মদ আবদুল হাকিম (১৮৭৬-১৯৫৭), শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন (১৮৯১-১৯৬২), মুহাম্মদ সেরাজুল হক (১৯০৩-১৯৬৩), কাজী আকরম হোসেন (১৮৯৬-১৯৬৩), খান বাহাদুর আবদুর রহমান (১৮৮৯-১৯৬৪), গোলাম মোস্ড়ফা (১৮৯৭-১৯৬৪) বেগম শামসুননাহার মাহমুদ (১৯০৮-১৯৬৪), খান বাহাদুর আহছানউলণ্টা (১৮৭৩-১৯৬৫), গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৫), মুহাম্মদ হাবীবুলণ্টাহ বাহার চৌধুরী (১৯০৬-১৯৬৬), মৌলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), মুহাম্মদ এমদাদ আলী (১৮৯১-১৯৬৯), ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্টাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯-১৯৬৯), মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (র.) (১৮৯৮-১৯৬৯), কাজী আবদুল ওদুদ (১৮৯৪-১৯৭০), আবদুল মওদুদ (১৯০৮-১৯৭০), নূর মুহাম্মদ আযমী (১৯০০-১৯৭২), ফররচ্খ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), মোহাম্মদ বরকতুলণ্টাহ (১৮৯৮-১৯৭৪), কাজী নজরচ্ল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা (১৯০০-১৯৭৭), শামসুর রহমান চৌধুরী (১৯০২-১৯৭৭), প্রিন্সিপাল ইবরাাহীম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯), মুহম্মদ এনামুল হক (১৯০২-১৯৮২), আবুল ফজল (১৯০৩-১৯৮৩), ডক্টর এম আবদুল কাদের (১৯০৬-১৯৮৪), শইখ শরফুদ্দীন (১৯০০-১৯৮৪), মুজিবর রহমান খাঁ (১৯১০-১৯৮৪) ।

আরও কিছু অপ্রধান ইসলামী সাহিত্যিক আছেন,[৭১৫] যাঁদের সাহিত্যিক অবদান গবেষণা ও পরিচর্যার অভাবে আমাদের মধ্য থেকে তাঁদের পরিচয় পর্যন্ড় হারিয়ে যাচ্ছে। ‘এই অসংখ্য কবি সাহিত্যিক যে

[৭১৫] . আবদুর রহমান খাঁ, পীর আবদুল খালেক (মৃত্যু:১৯৫৫), সৈয়দ আবদুল মান্নান (১৯১৪-), রামপ্রাণ গুপ্ত, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, কুমুদনাথ মলিণ্টক, সৈয়দ বদরোদ্দজা (১৮৯৭-১৯৭৪), গোলাম কিবরিয়া (১৮৪৩-), আবদুল লতিফ (১৮৭৪-১৯৩৬), আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২), সফিউদ্দিন আহমদ (১৮৭৭-১৯২২?), আলাউদ্দিন আহমদ (১৮৫১-১৯১৫?). আবদুল বারী (১৮৭২-১৯৪৪), কিরণগোপাল সিংহ, মীর ফজলে আলী, নাজির আহমদ চৌধুরী, শেখ ওসমান আলী, গাজী শামছুর রহমান (১৯২১-১৯৯৮), মুহম্মদ নুরল ইসলাম, সুফি মাওলান রূহুল আমিন (১৮৮২-১৯৪৫), খন্দকার ফয়েজউদ্দিন আহমদ (১৮৯৯-১৯৩৪), গাজী শামছুর রহমান (১৯২১-১৯৯৮), মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.) (১৯১৯-১৯৮৭), (১৮৯৫-১৯৮৭), মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (১৮৮৮-১৯৩৯), মতীয়র রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৭), মাওলানা মুহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিকী (১৮৮৮-১৯৩৯), এম. আকবর আলী (১৯১১-২০০১), দৌলত আহমদ (১৮৭০-১৯৪৪), শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী (১৮৯৫-১৯৪৪):, সুফি মাওলানা রূহুল আমিন (১৮৮২-১৯৪৫), আবদুল গফুর সিদ্দিকী (১৮৭২-১৯৫৯), গোলাম মকসুদ হিলালী (১৯০০-১৯৬১):, হুমায়ুন কবীর (১৯০৬-১৯৬৯), গোলাম রহমান, আবুল কাসিম মুহাম্মদ আদামুদ্দীন (-মৃত্যু-১৯৭২), নুরন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী (১৮৯৪-১৯৭৫), বেনজীর আহমদ (১৯০৩-১৯৮৩), মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম (র.) (১৯১৯-১৯৮৭), আবদুল কাদির (১৯০৬-১৯৮৪), আবুল হাসানাত (১৯০৫-১৯৮৫), আলী আহমদ (১৯১০-১৯৮৭), কাজী আবদুল মান্নান (১৯২৮-১৯৯৪), দেওয়ান মোহাম্মদ

অবদান সংযোগ করেন তার অধিকাংশই ইসলামী সাহিত্য বলে চিহ্নিত। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক গবেষণাগ্রন্থ ছাড়াও এই সময়কালে পুঁথি সাহিত্য পদবাচ্য কবিতা ও গল্প উপন্যাসও রচিত হয়। বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থ 'মোস্ড়ফা চরিত', ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বিষাদ-সিন্ধু' এবং সামাজিক উপন্যাস 'আবদুলণ্ঢাহ', 'বঙ্কিম দুহিতা' ইত্যাদি এই সময়কারই রচনা।'[৭১৬]

অন্যদিকে ইসলাম ও মানবতাবাদী দর্শন নিয়ে এই আলোচিত সময়ে যে অনেক কবি ও সাহিত্যিকের জন্ম হয়, তাঁদের সৃষ্ট রচনাবলী আজ ইসলামী সাহিত্যের এক বিরাট সম্পদ বলে বিবেচিত হচ্ছে। এখানে আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরচ্ল ইসলামের আবির্ভাব বাংলা ভাষায় ইসলামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

ইসলামকে নিয়ে কিভাবে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় কবি নজরচ্ল তাঁর কবিতায়, গল্পে, প্রবন্ধে ও সাহিত্যে আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। 'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে কাব্য সাহিত্যে এক নব উন্মাদনার সৃষ্টি করেন কবি কাজী নজরচ্ল ইসলাম। তিনি নিজে যেমন আত্মপরিচয় দিয়েছেন, 'কোরআন আমার বর্ম্ম / ইসলাম আমার ধর্ম / মুসলিম আমার পরিচয়' তেমনি বাংলা সাহিত্যকে ইসলামের আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। কি কবিতা, কি নাটক, কি উপন্যাস, কি ছোট গল্প এমনকি ফার্সী কবিতার অনুবাদের মাধ্যমেও ইসলামের আদর্শ পরিষ্ফুট করেছেন তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে। নজরচ্ল যেমন এক অনন্য প্রতিভা তেমনি সেই বহুমুখী প্রতিভার ছাপ তাঁর সাহিত্যের সর্বত্র বিরাজমান। নজরচ্ল সাহিত্য সম্পর্কে বিস্ড়ৃত আলোচনা এই স্বল্পপরিসর নিবন্ধে সম্ভব নয়। তবে এইটুকু বলবো, ইসলামের প্রশান্ড়িময় সমুজ্জ্বল জ্যোতি বাংলা সাহিত্যকে আলোকিত করে রেখেছে নজরচ্লের অবদান।'[৭১৭] নজরচ্লের স্বল্পকাল আগের ও পরের সময়কালে অবিভক্ত বাংলায় শত শত ইসলামী সাহিত্যিক ইসলামী সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিভক্তি, ইসলামী সাহিত্যের উপর রচিত ও প্রকাশিত বই-পুস্ড়ককে গ্রন্থাগারে বা জাতীয় আর্কাইভসে সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রতি অনীহা এবং অর্থাভাবে অপ্রকাশিত ইত্যাদি কারণে অনেক

আজরফ (১৯০৬-১৯৯৯), মনিরচ্দ্দীন ইউসূফ (১৯১৭-২০০০), কাজী দীন মুহম্মদ (১৯২৭-২০১১), মুহম্মদ নূরচ্ল হক (১৯০৭-১৯৮৭)।

[৭১৬] . আবদুস সাত্তার, "বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

[৭১৭] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

গুরচত্বপূর্ণ পান্ডুলিপি ও গ্রন্থ আজ দুস্প্রাপ্য হয়ে গেছে। যার ফলে, ইসলামী সাহিত্য আবার সঙ্কটের সম্মুখীন। 'নজরচলের সমসাময়িক এবং নজরচল পরবর্তী ফররচখ আহমদ পর্যন্ড় অনেক মরহুম কবি-সাহিত্যিক আছেন যাঁরা তাদের ইসলামী দর্শনের গবেষণা, প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ইত্যাদির সমাহারে বাংলা সাহিত্যকে ইসলাম সঞ্জাত করে সমৃদ্ধ করেছেন। এঁরা সংখ্যায় অনেক। মানবতাবাদ যদি ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয় তবে তাঁদের রচনায় মানবতাও সুস্পষ্ট এবং এই মানবতার জয়গানেও তাঁরা সোচ্চার হয়েছেন।'[৭১৮]

দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলা ভাষা মুসলমানদের সেবা থেকে কিঞ্চিত বঞ্চিত। ব্রিটিশ-হিন্দুদের বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সুশিক্ষার অভাব ইত্যাদি কারণে মুসলমানরা পলাশী যুদ্ধের পর থেকে তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে প্রাণ খুলে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে নাই। উলেণ্টখ্য যে, নবাব সিরাজদ্দৌলার পতনের পর থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ড় ব্রিটিশদের বিরচদ্ধে মুসলমানরাই সুদীর্ঘকাল লড়াই চালিয়ে আসছিল। এই লড়াই বা জেহাদ শুধু রাজনৈতিক ছিল না, সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিকও ছিল।

ব্রিটিশ সময়কালে মুসলমান কবি সাহিত্যিকগণই স্বাধীন মত প্রকাশের কারণে সবচেয়ে বেশি জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন। সেই তিতুমীর ও হাজী শরীয়তুলণ্টাহ থেকে ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মৌলানা আকরম খাঁ ও কাজী নজরচল ইসলাম পর্যন্ড় সকলেই ইংরেজদের রোষানলে পড়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। তাঁদের লিখিত বই-পুস্ড়ক ইংরেজ সরকার বাজেয়াপ্ত করে মুসলমানদের উপর সাংস্কৃতিক আঘাতের যে ইতিহাস রচনা করেছিলেন, তা আজও মুসলমানরা কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

এই প্রতিকূলতার মধ্যেও একদল আত্মবিশ্বাসী বাঙালি মুসলমান তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতির কল্যাণে জীবনোৎসর্গ করে গেছেন। সৃষ্টি করেছেন এক অসাধারণ ইসলামী সাহিত্যের উদাহরণ। তাদের পথ ধরেই ভবিষ্যতে ইসলামী সাহিত্যকে সাজানোর স্বপ্ন আমাদের বাস্ড়বায়ন করতে হবে। "বাংলা ভাষা এতদিন হিন্দুদের দান গ্রহণ করিয়াছে, এইবার তাহাকে মুসলমানের দানও গ্রহণ করিতে হইবে-অনুগ্রহ করিয়া নহে, আগ্রহের সহিতই গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার তরচণ সাহিত্যিকদের রচনায় আমরা যে আশার আলোক দেখিয়াছি, তাহা অসাধারণ না হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহারা আমাদের সাহিত্যিক

---

[৭১৮] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

সাধনার প্রথম যাত্রীর দল, দুর্যোগের মধ্য দিয়াই তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে, বন্ধুর পথকে সুগম করিয়া দিয়া। ইহাই তাঁহাদের কাজ, পরবর্ত্তী দল সেই পথ বহিয়াই জয়যাত্রা করিবেন।"[৭১৯]

সকল ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মুসলমান তরুণ সমাজকে আজ ইসলামী সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। ইসলামী সাহিত্য প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই বাংলার মুসলমানদের প্রকৃত মুক্তি নিহিত।

জন্মগতভাবে আমরা মুসলমান হলেও ইসলামী সাহিত্যের সাথে পরিচয় বা সম্পর্ক না থাকার কারণে ইসলামের প্রকৃত মর্ম ও উপলব্ধি আমাদের জীবনে পরিলক্ষিত হয় না। 'বাংলা সাহিত্যের তরুণ মোসলেম সাধকগণ, তোমাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট তাহা ভাবিবার অবসর এখনও তোমাদের হয় নাই, ওদিকে তোমরা মন দিও না। তোমরা কাজ করিয়া যাও-ইসলামের জন্য, নিজের দেশ ও জাতির জন্য, সকল ভুলিয়া তোমরা সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ কর। একথা ভুলিও না যে, আল্লাহ তোমাদের হাতেই বাংলার মুসলমানদের সকল প্রকার মঙ্গলের ভার দিয়াছেন। এখন বড় ছোটর বিচার করিতে গেলে তোমাদের মধ্যে বিরুদ্ধ মতের বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠিবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে যে হিংসার ভাব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তাহা তোমাদের সকল শ্রম এবং আমাদের সকল আশাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।'[৭২০]

ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। প্রাচীন কালের মানবতাবাদী, সুফী, সাধক, অলী-আওলিয়া ইত্যাদি ব্যক্তিবর্গের সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা আজ এই অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। "বাংলা ভাষার বয়স মোটামুটি হাজার বছর বলিয়াই ধরা হইয়া থাকে। বাংলার সহিত মুসলমানের ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় সম্বন্ধও প্রায় হাজার বছরের। বাংলা ভাষার জন্ম হইতেই এদেশের সঙ্গে মুসলমানদের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া, এদেশের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস ও ভাষার ক্রমবিকাশের স্তরে স্তরে মুসলমানদের সাধনাও জড়াইয়া রহিয়াছে।"[৭২১]

প্রায় ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ আজ বাংলা ভাষায় কথা বলে। বর্তমান বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডেই বাংলা ভাষা তার প্রিয় আশ্রয়স্থল পেয়েছে। এই ভূমিতেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইসলামী সাহিত্য তার পূর্ণাঙ্গতা পাবে। এই ভাষার সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মুসলমানরা তাকে মা-সন্তানের মতই লালন করছে।

---

[৭১৯]. সৈয়দ এমদাদ আলী, "বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী মুসলমান", প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[৭২০]. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

[৭২১]. ডক্টর মুহম্মদ এনামূল হক, "নূতন দৃষ্টিতে পুরানো বাংলা", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

সর্বশেষে মুসলমান সন্ড়ানেরাই বাংলা ভাষার মান মর্যাদা রক্ষা করার জন্য ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সুতরাং ইসলামী সাহিত্যের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় বাংলা ভাষায় অদূর ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। 'পাক-ভারত উপমহাদেশের সমস্ড় আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে আজ যে উর্দু ও বাংলা ভাষাই সর্বাপেক্ষাই উন্নত, বলিষ্ঠ ও ব্যাপক, তাহার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, ইহাদের প্রকৃতি ও রক্তে আছে ইসলমের বিশ্বজনীন উদারতা ও মানবিকতার ছাপ। প্রচারধর্মী সাম্যবাদী মানুষেরাই ইহাদের জন্মদাতা ও পালয়িতা।

বাংলা ভাষার গতিপথ লক্ষ্য করিলেও এ সত্য সহজেই বুঝা যায়। দ্রাবিড়, বৌদ্ধ ও সুলতানী আমল পার হইয়া সে আসিল বৃটিশ আমলে। এখানে আসিয়া পাদ্রী ও পন্ডিতদের ষড়যন্ত্রে সে অনেকখানি স্বাধীনতা হারাইয়া ফেলিল বটে, কিন্তু মুক্তির নূতন পথ ধরিয়া বাহিরে আসিতে তাহার বিলম্ব ঘটিলনা। এই মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করিলেন মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম প্রমুখ উদারধর্মী কবি-সাহিত্যিকেরা। পাকিস্ড়ান আসিয়া তাহার রূপান্ড়র ঘটিয়াছে। সুখসমৃতি ঘেরা পূর্বপাকিস্ড়ানই তো তাহার আদি বাসভূমি। এখানে আসিবা মাত্রই সে আবার তাহার হৃৎগৌরব ফিরিয়া পাইয়াছে।

উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাও এখন পাকিস্ড়ানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। এই গৌরব বাংলা ভাষা অন্যত্র লাভ করিতে পারে নাই। পূর্ব-পাক বাংলা সাহিত্যে এবারেও ইসলাম এক নূতন ভূমিকা গ্রহণ করিবে। ইসলামের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ও মহানুভবতার বাণী এবং তাহার রূপ, রস ও সুর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রেরণা যোগাইবে এবং সম্ভাবনার এক নূতন দিগন্ড় খুলিয়া দিবে।"[৭২২]

ইসলাম মানবতার ধর্ম। মানবকল্যাণের ধর্ম। দুঃখ-দুর্দশা, হর্ষ-বিষাদ ইত্যাদি দূর করার ধর্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেও সৃষ্ট উন্নত সাহিত্য মানুষের কল্যাণ চায়, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার পরিবর্তন চায়। তবে ইসলামের মত করে নয়। বর্তমান পৃথিবীতে বেশিরভাগ সাহিত্যিকই মানুষকে সাময়িক আনন্দদানের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের কথা সাহিত্যিক হুমায়ন আহমদ সহ এরূপ অনেক মুসলিম সাহিত্যিকই আছেন, যারা নিছক আনন্দ রস দান করার জন্যই লেখালেখি করেন ও সাহিত্য সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। ইসলামী সাহিত্য এ জাতীয় কাজের ঘোর বিরোধী।

[৭২২] . গোলাম মোস্তফা, "বাংলা ভাষার নূতন পরিচয়", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭

ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতির মধ্যে একটি নৈতিক ও আদর্শিক পরিবর্তনের জন্যই ইসলামী সাহিত্য যুগে যুগে সৃষ্টির প্রয়োজন। ইসলামী সাহিত্য হবে পরশ পাথর বা যাদুর মত, যার সংস্পর্শে এসে একজন পথহারা মানুষ পথ পাবে। দুনিয়া ও আখিরাতে তার জবাবদিহিতার প্রয়োজন বুঝতে সক্ষম হবে। এই সাহিত্যই আগামী বাংলাদেশে সৃষ্টি হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

এই জন্য ইসলামপ্রিয় নতুন প্রজন্মকে এই পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়ে শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী বলেনঃ ‘আমাদের বর্তমান লেখকগণ যে সাহিত্য সৃষ্টি কচ্ছেন, তাতে প্রাণের তারে তারে একটা পুলকের সুর ঝংকৃত হয়ে ওঠে সত্য, কিন্তু তাতে আমরা কেবল ক্ষণিক প্রীতি লাভ ভিন্ন অন্য কিছুই স্বাদ পাই না। মানুষ যাতে প্রকৃত মানুষ হতে পারে, এমন ইঙ্গিত তাতে বড় বেশী থাকে না। জাতীয় চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যদি কিছু ইঙ্গিত কোথাও থাকে, সে এত অস্পষ্ট যে, তা লোকের হৃদয়ে কোন স্থায়ী চিহ্ন আঁকতে পারে না।

আমাদের সাহিত্যের ভিতরের বস্তু এমন সরস, সতেজ ও প্রাণবন্ড় হওয়া দরকার যে, তা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসাড় সমাজ-দেহ কর্ম্মচঞ্চল হয়ে উঠে, হৃদয়ের কেন্দ্রে কেন্দ্রে তড়িৎ প্রবাহের সৃষ্টি হয়- এক অভূতপূর্ব প্রেরণার স্পন্দনে প্রাণ উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে, আলাদীনের প্রদীপ ঘর্ষণে দৈত্যের আবির্ভাবের ন্যায় হাজার হাজার সমাজ সংস্কারক কর্মীর সৃষ্টি হয়ে সমাজকে চঞ্চল করে তোলে।

যে সাহিত্য জাতির প্রাণে যত বেশী বিদ্যুৎ-জ্বালা সৃষ্টি করতে পারে, সেই সাহিত্যই আদর্শ সাহিত্য, আর জাতীয় দুঃখ-দুর্দশা মোচন করতে একমাত্র সেই সাহিত্যই সক্ষম। আমাদের সাহিত্যিকগণ যে দিন সেই জীবন্ড় সাহিত্য গড়ে তুলতে পারবেন-দৈত্যপুরীর রাজকন্যার চেতনা সম্পাদনের জন্য সোনার কাঠির সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন, সে দিন আমরা আমাদের এই অবনতির অন্ধকূপ হতে উদ্ধার লাভ করতে পারব-আমাদের সকল অবসাদ ও হীনতা আপনা হতেই টুটে যাবে, আমরা আবার আমাদের হারানো সৌভাগ্য ফিরে পাব।’[৭২৩]

ইসলামী ভাবধারার সাহিত্য যথার্থভাবে উপস্থাপন করতে পারলে তা অবশ্যই বাংলার মুসলমানদের নিকট আদরণীয় হবে। মানুষ ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা জানতে চায়। সঠিক ইতিহাস ও নজীর দেখতে চায়।

[৭২৩] .শেখ ইদ্রিস আলী, “মোসলেম বঙ্গ-সাহিত্য”, *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮

যেমন অসংখ্য টিভি চ্যানেলের মধ্যে পিস টিভি আজ ঘরে ঘরে ঈমানদার মুসলমানদের নিকট একটি প্রিয় চ্যানেল।

সারা পৃথিবীতে বাঙালি মুসলমানরা এর দ্বারা সহীহ-শুদ্ধভাবে ইসলামকে জানার সুযোগ পাচ্ছে। সুতরাং সঠিক ইসলামী ভাবধারাকে কাব্য, উপন্যাস ও প্রবন্ধ ইত্যাদি যেই কোন স্থানে তোলে ধরতে পারলেই তার পাঠকরা ইসলামের সুধা পেয়ে উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করবে। 'যেমন ধরুন নজিবর রহমান সাহিত্যরত্ন। তিনি লিখেছেন 'আনোয়ারা' উপন্যাস। আমি মনে করি না এখানে উপন্যাসের সবরকম টেকনিক মানা হয়েছে। তবুও দেখেন কি বিস্ময়কর! তখনকার সময়ে সেটার দশটা এডিশন হয়েছিল। বিক্রি হয়েছে মোয়া-মুড়কির মতো। সবাই কিনেছে। সবাই পড়েছে। ধর্মীয় গ্রন্থের মতো পাঠ হয়েছে মুসলমানদের ঘরে ঘরে। এটা কেন হয়েছিল ? কারণ উপন্যাসটা ছিল একটা সার্থক সুন্দর উপন্যাস এবং উপন্যাসটি একটা সময়ের প্রতিনিধিত্ব করেছিল। কারণ নজিবর রহমান একটা জিনিস রপ্ত করতে পেরেছিলেন, আর সেটি হলো কিভাবে লিখলে, কিভাবে উপস্থাপন করলে মুসলমানরা সেটা গ্রহণ করবে। আপনাকে তাই করতে হবে। জানতে হবে। জানতে হবে যুগ। যুগের মুসলমানরা কি চায়। কি পেলে তারা তৃপ্ত।'[৭২৪]

হিন্দু সাহিত্য বা হিন্দু প্রভাবিত সাহিত্য অধ্যয়ন করে মুসলমান ও তাঁদের সংস্কৃতির উন্নয়ন হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সেই বঙ্কিম থেকে আজ পর্যন্ড় হিন্দু সাহিত্য মুসলমানরা কম পড়ে নাই। এর দ্বারা হিন্দু বা ধর্মনিরপেক্ষ ভাবাপন্ন নীতিজ্ঞান বর্জিত কিছু মুসলিম সাহিত্যিক সৃষ্টি হওয়া ছাড়া মুসলমান সমাজের তেমন কোনো উন্নতি লাভ হয় নাই।

মুসলমান সমাজের উন্নতি করতে চাইলে সাহিত্যিককে অবশ্যই মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও আকীদা-বিশ্বাস নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করতে হবে। সাধারণ মুসলমানরা সেই সাহিত্য অধ্যয়ন করে তাঁদের প্রাণের তৃষ্ণা নিবারণ করবেন। গোলাম মোস্ড়ফা কর্তৃক রচিত 'বিশ্বনবী' এর একটি জীবন্ড় উদাহরণ। এ গ্রন্থ পাঠে পাঠক মাত্রই উপলব্ধি করতে পারেন ইসলামী সাহিত্য মুসলমানদের জীবনে কি আনন্দ দিতে পারে! 'হিন্দুগণ রচনা লিখতে গেলেই তাঁদের মনে বেদ-বেদান্ড়, উপনিষদ ও ব্রাহ্মণ, স্মৃতি ও পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের সংস্কৃত কথা, ভাব-ভঙ্গিমা ও কাব্য-সাহিত্যের রীতি ও রচনাভঙ্গি সব জেগে ওঠে। আমরা বাঙলার মুসলমানরা সংস্কৃত জানি না। তাই আমরা নিজের ভাবধারা ও ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে সাহিত্য রচনা

[৭২৪] . আল মাহমুদ, "আমাদের সাহিত্য", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

করলে তা হিন্দু সমাজে গ্রহণযোগ্য হয় না। একশত বছর হিন্দুদের এরূপ লেখা পড়ে আমরা সাহিত্যে কোন উন্নতি করতে পারিনি।

আমরা যদি নিজের ভাষার সেবা সাধনা করতাম তাহলে পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই আমাদের ভাষা ও সাহিত্য শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠত। আর আজ আমরা যে অভাব ও দৈন্যের মধ্যে পড়ে হা-হুতাশ করছি তা কখনো করতে হত না।'[৭২৫]

হিন্দু প্রভাবিত মুসলিম সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনসহ অনেক মুসলিম লেখকই ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সত্যকে তাঁদের সাহিত্যে তোলে ধরতে পারেন নি। অনেক মুসলিম সাহিত্যিকই ইসলাম সম্পর্কে কলম ধরে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে বিভ্রান্ড়ি ছড়িয়েছেন এই জাতীয় মুসলমান সাহিত্যিকবৃন্দ।

হিন্দুদের প্রভাব ও ষড়যন্ত্র এবং ইংরেজ রাজত্বের কূটকৌশলতা অনেক সরলমনা মুসলিম সাহিত্যিকই বুঝতে পারেন নি। ইত্যাদি প্রতিকূলতার মধ্যেও কিছু ঈমানদার মুসলিম সাহিত্যিক এগিয়ে এসেছেন এবং তাঁদের হাতে ইসলাম তার আসল রূপ ও সৌন্দর্য নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 'সাহিত্যচর্চার নির্মলতা উধাও হওয়ার প্রেক্ষিতেও সুখের কথা হলো এই যে, আমাদের আধুনিক সাহিত্যধারার যে আদি প্রেরণা অর্থাৎ স্বজাতিবাৎসল্য ও ইসলামী রেনেসাঁ-সাম্প্রতিককালে এর প্রবৃদ্ধি ঘটছে। বহু তরুণ ছুটে এসেছেন এ ধারার পালণ্ডা ভারী করতে এবং এরা নিবেদিত প্রাণ ও প্রতিভাবান। এঁদের সৃষ্টির ফসলে আগামী দিনগুলোয় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দুর্গতির ধারাটি ঘুচবে।

আরও সুখের কথা, ফররুখ আহমদের বন্ধু ও স্বপ্নের সাথী প্রবীণ কবি সৈয়দ আলী আহসান, খন্ডিত পঞ্চাশ দশকের অখন্ড প্রতিভা কবি আল মাহমুদ, কথাশিল্পী শাহেদ আলী, ও সানাউলণ্ডাহ নূরী, নাট্যকার আসকার ইবনে শাইখ, কবি ও সমালোচক মোহাম্মদ মাহফুজউলণ্ডাহ, সৈয়দ আলী আশরাফ, কবি ও গীতিকার দিলওয়ার, কবি আবদুস সাত্তার, কবি জামালউদ্দীন মোলণ্ডা, আবুল খায়ের মোসলেহউদ্দিন, কবি আশরাফ সিদ্দিকী, কবি ওমর আলী, কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ প্রমুখ যুগ সচেতন সাহিত্য ও

[৭২৫] . মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের স্থান" *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫

কাব্যস্রষ্টাগণ অন্ড়ত এ বিষয়টি অনুধাবন করেছেন যে, স্বজাতিবাৎসল্যের আদি-অকৃত্রিম ধারাটিকে পোষকতা দিতে হবে এবং বিশ্বদর্শন হিসেবে ইসলাম একটি আচরণীয় সুসংবাদ।'[৭২৬]

এঁদের হাত ধরেই আরও একদল ইসলামী সাহিত্যিকের আর্বিভাব ঘটছে, যারা আগামী দিনে ইসলামী সাহিত্যের ভবিষ্যতকে আরও উজ্জ্বল করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। 'এদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নবীনের এক দল আমাদের চোখ জুড়ানো সৃজনশীল কর্মকাে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন, এঁরা হচ্ছেনঃ রূহুল আমীন খান, হাসান আবদুল কাইয়ূম, জহুর উশ শহীদ, জামেদ আলী, সাজ্জাদ হোসাইন খান, লবনা জাহান, আবদুল মুকীত চৌধুরী, রাগিব হাসান চৌধুরী, খন্দকার হাসনাত করিম, আতা সরকার, শাহাদাত বুলবুল, মসউদ-উশ-শহীদ, মাহবুব বারী, মুশাররাফ করিম, মতিউর রহমান মলিণ্ডক, মমতাজ শহীদ, মকবুলা পারভীন, বুলবুল ইসলাম, আবদুল হাই শিকদার, হোসেন মাহমুদ, মাখরাজ খান, নিজামউদ্দিন সালেহ, সোলায়মান আহসান, সৈয়দ মূসা রেজা, আসাদ বিন হাফিজ, মুকুল চৌধুরী, হাসান আলীম, কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার, তমিজউদ্দীন লোদী, মুহম্মদ রবীউল আলম, খাদেম হাফিজ, আহমদ আখতার, বুলবুল সারওয়ার, কামাল মাহবুব, মোশাররফ হোসেন খান, নাসরিন চৌধুরী, মোজতাহিদ ফারচকী, ফারচক হোসেন, খসরচ পারভেজ, আশরাফ আল দীন, সালাহউদ্দীন নিযামী প্রমুখ।'[৭২৭]

বাংলা ভাষায় ইসলামী ভাবধারার সাহিত্যকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিককালে যে সমস্ড় প্রবীণেরা গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন, ইসলামী সাহিত্যের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে তাঁরাও নতুন প্রজন্মের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তাঁদের মধ্যে উলেণ্ডখযোগ্য কয়েকজন হচ্ছেনঃ 'ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, মুহম্মদ আবূ তালিব, অধ্যাপক আবদুল গফুর, আবু ফাতেম মোহাম্মদ ইসহাক, দেওয়ান আবদুল হামিদ, সৈয়দ আবদুস সুলতান, এস মুজিবউলণ্ডাহ, মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী, ডক্টর আশরাফ সিদ্দিকী, ডক্টর সৈয়দ আলী আশরাফ, ডঃ আবদুল মান্নান, ডঃ গোলাম সাকলায়েন, ডক্টর মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, জাহানারা আরজু, ওসমান গণি, মুহিউদ্দীন খান, আবদুল হক চৌধুরী, আখ্‌তার-উল-আলম, ফজল শাহাবুদ্দীন, ফারচক মাহমুদ, ডক্টর মাহমুদ শাহ কোরাইশী, আল-মুজাহিদী, আফতাব-উদ্-দীন, ডক্টর খোন্দকার রিয়াজুল হক, আবুল আসাদ, ডক্টর

[৭২৬] . আফজাল চৌধুরী, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

[৭২৭] . আফজাল চৌধুরী, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৪

আহমদ আনিসুর রহমান, শেখ দরবার আলম, অধ্যাপক আসাদ্দর আলী, নূর আহমদ সিদ্দীক, হাসনাইন ইমতিয়াজ, সৈয়দ মোস্‌ড়ফা কামাল প্রমুখ।'[৭২৮]

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এখানে প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল আনন্দময় ও সৌহার্দপূর্ণ। যার যার ধর্ম তাদের নিজ নিজ অবস্থানে থেকে প্রাচীন কালে থেকেই পালন করে আসছে। ভবিষ্যতেও তা চলমান থাকবে। এখানে কেউ কাউকে জোর করে ধর্মান্ড়রিত করে নাই। হিন্দু-মুসলমানের দুটো ধারা মুঘল, ব্রিটিশ, পাকিস্ড়ান ও বাংলাদেশ আমলে নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে চলে আসছে। এমনকি ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে চরম সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেও কলকাতাতে হিন্দু ও মুসলমানের দুটো ধারা ইসলামী সাহিত্যে ও হিন্দু সাহিত্যে তাঁদের নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বজায় রেখে স্ব স্ব জাতির জন্য তারা সাহিত্য সৃষ্টি করেছে।

ভারতবর্ষের বর্তমান ইতিহাস দেখলে যা অবিশ্বাস্য হওয়ার মত বিষয়। 'সেদিন কলকাতাই ছিল কেন্দ্রভূমি। সমস্ড় দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ ছিলো অখন্ডিত। একই কলকাতায় সাহিত্যচর্চা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাস, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণুদে, বুদ্ধদেব বসু, তারাশংকর, মানিক, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ড়কুমার, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ, সমরেশ বসু প্রমুখ এবং আবদুর রহীম, মোজাম্মেল হক, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, বেগম রোকেয়া, কাজী ইমদাদুল হক, এয়াকুব আলী চৌধুরী, ডাক্তার লুৎফর রহমান, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্ড়ফা, নজরুল ইসলাম, জসীম উদদীন, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আবু রুশদ, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, কাজী আবদুল ওদুধ, সৈয়দ আবুল হোসেন প্রমুখ। ভাবতে অবাক লাগে একই কলকাতায় বসে এঁরা একই বাংলা ভাষায় দুই স্বতন্ত্র সাহিত্যধারা প্রবাহিত করেন।'[৭২৯]

সমসাময়িক কালে মুসলমান কর্তৃক দৈনিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্র-পত্রিকাও কলকাতা থেকে হিন্দু পত্রিকার পাশাপাশি বের হতে থাকে। যাতে মুসলমান ও ইসলাম ধর্মের সুস্পষ্ট আদর্শ প্রচারিত

[৭২৮] . আফজাল চৌধুরী, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা", প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৫

[৭২৯] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৮

হতো। পত্র-পত্রিকার মাধ্যমেও মুসলমানরা তাদের প্রায় ডুবন্ড় আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। ' 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ', 'বসুমতী',র পাশে কলকাতাতেই উত্থিত হয়েছিলো 'সওগাত', 'বুলবুল', 'মুহম্মদী'র মতো পত্রিকা। একই কলকাতায় পাশাপাশি বাস করে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ তাদের আপন ঐতিহ্য ও গন্ডব্য করে নিচ্ছিলো। মুন্সী মেহেরেচ্লণ্টাহ, মওলানা মনিরচ্জ্জামান ইসলামাবাদী ও ইসমাইল হোসেন সিরাজীর জাগরণকামী বক্তৃতা ও রচনামালা, সৈয়দ এমদাদ আলী, মওলানা আকরম খাঁ ও মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীনের কুশলী সম্পাদনা শক্তি, বেগম রোকেয়া, কাজী আবদুল ওদুদ ও মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ভাবুকতা; আরো অসংখ্য লেখক ও কবির বহুমুখী উদ্যম সর্বোপরি নজরচ্ল ইসলামের অনন্যসাধারণ সাহিত্যকৃতি- এই সবই বাঙালি মুসলমানের আত্মচেতনাকে স্থানিকতা থেকে মুক্ত করে চৈতন্যের এক অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত করেছিলো।'[৭৩০]

ক. ইসলামী সাহিত্য ও সাহিত্যিকের প্রতি উদাসীনতা ঃ

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে আজ এটা প্রমাণিত যে, এর স্রষ্টা মূলত এবং প্রধানত প্রাচীন বাংলার মুসলমানগণ এবং বড় বড় পৃষ্ঠপোষকও যুগে যুগে মুসলমানরাই ছিল। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮০০), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক সংস্কৃত বাংলা প্রচলন ইত্যাদির মাধ্যমে বাংলা ভাষার ঐতিহ্যকে বিভিন্ন সময় বিকৃত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন সময় সংস্কৃত ভাষাকে বাংলা ভাষার ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেয়ারও ঘৃণ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

ইতিহাস সাক্ষী, বাংলা ভাষা তার সঠিক ভাব ও মর্যাদা হিন্দুদের হাতে কখনও পায় নাই। 'আসলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অমুসলিম লেখকদের অবদান যত বিপুলই হোক, তার অন্ড়্প্রবাহ মাঝে মাঝেই পৌণঃপুণিকতার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এবং এই দুরবস্থার মোকাবিলায় বারবারই মুসলিম সাহিত্যিকদের ফলদ আবির্ভাব। অর্থাৎ মুসলমানদের অবদান যতটা পরিমাণগত তার চেয়ে অনেক ও অধিক গুণগত, যা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি চলমানতাকে অবাধ ও অব্যাহত রেখেছে। কেউ অস্বীকার করলে করতে পারেন, কিন্তু এটাই ইতিহাস।'[৭৩১]

---

[৭৩০] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০

[৭৩১] . অধ্যাপক আবু জাফর, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান ", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৩

ইসলাম ধর্মবিদ্বেষী সাহিত্যিকবৃন্দ যাঁরা মূলতঃ হিন্দুদের সাহিত্য অধ্যয়ন করে সাহিত্য জগতে বিচরণ করছেন, তাঁদের অনেকেরই ধারণা ইসলাম নিয়ে সাহিত্য রচিত হতে পারে না। আর এই কারণেই ইসলাম নিয়ে রচিত সাহিত্যকে তাঁরা সঙ্কীর্ণ চোখে দেখেন। 'অতি প্রগতিবাদীরা কি মনে করবেন জানিনা, কিন্তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি এত গুরচত্বপূর্ণ, যা উলেণ্ঢখ না করলে পুরো আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এই বিষয়টি হলো বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ভান্ডার। পবিত্র মহাগ্রন্থ কুরআনে কারীমের বহু তাফসীর গ্রন্থ, হাদীস শরীফের বহু অনুবাদ, মহানবী (সা.) এর অসংখ্য পবিত্র সীরাতগ্রন্থ, সাহাবা (রা) জীবনচরিত ইত্যাদিসহ হাফিজ, রচ্মী, সাদী, ইমাম গাজ্জালী, খৈয়াম প্রমুখ অসংখ্য বিশ্বনন্দিত মনীষীর রচনা কর্মের অনুবাদ এবং আমাদের বহু আলেম উলামা ও ইসলামী চিন্ড়বিদের মৌলিক গ্রন্থসমূহ নিয়ে বাংলা সাহিত্যের যে এক বিশাল পরিমন্ডল তৈরী হয়েছে- শিশির দাস জাতীয় অতি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া- সেই বিপুল ধনভান্ডার গড়ে তোলার একক কৃতিত্ব মুসলমানেরই।

অতি প্রগতিবাদীরা এই বিশাল কর্মপ্রবাহকে তাঁরা ভাষা ও সাহিত্যের কোন কাজ বলে বিবেচনা নাও করতে পারেন। কিন্তু এতে কিছু যায় আসে না। কারণ, এই সদ্বিবেচকদের বিচার বোধই বড় অভিনব! কে একজন একটি চতুর্থ শ্রেণীর মার্কিনী নাটক অনুবাদ করলেন, তিনি সাহিত্যিক; 'কালকেতু উপখ্যান' নিয়ে বই লিখলেন, তিনিও সাহিত্যিক; কিন্তু হজরত উমর (রা) কি গাজী সালাহউদ্দীনকে নিয়ে কোন গ্রন্থ রচনা করলে, সেটা আর সাহিত্য পদবাচ্য হয় না।

বদনসীব! এই জন্যই আলণ্ঢাহ পাক এরশাদ করেন, 'আসলে চোখ তো অন্ধ হয় না, অন্ধ হয় বক্ষস্থিত হৃদয়'। অতএব, এই অন্ধ হৃদয় আলোচকদের মানদন্ড কোন মানদন্ডই নয়; তাঁদের একদেশদর্শী একাক্ষ বিবেচনাকে সসম্ভ্রমে পরিহার করে বাংলাদেশের অধিকাংশ পাঠক এটা পরম অনুরাগে মেনে নিয়েছে যে, ইসলামী চেতনা ও প্রেম ও বৈভবে সমৃদ্ধ যে অসংখ্য গ্রন্থ, সেই অবদান শুধু মূল্যবান নয়, অমর ও অবিনশ্বরও বটে।'[৭৩২]

আমাদের বিশ্বাস ইসলাম বিদ্বেষী সাহিত্যিকদের এই হীনমন্যতা পশ্চিম বঙ্গের বিখ্যাত লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথা শুনে কিছুটা হলেও দূর হবে। তাঁর ভাষায়ঃ "এই ঢাকাই হবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতিনির্ধারক প্রাণকেন্দ্র। কথাটি তিনি বলেছিলেন 'আনন্দ' পুরচস্কারলিপ্সু ঢাকার কিছু লেখকের মনরক্ষার জন্য নয়, মন পাওয়ার জন্যও নয়; বলেছিলেন মনের দুঃখে এবং কথাটি সর্বাংশে সত্য। অর্থাৎ

[৭৩২] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

সেই ভবিষ্যৎ অত্যাসন্ন যখন পালতোলা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জাহাজসমূহের অধিকাংশ নাবিক হবে মুসলমান।"[৭৩৩] আমাদের আরও বিশ্বাস, এই মুসলমান হবে ইসলামী আকীদা বিশ্বাসী ও তৌহিদবাদী মুসলমান। যাঁদের সাহিত্যের পাতায় পাতায় ইসলামী ভাবধারা ফুঠে উঠবে। আর সৃষ্টি হবে ইসলামী সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

খ. বাংলা ভাষার উপর কুরআনের প্রভাব ঃ

ইসলাম যেখানেই প্রবেশ করেছে সেখানেই সাথে করে কুরআন নিয়ে গেছে। কুরআনের প্রভাবে অসংখ্য মানুষ ইসলামী কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে আবির্ভুত হচ্ছেন। উর্দু ও ফার্সী ভাষার মত বাংলা ভাষায়ও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কুরআনের প্রভাব গত হাজার বছর যাবৎ বিদ্যমান। 'বিশ্ব সভ্যতা তথা সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে বিভিন্নভাবে এই একটি মাত্র গ্রন্থের যে প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, দ্বিতীয় আর কোন গ্রন্থকে তার সমকক্ষ দূরে থাক, কাছাকাছিও দাঁড় করানো সম্ভব নয়। এভাবে কিছুটা প্রত্যক্ষভাবে এবং বহুলাংশে ফার্সী, তুর্কী, উর্দু প্রভৃতি ভাষার মাধ্যমে আলকুর'আনের শব্দ, ভাব, কাহিনী, বিষয়, বর্ণনা, রূপক উপমা, সৌন্দর্য বহুভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। আলকুর'আনের সাথে আরবী, ফার্সী, তুর্কী, উর্দু প্রভৃতি ভাষার বিশ্ববরেণ্য অসংখ্য কবি ও তাঁদের অমর ধ্রচ্পদ সাহিত্যের প্রভাবত বাংলা সাহিত্যকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে ও বাংলা সাহিত্য তার আঞ্চলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে আন্ড়র্জাতিক ভাবধারা ও ঐশ্বর্য সম্পদে সুসমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।'[৭৩৪]

ব্রিটিশ শাসনের কারণে বাংলা ভাষার ব্যবহার বা প্রচলন সীমিত থাকলেও, বর্তমান বাংলাদেশ আমলে এর ব্যবহার সর্বদা উন্মুক্ত। ইসলামপ্রিয় বাঙালি মুসলমান ইসলামকে জানার ও বুঝার জন্য বাংলা ভাষায় নির্ভর করছে। যার ফলে, ইসলামী গবেষক ও সাহিত্যিকগণ প্রচুর বই-পুস্ড়ক বাংলা ভাষায় লেখার ও প্রকাশ করার আগ্রহ নিয়ে কাজ করছেন। "এখন চমৎকার বাংলা গদ্যে লিখিত হচ্ছে ইসলাম সম্বন্ধে নানা গ্রন্থ। বাংলাদেশে মুসলমানদের মধ্যে এখন ইসলামকে বিশেষভাবে জানার ও আত্মস্থকরণের এবং সচেতনভাবে বোঝার ক্ষেত্রে একটি জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামী চিন্ড়া এখন বাংলা ভাষার মাধ্যমে

[৭৩৩] . প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৫

[৭৩৪] . অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, "বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান" শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৫

বাংলাভাষী মুসলমানের কাছে অনেকখানি ঘরোয়া হয়ে উঠেছে। ইসলাম এখন আর এখানে দূর আরবের স্বপ্ন হয়ে থাকছে না, তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বাংলাদেশের শ্যামলিমা, বৃষ্টি-ভেজা বাতাস।”[৭৩৫]

গ. বাংলা ভাষার ইসলামী সাহিত্যকে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা ঃ

আমরা সুদীর্ঘকাল যাবত অন্যান্য ভাষা যেমন আরবী, ফার্সী, উর্দু ইত্যাদি ভাষা থেকে ধার-কর্য্য করে ইসলামী জ্ঞানের পুষ্টি লাভ করেছি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের সময় এসেছে আমাদের বাংলা ভাষায় সৃষ্ট ইসলামী জ্ঞান-গরিমা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া। গত এক হাজার বছরে বাংলা ভাষায় যে সমস্ড় মনীষীগণ ইসলামের প্রচার-প্রসারে ও ইসলামের সাহিত্য সৃষ্টিতে মৌলিক ভূমিকা রেখেছেন, এর সঠিক ইতিহাস বিশ্ব ইসলামী সাহিত্যের এক বিরাট সম্পদ। ‘পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নানা ভাব-সম্পদ তরজমা হয়ে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে এবং বাংলার জ্ঞান-ভা ারকে সমৃদ্ধ করছে। আমরা এসব তরজমার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন মনীষীর জ্ঞানরাজির সাথে সীমিত পর্যায়ে হলেও পরিচিত হচ্ছি। আমাদের দেশের মনীষীদের দুনিয়ার মানুষের সামনে তুলে ধরার ক্ষেত্রে আয়োজন খুবই দুর্বল। বিশেষত আমাদের দেশের খ্যাতিমান ইসলামী মনীষীগণ মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে মোটেই পরিচিত নন। উপমহাদেশের বড় বড় আলেমদের অবদানের সাথে বাংলাদেশের বহুলোক পরিচিত। কিন্তু আমাদের দেশের একজন মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম কিংবা অনুরূপ মাপের অন্য কোন মনীষীর অবদানের সাথে বাকি মুসলিম দুনিয়া অপরিচিত। মুসলিম বিশ্বের বিশেষত উপমহাদেশের মুসলমানদের ছোট বড় অনেক আন্দোলনের বিষয় আমাদের দেশে অনূদিত হয়ে পঠিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানদের হাজার বছরের সংগ্রাম, আমাদের মজনু শাহ, শরীয়ত উলণ্টাহ, দুদু মিয়া, তিতুমীর, এনায়েত আলী, বেলায়েত আলী কিংবা হাবিলদার রজব আলীকে আমরা দুনিয়ার সামনে সেভাবে উপস্থাপন করতে পারি নি। এদিকটির প্রতিও আমাদের নজর ফেরানো দরকার।’[৭৩৬]

ঘ. ইসলামী ভাবধারার পুস্ড়ক প্রকাশনা সংস্থা ও সংঘঃ

গত শতাব্দীর শুরচতে ইসলামী সাহিত্য চর্চার যে জাগরণ কলকাতা ও ঢাকা থেকে যাত্রা শুরচ করেছিল, তা ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর কিছুটা স্থবির হয়ে পড়লেও, পরবর্তীতে বাংলাদেশে এর ব্যাপক প্রসার লাভ

---

[৭৩৫] . মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, “ভাষা আন্দোলনের তিন অধ্যায়”, শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-১৮

[৭৩৬] . প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

করে। বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থাও ইসলামী ভাবধারায় লিখিত বই-পুস্ড়ক প্রকাশনায় এগিয়ে আসে। এতে ইসলামী সাহিত্য রচনার প্রতি লেখকরাও উৎসাহ বোধ করেন।

ইসলামের প্রাথমিক যুগের পন্ডিতদের কর্তৃক রচিত প্রচুর বই-পুস্ড়ক বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়। এ সমস্ড় বই-পুস্ড়কের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রভাব বাঙালি মুসলমানকে ইসলামী সাহিত্য চর্চার প্রতি আরো উৎসাহিত করে তোলে। 'পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ এবং এসব সম্পর্কে গবেষণাধর্মী গ্রন্থ কি বাংলা ভাষায় কম প্রকাশিত হয়েছে ? গাজ্জালীর দর্শন সংক্রান্ড় গ্রন্থ, ইবনে খালদুনের সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ ইত্যাদির নির্ভরযোগ্য অনুবাদ অনেক পাওয়া যায়। বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা থেকে প্রকাশিত ইসলাম সংক্রান্ড় বইগুলো দেখলেই এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। এগুলো কি কোন সদব্যবহার হবেনা? এগুলো সঠিকভাবে আত্মস্থ করে সাহিত্যে প্রয়োগ করলে ইসলামের প্রভাব পড়তে বাধ্য।'[৭৩৭]

বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্যের ভবিষ্যৎ নিঃসন্দেহে উজ্জ্বল এ কথা আত্মবিশ্বাসের সাথেই বলা যায়। শুধু ইসলামী ভাবধারায় লিখিত পুস্ড়ক নিয়ে প্রচুর সংখ্যক প্রকাশনা সংস্থাই প্রমাণ করে ইসলামী সাহিত্য এ অঞ্চলে কতটা আদরণীয়। নিম্নে বাংলাদেশে চলমান কতকগুলো সরকারী ও বেসরকারী ইসলামী পুস্ড়ক প্রকাশনা সংস্থার পরিচয় উপস্থাপন করছি, যা ইসলামী সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে আমাদের ইঙ্গিত দেয়ঃ

১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ (১৯৫৯), আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ ঃ

প্রথমে নাম ছিল ইসলামিক একাডেমী। ১৯৭১ এর পর এটিকে বর্তমান নামে নামকরণ করা হয়। কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে এ প্রকাশনাটিও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় শুরচ থেকেই গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭১ সালের পর এর কার্যক্রম বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ৬৪ টি জেলায় এর শাখা করে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ইসলামী সাহিত্য প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী। এ প্রকাশনা সংস্থাটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের, আব্বাসীয় ও উমাইয়া যুগে রচিত প্রচুর ইসলামী সাহিত্য বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে বাংলার ইসলামী সাহিত্য প্রিয় মানুষদের আত্মিক ক্ষুধা নিবারণ করে যাচ্ছে। কুরআনের অনুবাদ, তাফসীর, হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, সীরাতে রাসুল (সা.), ইসলামী বিশ্বকোষ, সীরাত বিশ্বকোষ, জীবনী-গ্রন্থ, ইসলামী আইন ও ফিকাহ শাস্ত্র, ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ,

---

[৭৩৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও স্থাপত্যকলা ও শিশু সাহিত্য ইত্যাদি গ্রূপ বা বিষয়ে হাজার হাজার কিতাব দেশি ও বিদেশি ইসলামী পণ্ডিতদের সাহায্যে প্রকাশ করে যাচ্ছে। মাসিক অগ্রপথিক, মাসিক সবুজ পাতা, ত্রৈমাসিক ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা ইত্যাদিও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ড় এক নজরে প্রকাশিত পুস্ড়কের তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিষয় / গ্রূপ	টাইটেল সংখ্যা	ফর্মা সংখ্যা	পৃষ্ঠা সংখ্যা	মুদ্রণ সংখ্যা	মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা
১	আল-কুরআন, তাফসীর ও কুরআন সম্পর্কিত	২৪৭	১৩৭৭৭.৭৫	১২১৪২৩	১৫৬৫৩৫০	১৯০০৬৯৪৯৩০৫০
২	হাদীস ও হাদীস সম্পর্কিত	১২২	৫৪৩২.২৫	৪৮৮৭৮	৪৮৩২৫০	২৩৬২০২৯৩৫০০
৩	সীরাতে রাসূলুলণ্ঢাহ (সা)	১২৫	২২১৩.৫	৩০৭৫০	৪৫৫৭৫০	১৪০১৪৩১২৫০০
৪	ইসলামী বিশ্বকোষ	৪০	৩৩৭৮.২৫	২৬৯৭৪	১৭১০০০	৪৬১২৫৫৪০০০
৫	সীরাত বিশ্বকোষ	১০	৭১০.৫	৫৬৭৪	৩২৫০০	১৮৪৪০৫০০০
৬	জীবনী-গ্রন্থ	২৮৩	৩২৪৯.৫	৫০৩০০	১০৩৯১৫০	৫২২৬৯২৪৫০০০
৮	ইসলামী আইন ও ফিকহ শাস্ত্র	৭৮	১৮৪৮.৫৬	২৩৫০১	২৩৬০০০	৫০৭৪২৩৬০০০
৯	ইসলাম ও ইসলামী আদর্শ	৪২৬	৪৬৪১.৩২	৬৭৩৭৯	১৩৬৩২৫০	৯১৮৫৪৪২১৭৫০
১০	শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি	২৫৯	২৭৩৭.৫২	৪২৬৮৮	৭৯৯৫০০	৩৪১২৯০৫৬৩০
১১	ইতিহাস-ঐতিহ্য	২০৩	৩৫২৫.৩০	৪৮৬২৩	৬১৩২৫০	২৯৮১৮০৫৪৭৫০
১২	অর্থনীতি, সমাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান ও স্থাপত্যকলা	২৪০	২২০০.৫৫	৩৫১৯০	১১৩২৩০	৩৯৮৩৫০৮০০০০
১৩	শিশু সাহিত্য	৭৪৮	৪০৬৩.২২	৩৮৫৫০	৩৩১০০০০	১২৭৬০০৫০০০০০
১৪	ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত বই	৪৮	৫৬১.৫	৮৮৯৮	২৫৫০০০	২২৬৮৯০০০০০
	অন্যান্য	৯৮	৮৯৪.৪৭	১১৮৪৬	২৯০৭৫০	৩৪৪৪২২৪৫০০
		২৯৩০	৪৯২৩৪	৫৫৮৬৭৪	১১১৭৪৬৭৫০	২৩৪০৮০০০০০

এ পর্যন্ড় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত পুস্ড়কের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা হচ্ছে- দুইশত চৌত্রিশ কোটি আট লক্ষ।[৭৩৮] অন্যদিকে ২০১১ সালে এসে এর প্রকাশিত পুস্ড়কের টাইটেল সংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫০৮।[৭৩৯]

২. বাংলা একাডেমী (১৯৫২), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১০০০ঃ

বাংলা একাডেমী রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খেদমতে নিয়োজিত সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সময় ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত বিভিন্ন কবি, সাহিত্যিক ও গবেষকদের রচনা এবং অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে।

৩. নজরুল একাডেমী, ঢাকাঃ

পাকিস্ড়ান আমল থেকেই নজরুল একাডেমী নজরুলের ইসলামী সাহিত্যের মূল্যায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বই পুস্ড়ক প্রকাশ করে যাচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠান নজরুলের ইসলামী গান, কাব্য আমপারা ইত্যাদি সাধারণ পাঠক উপযোগী করে নিয়মিত প্রকাশ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৪. আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০ঃ

এ প্রকাশনী বহুদিন যাবৎ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। কুরআন, হাদীস, মুসলিম জীবনী, ঐতিহাসিক উপন্যাস, ইসলামী অর্থনীতি, দাওয়া ও শিশু-কিশোর বিষয়ক প্রচুর প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এর ক্যাটালগ থেকে জানা যায়, এ পর্যন্ড় ৩৫০ টি শিরোনামে ইসলামী বই-পুস্ড়ক মুদ্রণ ও প্রকাশনার কাজ করেছে।

এ ভাবে নিম্নবর্ণিত আরও অসংখ্য প্রকাশনা সংস্থা ইসলামী সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থের প্রকাশনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

৫. মদীনা পাবলিকেশান্সঃ মদীনা ভবন, ৩৮ / ২, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।

---

[৭৩৮] . *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত পুস্তক তালিকা ০৭-০৩-২০০৪ পর্যন্ত* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: ২০০৪) পৃ. ৫

[৭৩৯] . *ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত পুস্তক তালিকা ৩০-০৬-২০০১ পর্যন্ত* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০১১) পৃ. ৫

৬. নজরুল ইন্সটিটিউট, কবি ভবন, বাড়ি ৩৩০-বি, রোড ২৮ (পুরাতন), ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯।

৭. খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ৯, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।

৮. খোশরোজ কিতাব মহল, ১৫, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০।

৯. বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইট লিঃ, নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২, জুবিলি রোড, চট্টগ্রাম / ১২৫ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।

১০. কাকলী প্রকাশনী, ৩৮ /4 বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১১. র‍্যামন পাবলিশার্স, ২৬, বাংলাবাজার ঢাকা, ১১০০।

১২. জ্ঞান বিতরণী, ৩৮/ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

১৩. পাঞ্জেরী, প্যারিদাস রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা।

১৪. আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলা বাজার ঢাকা-১১০০।

১৫. আযাদ বুকস, আন্দর কিলণ্ডা, চট্টগ্রাম।

১৬. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাঁটাবন মসজিদ, ঢাকা।

১৭. খায়রুন প্রকাশনী, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলা বাজার, ঢাকা।

১৮. কামিয়াব প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা।

১৯. বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৭১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

২০. এমদাদিয়া লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা।

২১. আহসান পাবলিকেশনস, বাংলা বাজার, ঢাকা।

২২. বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, বাড়ি # ০৪ সড়ক # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা, ঢাকা-১২৩০।

২৩. আজিজিয়া ফাউন্ডেশন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০।

২৪. আর, আই, এস, পাবলিকেন্স, কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০।

২৫. আল এছহাক প্রকাশনী, ২/৩, প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

২৬. আলফালাহ পাবলিকেশন্স, ১৯১ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

২৭. আলহেরা প্রকাশনী, ২/৩. প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

২৮. ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

২৯. খন্দকার প্রকাশনী, কম্পিউটার মার্কেট, বাংলা বাজার, ঢাকা।

৩০. ছারছীনা প্রকাশনী, ৫৮/১, প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

৩১. জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ, ১৬/১৭, বাংলা বাজার ঢাকা-১০০০।

৩২. দারুল কিতাব, ৫০, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

৩৩. দারুস সালাম পাবলিকেশন্স, ৩০ মালিটোলা রোড, ঢাকা-১১০০।

৩৪. নিউ এমদাদিয়া পাবলিকেশন্স, ৩৪/১, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।

৩৫. প্রীতি প্রকাশন ৪৩৫ / ক, বড় মগবাজার, ঢাকা।

৩৬. যোগাযোগ পাবলিশার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

৩৭. রহমানিয়া লাইব্রেরি, ৪২/৪৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা-১১০০।

৩৮. শতদল প্রকাশনী লিঃ ১৬/১৭ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।

৩৯. শতাব্দী প্রকাশনী, ৪৯১ / ১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

৪০. শিশু কানন, ২/৩, প্যারিদাস রোড, ঢাকা-১১০০।

৪১. সুহৃদ প্রকাশনী ১/জি/৯, মীরহাজির বাগ, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

৪২. সেরহিন্দ প্রকাশন, ৮৯ যোগীনগর, রোড ওয়ান, ঢাকা।

৪৩. স্মৃতি প্রকাশনী, ৪৫১ মীরহাজির বাগ, ঢাকা, ১২০৪।

৪৫. স্পন্দন অডিও ভিজুয়াল সেন্টার, ৪৩৫/২, বড় মগবাজার, ঢাকা, ১২১৭।

৪৬. হাবিবিয়া বুক ডিপো, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা-১০০০।

৪৭. হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, ৩৮ বংশাল, নতুন রাস্ড়, ঢাকা।

এছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে কিছু সংঘ যেমনঃ ‘বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন’, ‘পূর্ব পাকিস্ড়ান রেনেসাঁ সোসাইটি’, ‘তমুদ্দন মজলিশ’, ‘পাকিস্ড়ান সাহিত্য সংসদ’, ‘পূর্ব পাকিস্ড়ান সাহিত্য মজলিশ’, ‘আহছানিয়া মিশন’, ‘সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ’, ‘বাংলা সাহিত্য পরিষদ ঢাকা এ সমস্ড় সংঘের অসংখ্য ইসলামী সাহিত্য প্রকাশনা ছাড়াও ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক উদ্যোগে আরও অনেকেই ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বই-পুস্ড়ক নিয়মিত সেই প্রাচীন কাল থেকে আজ অবধি প্রকাশ করে যাচ্ছেন।

ইসলামী সাহিত্যের বিকাশ, চর্চা ও সমৃদ্ধির নিমিত্তে আমার এ গবেষণার বাস্ড়ব উপলব্ধিগুলোকে প্রস্ড় াবনা আকারে তুলে ধরলাম। এসব সুপারিশ বাস্ড়বতা ও প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে ক্রমান্বয়ে বাস্ড় বায়ন করা যেতে পারে।

১. স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কওমী ও আলিয়া মাদরাসা সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষায় পাঠদান তথা মাতৃভাষায় পঠন-পাঠন নিশ্চিত করা।

২. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বা বাংলা একাডেমি, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইসলামী দল ও সংস্থার উদ্যোগে আমার গবেষণাপত্রে আলোচিত ইসলামী সাহিত্যিকদের রচনাবলী পুনঃ প্রকাশ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩. জুম‘আ ও দু’ঈদের খুৎবা মাতৃভাষায় প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৪. ইসলাম প্রচারক ও মসজিদের ইমাম-খতিবদের মাতৃভাষায় শুদ্ধভাবে বক্তব্য পেশ করার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রচিত ইসলামী সাহিত্যিকদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া, যাতে তাদের মাধ্যমে মুসলিণ্ঢগণ ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের উৎসাহ পায়।

৫. ইসলামের পঞ্চস্ড়ম্ভের মৌলিক বিষয়গুলো মাতৃভাষায় বুঝে পালন করার সুযোগ সৃষ্টি করা, বিশেষ করে নামাযের সুরা ও দোয়া-দরূদ ইত্যাদি বাংলা অর্থসহ বুঝে পড়ার ব্যবস্থা করা।

৬. ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়াতে বাংলা ভাষায় ইসলাম প্রচারের যথার্থ ব্যবস্থা করা।

৭. বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য প্রচারের জন্য পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট খোলা এবং এ গ্রন্থগুলো ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করার সহজ ও ফ্রি ব্যবস্থা করা।

৮. নতুন প্রজন্মকে ইসলামের ইতিহাস-সভ্যতা-ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিত ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কিত বই-পুস্ড়ক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে পাঠ্য করে অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা ।

৯. বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলা, গ্রাম-গঞ্জ ও পাড়া-মহলণ্ঢায় পাঠাগার স্থাপন করে বাংলা ভাষাভাষী ইসলামী সাহিত্যিকদের রচনাসমূহ পাঠ করার ব্যবস্থা করা।

১০. বাংলাদেশের স্বনামধন্য কওমী ও আলিয়া মাদরাসাগুলোর উদ্যোগে আধুনিক আরবী, উর্দু ও ফার্সী ভাষা থেকে যুগ জিজ্ঞাসার জবাব সম্বলিত মূল্যবান বই-পুস্ড়ক বাংলা ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করা।

১১. জাতীয় আর্কাইভসে তাঁদের রচনাবলী সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবির্ভূত সমস্ড় মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের জীবনী নতুন প্রজন্মের সামনে উপস্থাপন করা।

১২. আমার এ ক্ষুদ্র গবেষণাই এ বিষয়ে শেষ ও চূড়ান্ড় গবেষণা বলে আমি মনে করি না। বরং এই ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যা নিয়ে আরও বহু গবেষণার সুবর্ণ সুযোগ আছে। তাই এ ক্ষেত্রে গবেষণার জন্য বাংলা ভাষাভাষী জ্ঞানী-গুণীদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উৎসাহ প্রদানের আহ্বান জানাচ্ছি।

সবশেষে বলতে চাই, বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১), সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১), শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), ডাঃ মোহাম্মদ লুৎফর রহমান (১৮৮৯-১৯৩৬), সৈয়দ আবুল হোসেন (১৮৯৬-১৯৩৮), এস. ওয়াজেদ আলী (১৮৯০-১৯৫১), আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯ / ১৮৭১-১৯৫৩), মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪), মুহাম্মদ আবদুল হাকিম (১৮৭৬-১৯৫৭), মৌলানা আকরম খাঁ (১৮৬৮-১৯৬৮), ড. মুহম্মদ শহীদুলণ্ডাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), কাজী নজরচ্ল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ বাংলা ভাষাভাষী জ্ঞানী-গুণীদের মাতৃভাষা বাংলায় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চা সহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ব্যবহারের জন্য পরামর্শ, অনুরোধ ও ক্ষেত্র বিশেষে আর্তচিৎকার করেছেন। আমি নগণ্য গবেষক তাঁদের সাথে সুর মিলিয়েই নতুন প্রজন্ম ও আগামী দিনের দেশ জাতি ও ধর্মের শুভাকাঙ্খী সকলের খেদমতে আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস সবিনয়ে পেশ করছি।

উপসংহার

আলণ্ডাহ রাব্বুল ‘আলামীনের অশেষ কৃপায় ‘‘**বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৯০১-১৯৫০)**” শিরোনামে আমার গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত হয়েছে। গবেষণার এই দুরূহ কাজটি আকার আকৃতিতে যেমনি বড় তেমনি চিন্ড়ার জগতে এর বিশালতা এবং পরিধিও ব্যাপক। স্বল্প পরিসরে এর পূর্ণাঙ্গ রূপ বর্ণনা করা

খুবই কঠিন। তবুও দীর্ঘ গবেষণা ও চেষ্টার মাধ্যমে গবেষণার বিষয়ে যেসব মৌলিক ও জ্ঞানগর্ভ উপাদান খোঁজে পেয়েছি তা হলোঃ

১. ইসলামী সাহিত্যের পরিচিতি তুলে ধরতে গিয়ে সাহিত্যিকগণ প্রত্যেকেই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কোন কোন বিশেষ দিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। এ সংজ্ঞা সমূহকে একত্রিত করলে যে নির্যাস বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে-বাংলা সাহিত্যের যে অংশে (কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি) কুরআন-হাদীসের আলোকে ইসলামী মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, সভ্যতার সুন্দর দিক ফুটে উঠে তাই ইসলামী সাহিত্য। অর্থাৎ যে সাহিত্যে এই মূল্যবোধগুলো শাখা প্রশাখায় পত্র পলণ্ঢবে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, সেটিই ইসলামী সাহিত্য। নৈতিক মূল্যবোধ বিরোধী কোনো লেখার সাথে ইসলামী সাহিত্যের কোনো সম্পর্ক নেই।

২. মানব জীবনে আনন্দ-রসের জন্ম দেয়া সাহিত্যের একটি অংশ হলেও শুধু আনন্দ দান করা সাহিত্যিকের উদ্দেশ্য নয়। তাই গবেষণায় দেখা যায়, ইসলামী সাহিত্যের লক্ষ্য অত্যন্ড় ব্যাপক ও মহৎ। অর্থাৎ ইসলামী সাহিত্য একদিকে যেমন উন্নতি, অগ্রগতি, কল্যাণ ও সাম্যের উৎস হবে, অন্যদিকে তেমনি মুক্তির ধারা ও সৃষ্টির প্রেরণা বিশ্ব মানবের প্রাণের মধ্যে ঢেলে দিয়ে জাগরণ সৃষ্টি করবে।

৩. ইসলামী সাহিত্যিকের দায়িত্বের পরিসর সুবিস্ড়ৃত হলেও ঐশী বিধানাবলীর পরিমন্ডল অতিক্রম করে প্রবৃত্তির সেবাদাসে পরিণত হতে পারে না। অর্থাৎ কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত সৎবৃত্তি ও কল্যাণের প্রসারে এবং অসৎবৃত্তি ও অকল্যাণকে সমাজ থেকে চিরতরে উৎখাত করার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করবেন।

৪. বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে গবেষণা করে যে বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়েছে তা হলো, ইসলামী সাহিত্য মানবতার উপকারী কোন বিষয়কে আপন করতে কৃপণতা করে না; বরং এটাকে নিজের হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার মতো মনে করে। একজন ইসলামী সাহিত্যিক সত্য ও সুন্দরের লালন করার ক্ষেত্রে মনে করেন বর্তমান পৃথিবীতে প্রচলিত বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে মূল্যবান সম্পদ এনে আমাদের সংস্কৃতিকে সাজাতে এবং সম্পদশালী করে তুলতে হবে। তবে সে কাজ করতে হবে আমাদের ধর্ম্ম এবং কালচারকে যথাস্থানে কায়েম রেখে, তাদের বর্জন বা স্থানচ্যুত করে নয়।

তবে সাম্প্রতিক কালে বাঙালি মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে স্বজাতি ও ধর্মবিরোধিতার একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যা খুবই দুঃখজনক ও লজ্জাকর। কুরচিপূর্ণ সংস্কৃতি অনুকরণ না করে বরং কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক রচিশীল সংস্কৃতি অনুসরণ করাই শ্রেয়।

৫. ইসলামী সাহিত্য মানবকল্যাণের মতোই গুরচত্বপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে গবেষণার ফলশ্রচতি স্বরূপ বলা যায় উন্নত মানের সাহিত্য সৃষ্টির উপর নির্ভর করছে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের উন্নত ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। উন্নত ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি করতে না পারলে, নাস্তিক্যবাদ ও অপসংস্কৃতির প্রভাবে বিদ্যমান ইসলামী মূল্যবোধ অচিরেই ধবংস হয়ে যাবে। এজন্য পরিকল্পিত উপায়ে ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়োজন।

৬. ১২০০-১৯০০ শতাব্দী সময়কালে ইসলামী সাহিত্য চর্চার রূপরেখা সম্পর্কে গবেষণায় দেখা যায় যে, যে সকল মনীষী এ সুদীর্ঘ সময়ে ইসলামী সাহিত্যের অঙ্গনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিংশ শতাব্দীর শুরচতে কলকাতা ও ঢাকাকে কেন্দ্র করে শত শত ইসলামী সাহিত্যিকের আবির্ভাব ঘটে। ইসলামী সাহিত্য চর্চা বাংলার মুসলমানদের মধ্যে নবজাগরণ সৃষ্টি করে এবং ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি ও অধ্যয়নের ক্ষেত্রে মুসলমান শিক্ষিত সমাজ প্রবলভাবে আগ্রহী হয়ে উঠে। যার ফলে বাংলার মুসলিম সমাজ পৌত্তলিকতা বর্জিত এবং একত্ববাদ প্রভাবিত সাহিত্য অধ্যয়নের সুযোগ পায়। সুতরাং যে সাহিত্য কর্ম বিংশ শতাব্দীর শুরচতে বাংলার মুসলিম সমাজে নবজাগরণ সৃষ্টি করেছিল, সে সাহিত্য ভা ারার আজ পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে হারিয়ে যাচ্ছে। তা রাষ্ট্র ও সমাজের উদ্যোগে পুনঃ প্রকাশিত হলে আবার বাংলার মুসলিম সমাজে ইসলামী জাগরণ শুরচ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

৭. অবিভক্ত বাংলার সমকালীন পরিবেশ পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করলে যে অপ্রিয় সত্য বেরিয়ে আসে তা হচ্ছে এই যে, উনিশ শতকের শেষার্ধে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলমানগণ সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। মুসলমানদের মধ্যে সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সংস্কারক, বক্তা, কবি ও সাহিত্যিক ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ মেধা ও যোগ্যতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন অবিভক্ত বাংলার অনেক হৃদয়বান ও ত্যাগী মানুষ। তাঁদের মত উদার হৃদয় নিয়ে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষার্থে আমাদের জান-মাল কুরবানীর নজীর স্থাপন করতে হবে। তাঁদের লিখিত ইসলামী সাহিত্য ভা ারকে বাংলার গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে পাঠাগার স্থাপন করে নতুন প্রজন্মের নিকট আমাদেরকে প্রচারের সুব্যবস্থা করতে হবে।

৮. ১৯০১-১৯৫০ এই সুদীর্ঘ সময়ের ইসলামী সাহিত্যিকদের জীবন ও কর্ম নিয়ে গবেষণার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালি ইসলামী সাহিত্যিকদের রয়েছে বর্ণাঢ্য সংগ্রামী জীবন ও তাঁদের রচিত সুবিশাল ইসলামী সাহিত্যকর্ম, যা কালের প্রবাহে ঢাকা পড়ে গেছে। আমাদের উদাসীনতা ও অসচেতনতার কারণে এ গুণীজনদের নাম আজ ইতিহাস থেকে মুছে যাচ্ছে। কুরআন, হাদীস, ফিক্‌হ বা ইসলামী বিধি-বিধান ও

ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন চরিত ও ইসলামী সংস্কৃতির বিকাশে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অগণিত মনীষী এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের এ পরিশ্রম আগামী প্রজন্মকে দান করবে আত্মমর্যাদাবোধ, স্বকীয়তা, অনন্যতা ও উন্নত জীবনের দিক নির্দেশনা।

৯. ১৯০১-১৯৫০ এই সময়ে লিখিত ও প্রকাশিত ইসলামী সাহিত্যের উপর রচিত গ্রন্থসমূহ নিয়ে গবেষণা করলে যে সত্যটি ফুটে উঠে তা হচ্ছে-ইসলামী জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনন্য সাধারণ ইসলামী সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। গত হাজার বছরে বাংলা ভাষায় ইসলামের উপর যে গবেষণা ও কাজ হয় নি; আলোচিত পঞ্চাশ বছরে বাঙালি ইসলামী সাহিত্যিকগণ নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে অনন্য সাধারণ এবং তুলনাহীন কাজ আমাদের উপহার দিয়েছেন। যথাঃ ক. কুরআন, হাদীস ও সীরাত ও বিষয়ক রচনাবলী। খ. ফিক্‌হ বা ইসলামী বিধি বিধান, ইসলামী সংস্কৃতি, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, জীবন চরিত ও গ্রন্থাবলী গ. ইসলামী ভাবধারায় লিখিত ও প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য রচনাবলী। একটি সুশিক্ষিত, সভ্য ও চরিত্রবান উন্নত জাতি গঠনের প্রধান উপাদান হিসেবে এ সাহিত্য ভা ারকে কাজে লাগানো গেলে পুরো জাতি উপকৃত হবে।

১০. ১৯০১-১৯৫০ এ সময়ের মধ্যে ইসলামী ভাবধারায় লিখিত ও প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বাংলার নবজাগরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম ছিল। ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্য নিয়ে আজ থেকে একশত বৎসর পূর্বে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা ইসলামী আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসারে সমাজে যে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল, আজ একবিংশ শতাব্দীর শুরচতে তা প্রবলভাবে প্রয়োজন অনুভব হচ্ছে বলে আমি মনে করি। এ জাতীয় ইসলামী পত্রিকা আবারও প্রকাশিত হলে আধুনিক বাঙালি মুসলিম সমাজ নিঃসন্দেহে ইসলামী জ্ঞানে-গুনে বিভিন্ন দিক থেকে উপকৃত হবে।

১১. বিংশ শতাব্দীর শুরচতে ইসলামী সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ইসলামী ভাবধারায় রচিত অসংখ্য গুরচত্বপূর্ণ বই-পুস্ড়ক মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলাম শিক্ষা বিভাগে সিলেবাসভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। ইসলামী সাহিত্যিকগণ উপলব্ধি করেছিলেন মাতৃভাষায় ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়নের বিশেষ উপকারিতা হচ্ছে-এতে সাহিত্য রসের মাধ্যমে ইসলামকে সহজে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করা যায়। অনূদিত বা ভিন্ন ভাষার বই থেকে যা সম্ভব হয়ে ওঠে না। এ দৃষ্টি কোন থেকে বাংলা ভাষার বিদগ্ধ ইসলামী কবি-সাহিত্যিকদের গুরচত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলোর সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের জন্য পাঁচটি গ্রন্থকে নমুনা স্বরূপ উপস্থাপন করে

এ বিষয়টি প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে। তবে থিসিসের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় আলোচনা সংক্ষেপ করার চেষ্টা করেছি।

১২. বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। যুগে যুগে ইসলামী সাহিত্যিকগণ ইসলামী সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে তাঁদের জান-মাল সহ সবকিছুই উৎসর্গ করে গেছেন। যুগের দাবি অনুযায়ী এবং অমুসলিম সাহিত্যিকদের ইসলাম বিদ্বেষের মোকাবিলায় এই পথকেই তাঁরা জিহাদের পথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। ইহলৌকিক লোভ-লালসা তাঁদেরকে এই পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্দশা ও পদে পদে বাধা সৃষ্টি করেও তাঁদের অগ্রযাত্রা থামাতে পারে নি। তাঁদের ত্যাগ ও সাধনার ফলে আজ বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে এক বিশাল ভান্ডার আমরা পেয়েছি। কিন্তু পরিতাপের বিষয় বাঙালি মুসলিম সমাজ বিশেষ করে আলেম-ওলামা এবং ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ইসলামী সাহিত্যের এই বিশাল ভান্ডারের সাথে কোন সুসম্পর্ক তৈরী করতে চান না। তাঁরা এখনও উর্দু ও আরবী ভাষায় লিখিত ধর্মীয় বই-পুস্তক থেকে জ্ঞান মন্থন করার ব্যর্থ চেষ্টায় মগ্ন।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে যে সমস্ত মনীষীগণ পৃথিবীতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন, তারা সকলেই মাতৃভাষায় জ্ঞানার্জন করেছিলেন এবং মাতৃভাষাতে তাঁদের ভিত্তি ছিল খুবই মজবুত। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালি আলেম সমাজ এখনও তা বুঝে ওঠতে সক্ষম হন নি বলে আমার মনে হয়। গত ১০০ বছরে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলে ইসলাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কম গড়ে ওঠে নি। কিন্তু সেই তুলনায় ফলাফল আশানুরূপ নয়। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে মাতৃভাষা বর্জন করে প্রবল আগ্রহ ও অন্ধ অনুসরণ করে উর্দু ও ফার্সী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান। যদি এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আরবীর পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ইসলামী বিষয় তথা কুরআন, হাদীস ও ইসলামের সমগ্র বিষয় শিক্ষা দেয়া হতো, তাহলে আলেম-ওলামাগণ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে আজ নেতৃত্বস্থানে অবস্থান করতে পারতেন।

মাদরাসা ও ইসলাম ধর্মীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাঙালি মুসলিম কর্তৃক লিখিত ইসলামী বই-পুস্তকের সাথে পরিচিত করানোর জন্য একটি দ্রুত পদক্ষেপ সংশ্লিষ্ট সকলের গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় অথবা আলেম-ওলামা ও ইসলামী সংঘ-সমিতির উদ্যোগে অনুবাদের কাজে উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে বড় বড় ইসলামী প্রতিষ্ঠানগুলো গুরচত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একটা কথা অনিবার্য সত্য যে, জ্ঞানের ইসলামী বিপণ্ডব না হলে রাজনীতির বা রাষ্ট্রের ইসলামী বিপণ্ডব হবে না। মুসলিম স্পেন সহ মুসলমানদের গৌরবময় রাজত্বের ইতিহাসই তার প্রমাণ। ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে প্রতিটা মুসলমানের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা উচিত। আর এ ক্ষেত্রে মাতৃভাষা কেন্দ্রিক বই-পুস্ড়কই সফল ভূমিকা রাখতে পারে।

পরিশেষে যে কথাটি না বলে পারছি না তা হচ্ছেঃ কুরআনের ভাষানুযায়ী আলণ্ডাহ তা'আলা প্রত্যেক নবী-রাসুলকে তাঁর স্বজাতির ভাষায় দ্বীন প্রচারের মহান দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছেন। অন্যদিকে, ইতিহাস প্রমাণ করে বিভিন্ন জাতি তাঁদের মাতৃভাষাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে উন্নতি ও অগ্রগতির চূড়ান্ড় শিখরে আরোহণ করেছেন। মাতৃভাষা চর্চা তাঁদের মধ্যে নব জীবন সঞ্চালন করেছে। বাংলার মুসলমানরাও যদি ইসলাম ধর্ম ও জ্ঞান-বিজ্ঞান ইত্যাদির চর্চায় মাতৃভাষাকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে, তবে শীঘ্রই দেখা যাবে তাদের ভাগ্যাকাশে শুভ ঊষার আগমন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা যতই বিদেশী ভাষায় পান্ডিত্য অর্জন করি না কেন, আমরা যতদিন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের সঙ্গে নিবিড়ভাবে না জড়াবো, ততদিন আমাদের সার্বিক উন্নতি ও অগ্রগতি সম্ভব নয়।

গ্রন্থপঞ্জি

আল কুরআন

সুরা ইউসুফঃ ২
সুরা ইবরাহীমঃ ৪
সুরা নাহলঃ ১৩, ১২৫
সুরা তা-হাঃ ২৭-২৮
সুরা কাসাসঃ ৩৪

সুরা রূমঃ ২২।

সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

আ

আবুল মনসুর আহমদ, *বাংলাদেশের কালচার* (ঢাকাঃ আহমেদ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৯)

আবুল আহসান চৌধুরী, 'বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ঃ উচ্চপর্যায়ের বাংলা ভাষা শিক্ষা', *সুশিক্ষাবর্ষ স্মারক গ্রন্থ* ২০০৩ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৩)

অধ্যাপক আখতার ফারূক, *বাংলা সাহিত্যে মহানবী (সা)* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮০)

বিচারপতি আবদুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০৫)

মাওলানা আব্দুল রশীদ তর্কবাগীশ, *শিরাজী স্মৃতি* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০০০)

অধ্যাপক মোঃ আবুল হোসেন মলিণ্ঢক, এয়াকুব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও সাহিত্য (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৪)

অধ্যাপক আবুল কাশেম ভূঁইয়া, *উপমহাদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৮০)

আবদুল কাদির, *বাংলা কাব্যে মুসলিম সাধনা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৮৭)

আলমগীর জলিল, *শিশু-সাহিত্য সাধনায় কয়েকজন মুসলমান লেখক* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ১৯৮৮)

আ.স.ম.বাবর আলী, *বাংগালী মুসলিম পুণর্জাগরণে কয়েকজন বাঙ্গালী সাহিত্য সাধক* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৮)

আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পা. *ইসলামী কবিতা: শাহাদাৎ হোসেন* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০০২)

আবদুল কাদির সম্পা. *শিরাজী-রচনাবলী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৩)

আলী আহমদ, *বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী*, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

আবদুল লতিফ চৌধুরী, *মীর মোশাররফ হোসেন* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮০)

আবু ফাতেমা ও মুহম্মদ ইসহাক, *ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মাওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮৮)

আখতার-উল-আলম, *জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত নওয়াব আবদুল লতিফ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮০)

আবদুল কাদির, *নওয়াব আবদুল লতিফ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮০)

আবদুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ সংস্কৃতির রূপান্তর, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৮২)

আবদুল মান্নান সৈয়দ, *বাংলা সাহিত্যে মুসলমান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জুন ১৯৯৮)

আবদুল মান্নান তালিব, *ইসলামী সাহিত্য মূল্যবোধ ও উপাদান* (ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় প্রকাশ, ২০০৭)

আবু জাফর (সংকলিত ও সম্পাদিত) *মওলানা আকরম খাঁ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭)

আব্দুল গফুর সিদ্দিকীঃ মাওলানা মুহাম্মদ নইমুদ্দীন (প্রবন্ধ) মাসিক 'মোহাম্মদী', শ্রাবাণ সংখ্যা, ১৩৬২

আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পা. *নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭)

আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পা. *নজরুল ইসলামঃ ইসলামী গান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, মে ১৯৮০)

আবদুল কাদির সম্পা, *রোকেয়া রচনাবলী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩)

আবদুল মান্নান সৈয়দ ও অন্যান্য সম্পা, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *রোকেয়া রচনাবলী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯)

আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পা. ফররুখ আহমদ, *ফররুখ আহমদ রচনাবলী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)

মওলানা আকরম খাঁ, আবু জাফর সম্পা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭)

আজহার ইসলাম, *মোজাম্মেল হক* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)

আজহার ইসলাম, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আধুনিক যুগ* (ঢাকাঃ অনন্যা, ২০১১)

আজহার ইসলাম, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলিম কবি* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯২)

আবদুস শহীদ নাসিম, *শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি* (ঢাকাঃ শতাব্দী প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৭)

আহমদ শরীফ, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০২)

আবদুল খালেক, এম.এ *সাইয়েদুল মুরসালীন ১ম ও ২য় খন্ড* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৯১)

আফজাল চৌধুরী, *ঐতিহ্য চিন্তা ও রসূল প্রশস্তি* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫)

আবদুল মান্নান সৈয়দ ও অন্যান্য সম্পা. বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, *রোকেয়া রচনাবলী* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯)

মুনশী আবদুল মাননান সম্পা, *কবি গোলাম মোস্তফা স্মৃতি ও অবদান* (ঢাকাঃ বিশ্ব পরিচয়, ২০০৩)

আহমদ শরীফ, *বাংলার মনীষা* (ঢাকাঃ অনন্যা, ২০০৫)

ড. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম সাধনা ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)* (ঢাকাঃ লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগের গবেষণা গ্রন্থ, ১৯৬৪)

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য* (কলকাতাঃ প্রতিভাস, ১৯৯৯)

কবি আবদুল হাকিম '*নূরনামা*'

ড. আবুল কালাম মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *বাঙালি মুসলিম ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁর অবদান* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন, ২০০৯)

আবুল হাসান চৌধুরী সম্পা. *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ রচনাবলী ১ম খন্ড* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, এপ্রিল, ১৯৯৭)

আবদুল মান্নান সৈয়দ, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৪)

ই

ইসরাইল খান, *মুসলিম সম্পাদিত ও প্রকাশিত বাংলা সাহিত্য পত্রিকা (১৯৩১-১৯৪৭)* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৫)

ইসরাইল খান, *বাংলা সাময়িক পত্র: পাকিস্তান পর্ব* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০৪)

অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁঃ মৌলভী নইমূদ্দীন, ‘মাহে নও’ চৈত্র’, ১৩৬৫ সাল

ইসরাইল খান, *মুহাম্মদ লুৎফর রহমান জীবন ও চিন্ত্মধারা (১৮৮৯-১৯৩৬)* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, এপ্রিল, ১৯৯৮)

ইমরান হাসান, সুনীল কান্তি় দে, *সুলতান পত্রিকায় বাংলার সমাজ সংস্কৃতি ও রাজনীতি* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ২০০১)

ইসরাইল খান সম্পা. *আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের অভিভাষণ সমগ্র* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ২০১০)

এ

আবদুল কাদির সম্পা. এয়াকুব আলী চৌধুরী অপ্রকাশিত রচনাবলী, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৩৭০)

এস. ওয়াজেদ আলি, “সাহিত্য”, *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী ১,* সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫)

এস. ওয়াজেদ আলি, “বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনার পথ”, *এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী ১, প্রাগুক্ত।*

এস. ওয়াজেদ আলী “ মুসলমান ও বাংলা সাহিত্য”*এস. ওয়াজেদ আলি রচনাবলী, প্রাগুক্ত।*

এ টি এম আতিকুর রহমান, *বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)

এম. এ. তোরাব আলী, আশরাফ-আতরাফ, সওগাত, শ্রাবণ, ১৩৩৫

ও

ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্ত় ও চেতনার ধারা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

ক, খ, গ

কবীর চৌধুরী, নজরুল দর্শন (ঢাকাঃ নজরুল ইন্সটিটিউট, প্রথম প্রকাশ ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯২)

কাজী নজরুল ইসলাম, *‘ইসলামী কবিতা’*, আবদুল মুকীত চৌধুরী সম্পা. (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৮২)

কাজী নজরুল ইসলাম, *সঞ্চিতা,* (কলকাতাঃ ডি, এম, লাইব্রেরী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২)

কাজী আবদুল ওদুদ, ‘হিন্দু-মুসলমনের বিরোধ’, শাশ্বত বঙ্গ, ব্র্যাক প্রকাশনা, ঢাকা, ১৯৮৩

কাজী আব্দুল ওদুদ, শাশ্বত বঙ্গ (ঢাকাঃ ব্র্যাক প্রকাশনা, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩), ৩৭৬-৭৭, পাকিস্ড়ান পাবলিকেশনস (সম্পাদিত) (ঢাকাঃ পাকিস্ড়ান পাবলিকেশনস, ১ম সংস্করণ, ১৯৫৬)

ড. কাজী মোতাহার হোসেন, *ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮০)

কাজী নজরচ্ল ইসলাম, *নাত ও গজল* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৭৯)

খান মুহম্মদ সালেক (সম্পাদিত), এয়াকুব আলী গ্রন্থাবলী (ঢাকাঃ আদিল ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৭৪)

খোন্দকার সিরাজুল হক, *মুসলিম সাহিত্য সমাজ: সমাজচিন্ড়া ও সাহিত্যকর্ম* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪)

খালেদ মাসুকে রসুল, *অগ্নি পুরচ্ষ সিরাজী* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৭)

খালেদ মাশুকে রসুল, *এয়াকুব আলী চৌধুরী জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৪)

খালেদ মাসুকে রসুল, *হাবিবুলণ্ঢাহ বাহারঃ জীবন ও কর্ম* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৯৯)

ড. খালেদ মাসুকে রসুল, *এয়াকুব আলী চৌধুরী: জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০০৪)

খন্দকার মুহাম্মদ বশির, মোহাম্মদ নজিবর রহমান সাহিত্য রত্ন (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮৭)

খান বাহাদুর আবদুর রহমান খাঁ, *শেষ নবী* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৮৬)

গোলাম সাকলায়েন, 'মোহাম্মদ নজিবর রহমান, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ- চৈত্র, ১৩৬৪

গিরিশ চন্দ্র সেন অনূদিত (কোরআন শরীফ, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৩৬), মুখবন্ধে মৌলানা আকরম খাঁ এর শ্রদ্ধা নিবেদন

ছ, জ

মাওলানা ছিদ্দিকুর রহমান, মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী এর শিক্ষাজীবন, *আলণ্ঢামা শামছুল হক স্মরণিকা*, (গোপালগঞ্জঃ খাদেমুল ইসলাম পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭)

জাফর আলম, *বাংলাদেশের স্মরণীয় বরণীয়* (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস,২০০৩)

জুলফিকার আহমদ কিসমতী, *চিন্ড়্রধারা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৮৮)

জি.এম. হালিম সম্পা, *নজরচ্ল মানস পরীক্ষা* (ঢাকাঃ পূবালী প্রকাশনী, ১৯৬৮)

ত, ন

তাহমিনা আলম, *বাংলার সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলিম নারী সমাজ ১৯০০-১৯৪৭* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯৮)

তাহ্মিনা আলম, *বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চিন্ড়্র-চেতনার ধারা ও সমাজকর্ম* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯৬)

দিলওয়ার হোসেন, *মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর ১৯৯৪)

নাসির হেলাল (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলা ভাষায় সীরাত বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫)

প, ব

প্রফুলণ্ঢচন্দ্র রায়, 'ডিগ্রির অভিশাপ', *বাংলদেশের উচ্চশিক্ষার দুশো বছর*, তপন বাগচী সম্পা. (ঢাকাঃ সূচীপত্র, ২০০৬)

ড. বদিউজ্জামান, *ইসমাইল হোসেন সিরাজী: জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ২০০৫)

বদিউজ্জামান, *মুসলিম জাগরণে মোহামেডান স্পোর্টিং* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০০৭)

ম

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ সম্পা. *ইবরাহীম খাঁ রচনাবলী প্রথম খন্ড* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)

মুহাম্মদ মতিউর রহমান, *ইসলামের দৃষ্টিতে সাহিত্য*, নতুন কলম (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, আগস্ট, ১৯৯৫)

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, বাংলা ভাষায় ইসলামী সাহিত্য চর্চা (১৮০০-১৯০০), এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ, ২০০৭, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। (অপ্রকাশিত পান্ডুলিপি)

মুহাম্মদ ইসমাইল, *ইসলামী সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান সমাজ* (কলকাতাঃ মলিণ্ঢক ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ, ২০০১)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার", *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৯০)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "নতুন সাহিত্য", *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী প্রথম খণ্ড*

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "বাঙ্গলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য",

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জুন, ২০০০)

অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীনঃ মুহাম্মদ নইমুদ্দীন 'দিলরুবা', জৈষ্ঠ্য ১৩৬০; মাসিক মাহে নও, চৈত্র সংখ্যা ১৩৬৫ সাল

মোঃ জামান খান, *বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি মুসলিম-মানস ও এস ওয়াজেদ আলির সাহিত্যকর্ম* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০০৩)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার", *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৯০)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "ভবিষ্যতের বাংলা সাহিত্য",

মুজিবুর রহমান খাঁ, *সাহিত্যের সীমানা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৯৯৭)

মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা, পুথি সাহিত্যে মহানবী (সা), (ঢাকাঃ তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৯২)

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, অভিভাষণ, 'শহীদুল্লাহ সংবর্ধনা গ্রন্থ'

মোঃ জামান খান, *বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালি মুসলিম-মানস ও এস. ওয়াজেদ আলির সাহিত্য কর্ম* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল, ২০১৩)

মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, "অভিভাষণ" *মৌলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী রচনাবলী ১ম খণ্ড*, মনিরুজ্জামান সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৩)

মুন্সী মেহেরউল্লা, *মুন্সী মেহেরউল্লা রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, নাসির হেলাল সম্পা. (ঢাকাঃ সুহৃদ প্রকাশন, ২০০৩)

ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯)

মোহম্মদ নসিরউদ্দীন, বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ, ঢাকা, ১৯৮৫

মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, 'আমাদের জাতীয় ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার', মাঘ, ১৩৩৬, মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ

মোতাহার হোসেন সুফী, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (ঢাকাঃ কাকলী প্রকাশনী, ২০০১)

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, *মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন রচনাবলী (প্রথম খণ্ড)*, মোমেন চৌধুরী সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০৪)

মুহম্মদ আবদুল হাই, *মুহম্মদ আবদুল হাই রচনাবলী ২য় খণ্ড*, হুমায়ুন আজাদ সম্পা. (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)

মোতাহার হোসেন সুফী, *তসলিমুদ্দীন আহমদ (জীবনী গ্রন্থমালা)* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ১৯৯৩)

মুহাম্মদ আব্দুর রউফ, *মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন ঃ সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫)

অধ্যাপক মজির উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা* (ঢাকাঃ দিদরি পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৭)

মোজাম্মেল হক, *মোজাম্মেল হক রচনাবলী প্রথম খণ্ড*, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পা. (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী ২০০৫)

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮)

মোঃ মোসলেম উদ্দীন জোয়ার্দ্দার, *এয়াকুব আলী চৌধুরী ঃ জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০২)

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *রাজনীতিতে বঙ্গীয় উলামার ভূমিকা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০২)

মৌলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, *মৌলানা মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী রচনাবলী ১ম খণ্ড*, মনিরুজ্জামান সম্পা. (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)

মোহাম্মদ সা 'দাত আলী, *সাহিত্য প্রতিভা* (ঢাকাঃ অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০০৯)

অধ্যাপক মজির উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা* (ঢাকাঃ দিদার পাবলিশিং হাউস, ১৯৬৭)

মনসুর মুসা, *মুহম্মদ শহীদুল্লাহ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)

মোরশেদ সফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্ড়্রচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া* (ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী, ২০০৭)

মোহাম্মদ জিলণ্ডুর রহমান, *বাংলা সাহিত্যে আলোর মিছিলে যাঁরা* (ঢাকাঃ অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০০৮)

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পা. *মোহাম্মদ বরকতুলণ্ডাহ রচনাবলী দ্বিতীয় খ–* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১)

ড. মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান, *বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৯)

মুহাম্মদ ইমদাদুল হক, *বীরভূমের দুটি উজ্জ্বল নক্ষত্র*, বুলবুল, কলকাতা, ১০ম বর্ষ, ডিসেম্বর, ১৯৭৭

মনসুর মুসা সম্পা. *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী দ্বিতীয় খ–* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩)

মোফাখ্খার হুসেইন খান, *পবিত্র কোরআন প্রচারের ইতিহাস ও বঙ্গানুবাদের শতবর্ষ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭)

মুহম্মদ মতিউর রহমান, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০০২)

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা দ্বিতীয় খ– (*ঢাকাঃ হাসি প্রকাশালয়, ১৩১১)

মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ও আলি হাসান, কোরান শরিফ (কলিকাতাঃ ১৯৩৮)

মোহাম্মদ তাহের, আল কুরআন (কলিকাতাঃ ১৯৭০)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, *মরচ ভাস্কর* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৪)

মুজিবুর রহমান খাঁ, *মহানবী* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ১৯৮০)

মোহাম্মদ বরকতুলণ্ডাহ, *নবীগৃহ সংবাদ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর, ২০১০)

মোহাম্মদ বরকতুলণ্ডাহ, *নয়াজাতি স্রষ্টা হযরত মোহাম্মদ (সা)* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর, ২০০৫)

মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭)

মোস্ড়ফা জামাল সম্পা. *মাওলানা ইসলামাবাদী* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৮০)

মাহযুযা হক, ড. *মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ ঃ আব্বা ও আমি* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ১৯৮৮)

ড. মুহম্মদ আবদুলণ্ঢাহ, *নওয়াব আলী চৌধুরীঃ জীবন ও কর্ম* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৮৭)

ড.মনিরচ্জ্জামান, *ড.মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৮০)

মুহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, *কাজী নজরচ্ল ইসলাম* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ১৯৮০)

মুনির চৌধুরী, *ইসমাইল হোসেন সিরাজী* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮০)

ড. মুহাম্মদ আবদুলণ্ঢাহ, *বাংলাদেশের দশ দিশারী* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রচ্য়ারি ১৯৯১)

মোঃ মোসলেম উদ্দীন জোয়ার্দার, *এয়াকুব আলী চৌধুরীঃ জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ২০০২)

মুনশী আবদুল মাননান সম্পা. *কবি গোলাম মোস্ড়ফা স্মৃতি ও অবদান* (ঢাকাঃ বিশ্ব পরিচয়, ২০০৩)

ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা-সাহিত্য* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮)

মোরশেদ সফিউল হাসান, *পূর্ব বাঙলায় চিন্ড়চর্চা ১৯৪৭-১৯৭০ দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া* (ঢাকাঃ অনুপম প্রকাশনী, ২০০৭)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ, ‘প্যারীর পত্র’, আনিসুজ্জামান সম্পা. *শহীদুলণ্ঢাহ রচনাবলী* প্রথম খন্ড (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪)

মুহাম্মদ আবদুর রহমান আন্‌ওয়ারী, *ইসলামী দা’ওয়াহ: স্বরূপ ও প্রয়োগ* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ২০১৩)

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, “বাঙলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য”, *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী রচনাবলী প্রথম খন্ড*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পা (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৯০)

মোতাহের হোসেন চৌধুরী ‘শিক্ষা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ’ *মোতাহের হোসেন চৌধুরী রচনাবলী, প্রথম খন্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)

মোহাম্মদ মোসলেমউদ্দীন জোয়ার্দার, *ডাঃ লুৎফর রহমানের সাহিত্য সাধনা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন, ১৯৯৪)

মোহাম্মদ সা’দাত আলী, *সাহিত্য প্রতিভা* (ঢাকাঃ অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০০৯)

কর্ম্মবীর মুনশী মেহেরচলণ্টাহ, মখদুম লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৩৪, ধর্ম্ম জীবনে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার, উদ্ধৃতঃ

মোঃ আবুল কাশেম ভূঞা, *পুথি সাহিত্যে মহানবী (সা)* (ঢাকাঃ তাওহীদ প্রকাশনী, ১৯৯২)

মোহাম্মদ বরকতুলণ্টাহ, *মানুষের ধর্ম্ম* (ঢাকাঃ হাওলাদার প্রকাশনী, ২০১১)

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত* (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮)

মুজিবর রহমান খাঁ, *সাহিত্যের সীমানা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ১৯৮৭)

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবু তালিব, *বাংলা সাহিত্যের উপেক্ষিত সাতজন* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৮০)

ড. মুহম্মদ মুজীবুর রহমান, *ইসলামী সাহিত্য চর্চায় তসলিম উদ্দীন আহমদ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ১৯৮২)

মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস, *নজরচ্ল কাব্যে নবী মোস্তফা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জানুয়ারি ১৯৮০)

ড. মুহাম্মদ আবদুলণ্টাহ, *মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি সাহিত্যিক* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৮০)

মোহাম্মদ আবদুর রউফ, মুন্সী শেখ জমিরচদ্দিনঃ সমকালীন প্রেক্ষাপটে ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০৫)

মনিরচদ্দীন ইউসুফ, *বাংলা সাহিত্যে সূফী প্রভাব* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মে ২০০৪)

মুহাম্মদ আবদুস শাকুর, *মুসলিম বিশ্বের নৈতিক পাঠক্রম* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ১৯৮৭)

মুকুল চৌধুরী, *পথিকৃৎ দশ মনীষী* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, সেপ্টেম্বর ২০০৮)

মোঃ মোবাশ্বের আলী, *নজরচ্ল প্রতিভা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ১৯৯৯)

মোহাম্মদ মাহফুজ উলণ্টাহ, *বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা প্রীতি* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রচয়ারি ১৯৮০)

মোহাম্মদ বরকতুলণ্টাহ, *পারস্য প্রতিভা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৮৭)

মহসিন হোসাইন, শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্য রত্ন (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ১৯৯৫)

অধ্যাপক মুহাম্মদ আবূ তালিব সম্পা. *বঙ্গদেশীয় হিন্দু মুসলমান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৯৪)

ড. মুহাম্মদ আবদুলণ্ঢাহ, *রাজনীতিতে বংগীয় উলামার ভূমিকা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রচ্য়ারি ২০০৯)

মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া, *উপমহাদেশের আলিম সমাজের বিপণ্ঢবী ঐতিহ্য ৪র্থ খ~* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ২০০৪)

অধ্যাপক মোঃ আব্দুল লতিফ, *আধুনিক মুসলিম মনীষা* (ঢাকাঃ বাংলা সাহিত্য পরিরদ, ২০০৪)

মনসুর মুসা, *মুহম্মদ আবদুল হাই* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮)

মুনশী শেখ জমিরচ্দ্দীন, *আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ড়* (রাজশাহী, ১৯৬৭)

মোহাম্মদ ময়জর রহমান, ‘সমাজ চিত্র’, আল-এসলাম, ভাদ্র, ১৩২৬, উদ্ধৃত, ‘জীবন ও জনমত’,

মোহাম্মদ আবদুল মজিদ, *ইবরাহীম খাঁ রচনাবলী ৩য় খ~* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ২০০২)

মিজানুর রহমান, *আবুল মনসুর আহমদের চিন্ড়ধারা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ২০০৮)

মোঃ মোসলেম উদ্দীন জোয়ার্দার, *এয়াকুব আলী চৌধুরী: জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ২০০২)

মোঃ আখতার হোসেন, *উনিশ শতকের বাংলা সাময়িক পত্রে সাহিত্য সমালোচনা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ২০০২)

মুস্ড়ফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত* **১ম** (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ফেব্রচ্য়ারি ২০০১)

মনসুর মুসা সম্পা. *মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী ৪র্থ খ~* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৫)

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পা. *মোজাম্মেল হক রচনাবলী* **১ম** *খ~* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ফেব্রচ্য়ারি ২০০৫)

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পা. মোহাম্মদ বরকতুলণ্ঢাহ রচনাবলী ৩য় খ~ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩)

মনসুর মুসা, *মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, অক্টোবর ২০০২)

র

রফিকুল ইসলাম, *কাজী নজরচ্ল ইসলাম জীবন ও কবিতা* (ঢাকাঃ মলিণ্ঢক ব্রাদার্স, ১৯৮২)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-‘হিন্দু ও মুসলমান’, সাধনা, চৈত্র, ১৩০১, The Indian Middle Class

রওশন আরা বেগম, *নবাব ফয়জুন্নেছা ও পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জানুয়ারি ২০১১)

রফিকুল ইসলাম ও অন্যান্য সম্পা. *নজরুল রচনাবলী ২য় খণ্ড* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, মে ২০১১)

ল

ডাঃ লুৎফর রহমান,'উন্নত জীবন', *ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধ সমগ্র,* বেলায়েত হোসেন সম্পা. (ঢাকাঃ দি স্কাই পাবলিশার্স, জুলাই, ২০১০)

ডাঃ লুৎফর রহমান প্রবন্ধসমগ্র, বেলায়েত হোসেন সম্পা. (ঢাকাঃ দি স্কাই পাবলিশার্স, জুলাই, ২০১০)

শ, স

শামসুদ্দিন মোঃ ইসহাক, *শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮০)

শাহাবুদ্দীন আহমদ, *ইসলাম ও নজরুল ইসলাম* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই ২০০৪)

শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নজরুল সাহিত্য বিচার* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০১)

শাহাবুদ্দীন আহমদ, *নজরুল কাব্যে ঐতিহ্যের স্বরূপ* (ঢাকাঃ জ্ঞান বিতরণী, ২০০৪)

শাহাবুদ্দীন আহমদ, *ইসলাম ও নজরুল ইসলাম,* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০)

শেখ আবদুল হাকিম, *নজরুল সাহিত্যে মানবতা ও ধর্ম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮০)

শেখ আজিজুল হক, *নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০১)

শেখ আজিজুল হক, *নজরুল ইসলাম: জীবন ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল ২০০১)

শাহজাহান মনির, *বাংলা সাহিত্যে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা (১৯১৯-১৯৪০)* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, জুন, ১৯৯৩)

শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, "মোসলেম বঙ্গ-সাহিত্য",

শেখ আবদুর রহিম, শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী

শামসুন নাহার জামান, *শেখ ফজলল করিম* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯)

শায়খ আহমদ মোলণ্ঢাজিওন, *নুরুল আনোয়ার* (দেওবন্দ: মাকতাবা থানবি, ১৯৮৩)

শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পা. *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩)

শায়ের গোলাম আকবর অনূদিত এবং মুহম্মদ আব্দুর রহমান কর্তৃক প্রকাশিত ও পুণ:মুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য

শামসুন নাহার জামান, *শেখ ফজলুল করিম* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৯)

সফিউদ্দিন আহমদ, *সাময়িকপত্রে ভাষা সাহিত্য ও শিক্ষা চিন্ড়া* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯)

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, *অনল প্রবাহ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪)

ড. সৈয়দ আলী আশরাফ, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, আগস্ট ১৯৮০)

সৈয়দ বদরচদ্দোজা, *হযরত মুহাম্মদ তাঁর শিক্ষা ও অবদান* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, অক্টোবর ২০০৩)

সৈয়দ এমদাদ আলী- ‘খান বাহাদুর কাজি এমদাদুল হক, সওগাত, ভাদ্র ১৩১৩

সৈয়দ উদ্দীন খান, মোলণ্ঢা ও সমাজ, সওগাত, আশ্বিন, ১৩৩৬, উদ্ধৃতঃ মোস্ড়ফা নূরউল ইসলাম, সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭,

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, *অনল প্রবাহ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ২০০৪)

সৈয়দ এমদাদ আলী, ‘বাঙ্গালার মুসলমান সাহিত্য সেবীগণের প্রতি’, সাম্যবাদী, কার্ত্তিক, ১৩৩২, সাম্যবাদী সাময়িকপত্রে

সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ‘মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি’, *বাঙালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্যচিন্ড়া* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯১)

সুকুমার সেন, শক শাস্ত্রবিদ মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুলণ্ঢাহ স্মারক গ্রন্থ (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)

সিরাজুল ইসলাম সম্পা. *বাংলাপিডিয়া ১ম খন্ড* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩)

বাংলা পিডিয়া ২য় খন্ড, , প্রাগুক্ত

বাংলা পিডিয়া ৩য় খন্ড, প্রাগুক্ত

বাংলাপিডিয়া, ৮ম খন্ড, প্রাগুক্ত

বাংলা পিডিয়া ৯ম খন্ড, প্রাগুক্ত

হ

হাবিব রহমান, *মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর চিন্তাধারা* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০০৩)

হাবিব রহমান সম্পা. *মুসলিম সাহিত্য সমজের বার্ষিক অধিবেশনঃ সভাপতিদের অভিভাষণ* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, এপ্রিল ২০০২)

হারুন-অর-রশীদ, 'অখন্ড স্বাধনী বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ, বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম)'

হোসেন মাহমুদ, *বাঙালি মুসলমানদের আলোকবর্তিকা ও অন্যান্য প্রবন্ধ* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫)

ড. হাসান জামান, *আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্য* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, মার্চ ১৯৮০)

হেলাল মোঃ আবু তাহের, *মুসলিম সাহিত্য প্রতিভা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ১৯৮০)

হোসেন মাহমুদ সম্পা. *শেখ ফজলুল করিম রচনাবলী* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, নভেম্বর ২০০৪)

সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Mrs, R. S, Hossain, `Educational Ideals for the Modern Indiab Girls', The Mussalman, Vol. XXV. T.W. Edition, Vol. VII, March 5, 1931.

Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslim in Bengal, Bangla Academy, Dhaka, 1977.*

Harun –or- Rashid, `The 1940 Lahore Resolution: Bengal ideas of statehood' Journal of the Asiatic Society of Bangladesh, Dhaka, June, 1994.

J.C. Marshman, Life and time of Cary, marsh man and ward, London, 1856

P.C Mozoomdar: The life and teachng of Keshabchandra Sen: 2nd edition (Calcutta, 2891)

N.K. Sinha, *The economic history of Bengal.*

Mrs, R. S, Hossain, `Educational Ideals for the Modern Indiab Girls', The Mussalman, Vol. XXV. T.W. Edition, Vol. VII, March 5, 1931.

অন্যান্য গ্রন্থ

আল'কুরআনুল করীম (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, পঁচিশতম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০২)

মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য, গদ্য, (ঢাকাঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ১৯৮৩)

মুসলিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য' মাসিক মোহাম্মদী, মাঘ, ১৩৩৪,

মুসলিম সাহিত্য সেবক, (ঢাকাঃঃজাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা, পূর্ব পাকিস্ড়ান)

বাংলার রাজনীতিতে মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)

সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ ১ম খন্ড, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২)

আল-জাহিয, *আল-বায়ান ওয়া আল-বায়ান ওয়া আল-তিব্য়ীন, খন্ড, ২, এডিশন, ৪* (মিশরঃ মাকতাবাতুল খানজি, ১৯৭৫)

আল-কুরআনের দৃষ্টিতে মাতৃভাষা চর্চা,

বাংলা সাহিত্য (সংকলন) গদ্য ও পদ্য, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য, (ঢাকাঃ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্ড়ক বোর্ড, ঢাকা, ১৯৯৬)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত পুস্ড়ক তালিকা ০৭-০৩-২০০৪ পর্যন্ড় (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: ২০০৪)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত পুস্ড়ক তালিকা ৩০-০৬-২০০১ পর্যন্ড় (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রকাশকাল: নভেম্বর, ২০১১)

লেখক মন্ডলী সম্পা. *মুসলিম মনীষা* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুন ২০০১)

সহায়ক বাংলা প্রবন্ধ

শেখ মোহাম্মদ ইদ্রিস আলী, "মোসলেম বঙ্গ-সাহিত্য", *বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান*, মোশরফ হোসেন খান সম্পা (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, জুন, ১৯৯৮)

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, "বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্যিক জাগরণ", প্রাগুক্ত

আফজাল চৌধুরী, "আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ধারা", প্রাগুক্ত

আল মাহমুদ, "আমাদের সাহিত্য", প্রাগুক্ত

আবদুস সাত্তার, "বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রভাব", প্রাগুক্ত

গোলাম মোস্ড়ফা, "বাংলা ভাষার নূতন পরিচয়", প্রাগুক্ত

আবুল মনসুর আহমদ, "সাহিত্য ও যুগধর্ম", প্রাগুক্ত

অধ্যাপক আবু জাফর, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলিম অবদান ", প্রাগুক্ত

আবুল কালাম মোহাম্মদ শামসুদ্দীন, "সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা", প্রাগুক্ত

এস. ওয়াজেদ আলী "বাঙ্গালা সাহিত্য ও বাঙ্গালী মুসলমান" *প্রাগুক্ত*

কাজী নজরুল ইসলাম "বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমান" *প্রাগুক্ত*

সৈয়দ এমদাদ আলী, "বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী মুসলমান", *প্রাগুক্ত*

ডক্টর আসকার ইবনে শাইখ, "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান", *প্রাগুক্ত*

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, "সাহিত্যে স্বাতন্ত্র কেন?" *প্রাগুক্ত*

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুলণ্‌ঢাহ্‌, "সাহিত্যের রূপ", প্রাগুক্ত

ডক্টর কাজী দীন মুহম্মদ, "বাংলা ভাষার বিকাশে মুসলমানদের অবদান" প্রাগুক্ত

ড. এস.এম. লুৎফর রহমান, "মুসলমানরাই বাঙলা ভাষার আদি ওয়ালেদ" শেখ তোফাজ্জল হোসেন সম্পা, *বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান,* (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ২০১৩)

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান, "ভাষা আন্দোলনের তিন অধ্যায়", প্রাগুক্ত

অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর রহমান, "বাংলা ভাষায় মুসলমানদের অবদান" *প্রাগুক্ত*

শাহাবুদ্দীন আহমদ, "ইসলামী ভাবপুষ্ট বাংলা ভাষার কবি-সাহিত্যিক", *প্রাগুক্ত*

কাজী দীন মুহম্মদ, “বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অবদান”, প্রাগুক্ত

মুকুল চৌধুরী, “বাংলা কবিতায় রসূল প্রশস্তি”, “বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে আমাদের অবদান”, প্রাগুক্ত

শেরে বাংলা এ.কে.ফজলুল হক, ‘‘গৌরবের মশাল হারাইয়াছি’’, *সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী* , হোসেন মাহমুদ সম্পা (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৩)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ,‘শিক্ষার বাহন’, *রবীন্দ্র রচনাবলী ৯ম খণ্ড* (ঢাকাঃ ঐতিহ্য, ২০০৬)

রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ‘ইংরেজি শিক্ষার পরিণাম’, *বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার দুশো বছর*, তপন বাগচী সম্পা. (ঢাকাঃ সূচীপত্র, ২০০৬)

রমেশ চন্দ্র মজুমদার, ‘ধর্ম ও সমাজ’, বাংলাদেশের ইতিহাস, মধ্যযুগ, জেনারেল প্রিন্টার্স, কলকাতা, দ্বি-স,

সংবাদ পত্র ও সাময়িক পত্র

সোলতান

মোহাম্মদী

The Mussalman

ইসলাম প্রচারক

মোসলেম হিতৈষী

আল্-এসলাম

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা

সওগাত

বঙ্গনূর

মোসলেম ভারত

ইসলাম দর্শন

ধূমকেতু

ছোলতান

নওরোজ

শিখা

মোয়াজ্জিন

জাগরণ

বুলবুল

আল্-ইসলাহ

মাহে নও

জার্নাল

সৈয়দ আশরাফ আলী সম্পা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৩।

এ. জেড.এম শামসুল আলম সম্পা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৩।

এ. জেড.এম শামসুল আলম সম্পা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০৪।

এ. জেড.এম শামসুল আলম সম্পা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৪।

মোঃ ফজলুর রহমান সম্পা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ, ২০০৮।

মোঃ ফজলুর রহমান সম্পা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০৮।

সামীম মোহাম্মদ আফজাল সম্পা ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন, ২০০৯।

মুহিউদ্দীন খান সম্পাঃ মাসিক মদীনা, সীরাতুন্নবী (সাঃ) সংখ্যা ৯৯, ৩৫ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুন, ১৯৯৯।

প্রফেসর ড.এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন সম্পাঃ জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামিক রিবার্চ সেন্টার, সংখ্যা ৫ জানুয়ারি-জুন, ২০১২।